সপ্তসাগর

শ্রীমতী বাণী রায়

কমলা বুক ডিপো
কলেজ স্কোয়ার / কলিকাতা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্তা বেলা
শ্রীযুক্ত সুশীল
শ্রীযুক্তা চম্পা
শ্রীযুক্ত অনিল
} রায়

করকমলেষু

১। **জুপিটার**—(কাব্যসংগ্রহ) মূল্য ১॥০ 'রঞ্জন পাবলিশিং', ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড। ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত বলেছেন: "এই দৃঢ়তার সাধনায়ও লেখিকা নিজের স্বাভাবিক অনুভূতি ও দৃষ্টিকে আবৃত করে সজ্ঞানে কি অজ্ঞানে পুরুষের মত ভাবতে ও দেখতে চেষ্টা করেননি। এ কাজ সহজ নয়। এই কবিতাগুলিতে লেখিকা সেই শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন।"

২। **পুনরাবৃত্তি**—(গল্পসংগ্রহ)—মূল্য ২॥০ প্রকাশক, মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের মুখবন্ধ "বাঙালী মেয়ের পক্ষে এতটা দুঃসাহস অপ্রত্যাশিত।"

৩। **প্রেম**—(উপন্যাস) মূল্য ৩৲ জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশরস্ বিভিন্ন পত্রিকায় সমভাবে নিন্দা ও প্রশংসা লাভ করেছে। কোন সমালোচকই এই অদ্ভুত বইটি সম্বন্ধে একমত হ'তে পারেনি;

৪। **শূণ্যের অঙ্ক**—প্রকাশক 'জিজ্ঞাসা'—শ্রীমতী সুচেতা কৃপালিনীর ভূমিকা। উৎসর্গপত্র—"জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতবর্ষের মেয়েদের হাতে দিলাম, যাদের সমষ্টিগত জীবনে আমরা শূণ্যের অঙ্ক দেখি।"

৫। **রঞ্জনরশ্মি** (বিচিত্র গল্পসংগ্রহ) মিত্র ও ঘোষ ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট ২॥০। এই পুস্তকের মনোস্তত্ব-নির্দ্দেশিকা খ্যাতনামা মনোস্তত্বিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোস্তত্ব-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় স্বয়ং লিখে দিয়ে বইটির বিজ্ঞানী অনুসন্ধিৎসাকে মর্য্যাদা দিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ভূমিকার জন্য শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে, 'দীক্ষা' গল্পের ছবি দুইখানির জন্য শিল্পী শৈল চক্রবর্ত্তীকে এবং উপসংহারের "গানগুলি মোর কাঙালের মত" ও "কাজল চোখে চাইলে চোখে"—গান দুইখানির জন্য নাম গোপনেচ্ছু কোন গুণী ব্যক্তিকে ধন্যবাদ দিলাম।

গ্রন্থকর্ত্রী

আধুনিক সাহিত্যিকমণ্ডলীর মধ্যে শ্রীমতী বাণী রায় অতি অল্প দিনেই একটি বিশিষ্ট স্থান অর্জন করিয়া লইয়াছেন। ছোটগল্প, উপন্যাস, সমালোচনা, গীতি-কবিতা, ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতি সাহিত্যের নানা বিচিত্র বিভাগে ইঁহার রচনা সুধীজনের অনুমোদন ও প্রশংসা লাভ করিয়াছে। সাহিত্যের নানা form এ ইঁহার অনায়াস-পটুত্ব ও স্বচ্ছন্দ-সাবলীল ভঙ্গী সত্যই বিস্ময়প্রদ। বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে এক আঙ্গিক হইতে বিভিন্ন আঙ্গিকে সঞ্চরণ-নৈপুণ্য ইঁহার রচনার বহুচর-বৃত্তির প্রশংসনীয় নিদর্শন। ইঁহার সাহিত্য-কৃতির উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য ইঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চ আশা জাগায়।

সম্প্রতি ইঁহার বিবিধ-রচনার একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সংকলনে তাঁহার ছোটগল্প, কবিতা, সমালোচনা প্রভৃতি নানা বিষয়ক রচনার উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। একখানি সম্পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসও ইহার মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। কৌতূহলী পাঠক এই একখানি সংকলন গ্রন্থের মাধ্যমে শ্রীমতী রায়ের সাহিত্যসাধনার বিস্ময়কর বৈচিত্র্য বিষয়ে সন্তোষজনক পরিচয় লাভ করিতে পারিবেন।

ম্যাথিউ আর্নল্ড তাঁহার ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও বাইরণের কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ উপলক্ষে বিশেষ জাতীয় কবি সম্বন্ধে সংকলনের বিশেষ উপযোগিতার বিষয় উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন। এক জাতীয় কবি আছেন যাঁহাদের সমগ্র রচনায় উৎকর্ষের বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয়। তাঁহাদের প্রথম শ্রেণীর রচনার সহিত অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট রচনা মিশ্রিত থাকে। তাঁহাদের প্রতিভার অসমতা ও বিচার-বুদ্ধির অনির্ভর-যোগ্যতা শ্রেষ্ঠ ও অপকৃষ্টের মধ্যে সুনিশ্চিত সীমারেখা টানিয়া দিতে পারে না। মাতার যেমন নিজ সন্তান সম্বন্ধে এক প্রকার স্নেহান্ধ সমদর্শিতা থাকে নিজেদের মানসসন্ততির প্রতি এই কবিদেরও অনেকটা সেইরূপ নির্বিকার মনোভাব। বিশেষ করিয়া যে সমস্ত সাহিত্যিক কোন বিশেষ theoryর দ্বারা আবিষ্ট থাকেন তাঁহাদের পক্ষে এই theoryর সাম্যবিধায়ী আচরণ ভেদ করিয়া রচনার অন্তর্নিহিত পার্থক্য পরিমাপ করা সহজ হয় না। সেইজন্য ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায়

শিব ও পাথরের মধ্যে প্রভেদ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই—পূর্ব ধারণার বিভ্রম তাহার স্বাভাবিক সূক্ষ্ম দৃষ্টির উপর তিমির যবনিকা টানিয়া দিয়াছিল। বাইরণের কবিতায় বিদ্রোহের সদা-প্রবাহিত ঝটিকা ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মৃদুতর ঘূর্ণীপাক ধূলা-বালি-ঝরা-পাতার আবর্জনা উড়াইয়া ছড়াইয়া শিল্পীর শাশ্বত স্থির দৃষ্টিকে বিপর্যস্ত করিয়াছিল, তাঁহার সৌন্দর্য্যের আদর্শের দেহে নানা ক্ষত চিহ্নেব বিকৃতি আরোপ করিয়াছিল। বাইরণ পড়িবার সময় আমরা লেখকের দুরন্ত জীবনাবেগ, বিদ্রোহের অপরিসীম ঔদ্ধত্য ও রোষের উত্তুঙ্গতা দ্বাবা এমন ভাবে আবৃষ্ট হই যে তাঁহার নিখুঁত শিল্পায়নের দিকে লক্ষ্য দিবার অবসব পাই না। কাজেই ওয়ার্ডসওয়ার্থেব দার্শনিকতাব তলানি ও বাইবণেব ক্ষোভের ফেনোচ্ছ্বাস যথা সম্ভব বাদ দিলে যে সারাংশটুকু বাকী থাকে তাহাতেই তাঁহাদের সত্য কবি পরিচয় উদঘাটিত হয়।

আমার মনে হয় যে শ্রীমতী বাণী রায়েব ক্ষেত্রেও এই বর্জ্জন ও সুষ্ঠু নির্ব্বাচন প্রণালী অবলম্বন করিলে তাঁহার আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি পাইবে। বাইবনেব সঙ্গে তাঁহার কাব্যমনোভাবের দিক দিয়া কিছুটা মিল দেখা যায়। তাঁহাব ব্যঙ্গ বিদ্রূপেব অকুতোভয় স্পর্দ্ধা ও তীক্ষ্ণতা, তাঁহার প্রচলিত নারীসুলভ সংস্কাব ও ভাবার্দ্র কোমলতার অকুণ্ঠ অস্বীকৃতি, তাহাব মনীষার ক্ষুবধাব ছেদনশক্তি, জীবনেব বিকৃত দিকের সহিত পরিচয়ের সদম্ভ উচ্চ ঘোষণা—এ সমস্তই তাঁহাব কাব্যধমনীতে বাইবনীয় রক্তকণিকার অস্তিত্বের নিদর্শন। কতকটা যুগ প্রবাহে, কতকটা ব্যক্তি মানস প্রবণতায় শ্রীমতী রায় জীবনকে একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিতে অভ্যাস করিয়াছেন; তরুণ জীবনের সর্বাশ্রয়ী আতিথেয়তা, সমস্ত অভিজ্ঞতাকে অভিনন্দন করিবার উদার উন্মুখতা যে কোন কারণে তাঁহাব শিল্পবোধের আমন্ত্রণ লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং তাঁহার form ও প্রকরণের বিস্ময়কর বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাঁহার বিষয়বস্তুর মধ্যে পুনরাবৃত্তিপ্রবণতা কতকটা লক্ষিত হয়। ছোটগল্প, কবিতা, উপন্যাস, ব্যঙ্গরচনা প্রভৃতি বিচিত্র বহিরাবরণের মধ্যে একই মনোভাব, অভিজ্ঞতার অভিন্ন অন্তঃসম্পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কাজেই মনে হয় যে একই বিষয়ের বিভিন্ন-রূপী আলোচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কয়েকটি উদাহরণ বাছিয়া লইলে লেখিকার সাহিত্যিক বৈশিষ্টের পরিচয়ের কোন অঙ্গহানি হইবে না। সংক্ষিপ্ত-সংহত সংস্করণের আঁট-সাঁট পোষাকেই তাঁহার সাহিত্য-সরস্বতীকে মানাইবে ভাল।

আদর্শ বিপর্য্যয়ের যুগে যে সাহিত্যে শ্লেষপ্রবণতা বাড়ে এই বহু-পরীক্ষিত সত্য আবার নূতন করিয়া বর্তমান যুগে প্রমাণিত হইয়াছে। গভীর ভাবাবেগের কূপে নির্মল জলের উৎস যখন নিঃশেষিতপ্রায় তখন সেখান হইতে ব্যঙ্গবিদ্রূপের আবিল, বালুকামিশ্রিত জলই সাহিত্যের জলাধারে উঠিয়া আসে। যুগসমাপ্তির উৎকট অসামঞ্জস্য চোখে এত বেশী করিয়া পড়ে যে তাহার স্বরূপ-উদঘাটন ও মুখোসঅপসারণেই পরিবর্তন-যুগের সাহিত্য বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করে। প্রতি যুগে রুচি ও আদর্শের স্রোত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ তটভূমির ভাঙ্গা-চোরা অসমতায় বিশেষ অসঙ্গতিটি ব্যঙ্গ-রসিকের বাঁকা কটাক্ষে বিদ্ধ হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত পরিচয়ের পর হইতে ইহার বিকৃত অনুকরণপ্রবণতার কত প্রকার-ভেদই না ব্যঙ্গের বিষয় জোগাইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত হইতে বাণী রায় পর্য্যন্ত ব্যঙ্গ-রসিকের শোভাযাত্রা এক অবিচ্ছিন্ন রেখায় গ্রথিত হইয়াছে। এই পরিচয়ের প্রথম যুগে ইংরেজের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সমাজ-আদর্শের অনুকরণ এক কথায় সাহেবিয়ানার অভিনয়—ব্যঙ্গের উপকরণরূপে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে এই পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হইয়াছে, ততই সাহেবিয়ানা, পোষাক-পরিচ্ছদ আদব কায়দার সীমা অতিক্রম করিয়া আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে চলিয়াছে। আমাদের মর্মমূলে যে জীবনাদর্শ অঙ্কুরিত, তাহাই আজ পাশ্চাত্য প্রভাবে বিসদৃশ রকমের ফুল-ফল প্রসব করিতেছে। মোসাহেবি প্রবৃত্তিটা আমাদের সনাতন ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত কিন্তু ইহার সহিত flirtation ও snobbery, ভালবাসায় চটুল বেহায়াপনা ও আভিজাত্যের উপহাস্য অভিনয় সংযুক্ত হইয়া সমাজ-দেহে একটি জটিল, মিশ্র ধরণের ব্যাধির সৃষ্টি করিয়াছে। এই বিস্ফোটকের চিকিৎসার জন্য অতি-আধুনিক ব্যঙ্গ-সাহিত্যিক ব্যবচ্ছেদ-ছুরিকায় শান দিতেছেন।

শ্রীমতী রায়ের ছোটগল্পের মধ্যে 'খেলা নয়' গল্পটি সমাজ বিধিতে অধুনা সুপ্রতিষ্ঠিত এক অভিনব কামকলাপদ্ধতির সাক্ষ্য বহন করে। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে' যে অবাধ দেহসম্ভোগেচ্ছা রাজপরিবারের সম্ভ্রম-মর্যাদা, মালিনীর দৌত্য ও সখিবৃন্দের সোৎসাহ সমর্থনের অনুকূল প্রতিবেশে বর্দ্ধিত হইয়া দেবমহিমা প্রচারের ও প্রাচীন যুগসম্মত গান্ধর্ব বিবাহের ছদ্মাবরণে নিজ শালীনতা ও সুরুচি

বজায় রাখিয়াছিল, আধুনিক যুগে তাহাই অন্য অজুহাতের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া স্বয়ংসিদ্ধ অধিকারে, কেলি-বিলাসের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতব্যঞ্জনারচিত চিন্ময় মূর্তিতে সাহিত্যের আকাশ-বাতাসে পরিব্যপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। পঞ্চশরের স্থূল মূর্তি ভস্মীভূত হইয়া তাহার সূক্ষ্মদেহ সাহিত্যিক বিশ্বে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। একুশ বৎসরের তরুণের সহিত উনত্রিশ বৎসরের প্রণয়কলানিপুণ, সাংসারিক জ্ঞানে পরিপক্ক বস্তুসঞ্চয়-স্থূল এক নারীর প্রেমলীলাভিনয় মানস ব্যাভিচারের একটি অভিনব ভাব-বিগ্রহকে রূপ দিয়াছে। শ্রীমতী রায়ের কৃতিত্ব, এই অনির্দেশ, পলক-পলাতক মনোভাবটিকে রেখায়, রংএ ও বর্ণনা-বিবৃতির আবেশময় ব্যঞ্জনায় একটি উজ্জল, বর্ণাঢ্য, অর্থগূঢ় চিত্রের স্থির বেষ্টনীর মধ্যে তিনি আবদ্ধ করিয়াছেন। এই চিত্রের মধ্যে নিষ্ঠুর সহানুভূতিহীন ব্যঙ্গের প্রখর উত্তাপে করুণ রসের ক্ষীণতম স্নিগ্ধতাটুকুও নিঃশেষে উবিয়া গিয়াছে। ব্যর্থ জীবনের আত্মকলাও এই ধূসর বালুকাবিস্তারের সুদূর দিকচক্রবালে বাষ্পবিভ্রমের মরীচিকা রচনা করে নাই। শ্রীমতী (গল্পের নায়িকা) বিবাহিতা ও স্বামীর সঙ্গে তাহার প্রবাসের স্থানগত দূরত্ব ছাড়া আর কোনও গভীরতর মর্মান্তিক ব্যবধান মুখব্যাদান করে নাই। আবার তাহার প্রণয়ী তরুণটিও প্রণয়ব্যাপারে অনভিজ্ঞতার ভান করিয়া শ্রীমতীকে এই খেলায় প্রণোদিত করিয়াছে আসলে তাহারও কিছু শিখিবার নাই। সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটি ছেলেখেলার একটা বয়স্ক সংস্করণ মাত্র। অবসরবিনোদের উপযোগী একটা রঙ্গীন বুদ্বুদবিলাস মাত্র! ইহার মধ্যে কোথাও কোন নাড়ীর টান নাই। গভীর সুরের রেশ নাই। ইহা নিছক ব্যঙ্গ-প্রহসন ও লেখিকার শিল্প-কৌশলের সার্থক উদাহরণরূপেই গ্রহণীয়।

(৩)

'লোফারের কাহিনী', 'নীলা ঝি' ও 'ইঁদুর' গল্পগুলির মধ্যেও আমাদের সমাজে Snobberyর যে নূতন প্রকরণ দানা বাঁধিয়াছে তাহার মুখোস খোলার অত্যুৎসাহ ও অব্যর্থ শরবেধনৈপুণ্য লক্ষিত হয়। আধুনিক লোফার প্রাচীন মোসাহেবের নূতন সংস্করণ—তফাৎ এই যে ইহার আত্মসম্মানহীন মনোরঞ্জনকলা সদর অপেক্ষা অন্দর সহজেই বেশী সক্রিয় এবং মুখরোচক কুৎসা রটনাই ইহার প্রধান অস্ত্র। 'নীলা ঝি' গল্পে ঝি জাতীয়া স্ত্রীলোকের নিজের কদর সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণার অসারতা কৌতুকজনক ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

'ইঁদুর' গল্পটি ব্যঙ্গরচনার একটি শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। পরিবর্তিত সমাজে আধুনিক নারীর স্বপ্ন-কল্পনা ও জীবনে সার্থকতার আদর্শ যে সম্পূর্ণ নূতন অক্ষপথে আবর্তিত হইতেছে তাহাই গল্পটির প্রেরণা জোগাইয়াছে। রাগিণী চক্রবর্ত্তী গানের ফাঁদ পাতিয়া ভাঁটাধরা যৌবনের বিদায়ক্ষণে প্রেমিক ধরিবার প্রাণপণ চেষ্টায় আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছে। যখন সাফল্য প্রায় করায়ত্ত, মিলনলগ্ন সমাগতপ্রায়, তখন এক তথাকথিত বান্ধবীর নিঃস্বার্থ অপচিকীর্ষা এক মুহূর্তে তাহার স্বপ্নসৌধের তলদেশে সুরঙ্গ কাটিয়া উহাকে ধূলিসাৎ করিয়াছে। রাগিণীর ফাঁদপাতারও যেমন, ইঁদুরের ঈর্ষ্যারও তেমনি নূতন যুগে নূতন ভাবে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে। রাগিণীর আত্মবিশ্লেষণে নিজের দুর্বলতা ঢাকিবার কোন চেষ্টা নাই—তাহার কৃপণতা ও ছোট নজরই তাহার একান্ত বশীভূতা সহচরীকে শত্রুতে পরিণত করিয়াছে। ইংরাজীতে যাহাদিগকে Old maid বলে সেই জাতীয় স্ত্রীলোকের চরিত্রের রুক্ষ তিক্ততা ও সন্দিগ্ধচিত্ততা রাগিণীতে চমৎকার ভাবে ফুটিয়াছে। ইঁদুরেরও সদাতৎপর আজ্ঞানুবর্তিতার পিছনে যে বিদ্বেষ ও প্রতিঘাতস্পৃহা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহার ইতিহাসটি সার্থক ইঙ্গিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। মনে হয় যেন স্বজাতীয়া লেখিকা ছাড়া আর কাহারও পক্ষে নারীর গোপন দুর্বলতার রন্ধ্রগুলি এমন অভ্রান্ত সূক্ষ্মদর্শিতা ও নির্মম সত্যনিষ্ঠার সহিত উদঘাটিত করা সম্ভব ছিল না।

'ফরাসী শিক্ষক' গল্পটি নিখুঁত ছোটগল্পের একটি উদাহরণ, রসের ভিন্ন প্রকাশ।

'চায়ের দোকান'টি-র আখ্যান-স্তর অত্যন্ত ক্ষীণ; ইহা প্রধানতঃ Addison, Steele বা Hazlittএর মত মননপ্রধান ও প্রবন্ধধর্মী। লেখিকার পরিচিতি-পত্রে সমস্ত রচনার জাতি পরিচয় আছে। চায়ের দোকানের আবহাওয়াটি একটি চিত্রের মত উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে; চায়ের উষ্ণ পেয়ালার চুমুক দেওয়া মাত্র মস্তিষ্কে যে সব অতিস্ফীত, অবাস্তব বাষ্পোচ্ছ্বাস গেঁজাইয়া উঠে যেরূপ দায়িত্ব-জ্ঞানহীন, নেশার আবেশ-সঞ্জাত অতিশয়োক্তি সকলের সমাবেশ হয়, স্থূল ইতর রুচি ও নিরঙ্কুশ পণ্ডিতম্মন্যতা যেরূপ পরস্পরের পরিপূরক রূপে আবির্ভূত হয়, গল্পটির মধ্যে তাহার একটি সুন্দর শ্লেষ-ব্যঞ্জনায় উপভোগ্য বাস্তব চিত্র অংকিত হইয়াছে।

'দীক্ষা' গল্পটিও লেখিকার স্বকীয়তার নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখযোগ্য। পঞ্চাশের মন্বন্তর লইয়া বাংলা-সাহিত্যে গল্প-উপন্যাসের বাণ ডাকিয়া গিয়াছে। দলে দলে

বুভুক্ষু নর-নারীর মিছিলের মত প্রকাশিত গ্রন্থাবলীরও একটি অনুরূপ সুদীর্ঘ মিছিল বাহির হইয়াছে। এই গল্পগুলি সবই করুণ-রসের অফুরন্ত প্রস্রবণ। দীর্ঘশ্বাসে ক্ষুব্ধ অশ্রুজলে স্যাঁতসেতে ও অবরুদ্ধ অসহায় ক্রোধে উষ্ণ। তাহাদের রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্বন্ধে লেখকবৃন্দের অতি-সচেতনতা তাহাদের মানসিক আবেদনকে অনেকটা গৌণ করিয়াছে। বাণী রায় তাঁহার গল্পে এই অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাসের প্রশ্রয় দেন নাই। এই শোচনীয় ব্যাপারে স্বচ্ছল অবস্থার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরও যে দায়িত্ব ছিল, তাহারাও যে মাঝে মাঝে একটু হাতঝাড়া রকম সাহায্য ছাড়া দুঃখের সত্যকার প্রতিকারের জন্য তাহাদের সবটুকু কর্তব্য করে নাই; তাহাদের ভাববিলাসমূলক সহানুভূতির পিছনে যে ছদ্মবেশী উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যই আত্ম-গোপন করিয়াছিল, এই নিষ্ঠুর আত্মপ্রসাদবিধ্বংসী সত্যটি তিনি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। যেখানে আমরা অশ্রুপ্লাবিত জলাভূমিতেই পদক্ষেপ করিতে অভ্যস্ত সেখানে স্বল্প-সিক্ত উপরিভাগের নীচে শক্ত কাঁকরের পাথুরে মাটিই আমাদের চরণকে ক্ষত-বিক্ষত করে এই আবিষ্কার যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি হিতকর। তারপর স্বামীপুত্রহীনা অনাথা রমণীটির আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায়টিও আমাদের সনাতন নীতি-বোধের সম্পূর্ণ বিরোধী; কিন্তু ইহা লেখিকার বলিষ্ঠ বাস্তবপ্রীতিরই পরিচয় বহন করে। যে মন্বন্তর আমাদের চিরন্তন সংস্কৃতি ও ধর্মজ্ঞানের বিপর্যয় না ঘটাইয়া, যাহা কেবলমাত্র আমাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, গৃহস্থজীবনের নিরাপদ আরাম ও বাইরের সম্ভ্রম-মর্যাদা মাত্র বিলুপ্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইল, তাহার মন্বন্তর আখ্যা নিশ্চয়ই অতিরঞ্জনের পর্যায়ভুক্ত। মহাভারতেও দেখি কৃষ্ণের লীলাসংবরণের পর যাদবরমণীরা অনার্য্য দস্যুকুলের অভিভব স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

সংকলনগ্রন্থে লেখিকার একটি সমালোচনা ও একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস মাত্র স্থান পাইয়াছে। সমালোচনাটির মধ্যে সূক্ষ্মদর্শিতার নিদর্শন আছে। অভিনব উপন্যাসটি পাঠকের হাতে তুলিয়া দিলাম। উপন্যাসটির পরিশিষ্টে লেখিকার পরিণতপ্রজ্ঞার নিদর্শন পাওয়া যায় ও বুদ্ধিপ্রখর উপলব্ধি ধরা পড়ে।

(৪)

এবার সংক্ষেপে কবিতাগুচ্ছের বিষয়ে কিছু বলিব। সংগৃহীত কবিতাগুচ্ছের মধ্যে তিনটি শ্রেণী পৃথক করা যায়। কতকগুলি নৈরাশ্যধর্মী, দীর্ঘশ্বাসক্ষুব্ধ, অতৃপ্তির এলো-মেলো হাওয়ায় উদ্‌ভ্রান্ত কবিতার পর্যায়ভুক্ত। মনে হয় যেন গভীর ভাবাবেগের ফাঁকে

ফাঁকে সঞ্চরণশীল শ্লেষপ্রবণতা উক্ত কবিতাগুলির রসকে জমাট বাঁধিতে দেয় নাই। শ্লেষ ও ভাব-গভীরতার সার্থক সমন্বয়ে গঠিত যে সম্ভাব্য মিশ্র মনোভাব এই কবিতাগুলিকে গঠন-সংহতি ও অন্তঃসঙ্গতি দিতে পারিত তাহাও যেন ঠিক গড়িয়া উঠে নাই। বিপরীতমুখী আকর্ষণে, অতর্কিত পরিবর্তনে, মানস-সংস্থিতির ক্ষিপ্র গতিবেগে কবিতার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অস্পষ্ট থাকিয়া যায় ও পাঠকের মনও নিশ্চিন্ত নির্ভরতাব সহিত কোন একটি কেন্দ্রিক ভাবকে আশ্রয় করিবার সুযোগ পায় না। ইহাদেব মধ্যে বিচ্ছিন্ন পংক্তিতে কবিত্বশক্তির দ্যুতি ঠিকরাইয়া উঠে। কিন্তু সমগ্র ভাবে একটি সম্পূর্ণ আলোক-বৃত্ত উদ্ভাসিত হয় না। যেন কাব্যানুভূতির ও ভাবোচ্ছ্বাসের মেঘ সংহত হইয়া নিবিড়তা লাভ করার পূর্বেই চিত্তবিক্ষেপের আকস্মিক দমকা হাওয়া তাহাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া উড়াইয়া দেয়। দিকচক্রবালে পুঞ্জীভূত মেঘের সমারোহ বৃষ্টির দাক্ষিণ্যকে আমন্ত্রণ করিয়া আনে না—কবির চাপল্য ও অস্থিরমতিত্বে পাঠকের মনেও অনুরূপ অতৃপ্তি জাগায়। হয়ত ইহা আধুনিক জীবনের অনতিক্রম অভিশাপ। মন যেখানে টুকরা টুকবা হইয়া নানা মরীচিকার অনুকরণে নিজ একাগ্রতাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া দিতেছে সেখানে সাহিত্যভাবেব কেন্দ্রমুখীনতা, মননেব একনিষ্ঠতা আসিবে কোথা হইতে?

শুদ্ধ প্রেমেব কবিতাগুলি বিচারেব মানদণ্ড স্বতন্ত্র। তাহাদেরই মধ্যে অনুপেক্ষনীয় কাব্যসম্পদ যথেষ্ট পরিমাণেই আছে।

তৃতীয় শ্রেণীর কবিতাগুলি সম্বন্ধে আরও মনখোলা প্রশংসা করা যায়। এগুলি আকারে সনেট ও লেখিকার অবিমিশ্র কবিত্বশক্তির নিদর্শন। 'অরণ্যমর্মর' অভিহিত এই সনেটগুলিতে কবিব বনানীব প্রতি নিবিড মোহ, তাহাব অগনিত প্রাণস্পন্দন, সবুজেব অজস্রতা, আদিম বন্য প্রকৃতির সূক্ষ্ম অনুভূতি, সনেটেব উপযোগী ভাব-নিবিডতা ও আঙ্গিকের দৃঢ়বদ্ধ সংহতির সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। অবশ্য সমস্ত সনেটেই যে এই উচ্চ আদর্শ অক্ষুন্ন আছে তাহা দাবী করা যায় না। কল্পনার লঘু খেয়াল, ভাষার অসংযম ভাবের কেন্দ্রশাসন-অসহিষ্ণু স্বচ্ছন্দচারিতা অনেক ক্ষেত্রে উৎকর্ষের মানকে নামাইয়া আনিয়াছে। তবু সনেটগুলি সত্যই আশ্চর্যরূপে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। লেখিকার স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্যানুভূতি এই কঠোর শাসন-সংযত সংক্ষিপ্ত আঙ্গিকের মধ্যে দৃঢ়পেশীবদ্ধ দেহে যৌবনলাবণ্যের ন্যায় অপরূপতা লাভ করিয়াছে। লেখিকার কবিমানসের সৌকমার্য শ্লেষাত্মক মনোভাবের বিসদৃশ সাহচর্য্য হইতে বিভক্ত হইলে সৌন্দর্যসৃষ্টির উন্নতর স্তরে পৌছিতে পারিবে।

গ্রন্থ সম্বন্ধে সাধারণভাবে দুই একটি মন্তব্য করিয়া ভূমিকার উপসংহার করিব। শ্রীমতী বাণী রায়ের প্রধান অভাব অনেক ক্ষেত্রে স্থিরদৃষ্টি ও সমগ্র জীবন-দর্শন। এখনও ইনি কিছু পরিমাণে প্রতিবেশের প্রভাবগ্রস্ত। প্রতিবেশ জীবনের যে খণ্ডাংশ সমূহ, যে অতি প্রকট বিকৃতিগুলি চোখের সামনে মেলিয়া ধরে, সাধারণ অনুভূতি আকাশ-বাতাসে ভাসমান যে ভাবকণিকাগুলি শুষিয়া লয়, অভিজ্ঞতা কি তাহারই মধ্যে সীমাবদ্ধ? যে পরিণত প্রজ্ঞা, দূরপ্রসারী কল্পনা ও সংশ্লেষশীল জীবনদর্শন জীবনের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত টুকরাগুলিকে এক গভীর রহস্যময় তাৎপর্যের সূত্রে গাঁথিয়া তুলিতে পারে তাহা আধুনিক সাহিত্যে বিশেষ দৃষ্টিগোচর নহে। যুগপ্রভাব যে এই সংশ্লেষণী দৃষ্টির প্রতিকূল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

শ্রীমতী বাণী রায় এখনও তরুণবয়স্কা, জীবনের প্রাত্যহিক অনুভূতিগুলির ঘটমান জগৎব্যাপারের কম্পন-আন্দোলন-অভিঘাত-সমূহের মর্মোদ্ঘাটন উপরিভাগের চাঞ্চল্যের সঙ্গে গভীরশায়ী শাশ্বত বিশ্ববিধানের যোগসূত্র আবিষ্কার যে পরিমাণ পরিণত বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভরশীল এই বয়সে তাহা থাকিবার কথা নয়। তথাপি তাঁহার মধ্যে যে উৎকর্ষ আছে তাহা সত্যই চমৎকার। তাঁহার চিন্তার স্বাধীনতা, দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য সত্যানুসন্ধানের দুঃসাহসিকতা, অনুভূতির আন্তরিকতা, ও প্রকাশভঙ্গীর অসঙ্কোচ বলিষ্ঠতা—এ সমস্তই তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিদর্শন। প্রচলিত ভঙ্গিমা (mannerism) হইতে নিজ স্বকীয়তার সম্পূর্ণ উদ্ধার ও ইহার উজ্জ্বলতর সার্থকতররূপে প্রতিষ্ঠা—এই পথ ধরিয়াই তাঁহার অগ্রগতি চলিতে থাকিবে এইরূপ আশা করি। বিষয়গৌরবের সহজ উপলব্ধি ও পরিণত মনন-শীলতার সহিত চমক লাগাইবার মোহ কাটিয়া যাইবে—প্রকৃত শক্তি আস্ফালন-শীলতাকে অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে। শক্তি আছে, উহার প্রয়োগ-রীতি সম্বন্ধে উত্তেজনার আতিশয্য দূর হইলেই পূর্ণ ফল পাওয়া যাইবে।

সংকলন গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে "সপ্তসাগর"। সপ্তসাগরে বলাধানকারী অবসাদনাশক, বায়ু-প্রবাহ ও তীক্ষ্ণ, ঈষৎ অস্বস্তিকর লবণাস্বাদ প্রচুর পরিমানেই আছে। বাঙ্গলা সাহিত্যের বদ্ধ কামরায় এই লবণসংপৃক্ত প্রবল হাওয়ার অভ্যাগমকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
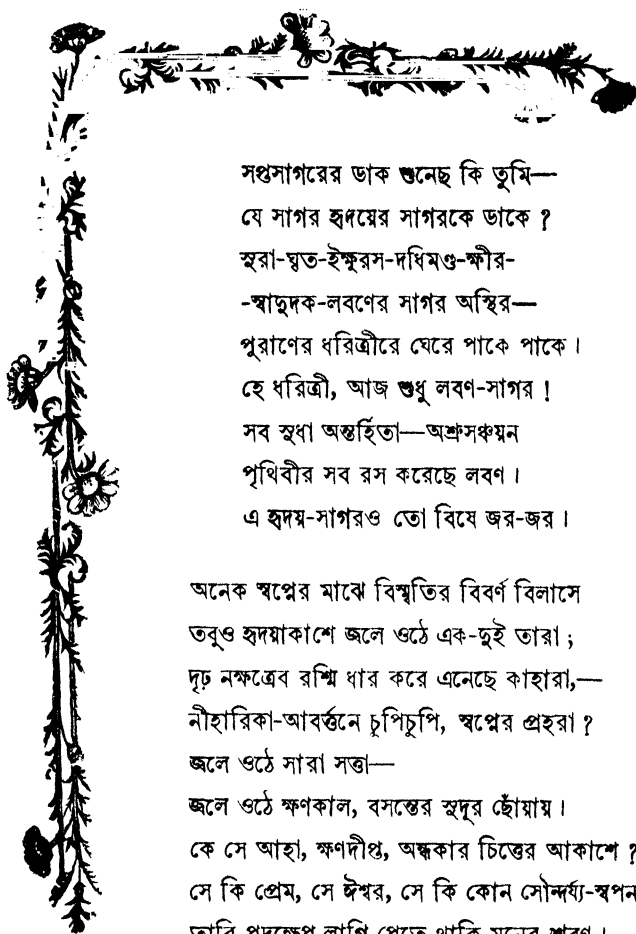
সপ্তসাগরের ডাক শুনেছ কি তুমি—
যে সাগর হৃদয়ের সাগরকে ডাকে ?
সুরা-ঘৃত-ইক্ষুরস-দধিমণ্ড-ক্ষীর-
-স্বাদূদক-লবণের সাগর অস্থির—
পুরাণের ধরিত্রীরে ঘেরে পাকে পাকে।
হে ধরিত্রী, আজ শুধু লবণ-সাগর !
সব সুধা অন্তর্হিতা—অশ্রুসঞ্চয়ন
পৃথিবীর সব রস করেছে লবণ।
এ হৃদয়-সাগরও তো বিষে জর-জর।

অনেক স্বপ্নের মাঝে বিস্মৃতির বিবর্ণ বিলাসে
তবুও হৃদয়াকাশে জ্বলে ওঠে এক-দুই তারা ;
দূঢ় নক্ষত্রেব রশ্মি ধার করে এনেছে কাহারা,—
নীহারিকা-আবর্ত্তনে চুপিচুপি, স্বপ্নের প্রহরা ?
জ্বলে ওঠে সারা সত্তা—
জ্বলে ওঠে ক্ষণকাল, বসন্তের সুদূর ছোঁয়ায়।
কে সে আহা, ক্ষণদীপ্ত, অন্ধকার চিত্তের আকাশে ?
সে কি প্রেম, সে ঈশ্বর, সে কি কোন সৌন্দর্য্য-স্বপন ?
তারি পদক্ষেপ লাগি পেতে থাকি মনের শ্রবণ।
তাহারি কচ্চিৎ ছায়া সুধাসিন্ধু করে যে লবণ।
অশ্রুর লবণ-সিন্ধু একপলে অমৃত বিলায় !
জ্বলে ওঠে দেহমন সে বসন্ত— সুদূর-ছোঁয়ায়।

গল্প—'কিছু বলবার আছে', 'কিছু বলতে চাই'—এই অনুভূতি গল্পের জন্মদাতা। যদি বক্তব্য বিশেষ না থাকে, তবে গতানুগতিক প্লট নিয়ে ছবির বর্ণনায় আধুনিক ছোট গল্প লেখা যায় না বলে আমি মনে করি। সাধারণতঃ, উপন্যাসের সঙ্গে গল্পের নানা পার্থক্য আমরা অনুধাবন করতে প্রচেষ্টা করি, যদিও গল্প ও উপন্যাসের নিত্য নূতন রূপ সাহিত্যে দেখা দিচ্ছে। মোটামুটিভাবে, উপন্যাসের আদিরূপের সঙ্গে গল্পের আদিরূপের তুলনামূলক সমালোচনায় দু'একটি তথ্যে উপনীত হই। একটি প্রণিধান-যোগ্য। উপন্যাসে সাধারণতঃ হ'ত চরিত্রের ক্রমঃবিকাশ, গল্পে পূর্ণবিকশিত চরিত্র নিয়ে আরম্ভ। সেই চরিত্রের কোন অসাধারণ পবিণতি গল্পের বক্তব্য হ'তে পারে। নানা ঘটনার গতির মধ্য দিয়ে উপন্যাস চলে, গল্প প্রধানতঃ একটি গতির দিকে উন্মুখ হয়ে থাকে। সেই উন্মুখতা গল্পের বৈশিষ্ট্য। অবান্তর-বর্জ্জিত তীক্ষ্নতা ও দ্রুততা ছোটগল্পের লক্ষণ। ছোটগল্পের ইতিহাস বাংলাভাষায় প্রাচীন না হ'লেও অত্যন্ত আশাপ্রদ। বহুল ও চমৎকার ছোটগল্প লেখা হয়েছে ভাষার গৌরব বর্দ্ধন করে। বিভিন্ন ভাষার ইতিহাসেও ছোটগল্প ক্রম-বিবর্দ্ধমান। উপন্যাসরচনায় যথেষ্ট উপাদান আবশ্যক হয়, দীর্ঘ সময় ও চিন্তাশীলতা প্রয়োজন হয়। ছোটগল্পে প্রচুর ক্ষমতা প্রয়োজন হ'লেও সূত্র টানবার প্রয়োজন হয় না সেই ক্ষমতার। তাই বোধহয় ছোটগল্প নিয়ে বেশী পরীক্ষা করা চলে। বিভিন্ন ভাষায় ছোটগল্পের প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্য দেখে সাহিত্যের ইতিহাসে দেওয়া লেবেল অঙ্কিত করে ছোটগল্পকে সংজ্ঞাদানে অভিলাষ হয় না। যে বস্তু প্রাণ-ধর্ম্মে নিত্য বর্দ্ধনশীল, তার সংজ্ঞা প্রতি মুহূর্ত্তে সে রচনা করে নেয় নব পথে। প্রতিভার হাতে সে প্রাচীন অনুশাসন অগ্রাহ্য করে নবজন্ম গ্রহণ করে যুগে যুগে। Somerset Maughamএর দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করছি ছোটগল্প সম্পর্কে :—

"Every writer sees the world in his own way and gives you his own picture of it."...

"Probability is the only test"....

সপ্তসাগর

খেলা নয়

একখানি চিত্রের মত দেখা যাচ্ছে শ্রীমতীকে। জানালার আশমানী পরদার পাশে সে বসে আছে। খয়েরী ডুরে শাড়ীর অঞ্চলের নিম্ন থেকে সুগোল বাহু প্রকাশিত, মনিবন্ধে একগাছি কঙ্কন, অনামিকায় চুনীর আংটি।

পুষ্পাধারে রক্ষিত একটি সিত পদ্মকলির প্রতি অঙ্গুলি প্রসারণ করল শ্রীমতী। নখর গোলাপী বর্ণে রঞ্জিত। বিপুল কবরী তার শঙ্খ-মসৃণ গ্রীবার ওপরে অবলুণ্ঠিত। কাল কেশে একটি সাদা ফুল মানাবে ভাল।

কিন্তু, পুষ্পাধারে রক্ষিত জলে পুষ্পের জীবন হবে দীর্ঘকাল স্থায়ী, অলকের উত্তাপে সে ঝরে পড়বে। আর কি হবে নিখুঁত প্রসাধনে? শ্রীমতীর স্বামী প্রবাসী।

তবু তুলেছি যখন পরাই যাক ফুলটা। কতদিন আর চুলে ফুল ধারণ করবার বয়স থাকবে? বিলম্ব নেই—আসছে অবসান। যৌবনের অবসান, রূপের অবসান।

ঊনত্রিংশ বৎসর। না এদিক, না ওদিক। 'গেল, গেল' রব উঠেছে, এখনও যায়নি। এখনও ক্ষীণ কটির গতিভঙ্গি অনেককে লুব্ধ করে, আকর্ণ নয়নে এখনও অনেকে ইঙ্গিত খুঁজে পায়। অবশ্য নিঃসন্তান অবস্থা এর জন্য দায়ী। নইলে বাঙালী কন্যার ঊনত্রিংশ? গতযৌবনা।

বাচা যায় এক অর্থে। মেদবাহুল্য আর ললাটে ভ্রূকুটি আনবে না। শক্ত দৃঢ় আবরণী দিয়ে দেহকে পীড়িত করে আর তন্বী সাজার দায় নেই।

মুক্ত, মুক্ত প্রেমের থেকে। বয়স্ক সাহিত্যিকেরা হয়তো কল্পনার চক্ষে মধুমঞ্জরীর সঙ্গে তাকে উপমিতা করবেন। সন্ধ্যার আবছায়া আলোতে তার প্রলেপলাঞ্ছিত মুখের দিকে চেয়ে তদ্গত চিত্তে স্বরচিত কাব্য শোনাবেন, কিন্তু তরুণেরা আর প্রলুব্ধ হবে না। তরুণদের জন্যই তো প্রেম। ওই যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে দ্বারে অনাদৃত অতিথির মত অপটু বেশে ঘুরে বেড়ায়,

অধ্যাপকেরা যাদের মানুষ বলে গণ্য করেন না, যারা সমাজে সম্ভ্রান্ত হয়ে ওঠেনি, প্রেম তাদেরি জন্য। বড় ডিগ্রিধারী, অনেক উপার্জনকারী ব্যক্তি-বৃন্দের জন্য নয়! বস্ত্র-ব্যবসায়ী নীলাম্বরী বয়ন করছে তাদেরি প্রিয়ার জন্য। বেলফুলের মালা ফেরি হচ্ছে পথে, তাদের ষোড়শী প্রেয়সী খোঁপায় দেবে বলে। তাদের চরণের শ্রীহীন পাদুকার শব্দ এখনও পঞ্চদশীদের বক্ষে দোলা আনে। নির্বোধের জন্য, অপরিনামদর্শীর জন্য, নিছক তারুণ্যের জন্য প্রেম। প্রেম যৌবনের নিজস্ব সম্পদ।

সত্যই কি বিদায় নেবে তারা, যারা এতদিন ধরে তার জীবন দুঃসহ করে তুলেছিল? যারা তার কলেজে যাওয়া আসার পথে নিয়মিত হাজিরা দিত, যাদের অসংখ্য পত্র আবর্জনার ঝুড়ি অলঙ্কৃত করেছে, যাদের পয়সা-ব্যয়-করা টেলিফোনের ডাকগুলি তাকে উত্যক্ত করে তুলেছিল? সত্যই কি সেই সব রবাহুতের দল আজ অদৃশ্য হয়ে যাবে তার যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে? কি অস্বাভাবিক হবে সে অবস্থাটা?

অথচ তার তো বিবাহ হয়ে গেছে। স্বামীর প্রেমে এখনও ভাঁটা ধরেনি। এখনও স্বামী নৈশ-শয়নের পূর্বে সুগন্ধি পোমাড সহযোগে কেশ সংস্কার করতে ভোলেন না। সন্ধ্যার পর প্রত্যহ ইস্ত্রীভাঙা আদ্দির পাঞ্জাবী পরিধান করে সম্মুখে আসেন। নয়নের তন্ময়তা, আলিঙ্গনের ব্যাকুলতা কিছু হ্রাস হয়নি। উনত্রিশ বৎসরে শ্রীমতীর ভয় কি? জমার ঘরতো শূন্য নয়।

তবু মনে বেদনা লাগে। উষাসমাগমে সহসা নিদ্রা ভেঙ্গে যায়। যৌবন চলে যাচ্ছে, আর তাকে রাখা যাবে না। প্রসাধনে বয়স ঢাকা পড়বে, যৌবনকে ফেরানো যাবে না।

অহেতুক প্রীতি এসেছে চিরদিন শ্রীমতীর পদপল্লবে উপহার। আজ অভাব সহ্য হবে না।

পরাই যাক ফুলটা। কবরীর অন্তরালে কাণ্ড অদৃশ্য হ'ল। মনে হ'ল ফুলটা যেন অলকে বিকসিত হয়ে উঠল সহসা। মনিবর্ধন বাবু নিশ্চয় কবিতা করে ওইভাবেই কথাটা বলতেন।

কিন্তু, শ্রীমতী গো, শ্রীমতী, কেন ফুল পরেছ? বয়স যাচ্ছে বলে নয়। জজি আসবে বলে।

ওঃ, ভারী একটা একুশ বছরের নাবালক শিশু। কমপক্ষে সাত-আট

বছরের ছোট। 'শ্রীমতীদি' বলে ডাকে, 'আপনি—আজ্ঞে' করে কথা বলে। ছোট ননদের সঙ্গে বিবাহ দিলে বেশ মানাবে। শ্বশুরালয়ে ফিরে যেয়েই কথাটা পাকা করা যাবে। এতদিন নানা ঘাটের নৌকা দেখে দেখে কিশোর বালকে আর অভিরুচি নেই।

তবু খয়েরী শাড়ী, যেটা পরলে বিশেষ ভাল তাকে দেখায়। তবু চুলে পদ্মকলি। একুশ—উনত্রিশ। হায় হায় করা যাক।

ছোকরার সম্পূর্ণ নাম জলদবরণ। কিন্তু ওই সচকিত মৃগনয়নে আর তরুণ তমাল তনুদেহে অত গুরুগম্ভীর নাম মানায় না। তার চেয়ে ডাক নাম 'জর্জিটা' অনেক শোভন। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর মনে করিয়ে দেবে বয়সটা তার একুশ মাত্র।

দ্বিধার সঙ্গে প্রথম আলাপের দিন বলেছিল সে, "আমাকে একটা গান শোনাবেন, শ্রীমতীদি ?"

গাইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তার মুখের দিকে একবার লক্ষ্য করে দেখে শ্রীমতী মত পরিবর্তন করল। কি সুন্দর! ওই ছিপছিপে সরল কঞ্চির মত গঠনসৌকুমার্যের জন্য, ওই ত্রস্ত-পক্ষ্মসমাকুল নয়নের জন্য, ওই কুঞ্চিত কেশস্তবকের জন্য জগতের যত শিল্প, যত সঙ্গীত রচনা হয়েছে।

তারপর সেইদিন। যেদিন জর্জি স্বীকার করল পাশের বাড়ীর মেয়ের প্রতি নিজের আসক্তির কথা। একটা নীচু আসনে বসে সে টেবিলের ওপর মাথা রেখেছিল, উল্টোদিকের আসনে বসেছিল শ্রীমতী। রক্তকিংখাবের ফিতের মত অধর জর্জির। দেখতে দেখতে সেই অধরের রং সমস্ত মুখে ছড়িয়ে গেল তার—এক হয়ে গেল তারা। কি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য!

তারপর কাজ হ'ল শ্রীমতীর, জর্জির প্রেমোপাখ্যান শোনা এবং শিক্ষা দান করা। লঘু নীল আলোতে উজ্জ্বল বর্ণের রঙ্গে দেখা যেত শ্রীমতীকে, যে রকম জর্জি পূর্বে দেখেনি। ষোড়শী পঞ্চদশীর সঙ্গে বিস্তর ভালবাসাবাসি হলেও এই নারীর অভিজ্ঞ কটাক্ষ, অর্ধজড়িত হাস্য জর্জির পক্ষে সুরার মত মাদক এবং সুরার মতই নিষিদ্ধ।

দিন অতিবাহিত হচ্ছিল না শ্রীমতীর। স্বামী প্রবাসে, পিত্রালয়ের স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কর্মবাহুল্য নেই। সরল শিশুটিকে প্রেমের ক্রীড়ায় শিক্ষা দান করে সময় কাটাবার সহজ পন্থা বাহির হ'ল শ্রীমতীর।

না, না। মৌখিক উপদেশাদি দেওয়া ভিন্ন শ্রীমতী কিছুই করেনি। আর, প্রশ্ন ওঠেনা। জর্জি একুশ মাত্র।

জর্জির প্রেম যেন শ্রীমতীরও প্রেম হয়ে দাঁড়াল। কিছু দিনের মধ্যেই পাশের বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রেমকরা অপেক্ষা শ্রীমতীর কাছে প্রেমের অভিনয় প্রদর্শনেই জর্জির বিশেষ রুচি দেখা দিল।

প্রেম কি শুধু যৌবনের জন্য? তাহলে প্রতিবেশিনী সপ্তদশীর সাগ্রহ পথ-চাওয়া ফেলে কেন জর্জি এখানে ছুটে চলে আসে উনত্রিশের কাছে? অগাধ দূরত্ব রেখে সামান্য কথার আঘাতে রক্ত স্রোতকে উদ্বেল করে তোলা যে সপ্তদশীদের সাধ্যায়াত্ত নয়। তারা জানে শুধু ভালবাসতে,—খেলা তারা এখনও শেখেনি।

নারী শুধু গ্রহণ করে যাবে—এইটাই সাধারণ মত। সেই দেবীর পদতলে প্রেম আসবে অর্ঘ্যরূপে—

> "মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ববাসনার
> অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
> অতিলঘু ভার।"

গ্রহণ করা ভিন্ন নারীর ধর্ম আর কি? সর্বতোভাবে গ্রহণ করা, সুতরাং নারীর ক্ষেত্রে বয়সের প্রশ্ন ওঠে না।

কিন্তু দেবে, পুরুষ। দেওয়া একুশ বাইশেই আসে ভাল। কিছু না রেখে উজাড় করে দেওয়া মন শক্ত হ'লে পারা যায় না। তাই পুরুষের ক্ষেত্রেই বয়স কথাটা প্রযোজ্য।

শ্রীমতী গো, শ্রীমতী, ভাবা হচ্ছে কি আশমানী যবনিকার আড়ালে বসে? ওসব কথা যে বিবেককে চাপা দেবার কথা।

ঘোর ধরে গেছে উভয়পক্ষে। তাই খোঁপায় পদ্মকলি, ডুরে শাড়ীর স্খলিত অঞ্চল। হাল্কা সুরের কথা, কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

ওইভাবে কি লোভনীয় দেখায় যে কোন নারীকে, বিশেষতঃ রূপসীকে! একাগ্রদৃষ্টি তন্ময় কিশোর, পাপপুণ্যের ধারণা যা'র স্থূল নয়। উপক্রমণিকায় শ্রীমতী অবশ্য জর্জিকে কখনই আমল দেয়নি। তার বিশ্বাস ছিল জর্জি বোধ হয় সত্যই উপদেশলাভের উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু, অবশেষে সে ধারণার অযথার্থতা সম্বন্ধে শ্রীমতীর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হ'ল।

আবার হায় হায় করা যাক। উনত্রিশ বছরের একটি রমণী একুশ বৎসরের একটি কিশোর বালককে বুঝতে পারল না! রমণীটি আবার এমন, যার সমস্ত জীবন পুরুষের প্রেম পেতে অভ্যস্ত।

পক্ষ্মসমাকুল ত্রস্ত মৃগনয়ন যার, নবদেবদারুর মত সরল যার দেহ, অধর যার রক্তকিংখাবের দুইটি অংশ—তার পর্য্যন্ত কিছু জানতে বাকী নেই। শ্রীমতীকে শিক্ষা দান করতে সেই সক্ষম। প্রেম সম্বন্ধে একুশ বছরের কিশোরেরা কতটা যে জানে অনুভব করে শ্রীমতী স্তম্ভিত হ'ল। অপ্রতিভ হ'ল। কৌতুকী হল।

তবে কেন জজি অভিনয় করেছিল? কি বিপদ! সেটা তো সহজে বোঝা যায়। মহামহিমন্বিতা শ্রীমতীদি কি তাহ'লে জর্জির মত অপ্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে ওই সব আলোচনা করতেন? একটু কৌতুহল, একটু করুণা যে জাগানো চাই। তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া যাবে।

বোঝার পরেও ছাড়লনা শ্রীমতী। কেন? কারণ তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। একুশ বৎসরের তরুণের প্রেমোন্মাদ উনত্রিশকে ঘিরে! যৌবন তাহ'লে এখনও যায়নি, এখনও পঞ্চদশী—সপ্তদশীর সঙ্গে প্রতিযোগ চলতে পারে জয়মাল্য সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত থেকে। জর্জি একটি এম-এ পড়া নগণ্য যুবক মাত্র হ'লে কি হবে? আজ তার প্রেম শ্রীমতীর কাছে প্রসিদ্ধ কবি মনিবর্ধন বা অসামান্য অভিনেতা অনিরুদ্ধ রায়ের অপেক্ষা অনেক প্রয়োজনীয়। কারণ, আজ শ্রীমতীর যৌবন চলে যাচ্ছে। একমাত্র যৌবনের অভিনন্দন, যুবকের মোহই তাকে আশ্বাস দিতে পারে—শ্রীমতী, তুমি এখনও মরোনি।

সুতরাং শ্রীমতী, প্রেম নিয়ে এতকাল খেলা করে আজ তুমি যুদ্ধে নেমেছ!

দীক্ষা

মেয়েটি কয়েকদিন হ'ল আমাদের বাড়ীর সামনে সরকারী লনে বসবাস করছে। গৃহস্থঘরের বউ ছিল, দেখেই বোঝা যায়। সিঁথিতে মেটে সিঁদুর, হাতে একগাছি ক্ষয় ধরা গেঁয়ো শাঁখার মোটা বালা। সঙ্গে ছোট বছর তিনের ছেলে একটি।

সম্পত্তি বলতে আছে একখানা মাদুর ও একটি চিরুণী। জল খেতে ও লঙরখানায় খিচুড়ি ধরতে একটা টিনের পাত্র। ছেলেটি শীর্ণ দুর্বল, হাঁটতে পারে না, বোধ হয় খাদ্যাভাবে। মা তাকে মাদুর পেতে বসিয়ে রাখে। শান্তদৃষ্টিতে চেয়ে সে গাড়ীঘোড়া দেখে, চিরুণী-টীন নিয়ে খেলা করে। একদিন
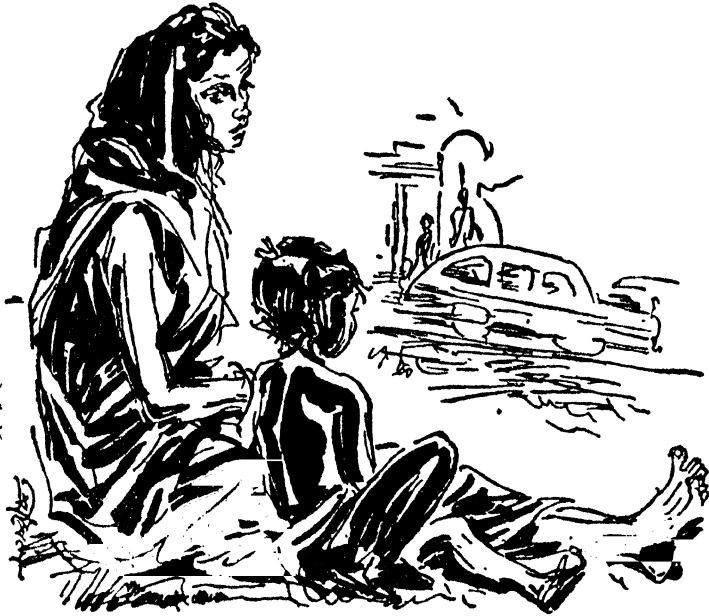
যে তার পেটে ভাত, মাথায় চাল ছিল সেকথা সে হয়তো ভুলেই গেছে। কোন নালিশ নেই তার। দিনে দুবার জলের মত পাতলা, অখাদ্য খিচুড়ি খেয়ে, মায়ের কাছে থেকেই সে খুসী। কথা বলতে পারে না, কোনদিন পারবে কিনা সন্দেহ। স্বাস্থ্যহীন শিশু ভাষাহীন চোখ নিয়ে মাঝে মাঝে

তাকায়, যখন তার মাদুর ঘেঁষে কোন গাড়ী চলে যায়। সেইসব গাড়ীতে থাকে তারা, যারা এই ছেলেটিকে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেছে। সরকারী অসম্পূর্ণ ব্যবস্থায়ও যে সব সরকারী ধামাধরা থাবা বসিয়ে বড় বড় গ্রাস ছেলেটির মুখ থেকে ছিনিয়ে দামী গাড়ীর এঞ্জিনে ঢেলে গাড়ী চালিয়েছে, তারা অবশ্যই থাকে সেইসব গাড়ীতে। ছেলেটি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে নালিশ জানায় না।

মেয়েটির স্বামী কোথায় কে জানে? হয়তো বা মন্বন্তরের বন্যায় দল বেঁধে সহরে আসতে যেয়ে ছিটকে পড়েছে। হয়তো বা দূরে মাটির নীচে মাটি হয়ে মিশিয়ে গেছে। রাস্তার ধারে পড়ে হাঁ করে ধুঁকছে। মেয়েটি তা জানে না। গৃহস্থ ঘরের বউ, চলে আসতে আসতে কতকিছু ফেলে এসেছে। শুধু রয়েছে মাদুরখানা, এখনও মাটিতে শোওয়া অভ্যাস হয়নি। রয়েছে চিরুণীটা। কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী সে ছিল। প্রতি সন্ধ্যায় চুল বেঁধে সিঁদুর পরে তুলসীতলায় দীপ দেখিয়েছে। পুরানো অভ্যাসে এখনও সহস্র লোকের দৃষ্টিতে চুলে বিকাল বেলায় চিরুণী বুলোয়, রাস্তার লন্ ঝেড়ে মাদুর পাতে। তার যৌবন অনাহারেও মরে যায়নি। ক্ষুধিত দৃষ্টি পড়ে নানাদিক থেকে। পাহারাদার পুলিশ, কোকেন-যোগানদার পানওয়ালা, উড়ে বামুন-ঠাকুর গায়ের কাছে সরে আলাপ জমাতে চায়। স্বভাবজাত গাম্ভীর্যে মেয়েটি তাদের আমল দেয় না। চুপ করে বসে নিজের মনে কত কি যেন ভাবে, কখনও রাস্তার শেষপ্রান্তে চেয়ে চেয়ে দেখে। কিসের যেন প্রতীক্ষা করে? আমি ভাবি কতদিন ওর এমন করে চলবে? আধপেটা, সিকিপেটা খেয়ে খোলা আকাশের নীচে এভাবে কতদিন ওর ছেলে বাঁচবে, কতদিনই বা ও বাঁচবে? পেটভরে খাবার, পরনের কাপড় জুটবার, মাথার ওপরে ছাদ তুলবার ব্যবস্থা এখনই ওর হয়ে যেতে পারে নূতন বড়লোক বেয়ারা-বামুনদের কৃপায়। গৃহস্থের বউ হ'লেও এখন গেরস্থালি ওর কি আছে? শুধু ওই ছেলেটাই শিকলের মত মাকে বেঁধে রেখেছে সৎপথে।

আমাদের বাড়ীর ছেলেপিলের ভুক্তাবশেষ খালি দই বা রসগোল্লার ভাঁড়ে তুলে ছেলেটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত। মাঝে মাঝে ভাল খাবারও যেত। মা নীরব কৃতজ্ঞতা জানাত চোখের চাউনীর মধ্য দিয়ে। আমাদের বাড়ীটি নিশানা ধরে আস্তানা গেড়েছিল দু'জন। বোধহয় অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে।

একদিন শুনলাম বাড়ীর মেয়েরা বলাবলি করছেন, "ছেলেটা বসে আছে কেমন করে দেখ! মাথাটা যেন বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে। হবে না? যা বর্ষা-বাদল চলছে মাথার ওপর দিয়ে।"

নিরুপায় লোকগুলির মাথা অকাল-বর্ষণে ভিজে যাচ্ছে। গোটা বর্ষাটাই গেল ওদের খালি মাথার ওপর দিয়ে। মেয়েটি ভিজে ঘাসের আশ্রয় ছেড়ে আমাদের গ্যারাজের সামনে পাকা জায়গাটুকুর ওপর মাদুর বিছোতে লাগল রাত্রে শোবার সময়। দিনের বেলা গাছের নীচে, পাঁচিলের আড়ে লুকিয়ে থাকতো বৃষ্টি এলে। গভীর রাত্রে কি করত জানি না।

আমরা তার ও ছেলেটির থাকবার কোন ব্যবস্থা করে দিলাম না। কারণ, নিজেদের অস্বস্তিকর বিবেককে বহুভাবেই আমরা ভুলিয়ে রাখতে শিখিয়েছিলাম। সরকার তো ওদের জন্য চালা বেঁধে দিয়েছেন। ইচ্ছা করে সেখানে থাকে না। সেখানে গেলেই পারে?

অসহায় ছেলেটিরও খাবার কোন বাঁধাবাঁধি ব্যবস্থা আমরা করিনি। কারণ, দু'বেলা লঙরখানা থেকে তো ওদের খাবার নিয়মিত মিলছেই। আমাদের কি দায়! ব্যবস্থা তো করাই আছে।

আজও ছেলেটার মাথা সিধে থাকছে না শুনে আমরা বিচলিত হ'লাম না। দেখলাম ছেলেটা মাথা ভেঙে যাবার মত করে ঝুঁকিয়ে চিরাভ্যস্ত জায়গায় বসে আছে। কিন্তু কান্না নেই তার, নালিশ নেই কিছু। মায়ের পাশে চিরুণী আর টিনটা নিয়ে শান্ত-সহিষ্ণু ভঙ্গিতে খেলা করে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দামী গাড়ী এলে ভাঙ্গা ঘাড় তোলবার চেষ্টা করে, না পেরে চোখ বেঁকিয়ে দেখছে। কিন্তু, মাথা তুলতে না পারলেও সে শুয়ে পড়েনি। মাও ছেলের দিকে উদ্বিগ্ন চোখে ঘন ঘন চেয়ে দেখলেও বাহ্যতঃ স্থির আছে! আমরাও ভাবলাম কিছু একটা হয়েছে ঘাড়ে বোধ হয়। ছোটলোকের ছেলে, এতে ওর ক্ষতি হবে না। কোন ভয় নেই। নানা ব্যস্ততায় ওদিকে আর মন দিলাম না!

কয়েকদিন হ'ল আমার রাসভারী জ্যাঠামশাই গ্যারাজের সামনের জায়গাটুকু নোংরা থাকে দেখে রাগারাগি করছিলেন। আমার সৌখিন ভাইরাও আপত্তি জানাচ্ছিল। আমাদের খিটখিটে বুড়ো দারোয়ানের কানে এসব কথা গেল।

সুতরাং, পরের দিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনলাম বুড়ো দারোয়ানের সঙ্গে মেয়েটির কথা চলছে। বুড়ো দারোয়ান চেঁচিয়ে বলছে—"চল্ যাও, আভি নিকালো।"

না-খেতে-পাওয়া শুক্‌নো ভীরু গলায় মেয়েটি ধীরে ধীরে মিনতি করছে, "আজ থাকি, কাল চলে যাব।"

সারাদিন বৃষ্টি হয়ে ঘাস ভিজে গেছে। তখন বৃষ্টি নেই, কিন্তু বাতাসে শীত, আকাশে মেঘ।

খিটখিটে দারোয়ান রুক্ষস্বরে বলল, "জরুর আজ যাওগে, সাহাবলোগ গুস্সা করেঙ্গে।"

একবার ভাবলাম উঠে দারোয়ানকে নিষেধ করি ওদের তাড়িয়ে দিতে। বাড়ীর মধ্যে তো থাকছে না, ক্ষতি কি আমাদের? কিন্তু জ্যাঠামহাশয় যদি দারোয়ানকে হুকুম দিয়ে থাকেন? তার চেয়ে কাল দেখা যাবে। একদিনে কিছু হবে না।

নিরুপায় নির্লিপ্ততায় চোখ মুদলাম। ঘুম আসতে দেরী হ'ল না।

পরের দিন ঘুম ভেঙে উঠে চা পান করে খবরের কাগজ খুলতেই বড়দি আমাকে খবর দিলেন, "ছেলেটা যে মরে যাচ্ছে।"

মরে যাচ্ছে? কাগজ ফেলে বারান্দায় চলে এলাম। দু'একজন লোক ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ছেলেটি চোখ বন্ধ করে অসাড় হয়ে ঘাসের ওপর বিছানো মাদুরে পড়ে আছে। গলার ঘড়ঘড় আওয়াজটা দূর থেকেও বোঝা গেল। ভিজে ঘাসে মাদুরটা ভিজে উঠেছে নীচ থেকে ভিজে জবজবে মাটির ছোঁয়াচে। ছেলেটার গায়ের জামাটাও ভিজে। ওর মা ক্রমাগত চোখ মুছছে আর ছেলেকে একটু স্বস্তি দেবার চেষ্টা করছে শুধু নিঃসম্বল দুই হাতের সেবায়। মনে হ'ল একদিন আগে দেখেছিলাম ছেলেটি ঘাড় তুলতে পারছে না। তার কারণ, ঘাড়ে বিশেষ করে কিছু হয়েছে বলে নয়, কারণ, আর ঘাড় তুলবার শক্তি নেই বলে। তবু সে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বসেছিল, স্বাভাবিক শিশুর জীবন-যাপন করতে চেয়েছিল, টিনের পাত্র আর দাঁতভাঙ্গা চিরুণী নিয়ে খেলা করে। আমাদের চোখের সামনে তার ঘাড় ভেঙে গেল, তবু আমরা কিছু করিনি। কাল ভিজেমাটির আক্রোশে যা বাকী ছিল হয়েছে। কানে শুনেও আমি তাকে পাকা মেজেতে শুতে দেবার ব্যবস্থা করিনি। আমার আলস্য এতই প্রবল হয়েছিল যে, আমি নিরপেক্ষ থাকবার ছুতো খুঁজছিলাম। তবে, প্রত্যক্ষ হত্যাকারী কি আমিই হ'লাম?

তারপরে পাগলের মত কিছুক্ষণ আমার ছুটোছুটি চলল। বাড়ী থেকে ব্র্যাণ্ডিমেশানো দুধ, হাতে-পায়ে সেঁক দেবার আগুন, হোমিওপ্যাথি ওষুধ সমস্ত পাঠালাম। বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে নির্দেশ দিতে লাগলাম। এতদিনের অবহেলার ঋণ একদিনে মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম। ডাক্তারকে খবর দিলাম। অবশেষে মরিয়া হয়ে বারবার টেলিফোন করে করে রিলিফ হাসপাতালের গাড়ী এনে তাদের দু'জনকে তুলে দিলাম।

নিশ্চিন্তচিত্তে ভাবলাম, বড় কাজ করেছি। আর আমার দোষ নেই। ছোটলোকের ছেলে, একটা ইনজেকশন পড়লেই চাঙা হয়ে উঠবে।

সারা বিকাল বাড়ীর সামনে শূন্য রইল। মন্বন্তরের মুখে ভেসে-আসা ছোটলোকের খোকা তার অকিঞ্চিৎকর খেলা দিয়ে সত্যই একটা জায়গা ভরিয়ে রেখেছিল।

দুইদিন গেল। তৃতীয় দিন অপরাহ্নে দেখলাম মেয়েটি একা গাছের নীচে বসে আছে! আমার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল।

বাড়ীর মেয়েরা খবর নিলেন; আগের দিনই ছেলেটার হয়ে গেছে। ইনজেকশনে সত্যই চাঙা হয়ে উঠেছিল, একটু উঠে বসেও ছিল। হাসপাতালে মেয়েটিকে খিচুড়ি দিয়েছিল খেতে। অশিক্ষিতা, স্নেহান্ধা মা একগ্রাস ছেলের লোলুপ, ক্ষুধার্ত্ত মুখে তুলে দিয়েছিল, খেতে খেতেই ছেলে আহার্য গ্রহণের শেষ চেষ্টায় মরে গেল। স্বামী নেই, গৃহ নেই, ছেলে বিসর্জ্জন দিয়ে কার কাছে ফিরবে সে? কোথায় ফিরবে? তাই সাধারণ রাস্তা হলেও, আমরা অনাত্মীয় হলেও, পুরনো জায়গায়ই ফিরে এসেছে সে। সর্বহারার দিকে তাকাতে পারলাম না। বিমনা, একা বসে বসে কয়েকদিন পরে সে-ও একদিন উধাও হ'ল। নিঃশ্বাস ফেললাম। নিয়তির অলঙ্ঘ্য টান থেকে সে আর বাঁচল না।

এই গল্পটি পুরণো, অতি চেনা। মন্বন্তরে এরকম একটি সত্য গল্প লিখতে প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেই আছেন আমাদের মধ্যে। যে কোন ব্যক্তি এবং যে কোন রাস্তার নাম বসিয়ে দিলেও মিথ্যা বলা হবে না। তাই ঘটা করে এই গল্পটিই আমি বলতে বসিনি। অনেকদিন পরের একটি ইতিহাসের মুখবন্ধ-স্বরূপেই এ কাহিনীর মূল্য দিলাম।

অনেকদিন পরে। এক গ্রীষ্মের অপরাহ্নে মা আমাকে হাসিমুখে ডাকলেন, "দেখে যা এসে।"

দেখলাম বাড়ীর মধ্যে উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে সেই মেয়েটি। এই প্রথম সে আমাদের বাড়ী ঢুকল। সহজ, জোরালো পায়ের গতি তার, দেহে স্বাস্থ্যের লাবণ্য, অঙ্গে উপযুক্ত বেশ! হাতে করে এনেছে সে কয়েকটি দেশী আম। নিজের দেশ থেকে এনেছে। এখন সে এ-শহরেই কাজ করে।

আমাদের জন্য সে আম এনেছে! এমনি মন্বন্তরে অনেকেই অনেককে সাহায্য করেছিল, তার মধ্যে একজন অন্ততঃ জীবন নূতন করে গড়তে পেরেছে। একটি দগ্ধ গাছ নূতন করে ফল দিয়েছে।

মেয়েটি বল্ল, "দিদিমণি খোকার অসুখে বড় করেছিলেন।"

একজন ভোলেনি। এমন অনেক অনেককে করেছি, করেছি অনেক বেশি। একজন ফিরে এসেছে। আমি তার অনেক বেশি করতে পারতাম। আমার

জানালার নীচে তার ছেলেটি তিলে তিলে মরেছে, আমি তাকে বাঁচাইনি। আমার অবহেলা সে ক্ষমা করে আমার জন্ম উপহার নিয়ে ফিরে এসেছে। আমি, আমার মত অনেকে, তার ছেলেকে মেরে ফেলেছি। সে কথা সে মনে রাখেনি, রেখেছে সামান্ত সাহায্যটুকুর কথা।

মেয়েটি চলে গেলে মা বল্লেন, "বয়ে গেছে একেবারে। স্বামীর খোঁজ নেই। ছেলেটা মরে গেল। ভুলে দিব্যি স্ফূর্তিতে আছে!"

স্বামী বা ছেলেকে সে ভুলেছে কি ভোলেনি সে বিচারে আমার প্রয়োজন নেই। আমাকে সে অনায়াসেই ভুলে যেতে পারত, তবু আমাকে সে ভোলেনি, এটাই বড় কথা। সমাজ দগ্ধ-গলিত আজ, তবু দিকে দিকে এই প্রেমের অঙ্কুর অমৃত ফলিয়ে যাবে। আজ ভারতবর্ষের আশা এরাই।

মনে পড়ে গেল, কৌপীনধারী মহাপুরুষ ক্ষমার আলো জ্বালিয়ে ভারতের প্রান্তে প্রান্তে অহিংসার বীজমন্ত্র বপন করে প্রেমের মহামন্ত্রে মৃত ভারতকে বাচিয়ে তুলেছিলেন! হিংসার মীমাংসা তিনি হিংসায় শেষ করেন নি। সেই ভারতবর্ষের আত্মা মেয়েটির মধ্য দিয়ে আমাকে স্পর্শ করল এতদিনে।

মা আদেশ করলেন, "দিয়ে গেল খুকীকে ভালবেসে। ভাঁড়ারে তুলে রাখ, ছোট বৌমা। চাকরদের হাতে হাতে দিও।"

আমি বলে উঠলাম, "ওতো আমাকে দিয়েছে।"

কাকীমা বিরক্ত হলেন,—"একটু হাড়ে টক হলেই ভাল আম তো তুমি ছুঁড়ে ফেলে দাও। তুমি আবার খাবে এই ছোটলোকের আম!"

আমি জানিয়ে দিলাম, "ওই আমই আজ আমাকে দিও। আমি ওই ছোটলোকের আমই খাব।"

ফরাশী শিক্ষক

"মঁসিয়ে, বঁ ন্যুই!" শুভরাত্রি জ্ঞাপন করে পথে নামলো অনীতা। মনে একটু আত্মপ্রসাদ হয়েছিল স্বাভাবিক ভাবে। তারা মাত্র তিনমাস কয়েকটি বন্ধু মিলে ফরাশী ভাষা শিখছে। একমাত্র অনীতার উচ্চারণ নির্ভুল হয়ে গেছে। শিক্ষক প্রতাপ গুইন এজন্য ছাত্রীর উপর প্রসন্ন।

প্রতাপ গুঁই ঈঙ্গ-বঙ্গ সমাজের বাসিন্দা। পরিবারটি বিবাহের দিক থেকে বহু ব্যতিক্রম করেছে। ফলে, বাঙ্গালী পরিবার তো দূরের কথা, ভারতবর্ষীয় পরিবারও বলা চলেনা গুঁই-বাড়ীর লোকেদের। প্রতাপ গুঁইএর বাবা বিয়ে করেন ফরাশী মহিলাকে বিদেশে ছাত্রাবস্থায়। প্রতাপের বিবাহ হয়েছে নামকরা বাঙালী অভিজাত পরিবারে। প্রতাপের বোন বিবাহ করেছে পাঞ্জাবী। প্রতাপের তিন ছেলের একজন ইংরাজ মহিলা, একজন বেহারী দুহিতার পাণিগ্রহণ করেছে। তৃতীয় ছেলে সম্প্রতি আমেরিকায় আছে, শোনা যাচ্ছে মার্কিন তরুণীর সঙ্গে সে বাগদত্ত। প্রতাপের কাকা-কাকিন এঁদের বৈবাহিক তালিকাও বিচিত্র।

মোটের ওপর সমস্ত বাড়ীতে একটা খাপছাড়া বৈদেশিক আবহাওয়া। সঙ্গে মিশেছে কলকাতা-প্রবাসীর দেশী সুর। বসবার ঘরে পিয়ানোর টুং-টাং ভেসে আসে, আবার দেখা যায় উড়ে চাকর নেহাৎ বাঙালী বাড়ীর মত র‍্যাশনের থলে ও মাছের চুপড়ি হাতে সদর দোর দিয়ে বাড়ী ঢুকছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা পড়ে ফিরিঙ্গী স্কুলে। বয়স্কেরা পরস্পরের সঙ্গে ইংরাজি ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু দুর্গা-ষষ্ঠীর দিনে নূতন কাপড চাই।

প্রতাপ গুইএর চলতি নাম পর্‌তাপা গুঁইন। বিদেশিনী জননীর মুখের বিকৃত উচ্চারণের 'পর্‌তাপা' অন্তরঙ্গ মহলে চলে আসছে।

পিতা ফরাশী মহিলা বিবাহের পরে কিছুদিন ফ্রান্সে বসবাস করেছিলেন। প্রতাপের জন্ম সেখানে। তারপরে মাতৃকুলের সূত্র ধরে প্রতাপ বহুবার যাতায়াত করেন। ফরাশী ভাষায় দক্ষতা তাঁর ফরাশী জাতির চেয়ে বেশী। মনেপ্রাণে তাঁর ফরাশী দেশ শিকড় গেড়েছে, সুরা ও সুগন্ধির বেসাতি নিয়ে। শ্যামল বাংলা দূরেই সরে আছে।

মিঃ গুইনের বয়স পঞ্চান্ন হবে। দীর্ঘ দেহ, বিরাট চেহারা। সর্বদা যেন ভাবে আছেন। হাতের কাছাকাছি ফরাশীভাষার বাছা বাছা মণিমুক্তো থাকে। মিঃ গুইন ফরাশী ভাষায় মহাপণ্ডিত। ভাষার শিক্ষাদান করে তাঁর জীবিকা নির্ব্বাহ হয়।

অনীতা ও তার তিনটি বন্ধু ফরাশীভাষা শিখতে মনস্থ করেছে। বি. এ. পড়ে তারা কলেজে একসঙ্গে। ইচ্ছা এম. এ.তে বাংলা বা কমার্সে'র সঙ্গে ফরাশী পেপার নেবে। তাছাড়া বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা আছে। কণ্টিনেণ্টে তো ফরাশী ভিন্ন গতি নেই। ভাষাটাও ভারী মিষ্টি, সাহিত্যিক মূল্য আছে। এমনি শিখে রাখা ভালো।

ইভার কাকা মিঃ গুইনকে ঠিক করে দিলেন। একসঙ্গে চারজন মেয়ে সপ্তাহে তিনদিন তাঁর বাড়ী যেয়ে পড়ে আসতো। একসঙ্গে টাকা দেওয়াতে প্রত্যেকের কম অর্থব্যয় করতে হ'ত।

অনীতা, কুন্দ, মীরা, ইভা, ক'জনের মধ্যে পড়াশুনায় ভাল অনীতা। মাথা ভাল, উৎসাহ যথেষ্ট। যে যার বাড়ী থেকে রওনা হয়ে ফরাশী শিক্ষকের বাড়ী পৌছয়। অনীতা উপস্থিত হয় নিয়মিত, বাড়ীর কাজও সে ঠিকমত করে নিয়ে যায়। তিনমাসে ভাষাটিও শিখে ফেলেছে সে যথেষ্ট।

মেঘলা হয়ে আছে, টিপিটিপি বৃষ্টিও পড়ছে। তাই অন্যেরা কেউ আসেনি। বর্ষাতি গায়ে জড়িয়ে পথে নেমে চলতে আরম্ভ করলো অনীতা। বিকেল সাতটায় মনে হচ্ছে রাত হয়ে গেছে। মিঃ গুইন গাড়ী ডেকে দিতে অথবা নিজে পৌছে দিতে পীড়াপীড়ি করছিলেন। হেসে উড়িয়ে দিয়েছে অনীতা। একা চলা-ফেরার অভ্যাস সে করেছে। কারণ, বিদেশে বিদ্যার্জ্জনের জন্য যাবে সে। ছোট একটা গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ আর যেই রাখুক অনীতা রায় রাখবেনা।

বিদ্যা একটা সাধনা। কুন্দ, মীরা, ইভা বোঝে কই ? একদিন আসে তো দশদিন আসে না। এমন করলে কি ফরাশী ভাষা শেখা যায়! আসলে, ওদের হুজুগ একটা, অনীতার দেখাদেখি ওরা এসেছে। কিছুদিন পরেই ছেড়ে দেবে নিশ্চয়। এই তো আজ ক্রিয়াপদ সম্পর্কে এতগুলো তথ্য ওদের জানা হ'লনা। মিঃ গুইনকে সে বলেছিল আজ একথাগুলো না বলে ওদের জন্য রেখে দিতে। তিনি কিছুতে রাজী হলেন না। বল্লেন, "ওরা তো অর্দ্ধেকদিন

আসে না। তুমি কেন ওদের জন্য পিছিয়ে থাকবে? আমার কাজ তোমাকে ভাল করে ভাষাটা শেখানো। তাহ'লে বুঝবো অন্তত: একটা মেয়েও আমার হাত দিয়ে বেরিয়ে মানুষ হয়েছে।"

ইংরাজির সঙ্গে ফরাসী মিশিয়ে কথাগুলো বলেছিলেন প্রতাপ গুঁই। আগাগোড়া ফরাসী এখনও অনীতা বোঝেনা। তবু মিঃ গুঁই যতদূর সম্ভব তাকে দিয়ে ফরাশী বলাবার চেষ্টা করেন, নিজেও বলেন। বাংলা দু'একটা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কথা ছাড়া ওঁর মুখে শোনেনি অনীতা। আশ্চর্য্য! এবারে এক টানা তিন বছর তো স্বদেশে আছেন, তবু স্বদেশী হ'তে পারলেন না উনি!

পা টিপে টিপে অনীতা পথ চলে বাড়ী পৌছলো। নাঃ, সে হ'বে অন্য রকম। বিদেশে গেলেও বিদেশী হবেনা ও। পরের দিন আবার ফরাসী ক্লাশ আছে। ওদের কাল কলেজে জানিয়ে দিতে হ'বে।

"What's that, মীরা?" মিঃ গুঁই গর্জ্জন করে উঠলেন, "ঠিক করে পড়। বল 'ল ফ্রুই'। কতবার বলেছি না, No consonant at the end of a word is pronounced, except C. F. L. R. And they are pronounced when at the end of a monosyllabic word, যেমন 'ল ফার'।"

কুন্দ ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো, "ফার কি, বাবা? ভুলে গেছি, ইংরেজী fur নাকি?"

দুঃভাগ্যক্রমে মিঃ গুইনের কানে কথাটা গেল। তিনি বল্লেন, "ঠিক! তিন মাস পরে 'ফার' কি? জাননা লোহার ফরাসী শব্দ, f-e-r? জানবে কি করে? কখনো আসনা তো নিয়মিত। একে কি ভাষা শেখা বলে? দেখনা অনীতাকে। তোমরা কথার মানে জানোনা এখনও। অনীতা কেমন অনুবাদ করছে।"

মীরা ইভাকে ঠেলা দিল অলক্ষিতে—"আবার আরম্ভ হল।" ইভা Otto-onion এর ফরাশী ব্যাকরণখানা মুখে চাপা দিয়ে হাসি চাপতে গেল। বইখানা ঝট্ করে হাত থেকে খসে মেজের ম্যাটিংএর ওপর পড়লো।

শব্দ শুনে মিঃ গুইন ফিরে তাকালেন মনের মত প্রসঙ্গে বাধা পেয়ে। কটমট্ করে তাকালেন একবার। কিন্তু, মনে-প্রাণে ফরাশী তো। তখনি

নীচু হয়ে বইখানি তুলে ছাত্রীর হাতে দিলেন। ইভা ভয়ে ভয়ে বললো, "মেয়ার্সি।"

মিঃ গুইন খুসী হয়ে উঠলেন, "হ্যাঁ, যতটুকু পার ফরাশীতে বলবার চেষ্টা কর। নইলে শিখবে কি করে? একটা ভাষা একটা দেশের প্রাণ। সেই দেশের সঙ্গে মনে প্রাণে না মিশলে কি করে হয়? আমি যখন ফ্রান্সে থাকি, ভুলেই যাই আমি বাঙ্গালী। এমনকি ইংরাজী ভাষাটাও ত্যাগ করে ফেলি। কথাতো বলিই, চিন্তাও করি ফরাশীতে। তবে তো শিখেছি। আমি চাই তোমরাও তাই শিখবে। অনীতা পারবে।"

কুন্দ হেসে ফেললো। মিঃ গুইন কিছু বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলেন, "কাভে ভূ?" (কি হ'ল?)

"Nothing Sir, কিছু না।"

ইভার বই একবার পড়ে গিয়েছিল তাই মিঃ গুইন অন্যমনস্কভাবে বল্লেন, "Ayez soin vos livres." (তোমার বইএর কি হল?)

অনীতা ছাড়া কথাটা কেউ বুঝলো না। এত ভালমানুষকে নিয়ে ওরা কেন অনীতাকে ক্ষ্যাপায়? বাবার বয়সী লোক, তায় গুরু। অনীতা ঠিকমত আসে, পড়া করে। তাইতো, তিনি একটু স্নেহ করেন অনীতাকে। তাই নিয়ে বিশ্রী কথা বলে ওরা, হাসাহাসি করে, জ্বালাতন করে মারে। মিঃ গুইন কিছু বুঝতে পারেন না।

"অনীতা ভাষার প্রাণ ধরতে পেরেছে। দেখনা ওর উচ্চারণের কৌশল।"

"আজকের তাহলে পড়া কি অনীতা-প্রসঙ্গ?" মীরা খোঁচা দিল চুপিচুপি।

মুখ লাল করে মাথা নামিয়ে অনীতা বসে রইল। সৌভাগ্যক্রমে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মিঃ গুইন থামলেন, "Quelle heure est-il?" (কটা বেজেছে? হে ভগবান্!) Mon dieu! লেখ সকলে, বলছি আমি।"

প্রত্যেকে দুরু-দুরু বক্ষে খাতা-কলম নিয়ে প্রস্তুত হ'ল। খাঁটি ফরাশী উচ্চারণে একগাদা শব্দ বলে যাবেন শিক্ষক। এক অনীতা ছাড়া কেউ পাঁচটির বেশী ঠিক লিখতে পারবেনা। তারপরে, তাই নিয়ে অনীতার সঙ্গে তুলনামূলক সমালোচনার লাঞ্ছনা আছে।

"অনীতা, নাভে ভূ পঁং দাঁকার (তোমার কালি নেই)?" নিজের দামী কলমটা অনীতার হাতে তুলে দিলেন তিনি ওর কলমে কালী নেই দেখে।

বাকী তিন বন্ধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

প্রতাপ গুঁইর বাড়ী থেকে বেরিয়ে ইভা বলল, "চলোনা, এককাপ কফি খেয়ে যাই। যে বকুনী আজ গুইন সাহেব দিয়েছেন। কফি ছাড়া হজম হবেনা।"

পাশে কফি হাউস্। চার বন্ধু চেয়ার টেনে বসলো। অনীতার বিশেষ ইচ্ছা ছিলনা। কফির পেয়ালায় কি প্রসঙ্গ উঠবে সে তা জানে।

কুট্‌কুট্ করে বাদাম খেতে খেতে মীরা বলল, "আর পারা যায় না। ফ্রেঞ্চ শিখবার সাধ ছুটে গেল। হুড়হুড় করে খালি ফ্রেঞ্চ ভাষা বলেন। আমরা যে কিছু জানিনা তাতে ওঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। ওঁর অনীতা বুঝলেই হ'ল।" অনীতা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "কই না? বেশী কথাতো ইংরেজিতেই বলেন মিঃ গুঁই। ফ্রেঞ্চ আর কতটুকু?"

কুন্দ ইভাকে ধাক্কা দিল,—"দেখছিস্, লেগেছে শ্রীমতীর, গুইন সাহেবকে সমর্থন করছে।"

ধাক্কা লেগে ইভার কাপের কফি উছলে তার স্কাই-ব্লু শাড়ী চিহ্নিত করে ফেলেছিল, তাই সে বিরক্ত হয়ে বলল, "কেন করবেনা শুনি? মিঃ গুঁই যেমন 'অনীতা, অনীতা' করেন, তার অর্দ্ধেক তোকে করলে তুইতো ওঁর কুকুর হতিস্, কুন্দ।"

কুন্দ চটে গেল, "দরকার নেই আমার। বাপের বয়সী বুড়ো হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে আছে, হ্যাংলার মত ছেলেমী করে মরছে। গা জলে যায় দেখলে। গঙ্গাপানে পা, সাধ যায়না।"

মীরা গলা নামিয়ে বলল, "মনেপ্রাণে উনি ফরাশী কিনা। চুল পাকলেও প্রাণ তো সবুজ। সত্তর বয়স হলেও সতেরো চাই। তাই আমাদের অনীতাকে মনে ধরেছে বুড়োর। নেহাৎ, জাঁহাবাজ বউ বেঁচে আছে, নইলে বৃদ্ধস্য তরুণী-ভার্য্যা হ'য়ে যেত অনীতা।"

'ছিঃ, ছিঃ, কি বলছ? উনি না আমাদের মাষ্টার মশাই? আর কত বড় বয়সে!"

"আহা, অনীতা নিদয়া হোসনা।" ইভা কুন্দকে চটিয়ে দিয়ে অপ্রতিভ হয়েছিল। এখন কুন্দর মান রেখে বলল, "তা, কুন্দ ঠিক বলেছে। অনীতা বলে সহ্য করে। আমার তো বুড় বয়সের ধেড়ে রোগ দেখলেই রাগ ধরে।"

কুন্দ খুশী হ'য়ে উঠল, "যেন খোকা! যতটুকু সময় অনীতার প্রশংসা না করেন, ততটুকু সময় নিজের ব্যাখ্যান। এই করেছি ফ্রান্সে, সেই করেছি ফ্রান্সে। এই নাচে গেলাম, ওই মহিলা এইকথা বল্লেন। এসব কথা প্রচার করবার উদ্দেশ্য যে আমাকে তোমরা বুড়ো ভেবে অবহেলা কোরোনা। আমার বহু অভিজ্ঞতা আছে, রস আছে।"

ইভা বলল, "এক-একদিন দুপুর বেলায়ও ড্রিঙ্ক্ করে বসে থাকেন। চোখ লাল, গায়ে কি গন্ধ, বাবা! লজ্জাও করে না, বাঙালীর ছেলে হয়ে ফরাশী সাজতে। মা ফরাশী হলেও বাবা তো বাঙালী। চিপটেন কেটে তো এধারে আমাদের মতই খাস বাঙালী চালে থাকেন। পয়সা জুটলে তো। এই তো ক'টি ছাত্রছাত্রী। পড়ানোর টাকাটা সম্বল। যৌথ-পরিবার না হ'লে বিপদে পড়তেন। তবু সাজের ঘটা কি, বাটন্ হোলের ফুলটি চাই।"

মীরা বলে উঠল, "মনে-প্রাণে ফরাশী কিনা। দ্রাক্ষার রস চাই। আর চাই নারী। স্বভাব তো ভাল বলে মনে হয়না। অত মদ খাওয়া, সাজগোজ আর এসেন্সের ঘটা।"

"অনীতার দিকে কেমন ভাবে চেয়ে থাকেন, দেখেছিস? পারে তো গিলে খায়। মাঝে মাঝে আবার ওর মুখের দিকে চেয়ে পডাতে ভুলে যায়। বুড়ো পাকা বদমাস। কি করবো? ধরণ-ধারণ দেখে আমার তো একদিনও শিখতে ইচ্ছে নেই। বাড়ী থেকে ছাড়েনা।" কুন্দ বলল। অবশেষে প্রতাপ গুঁইএর অসচ্চরিতা তাঁর ছাত্রীদের আলোচনার বস্তু হয়ে উঠলো, তাঁর শেখানো ভাষাটা নয়।

অনীতা হাত ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়াল—"আমার পয়সাটা এই রইল। আমি চল্লাম। বাড়ীতে কাজ আছে।" মিঃ গুইনের গুণ-কীর্তনের আসর থেকে অনীতা উর্দ্ধশ্বাসে পালাল'।

গালে হাত দিয়ে টেবল-ল্যাম্পের আলোতে বসেছে অনীতা। পাশে ফরাসী ব্যাকরণ। আজকের পড়ানোটা আজই দেখে রাখলে পড়াটা ভাল তৈরী হবে। কিন্তু, মনে তার আজ উৎসাহ নেই।

সত্যি, মিঃ গুইন ভালো লোক নয়? হ'লে ওরা অত যা তা বলবে কেন বাবার বয়সী বুড়োর নামে? অনীতা বোকা, বুঝতে পারে না।

ওরা তিনজন ঠিক ধরে ফেলেছে। কি হ'বে? কেন অনীতাকে এমন চোখে দেখলেন তিনি? অনীতা তো তাঁকে এত শ্রদ্ধা করতো, কত মন দিয়ে ওঁর পড়া করতো। মনে হত, এত বড় পণ্ডিত উনি। ঠিক মূল্য কেউ দিতে পারছে না ওঁকে। কেমন মায়া হ'ত ওঁর ওপরে। কোথায় যেন একটা দুঃখ আছে ওঁর।

সমস্ত ফরাশী ভাষার উপর কালো যবনিকা বিছিয়ে দিল বন্ধুদের কথা-বার্ত্তাগুলো। বিরাট মূর্ত্তি প্রতাপ গুঁইএর শাদা চুলে পর্য্যন্ত যে কালির ছিটে লেগে গেল। অনীতা ঠিক করলো মনে মনে সে বিশেষ ভাবে গুঁইকে লক্ষ্য করে যাবে।

ঘরে ঢুকলো দিদি মাধবী। এম, এ পরীক্ষা দিয়ে ধরাকে সরা দেখছেন। মুরুব্বী ভাব সবটাতে।

"কি পড়া হচ্ছে? ওমা, ওই এক ফ্রেঞ্চ! পাগল হয়ে যাবি নাকি? ইংরাজিতে নিয়েছিস অনার্স, কোন সময় পড়তে দেখি না! নেশা লেগেছে তোর ফরাসী-ভাষায়। ভাগ্যিস্, শিক্ষকটি বুড়ো! নইলে তো সন্দেহ হোত।"

দিদির কথায় অনীতা আর সামলাতে পারলো না, ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেললো। এতক্ষণের সঞ্চিত গ্লানি, সন্দেহ মূর্ত্তি ধরে উঠলো দিদির বাক্যবাণে।

মাধবী লজ্জিত হল, "ওকি কাঁদছিস্ কেন? খুকী নাকি, যে ঠাট্টাটাও সইতে পারিস না!"

বড়দিনের শেষ। কাল নূতন বছর। ফরাশী ভাষার পাঠ সেরে মেয়েরা মিঃ গুইয়ের বাড়ী থেকে বেরোচ্ছে। কলেজ বন্ধ, বড়দিনের চাঞ্চল্য আকাশে বাতাসে। বসন্ত শীঘ্রই আসবে।

অনীতা একটু পিছিয়ে পড়লো। মিঃ গুইনকে বিলিতি প্রথায় নববর্ষ জানানো হয়নি। যা সাহেবী চাল ওঁর। ওঁর কাছে এটা অপরাধ বলেই প্রতিপন্ন হ'বে। সুতরাং প্রিয় ছাত্রী অনীতা পিছিয়ে পড়ে দরজায় দণ্ডায়মান প্রতাপ গুঁইকে জানালো আসন্ন বিলিতি নববর্ষের শুভ ইচ্ছা।

প্রতাপ গুইনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। দীর্ঘ পাদক্ষেপে এক নিমেষে লাফিয়ে অনীতার পাশে রাস্তায় চলে এলেন তিনি। সজোরে অনীতার

হাত ঝাঁকিয়ে বললেন, "মেয়ার্সি, মেয়ার্সি মা শেয়ারি।" হাত ধরে বলে চললেন তিনি, "হ্যাঁ, কাল নূতন বছর আসছে। হ'লই বা বিদেশী, তবু তো জীবনের প্রকাশ। মন খুলে দিতে হয় সমস্ত উৎসবকে বরণ করে নিতে। তোমার এ বোধ আছে দেখে অনীতা, আমি খুসী হ'লাম।"

অস্বস্তিতে অনীতা ছট্‌ফট করতে লাগলো। এত বড় মেয়ের হাতখানা চেপে ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মিঃ গুইনের উচ্ছ্বাস ভাল লাগলো না তার। অন্য মেয়েরা এগিয়ে গেছে বটে, কিন্তু অনীতা আসছে না দেখে ফিরে তাকালেই সর্ব্বনাশ। যা-তা বলবে।

মরীয়া হয়ে হাত ছিনিয়ে নিল অনীতা, "ওরা অপেক্ষা করছে, আমি যাই। ও রিভোয়া, মিঃ গুইন।"

"ও রিভোয়া, অনীতা।" মিঃ গুঁইন একটু আহত হলেন যেন।

অনীতা বন্ধুদের সঙ্গ নিল চিন্তিত মনে। না, আর মনকে চোখ ঠেরে রাখা চলে না। তাঁর প্রতি প্রতাপ গুঁইর মনোযোগ যেন একটু বিশেষ ধরণের, যেন ছাত্রীর প্রতি স্বাভাবিক ও সমীচিন স্নেহের রূপ নয়, মাত্রা ছাড়িয়ে অনেক বেশী। এক দৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন ফরাশী শিক্ষক। সব সময় তাকে লক্ষ্য করেন। দেখে দেখে যেন তৃপ্তি হয় না। সবাই ঠিক ধরেছে। জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে দেখলো অনীতা সহজ আলোতে। মনেপ্রাণে ফরাসী মিঃ গুইন ফরাশী-সুলভ প্রণয়-ব্যপদেশে চান তাকে। অদ্ভুত লোক। এত বয়স অথচ টিপ্‌টপ্ সাজটি চাই। নিস্পৃহ ব্যক্তি হলে অত সজ্জার প্রয়োজন হো'ত না। সুরাসক্ত ব্যক্তি, সুরার অন্য আনুসঙ্গিক দোষও আছে নিশ্চয়। ইভার কাকা ঠিক করে দিয়েছেন, বিশেষ আলাপী তাঁর। ইভা তো সব থেকে বেশী নিন্দা করে। জানে বলেই করে।

নাঃ, আর ভালো লাগে না। এত উৎসাহের, আনন্দের ভাষা শেখা ছাড়তেই হবে শেষে। কত আশা ছিল মনে, কত শ্রদ্ধা ছিল শিক্ষকের প্রতি। মিঃ গুইন সমস্ত নষ্ট করে ফেলেছেন। আজ কি ভাবে হাতখানা ধরলেন অনীতার? কিছুতেই ছেড়ে দেন না। মুখচোখ কেমন যেন জ্বলে উঠলো? ছিঃ' ছিঃ! যত কষ্টই হোক দু'একদিনের মধ্যে ফরাশী শিক্ষা ছাড়বে অনীতা। কতদিন একা একা পড়তে হয়। মিঃ গুইনকে বিশ্বাস করা যায় না।

একটা ছুতো নিয়ে কেমন হাতখানা ধরলেন আজ! ক্রমে তো বেড়ে উঠবেন। ফরাশী ছাড়তেই হবে অনীতাকে।

"কেন, কেন? ফরাশী পড়বে না কেন তুমি? ভালো লাগে না, না আমার পড়ানো পছন্দ হয় না?"

আজও অনীতা একা। অন্য বন্ধুরা আসেনি কেউ। অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে অনীতা গোড়াতেই মিঃ গুইনকে জানালো সে আর ফরাশী পড়বে না।

প্রতাপ গুইন ভেঙ্গে পড়লেন যেন। অনীতাকে দেখে চোখ দুটো জলজ্বলে হয়ে উঠেছিল, নিষ্প্রভ হয়ে গেল। কুঁকড়ে গেল বিরাট মূর্ত্তি, মুখচোখে হতাশা, ব্যথা ফুটে উঠলো।

অনীতা বিপদে পড়লো। মিঃ গুইনের কাছে কোন কারণই ঠিকমত দর্শানো যাচ্ছেনা। যা বলছে অনীতা, যুক্তিজালে খণ্ডে ফেলছেন তিনি। বিরক্ত বোধ হলো অনীতার। পয়সা দিয়ে ভাষা শিখতে এসে মাথা বন্ধক দিয়েছে নাকি শিক্ষকের কাছে? বিব্রত ভাবে অনীতা বলে উঠলো, "আমার বাড়ী বড় দূরে। ট্রাম বাসের রাস্তা নয়। হেঁটে আসতে অসুবিধা হয়।"

"আমি তাহ'লে যাবো তোমার বাড়ীতে। তুমি কষ্ট করে এসোনা, অনীতা। এত দূরে আসতে তোমার কষ্ট হয়, এ কথা আগে বললেই হোত।" যেন এ বিষয়ে চরম নিষ্পত্তি করে ফেলেছেন এই ভাবে মিঃ গুইন নিরস্ত হলেন। নিজের বাড়ীতে গেলে গুইন আর কি করবে? অনেক লোক থাকবে। প্রস্তাব মন্দ নয়। কিন্তু, অনীতার তরুণ মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে বৃদ্ধের কাঙালপনায়। এ অঙ্কে যবনিকা-পতনই ভালো। আর মিঃ গুইনের কাছে পড়ায় মন বসবে না অনীতার। জন্মের মত গেছে অনীতার উৎসাহ। তা ছাড়া সে তো মা বাবার একা সন্তান নয়, মিঃ গুইন সত্তর টাকার কমে বাড়ী যেয়ে পড়ান না, অনীতা জানে। তার পক্ষে অত টাকা দেওয়া সম্ভব হবে না। উপায়ন্তর না দেখে অনীতা বলে দিল, "আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।"

"কেন?"

"আমি অত টাকা খরচ করতে পারি না।"

মিঃ গুইন হঠাৎ বাংলায় বলে উঠলেন, "তুমি, তুমি আমাকে টাকা দিতে পারো না বলছো? আমাকে তুমি টাকা দেবে?"

বাংলা মিঃ গুইনের মুখে শুনে অনীতার প্রাণ উড়ে গেল। স্থির দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে আছেন মুখের দিকে। ঘরের আবহাওয়া কেমন ভারী হয়ে উঠেছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। অনীতা দরজার দিকে তাকাতে লাগলো ঘন-ঘন। ভগবান ওকে রক্ষা করুন। মিঃ গুইন যেন কেমন করছেন?

অনীতা তাড়াতাড়ি বললো, "না, আপনার কাছে টাকার প্রশ্ন ওঠেনা, মিঃ গুইন। তবে বাবা বিনা পয়সায় শিখতে দেবেন না। তাই শেখা হবে না। আমি যাচ্ছি এখন।" দরজার দিকে পা বাড়লো সে।

মিঃ গুইনের বিরাট দেহ দরজা আড়াল করে দাঁড়ালো, "যেওনা অনীতা, শোন একটা কথা। কাকেও বলিনি এতদিন।"

অনীতার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠলো। মিঃ গুইন যে আর প্রকৃতিস্থ নেই, সে কথা বেশ বোঝা যাচ্ছে। কেন ওদের কথা মন দিয়ে শুনে আগেই পড়া ছেড়ে দিইনি? এ বিপদে পড়তে হোতনা তাহ'লে। এখন কি করা যাবে? বাইরের ঘরে জনমানুষের সাড়া নেই বাড়ীর। রাস্তার দরজাটা আগলে প্রতাপ গুঁই দাঁড়িয়ে আছেন। বৃদ্ধ লম্পটের হাত থেকে অনীতা আজ কি করে মুক্তি পাবে?

ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় থেমে থেমে প্রতাপ গুঁই বলে চললেন, "শোন অনীতা। আমাকে তোমার টাকা দেবার প্রশ্ন ওঠেনা। সকলে মিলে দিতে, তাই এতদিন নিয়েছি কে কি মনে করবে ভেবে। কিন্তু, তোমার টাকাটা আমি খরচ করিনি, আলাদা করে রেখেছি। তোমাকে একদিন ফিরিয়ে দেব বলে।···আমার একটিমাত্র মেয়ে ছিল, বেঁচে থাকলে সে তোমার বয়সী হত। ফ্রান্সে মারা গেছে।····· ফরাশী দেশ, ফরাশী ভাষা সে ভালবাসতো বড়। ঠাকুরমায়ের দেশ তার। সে—সে ছিল তোমারি মত দেখতে, তোমারি মত উৎসাহে ভরা। তোমাকে দেখে তার কথা মনে আসে আমার। তাই মা, পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকি।"
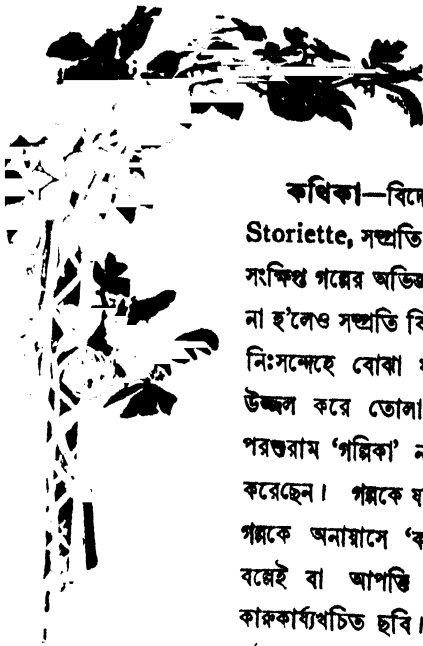
কথিকা—বিদেশী সাহিত্যে Vignette, Storiette, সম্প্রতি short-short নামে অভিহিত। সংক্ষিপ্ত গল্পের অভিজ্ঞান ভাষা-সাহিত্যে সুস্পষ্ট বর্ণিত না হ'লেও সম্প্রতি বিভিন্ন পত্রিকায় বহুল প্রচার দেখে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় লক্ষণ কি। একটি মুহূর্ত্তকে উজ্জ্বল করে তোলা এই রচনার উদ্দেশ। শ্রদ্ধেয় পরশুরাম 'গল্পিকা' নামে সংক্ষিপ্ত গল্পকে অভিহিত করেছেন। গল্পকে যদি কথা বলা হয়, তাহ'লে ক্ষুদ্র গল্পকে অনায়াসে 'কথিকা' বলা চলে, 'সংক্ষেপিকা' বল্লেই বা আপত্তি কি? 'ভিনেট' অর্থে ছোট কারুকার্য্যখচিত ছবি। অসম্পূর্ণ অথচ নিখুঁত চিত্র। সেই অর্থ ধরে ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কিন্তু স্বয়ং-সম্পূর্ণ কাহিনীকে আমরা কথিকা বা সংক্ষেপিকা বলব। রচনা-কৌশলের উপর এ ধরণের লেখা নির্ভর করে সার্থকতার নিমিত্ত।

পাথরের বাসন

এদিকে হাতে তৈরি এবড়ো-খেবড়ো মেটে পাথরের বাসন যথেষ্ট। দেশীয় লোকেরা অজস্র তৈরি ক'রে ক'রে বিদেশী যারা এসেছে, তাদের বাসা-বাড়িতে ফেরি করে এদেশের দু'আনার বস্তুটা আট আনায় বিক্রি করে। উভয় পক্ষ ভাবে, বেশ জিতলাম।

কাকীমার বাসনের বাতিক। ঘাটশিলা ছাড়বার দিনও এগিয়ে এল। প্রায়ই দেখি দরজার সামনে ঝাঁকাতে কালো পাথরের থালা-বাটি নিয়ে পসারীর মেলা, দরদস্তুর চলছে উচ্চকণ্ঠে। তারপরেই বিজয়গর্বে হাসতে হাসতে কাকীমা আসতেন আমার ঘরে। সেখানে ছোট ছোট ছাপার অক্ষরের ওপর ঝুঁকে আমি ল্যাটিন সাহিত্যের রসাস্বাদ করি। অঞ্চলতলে পাথর মুড়ে কাকীমা সোল্লাসে বলতেন, "দেখ খোকা, এক জোড়া কিনলাম—মাত্র দেড় টাকায়। কালীঘাটে এর দাম কত জানিস? তিন টাকার এক পয়সা কম নয়।"

কাকা বিরক্ত হতেন; বলতেন, "দুদিন ধ'রে ক্রমাগত বিশ্রী বাসনগুলো কিনে যাচ্ছ; একখানা মালগাড়ি ভাড়া নিয়ে কুলোতে পারলে হয়।"

সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরেছি সুবর্ণরেখার তীরে বেড়িয়ে। পেট্রোম্যাক্স বাতিটা আনবার জন্য কাকার শোবার ঘরে ঢুকতে হ'ল। চৌকিতে পাতা বিছানার ওপরে কাকীমা একা ব'সেছিলেন, সামনে তাঁর এতদিনের ক্রীত সমস্ত পাথরের বাসন। উন্মনাভাবে বাইরের দেবদারু-গাছটার দিকে চেয়ে আছেন, চোখের নীচে জলের ধারা।

কাকীমার অনর্গল হাসি ও স্ফূর্তির মধ্যেও অশ্রু-নির্ঝর আছে? ডাকলাম, "কাকীমা!"

চোখ সজোরে মার্জনা ক'রে কাকীমা আমার দিকে তাকালেন, বললেন, "ভাবছি, এত বাসন কিনলাম—সব নিজের জন্যে! দেবার লোক আমার নেই আর। মা বিধবা হবার পর পাথর ছাড়া অন্য কিছু ছুঁতেন না। তাঁকে দিলে কত কাজে লাগত! বড়দি বড় বাসনপত্র ভালবাসত, তাকে হাতে

ক'রে দুখানা দিলে সে কত খুশী হ'ত। ননদটা পূজো-আচ্চা ব'লে পাগল হ'ত, সেও আর নেই। আমার দেওয়ার সুখ গেছে। তাই ভাবছি, এত বাসন নিয়ে কি করব?"

* * * * *

পেট্রোম্যাক্সে পাম্প্ করতে করতে আমিও ভাবছিলাম। সহসা লঘু পদে ঘরে ঢুকলেন কাকীমা, চোখে মুখে তাঁর উৎসাহ-চাঞ্চল্য। বললেন, "খোকা, কাল হাটে একবার আমাকে নিয়ে যেতেই হবে। পাশের বাড়ির চাকর আমাদের বঙ্কু চাকরটার কাছে বলছিল, হাটে নাকি আরও ভাল ভাল সব বাসন আসে, আরও সস্তায়। একটা কালো পাথরের ঘটি আমার চাই। কাল দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে উঠেই তুই আর আমি রওনা হয়ে যাব কেমন? তোর কাকার কানে তুলে কাজ নেই, সব-কিছুতেই ওঁর টিকটিক।'

শুনেছিলাম, পাথরেই শুধু দাগ পড়ে না।

অপমান

মানুষকে কত অপমান করি! অজানিতে। শিক্ষার অভাবে, ভদ্রতার অভাবে, সংস্কৃতির অভাবে অপমান করে বুঝতে পারি না কাউকে অপমান করেছি। কলহ করে মনে থাকে। আত্মপ্রসাদ অনুভব হয়, প্রতিপক্ষকে অসম্মান দেখিয়ে। অনেক সময় পরিজন মহলে জানাই, "ওঃ, খুব শুনিয়ে দিয়েছি ওকে!" বন্ধুদের বলি, "যেমন লোক ঠিক তেমনি ব্যবহার করে শুনিয়ে দিয়েছি, ভাই!" শুনে তারাও খুশী হয়, আমরাও হই। কিন্তু অসতর্ক মুহূর্তে বিনা কারণে যখন আমার মতই একজন মানুষকে মর্য্যাদা দিই না, সেই সব মুহূর্তে ক'জনের মনে থাকে?

আমাদের কেউ অপমান করলে ভুলতে পারি না। কাঁটার খোঁচার মত মনে বিঁধে থাকে সর্বদা নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে। প্রতিজ্ঞা করি, কখনও, "এর শোধ নোব।" মনে নৈতিক বল পাই। "Tit for Tat!" কিন্তু, আমরা যাকে অপমান করি, তাকে তো ভুলে যাই।

একজনকে অপমান করেছিলাম। একজনকে নয়,—বহুজনকে, বহুবার। জীবনের দীর্ঘ ও জটিল পথে চলতে চলতে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে কত লোককে মান দিই নি! নিজে মান চাই অথচ অন্যকে দিই না। মানুষ হয়ে জন্মেছি, অন্য মানুষকে মর্য্যাদা দিতে শিখিনি। যে কুণ্ঠিত, তার কুণ্ঠা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছি। যে সঙ্কুচিত, তার সঙ্কোচের বিহ্বলতা আমাদের জন্য কমছে কই?

হ্যাঁ, অনেককে অপমান করেছি, করছি। বিনা কারণে। যাদের অপমান করে নিজে অপমানিত হয়েছি। এইরকম একজনের কথা আজ শোনাব।

ছোট্ট একটি দোকান—একজনের বাড়ীর রোয়াকের ওপর কাঠের পাটাতনে সাজানো। বাক্সে গেঞ্জি, মোজা, সস্তা ছিটের হাফশার্ট দোকানীর সম্বল মাত্র। রোগা, আধাবয়সী লোকটি। চারপাশে বড় বড় দোকানের ভিড়ে, অভিজাত পল্লীতে যেন মরমে মরে আছে। বিস্ময় বোধ হল—ওর এ বিড়ম্বনা কেন? এ পাড়াতে এসব জিনিষ কে কিনবে?

যাই হোক, আমি সস্তার কিস্তি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। পূজোর সময়—

বাড়ীর ঠাকুর চাকরেরা ধরেছে—"দিদিমণি! সবাইকে জামা দিতে হবে।" চিরদিনের প্রথা মত আমার হাত অর্থশূন্য। সেটাই এ হাতের বিশেষত্ব। তাই, মনে হ'ল—এর কাছ থেকে জামা কয়েকটি নিয়ে যাই। বেশ রং-চঙে আছে! ছোটলোকেরা পছন্দ করবে ঠিক। এত সস্তাতে কোথাও পাব না।

সেই লোকের দোকানে জামা কিনলাম। অসম্ভব কম দামে পেয়ে আনন্দ হ'ল। একসঙ্গে এতগুলো জামা একজন আধুনিকাকে বিক্রী করতে পেরে লোকটিও উল্লসিত হয়ে উঠলো।

ছেঁড়া কাগজের টুকরোতে জামাগুলো বেঁধে দিতে দিতে দোকানী সবিনয় অনুরোধ জানালো, "আবার আসবেন, মা। যা আপনার দরকার, সব আমার কাছ থেকেই নেবেন।"

হাসলাম। হঠাৎ অসতকে বলে ফেললাম, "তোমার দোকানে আমার দরকারী কি আর পাব?"

লোকটি এক নিমেষে নিভে গেল। অপ্রতিভ-লজ্জিত মুখ নীচু করে অকারণে সাজানো জিনিষগুলো গোছাতে গোছাতে কথাটায় তালি দিতে চেষ্টা করলো, "না, না,...তাই বলছি এমনি.. আর কি—।"

দুই বছর কেটে গেছে। তার সে অপমানিত মুখের ছবি আজও তো ভুলতে পারছি না।
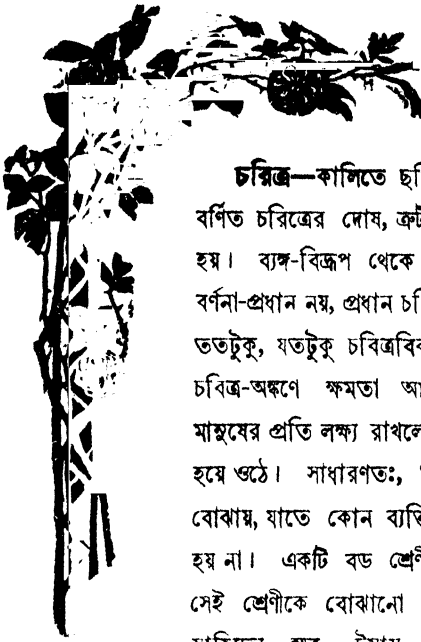
চরিত্র—কালিতে ছবি আঁকা। তীক্ষ্ণ লক্ষ্য প্রয়োজন। বর্ণিত চরিত্রের দোষ, ত্রুটী, বিশেষত্ব, নিখুঁতভাবে দেখাতে হয়। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ থেকে উদ্ভব হ'তে পাবে। এক্ষেত্রে বর্ণনা-প্রধান নয়, প্রধান চবিত্র। প্রকৃতপক্ষে, প্লটেব প্রয়োজন ততটুকু, যতটুকু চবিত্রবিকাশেব সহায়তা-বর্দ্ধক। আদর্শ-চবিত্র-অঙ্কণে ক্ষমতা আবশ্যক হয় না; রক্ত-মাংসেব মানুষের প্রতি লক্ষ্য রাখলে চবিত্র রচনাব দিক থেকে সার্থক হয়ে ওঠে। সাধারণতঃ, 'চরিত্র' বলতে একশ্রেণীর রচনা বোঝায়, যাতে কোন ব্যক্তিবিশেষের কথা বিশেষভাবে বলা হয় না। একটি বড শ্রেণীগত ব্যক্তিব চরিত্র অঙ্কন কবে সেই শ্রেণীকে বোঝানো 'চবিত্রের' প্রতিপাদ্য। ইংরাজি সাহিত্যে স্যর্ টমাস ওভর্‌বেবি (১৫৮১—১৬১৩) Characters নাম দিয়ে কতগুলি চমৎকার রচনা লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। তিনি আবার গ্রীক দার্শনিক Theophrastusএব আদর্শে এইসব চবিত্র লিখেছিলেন।

লোফারের কাহিনী

প্রথমেই বলে রাখছি আমি কোন চেনা ভদ্রলোকের কাহিনী বলতে বসিনি। আর, লোফার কথাটির ইংরাজি আভিধানিক অর্থই আমি ব্যবহার করতে চাই: One, who loafs about বাংলা মানে যার: 'যে ব্যক্তি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায় এবং সময় আলস্যে নষ্ট করে'। ইংরাজি শব্দের সম্ভাব্য জার্মান মূলটির অর্থ আবার: 'যে দৌড়ায়'। এই সব মিলিয়ে আমার মনে 'লোফার' শব্দটির যে ছায়া পড়েছে সেই ছায়াই আমি নায়কের ওপর আরোপ করে তাঁকে সসম্ভ্রমে 'লোফার' বলছি। সুতরাং, আমি চেনা ভদ্রলোককে গালি দিয়ে গল্প লিখতে প্রবৃত্ত হচ্ছি না।

একজন ভদ্রলোককে চিনতাম। চিনতাম কেন, এখনও চিনি, তবে, আগের চেনা এবং এখনকার চেনায় এই প্রভেদ যে, আধুনিক চেনাটি উভয়-পক্ষের ইচ্ছানুযায়ী নয়। ভদ্রলোক গায়ের জোরে চেনাটি আমার স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়েছেন।

যখন আমরা শিশু তখন এই ভদ্রলোক আমার দৃষ্টিগোচর হন। তাঁর বয়স তখন অনির্দিষ্ট ছিল। এখনও হিসাব ধরলে যা বয়স তাঁর, তার চেয়ে তরুণ দেখাবার নিদারুণ প্রচেষ্টায় ভদ্রলোক ম্রিয়মান। প্রৌঢ় বয়সের প্রশান্তি মেদবাহুল্যে। ছিপছিপে ছোকরা সাজবার চেষ্টায় ভদ্রলোকের মুখেচোখে কেমন একটা খিটখিটে শীর্ণভাব এসেছে। মেয়েদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি জিতেছেন বটে, কিন্তু সংগ্রামের ছাপে দেহের যা অবস্থা হয়েছে, তার চেয়ে পরাজয় ভাল ছিল অনেক। তাঁর যে বয়স হয়েছে সে কথা তিনি ভুলতে পারলেও আমরা পারছি না কেন, এতেও তার সুস্পষ্ট আপশোষ। যাক সে কথা। সম্প্রতি কেন যে তাঁকে লোফার বলছি সেটার ব্যাখ্যা করি।

যেদিন থেকে আলাপ হয়েছে সেদিন থেকে ওই ভদ্রলোককে ঘুরতে দেখেছি উদ্দেশহীনভাবে,—অজস্র। নানা জায়গায়, নানা সময়ে। বিবাহাদির পূর্বে যখন তিনি নির্ঝঞ্ঝাট ছিলেন, তখন সারাবছর কৃচ্ছ্রসাধন করে কিছু কিছু হাতে জমাতেন। তারপরে বাংলার সস্তা কোন স্থানে 'লোফ' করে বন্ধুদের কাছে উত্তরমেরু ভ্রমণের মনোমত কাহিনী বিবৃত

করতেন। আজকাল সন্দিগ্ধা পত্নী এবং পুত্রকন্যাপরিবৃত অবস্থায় দেশভ্রমণ সম্ভব হয় না। তবে দেখা হ'লেই গল্প জমান: 'এবার ভাবছি দক্ষিণ-ভারতে পাড়ি দেব', অথবা 'এবারে সিলোনে যাওয়া হচ্ছি শিগ্‌গিরই'। অবশ্য তারপরে দেখা যেত সারাবছর ধরে ভদ্রব্যক্তিটি তেলমাখা ধুতি ময়লা কামিজ পরে র‍্যাশন ও বাজার টানাটানি করছেন।

এইসব প্রচারকার্যে তাঁর নিপুণ মনোযোগে বেশ বোঝা যায় তাঁর জীবনের মর্মকথা এবং উদ্দেশ যাওয়া, কোনদিকে যাওয়া; যেখানে তার যাবার সাধ্য নেই। এবং ক্রমাগত এগিয়ে যাবার চেষ্টাই তাঁর লক্ষ্য। তবে, এই এগিয়ে যাওয়া আত্মিক অথবা উন্নতিমূলক নয়। সংসারে তাঁর চেয়ে উন্নততর প্রাণীকে ধাক্কা দিয়ে অথবা পা মাড়িয়ে সে জায়গা আত্মসাৎ করবার ইচ্ছা। এই ভদ্রলোককে দেখেছি ভীড়ে। এক জায়গায় সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে প্রসেশন আসবার আশায়, তিনি করছেন ঠেলাঠেলি। দেখেছি ভদ্রলোককে বড়লোকের বাড়ীর অফিসরুমে সন্তুষ্ট না হয়ে ড্রইংরুমের উদ্দেশেই পদপ্রসারণ করতে। দেখেছি কার্যস্থলে বা সামাজিক জগতে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন ব্যক্তির অহেতুক নিন্দা করে অন্তরঙ্গতায় অগ্রসর হবার উদ্যমে। মহিলাদের সঙ্গে কথাবার্তায় দেখেছি বিদ্যাসুন্দরী রসিকতার চেষ্টায় এই অগ্রগতির বাড়াবাড়ি প্রকাশ।

আগে অত অসহ্য লাগত না। ভদ্রলোকের বাইরের বোহেমিয়ান, ধার-করা ভঙ্গি আন্তরিক ভাবতাম। কারণ, তখন আমার ও বন্ধুমণ্ডলীর বয়স ছিল কম। ভদ্রলোক এমন করে গায়ে বাতাস না লাগিয়ে আলগোছে বেড়াবার ভাব দেখাতেন যে মনে হ'ত সত্যই 'loafing' ছাড়া তিনি কিছু করেন না। পরে জানলাম, তিনি কেরাণীগিরি করেন বড়কর্তার পদলেহন করে, তিনি মেছুনীর সঙ্গে মাছের দর নিয়ে ঝগড়া করেন, এবং তিনি প্রেম করেন অথবা করতে চান।

আমাদের সবচেয়ে কম আপত্তি প্রেম করায়। অত্যন্ত নিরাপদ ব্যসন। এ চৈতন্যের দেশ, একদা প্রেমের বন্যায় ভেসে গিয়েছিল। এ দেশ গান্ধীজীর ভক্ত, এখন প্রেমস্রোতে ভাসমান হ'তে হ'তে ঠেকে যাচ্ছে বারে বারে। বাংলার পুরুষ প্রেম করবে না? হতেই পারে না, কিন্তু আপত্তি এই যে, ভদ্রলোকের প্রেম ঘর থেকে বাইরে এসে, বাইরে থেকে ঘরে যাওয়াযাওয়ি

করে' আপন থেকে পরে ঠেকেছে। আমিও বন্ধুমণ্ডলী বড়ই বিব্রত আছি।

না, না দেখে ধরা যাবে না। সেই তো মজা। লোকের সামনে শুনি আমি তাঁর বোন। মনে মনে আশ্বস্ত হই, বাঁচা গেল। আড়ালে কবির ভাষায়: "আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে—"। পরের পংক্তি মিলবে না। আমি 'নিঃসহায়' নই, নেহাৎ ভদ্র। তাই সদর দরজা সোজা দেখিয়ে দিতে পারি না, এড়িয়ে চলার ছল খুঁজি।

বাড়ীর লোকেরা ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার মিশবার অনিচ্ছা দেখে কটূক্তি করেন: "কেন ভদ্রলোক গাড়ী চড়ে আসেন না বলে বুঝি আপত্তি? কেন, উনি বড় সাহিত্যিক বা নেতা নন বলে শ্রীমতীর আর ভাল লাগে না? ছেলেবেলা থেকে দেখছেন না তোমাকে? কি স্নেহটাই করেন! এসেই, 'আমার দিদিমণি কই', বলে খোঁজ করেন।"

কিছু বলা চলে না। আমি উপস্থিত না থাকলে, তিনি আমার বন্ধু-মণ্ডলীকে হাতের কাছে পেলে নির্বিবাদে মনোযোগ স্থানান্তরিত করে ফেলেন। ফলে, তারাও আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। হয়তো শীঘ্রই সুনামের সঙ্গে বন্ধু-মণ্ডলীকেও হারাতে হ'বে।

আমার বসবার ঘরের দরজা একতলার রাস্তার ওপর খোলা আবার। ঘর বদলাতে চেয়েছি, কেউ গ্রাহ্য করেননি, বরঞ্চ সন্দিগ্ধ হয়েছেন। দোতলার শোবার ঘরে বসে দেখেছি এমন লোক এসেছেন, যাঁদের সেখানে আনা চলে না! তাই শেষাশেষি বন্ধু-মণ্ডলীকে নিয়ে নীচেই গেছি চলে।

কোন বাধাই দেওয়া যায় না। ভদ্রলোক ভৃত্য-তন্ত্র গ্রাহ্য করেন না। বসবার ঘরে একহাট লোকের মধ্যে ঢুকে স্বায়ত্তশাসনের গৌরবে সোফায় বসতে বসতে বলেন, 'আসতে পারি কি?' এ প্রশ্নের উত্তর আবশ্যক হয় না।

তারপরে চলে ভারতচন্দ্রের ভাবধারার অনুস্মৃতি ভদ্রলোকের তরফ থেকে, আমাদের তরফ থেকে কাষ্ঠহাসি। কি বলতে ভদ্রলোক কি বলেন! এমন চাষাড়ে কথা বেফাঁসে বলে ফেলেন যে, বন্ধু-মণ্ডলীর মুখ লাল হয়ে ওঠে, আমার মাথা কাটা যায়। নানারকম ইঙ্গিত দিলেও ভদ্রলোক ওঠবার নাম করেন না। ঘরের অন্য লোকেদের সঙ্গে যে তাঁর বয়সে বিশবছরের তফাৎ, সে তথ্য তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারে না। ক্রমে ক্রমে একে একে বন্ধু-মণ্ডলী

উঠে চলে যায়। আসরটাই ম'টী হয়। ভদ্রলোক নিজের লোফার (loafing about) নাম সার্থক করে বসে থাকেন তাঁর স্নেহ-সঞ্চিত কোঁচানো ধুতি, গিলে পাঞ্জাবী আর ছড়ির সাজে। এই লোক যে সকালে লোফারের বেশে ও ভাবে (গালির অর্থে) মেছুনীর সঙ্গে ঝগড়া করেছেন, কে বলবে? কেবল উপরের পালিশ আজকাল হঠাৎ খুলে খুলে যায়, তিনি যে loafer কদর্থে, এ কথা ধরিয়ে দেয়। আগে এমন হ'ত না। বয়সে স্নায়ু শিথিল হওয়াতে প্রায়ই এ দুর্ঘটনা ঘটছে।

কিন্তু, ভদ্রলোক তো আপনাদেরও পরিচিত। প্রায়ই তো অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনার বাড়ীর মহিলাবৃন্দের মুখে এঁর প্রশংসা শুনেছেন। রেডিও-গ্রামোফোনের মত ইনি আপনার বাড়ীতেও মুখর। অনেক কথা, ভাঙাসুরে গান, বেকায়দায় এস্রাজ বাজানো, ভুল কোটেশন-কণ্টকিত সাহিত্যচর্চায় এঁর উপস্থিতি সরগরম থাকে।

রমণীপ্রিয় বস্তুর সন্ধান ভদ্রলোকের নখাগ্রে। কোন দোকানে কম দামে ভাল শাড়ী মেলে, কোন স্বর্ণকারের বাণী কিছু কম, এ সব তথ্য ভদ্রলোকের কাছে খবরের কাগজের হেডলাইন। মহিলাদের সঙ্গে মার্কেটিংএ যাওয়া, সিনেমার প্রথম শো'য়ের টিকিট সংগ্রহ ইত্যাদি ব্যাপারে ভদ্রলোকের উৎসাহ দেখছি দিন দিন বর্ধিত হচ্ছে। থিয়েটারে শীতল পানীয়, গৃহিণী জাতীয়াদের জন্ম পান-জরদা যোগান দেওয়া এঁর অবশ্য কর্তব্য। তাতে যা সামান্য খরচ হয়, গ্রাহ্য করলে চলে না। প্রতিদানে নিমন্ত্রণ পাওয়া যায়। বাড়ীর খরচটাও বাঁচে, ভালমন্দে মুখও বদলানো হয় নিখরচায়। অভিজাতবংশের মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশার অভিপ্রায়ে ভদ্রলোক নিজের সামান্য সুখ-সুবিধা তো প্রত্যহই বুদ্ধদেবের মত ত্যাগ করছেন, চাই কি, প্রয়োজন হলে প্রাণটাও ত্যাগ করতে পারেন বোধ হয়।

নর অপেক্ষা নারীসভায় ইনি অধিক শোভা পান দেখেছি। কোন বাড়ীতে পা দিয়েই ধীরে ধীরে ভদ্রলোক পুরুষ সঙ্গ ত্যাগ করে মহিলা-সভায় প্রধাবিত হ'ন, নিজের স্ত্রীকে আড়ালে রেখে পরস্ত্রী সাহচর্যে অবাধ মেলা-মেশার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে। বাড়ীতে প্রাচীনপন্থী, বাইরে ইনি উদার মতাবলম্বী। অল্পবয়স্কা বধূদের তিনি সার্বজনীন দেবর ও কুমারীদের দাদা সাজেন। সেই সুযোগে তিনি সরল শিশুর মত হাত ধরে তরুণীদের টানাটানি

করেন, কিশোরীদের পিঠ চাপড়ান। কারুর বলবার কিছু নেই। ভদ্রলোকের মত :

"সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে—"

কিন্তু, নিজের সহধর্ম্মিণীটি বাদ।

ভদ্রলোকের জেনারেল নলেজ অসাধারণ। চিংড়ির কাটলেটের আভ্যন্তরীণ মাছের সাইজ; বেট্‌ ডেভিসের প্রস্থ, খুকীভাবাপন্না' বাঙালী নায়িকার সঠিক বয়স নির্ণয়ে তিনি বিশারদ, আবহাওয়া-নির্ণয়-বিশারদের মতই প্রায়। বিজ্ঞাপনে দেখা বই, না পড়ে সমালোচনার ওস্তাদ তিনি। সর্ব্ব বিষয়ে প্রাজ্ঞ, শুধু নিজের বিষয়টি ছাড়া।

তার মানে, ভদ্রলোকের অগ্রগতির প্রবৃত্তি তাঁর ধ্বংস আনছে। একদা সু-চেহারা ও বড় বড় কথার জোরে এবং দু'একটি উচ্চদরের আত্মীয়-মাহাত্ম্যে ভদ্রলোক উর্দ্ধতন-স্তরের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশায় আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারতেন অনায়াসে। তিনি তখন সংসারে জড়িত হয়ে পড়েন নি। মনে হ'ত, হয়তো ভদ্রলোক ভবিষ্যতে একটা কেউ-কেটা হয়ে দাঁড়াবেন। বিদ্যা কলেজের গণ্ডিতে হোঁচট খেলেও ফিচেলী বুদ্ধির অভাব ছিল না। মিথ্যাকে সত্যের বরমাল্যে বরণ করতেও দ্বিধা হয়নি! তাই, সে কালে অনেক দ্বারে মাথা গলাতে পারতেন। মাথা গলিয়ে শান্তি ছিল না, ধড় প্রবেশ করাবার প্রচেষ্টায় ভদ্রলোক ধড়ফড় করতেন। কখনও দাপাদাপিতে একটু এগোতেও সক্ষম হতেন। তারপরে ডালপালা লাগিয়ে চারাগাছকে মহীরুহে পরিবর্তিত করবার সাধনায় ভদ্রলোক তটস্থ থাকতেন সর্বদা। সেই সব বাড়ী সম্পর্কে নানা অন্তরঙ্গ কথা জানবার দাবী করতেন ভদ্রলোক এবং যত্র-তত্র সে সব গোপনীয় কাহিনী বিতরণ করতে ব্যস্ত ছিলেন। কিছুদিন পরেই কলিকাতার সমাজে ভদ্রলোকটি কিঞ্চিৎ পরিচিত হ'লেন। এই আনন্দের দিন কিন্তু স্থায়ী হ'লনা। কারণ, ভদ্রলোকের প্রকৃত স্বভাব ও শিক্ষা বেশী দেখার ফলে ধরা পড়ে গেল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উপরের পালিশও ধুয়ে উঠতে আরম্ভ হ'ল। প্রাত্যহিক জগতে তাঁর প্রকৃত সামাজিক মূল্যও নির্ণীত হ'য়ে গেল। সুতরাং কলিকাতার সমাজ ভদ্রলোকের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ক'রল। কিন্তু তাতে দমবার পাত্র নন তিনি। সংসার করলেও

প্রতিদিন নিয়মিত বিকালবেলা বুড়ো বয়সে ছোকরা সেজে পূর্বপরিচিতদের বাড়ী ধন্না দেন ও বেছে বেছে নূতন করে পরিচয় জমিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। বাছা'র মানদণ্ড দু'টি ছিল চিরকাল,—অর্থ ও খ্যাতি; তাছাড়া নারীর সৌন্দর্য। আজকাল দেখছি, আধুনিকতাও আকর্ষণের বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর কাছে। মনে বোধ হয় এখনও দুরাশা আছে, নূতন সামাজিক জগতে বিশিষ্ট স্থান তিনি করে নিতে পারবেন। পথেঘাটে আলাপ হ'লে, যদি আপনার কোন সামাজিক মূল্য থাকে, আর রক্ষা নেই। ইচ্ছা থাক না থাক, ভদ্রলোক আপনার পরিচিতের মহলে কায়েমী হ'য়ে বসবেন। আপনি তাঁর 'দাদা' বা 'দিদি' হবেন, আপনার মা'কে তিনি 'মা' ডাকবেন। চান বা না চান আপনার কাজ হয়ে গেল। সিন্ধবাদের বুড়োর মত এই ভদ্রব্যক্তিকে আর ঝেড়ে ফেলতে পারবেন না।

নিজের অবস্থার উপরের স্তরের জগতে ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যাবার উদ্যমে তিনি যে হাস্যাস্পদ হয়েছেন সে বোধ নেই ভদ্রলোকের। 'বোর' এই ভীতি-প্রদ সামাজিক কুখ্যাতিতে যে তিনি চিহ্নিত আছেন, এ জ্ঞান তাঁর বহুবিধ জ্ঞানযুক্তমনে প্রবেশ করে না। অথচ, তাঁরি মত সাধারণ স্তরের লোকজনকে তিনি সযত্নে পরিহার করেন। দরিদ্র-আত্মীয়-স্বজনকে দেখলে মাঝে মাঝে চিনতেও পারেন না, অথচ একদিন দেখা কোন জমিদারতনয়ের হাতের আংটির পাথরটিও মনে থাকে। সহধর্মীদের প্রতি তাঁর ব্যবহার জু'দের প্রতি হিটলারের ব্যবহারের মত ঘৃণামিশ্রিত। যে বাড়ীতে ভদ্রলোক সম্প্রতি বাস করেন, একপাশে থাকেন একজন তাঁরই মত কেরাণী, অন্যদিকে একজন প্রসিদ্ধ সিনেমা ডিরেক্টর। ডিরেক্টরের কুকুর যে কি কি খায় সে তালিকা ভদ্রলোকের নিজের কণ্ঠস্থ, স্ত্রী-ছেলেমেয়েকেও তিনি কণ্ঠস্থ করিয়েছেন। কেরাণীটির নাম পর্যন্ত তিনি জানেন বলে স্বীকার করেন না।

বাংলা প্রবাদ আছে, 'কুকুরকে লাই দিলে পাতে বসে খায়।' ভদ্রলোক মানুষ, অবশ্যই কুকুর নন। কিন্তু, যদি একদিন একটু ভালমুখে কথা বলেন দ্বিতীয় দিন আপনার ব্যক্তিগত জীবন ভদ্রলোকের অ্যানোটেশন-পরিশোভিত অবস্থায় বাজারে বিক্রী হবে। একদিনের কথা ভদ্রলোকের মুখ থেকে তুলে দিচ্ছি।

এক বর্দ্ধিষ্ণু-বাড়ীর ড্রইংরুমে বহুলোক বসে আছেন। পান-জরদা

চিবোতে চিবোতে ভদ্রলোক গল্প বলে যাচ্ছেন অভিনেতার ভঙ্গিতে :—

"মাসীমা, দত্তদের কথা বলছেন না কি? ওদের সমস্ত খবর আমি জানি। মেজছেলে আমার বিশেষ বন্ধু কিনা। মিসেস দত্ত আমাকে ঠিক নিজের ছেলের মত দেখেন। বাড়ী গেলেই ছুটে আসেন, নিজের হাতে চা-খাবার দেন, কত সুখদুঃখের কথা বলেন। আহা, স্বামীর ব্যবহারে মনে সুখ নেই একতিল! না, না। ওসব হাসিখুশী মুখে, কেবল মুখে! আমি কি জানি না? আমাকে মিসেস্ দত্ত যে সব কথা বলেছেন, সে সব জীবনে কাউকে বলেন নি। সেবারে ছোটমেয়ে বেব্‌সি যা কাণ্ডটা করল, এক আমি জানলাম আর ওর মা। আমি মিসেস্ দত্তকে বললাম, "মা, মায়ের মত দেখি আপনাকে, কিন্তু এ আমি সইব না।" মিসেস্ দত্ত বল্লেন, "তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম, বাবা, যা হয় তুমি কর।" তারপর বেব্‌সিকে যা বকুনীটাই দিলাম! কেন? বেব্‌সির কীর্তি জানেন না আপনারা? সেই যে মুসলমান আই-সি-এসটির সঙ্গে? সেও তো আমার বিশেষ আলাপী। তবে শুনুন—"

আমার আর শোনার প্রবৃত্তি হয়নি। এমন ভদ্রলোককে আপনারা অনেক দেখেছেন। তাঁর সম্বন্ধে কি করা উচিত সে আপনারা বুঝবেন। কিন্তু, আমি যে জ্বালাতন হয়ে উঠেছি।

ভদ্রলোককে কোনমতে দমাতে না পেরে অবশেষে সন্ধ্যা লাগতে লাগতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ি পাগলের মত। কোন দিন যাবার জায়গার অভাবে পথে যে দিকে দুই চোখ যায় চলি। কোন দিন বা লেকের মাঠে একা বসে থাকি। এতে বাড়ীর আড্ডা আমার ভেঙে গেছে—বন্ধুমণ্ডলী বিরক্ত হয়েছে। নরম সোফা, গরম কফির শোকে লেকের জলে আমার চোখের জল মিশেছে। তবু দুর্বল হইনি। ভদ্রলোক স্থিরনিশ্চিত আমার সঙ্গে মিশবেনই, আমিও স্থিরনিশ্চিত—দেবনা। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু নিজের বাড়ীতে বসে থাকবার স্বাধীনতাটুকু আমি পেলাম না!

এক উপায় আছে—যা-তা বলে অপমান করা ভদ্রলোককে। ভদ্রগোছের অপমানে হ'বে না, চেষ্টা করে দেখেছি। মাঝে মাঝে ঘরে দরজা দিয়ে পৃথিবীতে মানুষী-ভাষায় যত গাল সৃষ্টি হ'য়েছে, যা আমি জানি, ভদ্রলোকের

উদ্দেশে প্রয়োগ করি। বই দেখে গালি-গালাজ মুখস্থ করে রাখি। সাময়িক শান্তি হয়। কিন্তু সে তো প্রকাশ্যে বলা সম্ভব নয়। সে সব বকুনী আমি জানি এ কথা লোকের মধ্যে বসে ভাবলেই আমার কান গরম হয়ে ওঠে। অসম্ভব! হায় ভগবান, কেন আমি ভদ্র হ'লাম?
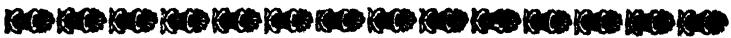
সুকুমার প্রবন্ধ—বিদেশী ভাষার Belles-lettersএর অনুকরণে বাংলা ভাষায় সম্প্রতি রচনা-প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। নামটি ফরাসী, আভিধানিক অর্থ elegant or polite literature—সুকুমার সাহিত্য। 'সুকুমার সাহিত্য' কথাটির মধ্যে নানা রচনার সীমা পাই ; উপন্যাস, কবিতা, সমালোচনা পর্য্যন্ত এই শ্রেণীগত। তবে, বর্ত্তমান প্রকার নিবন্ধকে 'সুকুমার সাহিত্য' এই অনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞাবদ্ধ করা সমীচীন নয়। তাই আমবা 'সুকুমার প্রবন্ধ' কথাটি এখানে রচনা করে নিলাম। যে রচনা নির্দ্দিষ্ট কোন শ্রেণীতে ফেলা যায় না, তখনই আমরা তাকে 'সুকুমার সাহিত্য' বলতে পারি। Belles-letters কথাটির ফরাশী অর্থ Fine Literature. যে রচনা মোলায়েম, মধুর ভাষায় লিখিত, বিভিন্ন রচনার উপাদানে গঠিত—তাকেই সাধারণতঃ 'বেল-লেৎর্' বলে একটা শ্রেণীতে ঠেলে দেওয়া হ'ত। কারণ, প্রকৃতপক্ষে বেল-লেৎর্ বলে সুনির্দ্দিষ্ট কোন বিশেষ শ্রেণী নেই। লেখাব ভঙ্গি যখন বাঁধা-ধরা শ্রেণীতে ফেলা যায় না, যখন রচনার মধ্যে প্রবন্ধ, কাব্য, গল্প ইত্যাদিব উপাদান মিশ্রিত হয়ে থাকে, তখন সেই রচনাকে বেল-লেৎর্ বলে দেওয়াই যুক্তি-যুক্ত। গয়টে, রুসো, ডিকুইন্সি প্রভৃতি লেখকের 'confessions' জাতীয় রচনাকে নিরাপদভাবে 'বেল্-লেৎর্' বলা চলে। কার্লাইলের প্রসিদ্ধ পুস্তক 'Sartor Resartus'-কেও আমরা এই নামে অভিহিত কবব। পোপের ভাষায়—'Proper study of mankind is man', বাক্যটি বেল্-লেৎর্এর উৎস ধরে উপরোক্ত রচনাদি অনুধাবন করলেই বেল-লেৎরের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম হ'বে অতি সহজে। ১৭১০ খৃঃ ইংরাজি ভাষায় প্রথম বেল্-লেৎর্ লেখা হয় প্রসিদ্ধ 'ট্যাট্‌লার' পত্রিকায়। কল্পনাগ্রাহীরূপ বাঞ্ছনীয়।

চায়ের দোকানে

চায়ের দোকান স্মরণ করলেই পানীয়টিব কথা প্রথমেই মনে হয়। বিশেষ করে মনে হয়, কারণ চা-ই হচ্ছে মহিলাদের পক্ষে একমাত্র নিরাপদ ব্যসন। জরদা সহযোগে তাম্বুলাদি সেবন করলে দাঁতের সৌন্দর্য্য নষ্ট হ'বার সম্ভাবনা আছে। সিগারেট ধরালে কেটি মিত্তিরের 'গট্ ম্যাচিস্' উক্তির কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়। অন্য কিছুর অভ্যাস থাকলে আপনারা সামাজিক জগতে আমাকে অপাংক্তেয় করবেন। সুতরাং, চা-ই খাওযা যাক।

শুধু 'মহিলা' কেন বলছি? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিষেধ-বাণী সত্ত্বেও আজ চা আমাদেব জাতীয় নেশা। বহুলোকেব পেশা রক্ষা করছে পর্যন্ত। এক কাপ কড়া চা না পেলে সাহিত্যিক লেখনী অচল, সাংবাদিক মূক, গায়ক মৌন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থেকে বালক-বালিকা চায়ের কবলগত। সুতরাং, আমাদের জীবনের যে একটি দিক সম্পূর্ণভাবে চাযের দোকানে প্রতিফলিত হ'তে পারে, এবিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ নেই।

যদি বলেন, কেবল ছেলে ছোকবাই চায়ের দোকানে ভিড় জমায়, আমি বলব—ভুল। খিট্‌খিটে ডিস্‌পেপ্‌সিযার গঙ্গাযাত্রী ছাড়া একবার চায়ের দোকানে পদার্পণ করেননি এমন লোক নেই, অন্ততঃ এদেশে। চৌরঙ্গীর সুসজ্জিত প্রাসাদই হোক, আর গলিব মুখে ভাঙা চালাই হোক, চায়ের দোকান জনাকীর্ণ কেবল চা-পানার্থীর সমাবেশে। কফিহাউস্‌কে অবশ্য সবিনয়ে নমস্কার জানাচ্ছি। কিন্তু, চায়েব দোকানই বা কম কি?

চট্ করে দোকানে ঢুকে পড়ুন। হ্যাঁ, কোনের দিকের ত্রিপদী খানা বেছে নিয়ে বসে যান। এক কাপ চা ও কিছু খাবার অর্ডার দিন। উদ্দেশটা অবশ্য চা-পানই, তবে বেশিক্ষণ থাকতে হ'লে শুধু 'পেয়তে' চলবে না, কিছু 'চব্য-চোষ্য-লেহ্যরও' দরকার হ'বে, নইলে মালিক থেকে 'বোয়'-এর রক্তচক্ষুর নীরব ভৎর্সনা আপনার ওপবে বর্ষিত হ'বে। যদি আপনি মহিলা হ'ন এবং যদি দোকানটি অভিজাত শ্রেণীর হয়, তা'হলে আজকের বিশেষ মেনু আপনার সম্মুখে ধরে জিজ্ঞাসা করবে, 'মেমসাহিবির কিছু চাই কি?' অর্থাৎ, 'প্রস্থান কর, টেবিল আট্‌কে বসে কেন?' যদি দোকানটি হয় মধ্যবিত্ত এবং আপনি পুরুষ হ'ন, তবে হাতকাটা পিরাণপরা ছোকরা সশব্দে ময়লা ঝাড়ন

দিয়ে রুক্ষভাবে আপনার টেবল্ ঝাড়বে। আর, যদি দোকানটি কৃষান-মজদুর শ্রেণীর হয়, তবে কেউ কিছুই বলবে না। যাক্ বসে 'বোয়'কে পেলেন কি? দেখে তো এলোই না, ডেকেও সাড়া নেই। মালিক স্থির, অবশেষে আপনার অস্থিরতা দেখে দয়াপরবশ হয়ে প্রতিবেশী চা-খোর দয়া করে ডেকে দিলেন। কে বলে প্রতিবেশী মন্দ? অর্ডার দিয়েছেন কি? মান রাখতে চাইলে খুব কম দেবেন না, কিন্তু সাবধান, বেশী দেবার বাসনাও সম্বরণ করবেন, বিশেষতঃ যদি মহিলা হ'ন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে।

সে এক নিদারুণ গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ দিবসে কোন কারণে খাওয়া হয়নি দুপুরে। অপরাহ্ন গোটা পাঁচেকের সময় একটি বর্দ্ধিষ্ণু চায়ের দোকানে ঢুকলাম একজন বন্ধু সমেত। সারাদিন খাওয়া হয়নি, তার উপর সাত্ত্বিক আহারে অভ্যস্ত থাকায় মোগলাই খানা মন্দও লাগছিল না। খেয়েই চললাম। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম বন্ধু মেয়েটি খাওয়া বন্ধ করে মাথা নামিয়ে বসে আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, "ব্যাপার কি?"

উত্তর পেলাম, "আর খেতে ইচ্ছা করছে না, তুমি খাও।"

একটু পরেই একটা অনিমেষ দৃষ্টির আঘাতে সচেতন হয়ে দেখলাম, যে 'বোয়'টি পরিবেশন করেছিল, একটু দূরে দাঁড়িয়ে সে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে। আজকালকার তরুণদের মনের কথা 'দেবাঃ ন জানন্তি।' সুতরাং এ আকস্মিক মনোযোগের হেতু অন্বেষণ না করে আমার আপাত প্রয়োজনীয় কার্য সমাধা করে চললাম। একটু পরে একটা ঝট্‌পট্ শব্দ শুনে দেখি—অন্য একটি 'বোয়' পরদা ঠেলে বেরিয়ে এল। প্রথমের পাশে দ্বিতীয় দাঁড়াল, লক্ষ্য আমি। তবু বিচলিত হ'লাম না। আরও একটা কোর্স চেয়ে নিয়ে চায়ের সঙ্গে আরাম করে খেয়ে যেতে লাগলাম। হঠাৎ মাথা তুলে দেখি ক্যাসিয়ার একবার আমার টেবিলের সম্মুখ দিয়ে পায়চারি করে ম্যানেজারের ঘরের দিকে চলে গেলেন। তক্ষুণি ম্যানেজার বেরিয়ে এলেন, পাশে এলেন তাঁর বন্ধু। সকলের লক্ষ্যস্থল আমি।

নার্ভাস্ হয়ে গেলাম। এদিকে পাশের লোকজনও নিজেদের আহার বন্ধ করে তাকিয়ে আছে আমারি দিকে। ভয়ে ভয়ে চুপিচুপি বন্ধুকে প্রশ্ন করলাম, "আমার মুখে কিছু লাগে-টাগে নি তো?"

"না।"

"চুল ঠিক আছে ?"

"হ্যাঁ আছে, রাক্ষস !"

বন্ধুর এই চাপা রাগে 'রাক্ষস' কথাটি শুনে এক মুহূর্ত্তে চরম সত্য আমার কাছে প্রকট হল। আমি মহিলা হয়ে খাচ্ছি বেশী, এরা আমার খাওয়া দেখছে। অথচ, একজন বয়স্ক ব্যক্তির সারাদিনের আহারের পক্ষে আমার খাওয়া কিছু বেশি হয়নি, বিশেষতঃ যখন এখনও আমাকে ডিস্‌পেপ্‌সিয়াতে ধরেনি। কিন্তু, বেশি খেলেও দোষ, কম খেলেও অবজ্ঞা। চায়ের দোকানের কর্ত্তৃপক্ষের মেজাজ বোঝা শক্ত। আহার্য্য দুষ্প্রাপ্য এবং লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ার পরে এ মেজাজ বহু ডিগ্রী চড়ে গেছে। অর্ডার ভারী দেবেন, খাবেন কম, নষ্ট করবেন খাবার। চায়ের আধকাপ ফেলে রাখবেন, তবেই মালিক ও পরিবেশকের চোখে আপনার মর্যাদা। তাছাড়া আমি দেখেছি মেয়েদের বড় বিপদ। আপনারা হয়তো আমাকে মিথ্যাবাদী ভাবছেন, ভাবছেন আমি একটি আষাঢে গল্প শুনিয়ে পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে চাইছি। কিন্তু আমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেই সত্যমিথ্যা অবগত হ'তে পারবেন। যদি চান তো তার ঠিকানা দিতে পারি।

মেয়েদের হাতব্যাগে পয়সা থাকলেও, মনে চা-পিপাসা থাকলেও, চায়ের দোকানে একাকী প্রবেশ তাদের পক্ষে হারকিউলিসের অন্যতম কঠোর কর্ম। আমরা শুনেছি একজন প্রবীণ সাহিত্যিক ট্রাম-বাসের ভিড়ে মেয়েদের দেখে ঘোর নারী বিদ্বেষী হয়ে উঠেছেন। তাহলে, চায়ের দোকানে মেয়েরা কি করবে, শুনি ? সেস্থানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আর চা খাওয়া পর্য্যন্ত, যে দৃষ্টিতে পুরুষ তার দিকে তাকাবে, সে দৃষ্টিতে প্রথম দর্শনীয় ভাব-বৈচিত্র্য হচ্ছে বিস্ময়। যেন মহিলাদের পুষ্পমধু ও শিশিরাদি পান করাই সমীচীন। বড়জোর পুরুষের সহগামী হয়ে আসা চলে।

দুঃখবিলাস থাক। আপনার কথাই হোক। স্বাধীনভারতে আত্মকেন্দ্রিক হ'তে চাইনা। চা পেয়েছেন কি ? অনেকবার তাগাদা দিয়ে, 'ও মশাই, একটু তাড়াতাড়ি করুন না', ইত্যাদি বচন ঝেড়ে, অবশেষে আধঠাণ্ডা চা এল, কিছু পিরীচে পড়েছে। চা ও ভেজাল খাদ্য নিয়ে বেশ ধ্যানে বসবার মত বসুন। হঠাৎ সামলাতে হ'বে ক্ষণভঙ্গুর পেয়ালা, বেপরোয়া তরুণ বেরিয়ে যাচ্ছে। আবার সঙ্কুচিত হন, শাড়ীর পেখম মেলে ক্যাবিনের

উদ্দেশে ধাবিত হচ্ছেন তরুণী। জন-সমাগমে কনুইয়ের খোঁচাও খাচ্ছেন আপনি।

তারপর? আহা, মনে হয় 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার' রাজ্যে এলাম বোধহয়। এতই কি জ্ঞান জগতে সঞ্চিত ছিল, আর আমারি চারপাশে? এত দার্শনিক, এত সাহিত্যিক, এত রাজনীতিবিদ্ পাশ থেকে উঠে এসে চা-মাহাত্ম্যে স্বীয় জ্ঞান-কিরণ বর্ষিত করছেন। কোন স্বার্থপরতা নেই—সকলের কানের জন্যই এই সংবাদাদি দেওয়া হয়। একটু শুনুন—মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে কত কি মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। যখন বেরিয়ে যাবেন, কয়েকটি মুদ্রাখণ্ডের বিনিময়ে কত না সংবাদ নখাগ্রে পাবেন! আপনি জানবেন, অমুক সাহিত্যিক কিভাবে আড্ডা দেন, অমুক অভিনেত্রীর ওজন কত, অমুক মন্ত্রী কত গুলি জরদা খান, অমুক শিক্ষয়িত্রীর হিষ্টেরিয়া, ইত্যাদি বহুকথা। যাদের সাধু বলে আজন্ম জানতেন, শুনবেন তারা পাকা চোর। যাকে ঘৃণিত জীব মনে করতেন, শুনবেন তাকে প্রত্যহ পুষ্প-চন্দনে পূজা করা উচিত। কত না ধারণা ওলট্‌পালট্ হয়ে যাবে চা-দোকানের আলোচনা শুনলে!

তারপর রাজনীতি। খবরের কাগজের হেডলাইন পড়ে কতলোক রাজনীতিজ্ঞ হতে পারে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাবেন চায়ের দোকানে। কেন এই পার্টি এই কাজ করল; তার ফল কি হবে; কিসের আশায় সেই নেতা সেইকথা বল্লেন; সমস্ত গোপনীয় তথ্য, দেখা যায়, আর গোপন নেই। বড় বড় নেতাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে, দেশ শাসন ঠিক কিভাবে করা উচিত এই গবেষণার মধুচক্র মোড়ের চায়ের দোকান। শুনে মনে হয়, কে বলে দেশে নেতার অভাব? কেন এই সব অমূল্য তত্ত্বকথা যত্রতত্র বিতরিত হচ্ছে?

টেনিসন 'লোটাস ঈটারের' সম্পর্কে অপূর্ব কবিতা রচনা করে গিয়েছেন। আমিও ভাবছি, নিরিবিলিতে বসে চায়ের দোকান নিয়ে একটি কবিতা লিখে অমর হ'ব। যত উৎসাহ, যত গতিবেগ, যত গলার জোর, যত ঠেলাঠেলি, যত জ্ঞান, যত সাহস দেখি চায়ের দোকানে, সেসব যায় কোথায়? শাদা পেয়ালার সোনালী জলেই কি চির-নির্বাণ লাভ করে? বিস্মরনী পদ্মমধু পান করি আমরা চায়ের পেয়ালায়।

বাড়ীতে বাঁধাধরা গোনা কয়েকটি পাত্র, তাও চিনির অভাব জানিয়ে গৃহিণীর ভ্রূকুটি-সহ প্রদত্ত। কুচ্ পরোয়া নেই—চলুন চায়ের দোকানে যাই—

আপনি এবং আমি। যত কাপ খুশী চা খেয়ে যাব, টেবিল চাপড়িয়ে গলাবাজী করতে করতে। পাশের বাড়ীর মেয়ের নিন্দা করব, সামনের বাড়ীর ছেলের প্রশংসা করব। পথে চলতি নারীর দিকে বক্র কটাক্ষে চাইব, দোকানের ক্রেতাদের বিদ্রূপ করে হেসে গড়িয়ে পড়ব। আর কথা বলব সব বিষয়ে সবজান্তা হয়ে। কি তেজ, কি উৎসাহ! তারপর রাত হলে বাড়ী ফিরব—আপনি গৃহিণীর তর্জন লাভ করবেন, আমি মায়ের গালমন্দ। নির্বিবাদে সব হজম করে যাব। পরের দিন যে যার কর্মস্থলে গিয়ে কলম পিষব' শান্ত-শিষ্ট মূর্তিতে এবং ওপরওয়ালার দাপট সহ্য করব। চায়ের দোকানের আমি আর এই আমি কি একই প্রাণী? চা-পাত্রের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে আমার অবচেতন সত্তা, যা চায়ের নেশায় দোকানের আবহাওয়ায় জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। চিরকাল তাই হয়েছে। চীন দেশ ধ্বংস হয়েছিল অহিফেনের নেশায়, বাঙালী ধ্বংস হ'বে চায়ের দোকানে। তাই আমার একটি পরিকল্পনা আছে—সমস্ত চায়ের দোকান তুলে ফেলা হোক, আর সেইখানে বসানো যাক এক-একটি ছোটখাটো স্কুল। এইবার চুপ করি। এর পরে আমার গায়ে ঢিল-ছোঁড়া হবে। সুতরাং বিদায়।

কবিতা—"কাব্যের নূতনরূপ স্বীকার করে নিতে সময় লাগে, অনভ্যস্ত ধ্বনি ও ভাবের রসগ্রহণে মন স্বভাবতই বিমুখ হয়।" —রবীন্দ্রনাথ

"It is changes in the attitude, not subject-matter, which affect the course of poetry"—Parsons.

"Great poetry embodies the sublimest expression of the human mind. Of all the forms of expression, used by mankind, poetry is the most natural and direct."

—Hammerton.

কবিতা নিয়ে অধুনা নানা পরীক্ষা হয়ে গেছে। নানা আঙ্গিকে নানাভাষায় নানা কবিতার হাতে কাব্য নব-জন্ম গ্রহণ করে। বাংলাদেশ রবীন্দ্রকাব্যে বিহ্বল হলেও নিত্য নূতন পরীক্ষায় রুচি ছিল। 'সাম্প্রতিক কাব্য' বলে তাই একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী পরিগঠিত হয়। জরাজীর্ণ প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে মুক্তি এই কাব্যের কাম্য হয়। আঙ্গিক ও ভাষার দিকে কত পরিবর্তন এ কাব্যে সাধিত হয়েছিল, কোন বিদেশী ভাবধারা এ কাব্যের পশ্চাতে কাজ করেছে, বলতে আরম্ভ করলে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ রচনায় প্রবৃত্ত হ'তে হয়। তাই কবিতার লক্ষণ সংক্ষেপে বলে নিরস্ত হ'ব।

এক একটি mood বা সর্বাঙ্গীন ভাবধারাকে প্রকাশ করা কবিতামাত্রের ধর্ম। এই ভাবধারার ক্রম-আবর্তন ও বিবর্তন বিগত যুগ ও অধুনা যুগের কবিতার পার্থক্য সূচিত করে। এ সঙ্গে আঙ্গিক ও ভাষার পরিবর্তন লক্ষণীয়।

কাব্যের ভাষা আবেগের ভাষা হওয়া উচিত। কবি নিজের হৃদয়-জাত অনুভূতি প্রকাশ করেন ব্যঞ্জনাময় ভাষার মাধ্যমে। সেই ভাষার আবেগ পাঠকের মন স্পর্শ করে অনুরূপ অনুভূতি জাগ্রত করে তোলে। তাই তো কাব্যের ভাষায় আবেগের ঐশ্বর্য্য চাই। তবে সে ভাষা বিগত যুগের প্রথামত কাব্যের সুনির্দিষ্ট একটি ভাষা না হ'লেও চলবে। আধুনিক ঐতিহ্যে গদ্যের ও কবিতার ভাষায়

বিশেষ পার্থক্য নেই। তবু আমার মতে, কবিতার ভাষা হৃদয়-স্পর্শক্ষম হওয়া দরকার।

কাব্যে ভাষা শুধু নয়—ছন্দও চাই। ভাষা যেমন হৃদয় স্পর্শ করে, তেমনি ছন্দ আনে আনন্দ। ছন্দের সহায়তায় কাব্য ধরে সঙ্গীতের রূপ। মিল বর্জ্জন করলেও, তাই রাখা হ'ক ছন্দ।

ভাবধারার বিপ্লবই যুগে যুগে স্বাভাবিক পবিণতি। রবীন্দ্রনাথের মতে কাব্যের পরিবর্ত্তন অন্তর্বিপ্লবকে আশ্রয় করে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হ'বে। কিন্তু, বাহিরের কোন আদর্শ তার স্বাভাবিকরূপ, (যেটা একটা চেহারার সীমায় বাঁধা), বদল করবে না। কিন্তু, আধুনিক কাব্যে বাহিরের রূপও দ্রুত নিত্য নূতন ধরণে বদলে যাচ্ছে। বিশ্বসাহিত্যে, বিশেষ করে ইংরাজি ভাষায়, কবিতার বিবর্ত্তন বিস্ময়-জনক। যুগের সঙ্গে কাব্যের রূপ বদল আমরা প্রার্থনা করি। তবে যুগ-ধর্ম্মকে স্বীকার করার মধ্যে বেখাপ্পা অসঙ্গতির স্থান নেই।

কবিতার সংজ্ঞা অনেক। কবিতা আত্মার পিপাসার অভিব্যক্তি—সে পিপাসা ধরা-ছোঁয়ার বস্তু না হ'লেও সত্য। যে যুগে কাব্য আদৃত হয় না, সে যুগ হতভাগ্য।

কি দেবে আমায় ?

শুধু তুমি দাও, দাও—
বলিব কি চাই ?
নীড়ের আরাম দিও নাকো।
প্রাত্যহিক হাঁড়িবেড়ি ; র‍্যাশন-বাজার ;
কাপড়ের কোটা আর আত্মীয় তোমার ;
চায়ের বান্ধব দল ; কাজের মিছিল ;
সন্তান-পালন ; গৃহ-সংসারের দিন
আমার সুরভি-ঘেরা যামিনী ছায়ায়
এনো না রাহুর প্রায় ।
আমার আকাশে এখনো চাঁদের ছোঁয়া,
এক ফালি চাঁদ,
পূর্ণিমার নহে স্বপ্ন, নয় মায়া ফাঁদ,
তবু এতটুকু এই তৃতীয়ার শশী
এখনো মাথার আড়ে প্রহরাতে বসি।
তোমার অনেক ক্ষুধা, অসংখ্য চাওয়াতে
দিও না মুছিয়া বন্ধু, সেই ক্ষীণ চাঁদে।

তবু বলি, দাও, দাও—হায়, কিবা দিবে !
শূন্য কাঁদে দিবারাত্রি,
পূর্ণতা-বন্ধনে যদি না বন্ধন চাই—
যাত্রী দিনগুলি তোমার রচিত গৃহ-পথিক শালা
যদি না বিশ্রাম নেয়,—
কি দিবে আমায় ?

পৌরুষের কামী বাহু, সতৃষ্ণ অধর,
হৃদয়ের তপ্ত স্পর্শ,
যদি নাই আনে বাসনা-নিবৃত্তি শান্তি হৃদয়ে আমার ;
আমারে বা কিবা দেবে ?
কি আছে তোমার ?

তবু যে রঙিন দিন গেঁথে তোলে জাল ;
সকাম নিস্পৃহ মন বসন্তে , বর্ষায় ;
মনের ভিক্ষুক হস্ত নিত্য কিবা চায় ?
সে তো ভিক্ষু, ওগো বন্ধু, তোমারি দুয়ারে।
সকল সত্তার মম বৈদেহী সঙ্গীত
তীব্র, তীব্রতর তার জ্বালা-দাহ সনে
প্রতিক্ষণে, প্রতিক্ষণে
চায় কিবা চায় ?
দাও, দাও, দাও তুমি—
গোধূলি বেলায়
ছিদ্র, ওগো জলপাত্র এ ভৃঙ্গার মম ;
রাত্রির পিপাসা জাগে,—
পিয়াসের বারি
এক বিন্দু জল দাও ভিক্ষা, প্রিয়তম।

কথা

শুধু কথা বলিবারে চাই—
কানে কানে কথা,
যত কথা আছে মম হৃদয়ে সঞ্চিত,
বাসনা-বেদনা দিয়ে একান্তে পুঞ্জিত,
সকলি ঢালিব প্রিয়, তোমারি শ্রবণে।
মন রাখো মনে,
দেহ থাক দূরে দূরে, মন রাখো মনে।
সময়, সময়! কোথায় সময়, বল?
চলে কাল রথ,
চক্রনেমী-তলে তারি নিষ্পেষিত প্রাণ।
মরণ-সমান
তীব্র এ পিপাসা ফেলে যন্ত্রনা-বেষ্টনে।
তোমারি শ্রবণে
কম্পমান অধর যে ব'লে দিতে চায়
কত কি অজানা বাণী?
লইছে বিদায়
গোধুলির রাঙা আলো ঘন অন্ধকারে।
সাগরের পারে
আমি একা প্রতীক্ষায়।
জীবন-সাগর তরঙ্গে তরঙ্গে মত্ত, বিভ্রান্ত বেলায়।
কালের কুটিল ছায়া মৃত সভ্যতায়
টেনে দেবে যবনিকা?
আমার নয়ন হারাবে নিমেষ-শিখা;

অগাধ বিস্মৃতি সকলি ফেলিবে গ্রাসি।
তাই কাছে আসি,
তাই চাই যত কথা আছে বলিবারে।
দুর্লভ মানব-জন্ম মূক কথা ভারে।
বুকের নিরুদ্ধ বাণী শোন কানে কানে,
প্রাণ রাখো প্রাণে।

জাগো

আমি যারে ভালবাসি, সে নহে একাকী—
আমারি মতন সে তো রজনীর মাঝে
জাগে না উন্মুখ-বাহু, নিদ্রাহীন-আঁখি।
সে নহে একাকী।
তার দীর্ঘশ্বাস
কখনো করে না উষ্ণ সন্ধ্যার বাতাস।
পূর্ণিমায় নির্মম সে চন্দ্ররশ্মি জাগে,
আমারি নয়ন ভরে বিরহ ব্যথায় ;
মর্মতলে বিষক্ষত অসহ-বেদনা
তারে কি কখনো কভু করেছে উন্মনা ?

আমি যারে ভালবাসি, সে নহে একাকী—
একাকী হিয়ার ডাক কভু কোন ক্ষণে
বিবাগী কি করে তারে ?
—নয়, আমি জানি।
তৃষিত অধরপার্শ্বে অন্যের অধর
লগ্ন চির-নিশিযামি ;
আলিঙ্গনে তার বাঁধা থাকে অন্য তনু ;
সে নহে একাকী।

আমি যারে ভালবাসি, সে নহে একাকী—
তাই একা কণ্ঠ মম গাঁথিছে কবিতা
অগ্নি আর জ্বালা দিয়ে,
অশ্রুচিহ্ন নাই,
বিক্ষুব্ধ মনের বাণী ছন্দে গেঁথে যাই।

রজনীর তমোময় কামুক প্রহরে
আমারি মনের কথা ঝঞ্ঝারূপ ধরে,
চ'লে যায় অন্বেষিয়া তুমি যেই গৃহে,
কাঁপে নাকি গৃহদ্বার সে ঝঞ্ঝা-প্রহারে ?
সুখসুপ্ত ওই দেহ, শোন তুমি শোন,
আলস্য-জড়িমা ছাড়ে ঝঞ্ঝার সে ডাকে ?
রক্ত আর মাংস ল'য়ে অনন্ত বিলাস
তখনো কি বেঁধে রাখে সরীসৃপ-পাকে ?
কখনো কি সাড়া দাও ?
দেহত্যাগী প্রাণ,—
যে প্রাণ অমৃত-কণা করেছে সন্ধান,
যারি লাগি আজো আমি রচি মম গান ;
—সেই মন ভুলেছে কি অবাস্তব দিন
ভোগের যামিনী অন্তে ধূলিমুঠো শুধু ?
দেহ তুমি ফেলে দিয়ে দিয়েছ কি সাড়া,—
—'অমৃত যে মৃৎপাত্রে—সে দান তোমার।
আমিও একাকী জাগি, হে ঝঞ্ঝা আমার !'

একলা দিনে

হয়তো এমনি দিন কাটিবে কতই !
তোমার প্রতীক্ষা-ম্লান বসি বাতায়নে
মিলিবে নিশ্বাস মম দক্ষিণার সনে।
তোমারে পাবনা শুধু পাশে।

বর্ষা যবে আমার এ জগতের 'পরে
টেনে দেবে যবনিকা বৃষ্টির অক্ষরে ;
রাত্রি জাগে মোহময় চাঁদের আভায়,
তারায় তারায় যবে স্বপন ঘুমায় ;
সঙ্গীহীন দিবারাত্রি ঝরাবে নয়ন।
তোমারে পাবনা তবু পাশে।

অনাগত যত দিন আছে
তাহারা কখনো কেউ পাবে কি তোমায় ?
শরতের আগমনী বসন্তের হোলি,
হৈম কোজাগরী আর প্রথম বৈশাখ ;
—সবদিন ছন্দহীন আসিবে বৃথায়।
তোমারে পাবনা কভু পাশে।

বালি

বালি, বালি, বালি !
ধূ ধূ করে খালি।
সাহাবার মরুভূমি নয়,
পেওনাতো ভয়,
আরবের মরুপথ নয়।
সহরের শেষে জমা রাশি রাশি বালি,
হতেছে তৈরী বাড়ী গুটি পাঁচ ছয়।
তুমি পেওনাতো ভয়,
অক্ষয়-অব্যয় নয়, কিছু নয় !
গলে যায় জল হয়ে বর্ষণ লেগে,
ভেঙ্গে পড়ে বালিবাঁধ বাতাসের বেগে।
নির্ম্মাণ যাহা হয়, সে-ও স্থায়ী নয়—
বোমাতে হয়তো যাবে—পেওনাতো ভয়।

—শুধু শুধু বালি, তবু ভয় পাও ?
পিপাসায় যায় প্রাণ শুধু বালি দেখে ?
মরুতে চলোনা, তবু মরীচিকা ছবি
বারে বারে চোখে আঁকো ভুল করে, কবি।

অতীত প্রহরে চলো—যবনিকা তুলি
দেখাই বালির ঘড়ি, ধীরে ধীরে ঝরে
সোনার রেণুর মত বালুকার কণা,
তারো সাথে ঝরে যায় সময়ের ফুল।
বন্ধু, বন্ধু, কোরোনাতো ভুল।

আমারো দিবস ঝরে বালুকার মত,
চেয়ে দেখ ছিদ্রেতে আর বাকী কত।
তোমার আমার দেখা বালির মতন
ঝরে যায় ক্ষণে ক্ষণে, ঘনায় মরণ।
অভ্রের চিকিমিকি তবু রবিকরে,—
তবু তো নিশীথ রাতে কালছায়া ম্লান।
বালির রয়েছে রূপ, দেখি তাই আমি,
—এত ভাল লাগে যার সংক্ষেপ জীবন।
জানি, জানি অন্তরীক্ষে ঝরে বালুঘড়ি,
ঝরে যায় শুভক্ষণ ফুলের মতন।

আমরা দুজনে বেঁধেছি ঘর
এই বালির ভিত্তি 'পর,
ঘর করে টল্‌মল্‌—
দুয়ার রুদ্ধ, অন্ধকারেতে খুঁজে মরি অর্গল।
উত্তর হাওয়া হানিছে আঘাত,
বালি হোল চঞ্চল,
ঘর করে টলমল।

যদিও বালির ঘর,
তবুও দেহলী 'পর
জ্বলিবে আমার বিনিদ্র রাতে মনের কামনাগুলি,
অর্গল তবু পাইনা খুঁজিয়া—যায় না দুয়ার খুলি।

নূতন কিছুই নয়,
পেয়োনা, পেয়োনা ভয়।

সহস্র যুগে সহস্র প্রাণী বেঁধেছে বালির ঘর,—
স্থায়ী নহে কিছু, তবু কত গৃহ রচিত বালির 'পর।
তুমি পেয়োনাতো ভয়,
এমনি করেছি বহুদিন মোরা,
এওতো নূতন নয়।
স্বপ্নেতে দেখি বিরাট প্রাসাদ অভ্রেতে তুলি শির,
সিংহদুয়ার, বাতায়ন সারি, সোনার মিনার তার,
প্রবেশ করিছ সিংহদুয়ারে—আমিও চলেছি সাথে,
সহসা দোঁহার মাথার উপরে গৃহ হোল চুরমার।
যুগ যুগ ধরি এইতো নিয়ম,
এইতো করেছি হায়,
বালির ভিত্তি, তাইতো বন্ধু,
প্রাসাদ খসিয়া যায়।

মৃত্যুর পরে

কি করিবে জানি, তুমি পেলে এ সংবাদ।
ব'সে আছ বাতায়নে,
খাতাপত্ররাশি সামনে সাজানো আছে।
কলমের মুখে ক্ষিপ্রগতি তীক্ষ্ণ নিব।
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
মস্তিষ্ক কর্ত্তন হয় কত জনে জনে।
কি করিতে পার তুমি পেলে এ সংবাদ
ভ্রূকুঞ্চিত আঁখি,
কাজের সময়ে বাধা ভাল তো বাস না;
অপূর্ব্ব এ হস্তাক্ষর, কষ্টসাধ্য পড়া,
অথচ পড়াও চাই—
ভ্রূকুঞ্চিত আঁখি,
অবশেষে উঠে যেয়ে ডাকিলে, "সাউথ—"
"হ্যালো!...নেই? ..কোথা গেছে?...কি!—"
রেখে দিলে ফোন, (কল্পচোখে দেখি আমি),—
দাঁড়ালে ক্ষণেক টেবিলের কোণা চেপে;
দেখিলাম কাঁপে সক্রিয় অঙ্গুলি,
যাহা কোন সন্ধ্যাবেলা পরশ করিয়াছিল
আমার ললাট।
আদর করিয়াছিলে প্রথম ও শেষ।
ফিরে এলে আসনেতে,
কি দিব উপমা?
বজ্রাহত দ্রুম যেন? শরাহত পাখী?

রাখিলে টেবিলে মাথা ;
কাঠের টেবিল, কালি-কলুষিত কাঠ
জীবনে প্রথম চিনিল চোখের জল,
—কাব্য-অশ্রু নয়।

সে গৃহের চারিপাশে ভাসে স্মৃতি মম,
একা তুমি নও, নও ;
মৃতের নিশ্বাস কখনো অধরে লাগে ;
উৎকণ্ঠ শ্রবণে কখনো আশ্রয় মাগে
হাসি-কথা যত।
কত ভাবে রূপ কত !
কভু ম্লানমুখ, কখনো বিদ্রূপদীপ্তা,
কখনো মানিনী ;
যতবার দেখেছ যে, সব রূপে যেন
জনাকুল হ'ল সেই শ্রাবণ-যামিনী।

কিছুদিন চ'লে গেল বৈরাগ্য-বিষাদে,
উন্মনা সকল কাজে ;
শূন্য লাগে সব ;
অকারণে কাজভঙ্গ করে না তো কেউ
টেলিফোনে ডেকে নিয়ে কৃত্রিম কলহ।
পক্ষাধিক পরে, কিংবা মাসাধিক পরে,
—(সঠিক আমার মূল্য জানি না তো আমি !)—
শান্তি কিছু ফিরে পেলে।
কাজ, কাজ, কাজ !
কাজের সমুদ্রে, বন্ধু, ডুবে গেল শোক !

নির্লিপ্ত ঔদাস্য এল—লিখিলে কবিতা,
দেহাতীত লোকে যার হয়েছে বসতি,
তাহারে উদ্দেশ ক'রে, (শুনি স্পষ্ট আজি)—
'অন্তরের অন্ত লক্ষ্মী, ধরহ মালিকা ;
তোমারি উদ্দেশে তোলা হৃদয়-কুসুম
লহ সখি। আমারি মানসে
বিরহ-চিতার বুকে জাগ নবরূপে।
মিলিল না আজো হায়, আকাশ-সাগর!
মহাকাল-স্পর্শতাপে লুটায় কলিকা ;
প্রাণ তবু পূর্ণ, আহা, তাহারি সুবাসে।'
লিখিলে অনেক আরো।
পরিপূর্ণ খাতা মুদ্রণে প্রকাশ হ'ল।
যত পঞ্চদশী নিরালা শয়নঘরে
নীলাম্বরী শাড়ি চাপি নয়নের 'পরে
পড়িল সে গাথা।
অনেক প্রশংসা পেলে।
এমন কি যারা শত্রু ছিল, কাছে এসে
বলিল বাখানি, "অমর এ প্রেম-কাব্য
বিরহ-গীতিকা। হার মানে 'ভিটা-নুভা'
ধন্য কবি তুমি।"

শান্তি তো পেয়েইছিলে। পেলে যে পুলক!
সার্থক এ বিরহের মর্মঘাতী ব্যথা ;
দুঃখ সে করেছে তোমা আরও মহীয়ান ;
জাগায়েছে চিরসুপ্ত অন্তর্লোকে সাড়া।
একান্ত প্রসন্ন হ'লে।
পরিপূর্ণ তুমি বেদনার উপহারে।

অদর্শন দিয়ে তোমারে করেছি ধন্য
'লাবণ্যের' মত।
'অমিতের' নির্বুদ্ধিতা আশ্রয় করিয়া
হ'লে, হ'লে আত্মপ্রীত।
জানালে প্রশংসা আমারে অনেক শত
অকাল মরণে।
(আমার কৃতিত্ব, প্রিয়, সর্বশ্রেষ্ঠ এই !)

সুতরাং শোন বন্ধু, মরিব না আমি।
প্রেমের লাগিয়া মম নহে মৃত্যুপণ।
জানিয়াছি জীবন যে মর নিত্যযামি।
অনিত্য এ কমলের তরল সলিল।
কিন্তু, প্রেম আরও তুচ্ছ, আরও ক্ষণস্থায়ী।
ভালবাসা থাকে, দেহ থাকে যতক্ষণ।
দেহ নিয়ে যতটুকু স্থান জুড়ে রই
ততটুকু স্থান পাই মানব-অন্তরে।
সুতরাং, এ জীবনে সেই লক্ষ্য ধ'রে
যত পারি প্রাণসূত্র দীর্ঘ ক'রে যাই,
যত সুখ আছে লই।
মিলিবে প্রেমিক, যতদিন শ্বাস, হায় !
যদি দেহ যায়,
দেহাতীত লোকে প্রেম উঠিবে না জানি !

চিরজয়ী

তুমি যদি শোনাও সঙ্গীত ;
দিশেহারা হয়ে যাই—
ধূলিলীন অন্তরেব গোপনীয় স্তরে
আজো জাগে উর্ধ্বমুখী চাতকের চির আশা,
জাগে ভালবাসা।
যৌবনের মদিরতা, বাসনা মলিন
নিস্তব্ধ লজ্জায় মরে।
প্রগল্‌ভ চিতে
নেমে আসে তারালোক চিরশান্তি দিতে।

তুচ্ছ-দীন এই প্রাণ
ধরণী-ধূলায় থাকে তার তুচ্ছতর
বিলাসিতা নিয়ে।
কাটিছে প্রহর
লঘু চপলতা দিয়ে ;
কেটে যায় দিন ;
তুমি রাখো কি সন্ধান ?

তোমার সুরের বাণী হয়তো, প্রেমিক,
রেখেছে লুকায়ে বক্ষে দেহের কামনা,
হয়তো তোমারও গান
সহস্র সমান
নিরুপায় ভিক্ষাভাণ্ডে শরীর বন্দনা।

তবু থাকি অন্ধ হয়ে—
ভাবি মনে মনে,
আমারে বেসেছে ভাল কেহ এতদিনে ;
যে প্রেম আলোক স্বপ্নে,
তারই রূপ ল'য়ে
অমর-সঙ্গীতে কেহ নিতে চায় চিনে।

আমার প্রমাদ প্রিয়, ট্রাজেডি আমার,
জেনেছি অনেক কিছু।
ভীরু আঁখি নীচু
অভিসারী পদে আসে সলাজ কিশোরী
প্রিয়ের সান্নিধ্যে তার,—
নহে মোর গতি।
জেনেছি অনেক আমি ;
প্লেটনিক প্রেমে কতখানি থাকে খাদ,
সোনা কয় রতি !

যদি বলো ক্ষুদ্রমনা ;
কভু মানিব না।
জেনেছি সকল তথ্য নিজেরেও দিয়ে।
প্রেমের মুকুর 'পরে
আপন অন্তরে
চমকি উঠেছি দেখি বাসনার ছায়া।
স্পন্দহীন বিশ্ব শোনে যে কাব্যের মায়া,
সে কবিতা আসে নাই চিত্তদ্বারে মম
দেহাতীত রূপে বাণী আকাশের নিয়ে।

কিছু আছে সত্য তার, কিছু বর্ণারোপ,
অর্ধেক কল্পনা আর অর্ধেক বাস্তব।
যে মনের একপাশ সুধার প্লাবনে
ভুলে যায় নিখিলের শত অসঙ্গতি।
প্রতিভা-পূজারী সে যে কোন শুভক্ষণে
বিলায় নিজেরে কোন চারণ-চরণে।
সে মনেরি অন্য পাশ সিনিক অধরে
সবজানা মৃদু হাস্যে চুপিচুপি বলে,
এখনও প্রেমের গান!
জানি, পংক্তি তলে
গুমরিয়া কেঁদে যায় যৌন আবেদন।

তবু থাকি অন্ধ হয়ে; কেন প্রিয়, জান?
পিপীলিকা পক্ষভরে মরে কেন জান?
কেন জান সূর্য্যমুখী সূর্যে দেয় মন?
কেন জান চাতকের আশা যে গগন?
ধূলো ওঠে সোনা হয়ে—
অতৃপ্ত এ প্রাণ
পেতে চায় মাঝে মাঝে অমৃত-সন্ধান।

শিবরাত্রি

চাহিনা ঐশ্বর্য্যদীপ্ত ধ্বজা ঊর্দ্ধগামী ;
মর্ম্মরের কক্ষতলে রৌপ্যের দেহলী ;
স্বর্ণাসনে নিরমম বিগ্রহেরে আমি,
হীরকে আবৃত শিলা,—আঁখি যায় জ্বলি ।
আমি তো চাইনে তারে
সহস্র ভিখারি, যে দেউলে কেঁদে মরে ব্যর্থ প্রার্থনায় ;
মুণ্ডিত মস্তক শত ভক্তনামধারী
আগুলিয়া রাখে নিত্য প্রসাদ তোমারি ;
হে ঈশ্বর, সেই লক্ষ ভক্ত জনতায়
সমারোহে শিবরাত্রে ডেকোনা আমায় ।

তুমি ডেকে নাও মোরে,
এর চেয়ে ভালো
সুদূরে নিঃসঙ্গ কোন সামান্য দেবতা,
বনালয়ে যাপে দিন বনফুল ক্রোড়ে
ভক্তহীন স্বস্তি লয়ে ।
বায়ু যায় কয়ে
বিস্মৃত অতীতে তার মহিমা-বারতা ।

শিবের চত্বরে আজ যাব না তো আমি,
যারা যায়—যাক তারা তুচ্ছ বরকামী ।
পুরাণের শিবলিঙ্গে
পুষ্প-বিল্বদল
অভিষেক বৃথা দাও—ও পূজা নিষ্ফল ।

হে কুমারী,
লও শুধু নয়নের জল।
ত্রিশ কোটী দেব মাঝে শিবরূপ ধ্যানে
আজো নারী মাগে কেন প্রিয়তমে তার?
যে দেবতা উদাসীন, কণ্ঠে সর্পহার,
কেন সেই দেব লাগি ব্রতের পালনে
উপবাসী দিবারাত্রি কাটে জাগরণে?
তুমি একব্রতী বলে, গৌরীর প্রেমিক!
অনেকের বন্ধু আছে—একনিষ্ঠ শিব।

হে মোহন, শোন মম কথার আঘাতে
ইন্দীবর নেত্রযুগে প্রশান্তি নিবিড়
দীর্ণ হয়ে চূর্ণ হোক—
তীক্ষ্ণ বাক্যাঘাতে
ক্ষণিকের দৃষ্টিপাতে
জ্বলুক অনল, ওগো চন্দ্রচূড়, ওই তৃতীয় আঁখিতে।
নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে
আর পারিবেনা তুমি ভোলাতে আমায়।
বহ্নিআলেয়ায়
প্রলয়ের নৃত্যতালে হোক পরিচয়,
আজ শান্তি নয়।
বার বার করেছ বঞ্চনা,
তোমার বরণ মাল্য ছিঁড়ি যে ধূলায়
ভেবেছি তো আর গাঁথিব না।
রাজবেশ ধরি
দ্বারে কত এসেছে ভিখারী!
আপনা পাশরি
সঁপিতে গিয়েছি মাল্য হীনকণ্ঠে তারি।

কঠিন ধিক্কার
মোহভঙ্গে দিয়ে বারবার
সে মালারে দলিয়াছি চরণের নীচে।
পূজা মম হয়েছে যে মিছে।

হে মোহন, দেখ মম গতায়ু দিবস
থরথর কাঁপিতেছে বিদায়-বিবশ।
বিশুষ্ক মালিকা আজো হস্তে শোভে কম,
পরাইনি গলে কারো।
ক্ষুব্ধ আত্মা মম
শিবরাত্রি যাপিতেছে পিপাসা দহনে।
সুস্নিগ্ধ পারণে
জানি, তুমি এনে দেবে চরম সন্ধান।
তাই এই প্রাণ
অন্তহীন শিবরাত্রি করে ফিরে ফিরে ;
ব্রহ্মচারী প্রাণ
বরমাল্য কণ্ঠে তব করিতে প্রদান,
অন্তহীন পিপাসায় সলিলের তীরে!

বর্ষশেষের গান

কোথায় তুমি, কোথায় তুমি,
আকাশে ওড়ে সুর—
পাশের বাড়ির আলিসা ধরে
ওঠে সে অনেকদূর।
গির্জাঘরের ঘড়ির আগে,
অক্‌টোলিনির চূড়ার আগে,
নীল আকাশে সে সুর আজি ব্যথায় চুরচুর।
তোমারে চাই, তোমারে চাই,
—কাঁদিয়া কহে সুর।

চৈত্রশেষের বেদনা দিয়ে গড়া এ সুর মম,—
অনেকদূরে যাবে;
রেলের সাঁকো, বনের ধার;
জোয়ারে ভাঙা তটের পার;
সাগরপাশে বিরহে লুটি আমার সুর গাবে,—
কোথায় তুমি, কোথায় তুমি?
কোথায় গেলে পাবে?

চিলের ওড়া শিখেছে সুর;
কাকের ডানার গতি;
এরোপ্লেনের পাখার বেগ ধরেছে সুর মম।
অনেক দূরে যেতে যে হবে,

যেখানে প্রিয়তম,
পাথরপুরে একেলা নিশি জাগো।
অনেকে আছে সেখানে, শুধু আমার ছায়া নাই ;
বল তো প্রিয়, নিরালা ক্ষণে পরশ আজও মাগো ?

বাঁধন হারা এ সুর আজি বাতাসে মেলে যায় ;
সুবাস সম, বীজাণু সম
ছড়ায় চারিদিক।
চৈত্রনিশা অবশ প্রেমে নূতন বাহুডোরে
আকাশে কাঁপে পহেলা রবি মাগি,
তোমারি লাগি, তোমারি লাগি,
কাঁদিয়া কহে সুর—
আমারি সুর আকাশে অনিমিখ—
আজিও শুধু তোমারি লাগি
—আমার সুর কহে—
তোমারি লাগি
বিরহে আমি জাগি।

দেশ

চেতনার প্রভাতে

শুধু স্মরি গত অপরাধ—
নিঃসঙ্গ কারার কক্ষে নিঃসঙ্গ নায়ক,
এ ভারতে, হে বিশ্বের মুক্তির বাহক,
স্থবির-দুর্ব্বল দেহে নিত্য উপবাস,
তবু মুখে তুলেছি যে বিলাসের গ্রাস ;
একবেলা অনাহারে করিনি স্মরণ !
বন্ধনেরে জয়-করা প্রেমের সাধনা,
মৃত্যুরে পরাস্ত-করা নিরস্ত্রের রণ,
একা একা করে গেলে।
বেদনার কণা
উপহার দিলাম না।
অসার চেতনা
কোনদিন হ'লতো না সে প্রেমে বিহ্বল !

নিরুদ্ধ পাথর-চাপা দেয়ালে নিষ্ফল
কত কালো রাত্রি এল !
বাদুড় উড়িল ; বুভুক্ষু শকুনী দল
ভারত শ্মশানে
শবদেহ ত্যাগ করে,
'রাত্রির প্রহরে
তমসার বার্ত্তা আনে
নিস্প্রদীপ সেলে।
অগ্নি দিলে জ্বেলে
সূচীভেদ্য অন্ধকারে।

দীর্ঘ-দৃঢ় ব্রত পদচিহ্ন অনুসারে
করিলে গ্রহণ।
আনন্দমঠেব সত্য হ'ল উদ্‌যাপন।

তোমারি জীবনে তারা
জন্ম নিল, যারা
মরণে বরণমাল্যে ডাকে বারবার।
সহস্র বিপ্লব জাগে ;
শত ঢেউ লাগে ;
কত দীপ জ্বলে, নেভে হৃদয়ে তোমাব !
কক্ষে কক্ষে তবু কেন জ্বালি দীপান্বিতা,
বহ্নি দিয়ে লিখি নাই জীবনের গীতা ?

অজানা সমুদ্র তীরে,
হে বিপ্লবী তুমি,
ডাক দিলে ইশারায় ;
ঘুমন্ত উষায়,
প্রদোষেব মুর্চ্ছাহত মোহ-চন্দ্রিমায়,
কপোলে-ললাটে চুমি,
ডেকে গেল স্বব।

আজ স্মবি অপরাধ—
দেই নাই সাড়া ;
তোমার স্রোতের বেগে ভাসায়ে শরীরে,
স্বর্গের সোনার দ্বারে হয়ে অগ্রসর,
আমরা যাইনি পেতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান,
মুক্তি যার জন্মসত্ব—সেই মুক্ত প্রাণ।

অলকার একপাশে ছিল ল্যাজারাস,
আজ তারা ব্যাধিমুক্ত, এলে স্বপ্রকাশ।

কাব্যধর্ম্মী মনে তবু আসে দ্বিধা-ভয়—
শ্মশান বৈরাগ্য নাকি, শ্মশানেই লয়?
এই মত্ত দেশপ্রেম, বল, শেষ হয়?
আবার কি ফিরে যাব তমসার পারে?

তোমারে করেছি হত্যা বিমূঢ় অজ্ঞানে,
শতবার ভুল-বোঝা, স্পর্দ্ধিত বিচারে;
তমসার জ্যোতিরেখা, পথের সন্ধানে
তোমার পথের থেকে ফিরে কতবারে!

তবু আজ ডেকে যাই—
দিয়ে যাই ডাক;
প্রতি কণ্ঠে পাই বন্ধু, বজ্রের শপথ।
সহস্র জনতা এক কণ্ঠে ধ্বনি পাক্,
প্রলয়ের বুকে পাক্ খুঁজে শেষ পথ।
ভারতের গিরিচূড়া, বনে উপবনে,
প্রতি বিহগের সনে,
প্রতি ধূলিকায়
আমার গলার স্বর ডেকে ডেকে যায়—
হাত দাও, হাত দাও,
প্রেমে দীক্ষা নাও।
জোয়ারের রুদ্ধ বেগ,
গতির আবেগ,
আমাদের পায়ে পায়ে তুলে দিক সাড়া।

হাতে শুধু হাত দাও,—
ডেকে গেল যারা,
বিনিদ্র নিশির তারা প্রহরী নির্ভীক
তাদের ডাকের সাড়া আজি ডাক দিক :
মিলনের পূর্ণিমায় আজি ডাক দিক

সাম্প্রতিক

কাহার বিদায় যেন জীবনের তলে
জড়ানো বয়েছে, আহা, নয়নেব জলে :
যখনি আঘাত বাজে, কেঁপে ওঠে তাব,
ধ্বনিত বিলাপ হয়—'যাই যাই' বলে।

তবু খোল পুষ্পমাল্য কাল কেশ হ'তে,
—শ্বেতপুষ্প সৌবভেতে মূর্চ্ছে দেহমন।
এবাব বাগিণী হোক ভৈরবী উদাস,
বীণাতে বেঁধনা পুনঃ ললিত-বিভাস

অবলুপ্তি শান্তিস্নানে করিনি সন্ধান ,
বাজেনা মিলন এই রুদ্র বীণা বুকে :
বেজেছে সুদূর এক গভীব ইঙ্গিত,
ভস্মজাল ভেদি জ্বলে চিত্তে হুতাশন।

চেয়ে দেখ মূঢ় মন—
সপ্তসিন্ধুপাবে
দুর্ব্বল বাসনা দিয়ে গড়া হিমপুবী,
শীতল আরামে তাব বিছাবে শয়ন ?
মালাগাঁথা তুলে নেবে ফেলি প্রহরণ ?
সেখানেতে পথ চাহে বিবহী কুমার
নয়নেব নিদ্রাহীন অনিমেষ পলে।
ধূপধূমে ছায়াচ্ছন্ন নিদ্রিত প্রহব।
বাতায়নে গাহে বসি প্রেমিক কোকিল।
সে প্রাসাদ গাঁথা থাক অবচেতনায়,
আমারে জগৎ ডাকে—নিলাম বিদায়।

যে অনল নিজহাতে জ্বালিয়াছি আমি
শেষদান জানি তায় এই আত্মাহুতি,
তবুও অন্তরে জ্বলে অনির্ব্বাণ শিখা,
ছায়াপথ বক্ষে হয় অগ্নিপথ লিখা।
অবলুপ্তি চাহি নাই প্রেমের শয্যায়—
বাজুক বীণার তারে বিদায়-বিলাপ,
অদেখা প্রণয়ী মম করে হাহাকার—
আমারে জগৎ ডাকে—বিদায় এবার।

এলেজি

'প্রবাসী পরদেশী হে'—

প্রবাসী, পবদেশী হে, আমি দ্বারেতে সমাগত,
ভুবন-ভবা শোভাব মাঝে কোথায তুমি আজি ?
ফুলেব বনে তোমাবে খোঁজে ভ্রমবা আখি মম। •
মমতাহীন দিবসবাতি তোমাবি অবসানে।
ভরিযা দিতে ফুলের গানে প্রতিটি ক্ষণ নিতি,—
ফলেব বোঝা নামাতে আসি কুটীব আঙিনাতে ;
আমাব বনে তোমাব লতা, বাতাসে দোলাছুলি,
ফুলেব বনে ফুলেব বঁধু, কেমনে আছ ভুলি ?

অতল-নীল আকাশতলে পাহাড়-চূড়া জাগে,
বিলীনরেখা চক্রবাল পাযেব ছোযা মাগে।
সকল আশা, ভবসা তব হ'ল কি দূবাহত ?
ফুলেব বনে ঝবিয়া গেলে প্রবাসী ফুল মত।

প্রবাসী পাখী, বাধিলে বাসা অচল-চুড়া 'পবে,
প্রবাস হ'ল আপন ঘব— ডাকিলে সবে ঘবে।
প্রীতিব তাত সুবাসকণা এখনো ভেসে আসে,
যদিও তুমি ফুরায়ে গেছ— আমাবি গৃহপাশে।

কোন অভিনেতার প্রতি

আজি মম নিদ্রাহীন আঁখি
রজনীর নিদ্রাহীন যামে অন্ধকার পটভূমিকায়
স্থির দৃষ্টি দিয়া এঁকে যায়
তোমার প্রস্মিত সেই অতুল লাবণ্য।
শুষ্ক-শক্ত প্রাচীরের মত
অবাস্তব দিবারাত্রি যত
বেড়িয়া ধরেছে মোরে চারিপাশ হ'তে ;
রজনীর স্বপ্নডোরে
তাই বার বার
বাধা পড়ে হৃদয় আমার ;
সমারোহ জেগে ওঠে ভীরু কল্পনার।
দেখি যেন প্রসারিত কার শুভ্রকর,
প্রসারিত জীবনের প্রতি ,
অনন্ত জীবন-স্রোত বহে চারিধার ;
তুমি একা মৃত কেন, হে বন্ধু আমার ?

তুমি কি দেখিয়াছিলে স্বর্গের ইসারা
আমার বিশীর্ণ এই করাঙ্গুলি 'পরে ?
জেগেছিল আহ্বান এই কণ্ঠস্বরে
তোমারে ফিরায়ে নিতে, হে যক্ষপ্রবাসী ?

পৃথিবীতে নিদ্রাহীন যাপিলে প্রহর
চির-অভিনেতা তুমি, আলোর উৎসবে।
প্রলেপ-লাঞ্ছিত মুখে
চির-অভিনেতা ;
নৃপতির সজ্জাতলে ভিখারী-হৃদয়।

সে হৃদয় পেয়েছিল যা কামনা তার,
চিরদিন ভুলে-থাকা ভালবাসা আর ?
চিরদিন দূরেরাখা অতৃপ্ত প্রণয়
একটি মুহূর্ত্ত মম করেছে অক্ষয় !

তাই আজও দেখ চেয়ে—
শুভ্র মুক্তা সম দীপ্ত পঞ্চ করাঙ্গুলি
ব্যগ্র প্রার্থনায়।
দেহ যদি ধরা হতে নিয়েছে বিদায়
ভালবাসা আজও ফেরে ধরণীর শ্বাসে।
দূর থেকে চলে আসে,
অসতর্কক্ষণে উন্মনা আজিও, বন্ধু, করে যে আমায়!

হাতে হাত রাখি নাই সকলের মত,
—জানিতাম দেহদ্বারে অনেক পথিক,
তাই, তাই অন্য পথ করেছি সন্ধান ;
বাহির সকলে পেল—পেলাম যে প্রাণ !

বলে যাও অভিনেতা,—
নিদ্রাহীন যামে
অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা মম ঊর্দ্ধ অভিমুখী—
সত্য সেই ভালবাসা ?
সত্য কাছে আসা ?
অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা আজও দহিছে হৃদয়—
বলে যাও অভিনেতা—
—সে কি অভিনয় ?

জীবন

লুসিফার

আজও মম মলিন ললাটে
প্রভাশূন্য ম্লান তারা জ্বলে,
মেঘময় যামিনীর হীনতেজা তারা।
জন্মলগ্নক্ষণে
আত্মার আলোকরেখা তমো ভেদ করি
জ্বলেছিল এ ললাটে মাহেন্দ্র লগনে।
আজও তাই ক্ষীণ আলো জ্বলে
অন্ধকারে মৃত্যু হানি প্রতি পলে পলে,
মেঘজালে নিষ্প্রভ তারকা

আমি লুসিফার।
অরণ্য আঁধারে মরি পথচিহ্নহীন,
ঝরে যায় দিন
বিশীর্ণ পুষ্পের মত অজানা বিরহে
শুধু চিত্ত দহে
পথভ্রষ্ট—শাপগ্রস্ত দেবদূত-শাপে।
অন্ধকারে যাপে
অভিশপ্ত দিবা মম আলোকের জ্যোতি।
তবু জানি মনে মনে
স্বর্গভ্রষ্ট আমি।
আমি লুসিফার।

স্বর্গের আসনে, শোন দেবতা আমার,
লোভ করিয়াছি বহু।

কত বারে বার
চাহিয়াছি অধিকার
উচ্চ সিংহাসনে।—
জন্মলগ্নক্ষণে আলোকের দেবদূত :
—এই অন্ধপাপে
আদিম আঁধারে যাপে
অভিশপ্ত দিন আমারি আলোর জ্যোতি।
ক্রমে নীচে যাই—
সুখপূর্ণ কি সহজ ভ্রমণের গতি!
ডাকিছে অতল মোরে পরম আদরে,
পাতালে রচিত আছে রাজসিংহাসন,
সাঙ্গপাঙ্গ জুটিয়াছে।
শোন অন্তর্যামি, এবারে তোমার মৃত্যু।
অন্ধ রসাতলে
লৌহের বন্ধনী দিয়ে বাঁধিয়া তোমারে
লভিব সাম্রাজ্যশক্তি একচ্ছত্র আমি,
সাবধান এইবার হোয়ো অন্তর্যামি!

তুচ্ছ যত দর্শনের লক্ষ তর্কজালে
ধূলা উড়ায়েছি, আজ মুমূর্ষু তপন
নিজের অন্তর খুঁজি মনোমত সাধ
যুক্তির আকারে গড়ি বেঁধেছি নয়ন।
বাঁধিয়াছি তোমারেও, শোন তুমি প্রিয়,
আপনার অবিশ্বাসে হীনবুদ্ধি দিয়া
নিক্ষেপ করেছি তোমা কোন পঙ্কস্রোতে,
সাথে হায়, নিজসত্তা দেছি বিসর্জ্জন।
মনোমত যুক্তি দিয়ে বেঁধেছি নয়ন।

ভুলের গাঁথিয়া মালা কণ্ঠে পরি নিজ,
ভুলের কুসুম-সাজে সাজি নিরন্তর।
জীবনে মরণে ভুল—তবু অকস্মাৎ
চেতনা চকিতে আনে স্বর্গভাষী স্বর।
—'মাহেন্দ্রলগন আজও বিফল প্রয়াসে
তোমারি স্মরণে কাঁদে;
পারিজাত-বনে আজও রতি ক্রীড়া করে;
আজও সুরসভা
উৎসবের রাত্রে হাসে দীপাবলী জ্বালি;
সঞ্জীবনী-পাত্রে আজও লুকায় বাসনা,
বেদনার তীব্রদাহ;—
সে স্বর্গ তোমার।
নহ তুমি তার।
এ অরণ্য, হায় মূঢ়, সপ্তস্বর্গে যার,
একদা প্রবল তেজে ছিল অধিকার,
এ অরণ্য, অন্ধকারা মোহান্ধ সত্তার,
আজ তারি বাসভূমি!
হায় লুসিফার!'

শুনেছি সঙ্গীত আমি,
দিয়েছি উত্তর।
সে উত্তর জানেনাতো দিবারাত্রি মম,
জানে শুধু স্বপনের চরম বিস্মৃতি,
আর তুমি জানো একা, হে অন্তরতম।

শরণং গচ্ছামি

দেহ হ'তে দেহান্তরে করেছি সন্ধান,
ব্যগ্র-ন্যস্ত পায়ে পায়ে করেছি ভ্রমণ
কি পরম সত্য লাগি ;
মিথ্যা মরীচিকা
নামাল সত্যের মুখে কালো যবনিকা ;
ঐশ্বর্য্যের ভরা ভাণ্ড করিল গোপন।
লুব্ধ অজানার লাগি দেহ হতে দেহ
নখরে কারয়া দীর্ণ খুঁজেছি রতন
সাগরে ডুবুরী সম।
অন্বেষণ মম
তবু দেহ-রত্নাকর দেয় নি কখনো।
এ জীবন-বালুতটে আজো ঢেউ গনি'
কাটাই তমসাচ্ছন্ন বিরহ-রজনী।

হে মোহিনী, সুধা-পাত্র আবরিত হাতে
এসেছ, এসেছ তুমি কোজাগরী রাতে।
হে যৌবন, পূর্ণিমার অতন্দ্র প্রহরে
আমার সাগরে শোন, জোয়ার-কল্লোল ;
প্রেমের বাহীর বক্ষে এখনও হৃদয়
ধরা দিতে বারবার হয় যে চঞ্চল !
হে যৌবন, স্বর্ণপাত্রে স্খলিত সুরায়
বার বার দেহমন সিক্ত মদিরায়।
ধরার বাঞ্ছিতা তুমি ;
আকাশের পারে
তারকা-সনাথ রাত্রি কম্পিত যেথায়,
যেথা চির দক্ষিণের অশান্ত সমীর

নীল মেঘে ঝুলনের দোলা দিয়ে যায়,—'
যত বিরহীর আঁখি সেই অলকায়
প্রাণের প্রতিমা খুঁজি উন্মনা ব্যাকুল ;
স্বপনের ভাঙা-ভাঙা পরীর পাখায়
যেখানে মনের আশা চির প্রেমাকুল :
সেই কল্পলোক পারে, মোহিনী যৌবন,
ব'সে আছ, আধহাসি বিবশ-অধরে।
যত অলক্ষিত সূত্রে তুমি ক্ষণে ক্ষণে,
হে যৌবন, স্পর্শ কর ধরণীর মনে।
তাই তো নীরস যত দর্শনের পাতা
প্রবল দক্ষিণা বায়ে ছিঁড়িয়া উড়াই।
নিরাশা তো পরিণাম,
তবু ফিরে যাই
দেহ হ'তে দেহান্তরে অন্ধ বাসনায়।

এ যৌবন মৃত আজি দূর-অস্তাচলে,
প্রভাতী তারার মত মাগিছে বিদায়
তারি মত ক্ষীণজ্যোতি মুমূর্ষু ব্যথায়,
উদয়-আকাশে চাহি নয়নের জলে।
আসন্ন বিদায়ক্ষণ ;
হরকোপানল
আমার স্মরেরে ভস্ম করেছে সময়ে।
আজি কৈলাসের শিরে আকন্দ কেবল,
রক্ত সুরাপাত্রে দেখি শুভ্র গঙ্গাজল।

তবু কেন, তবু কেন কোদণ্ড-টঙ্কার ?
অশোক-পলাশ গাত্রে হ'ল নিষ্পেষণ ?

পড়িল অলকে ঝরি কুরুবক-দল ?
শিহরে ভুবন আজো মন্মথ-স্মরণে !

হে যোগী, নয়ন মেল ;
হৃদয়ে আমার
আবার, আবার দহ প্রমত্ত মদন ;
ক্রোধ প্রভু, ক'রো না তো আর সংবরণ ;
নিমেষে ঘুচাও মম প্রণয়-বিকার।

ধীর-শান্ত বনস্থলী ;
ধীরে বয় বায়ু ;
দেহ হ'তে দেহান্তরে ব্যাকুল ভ্রমণ—
এই তো অর্পণ করি পায়েতে তোমার
হে বিরাগী, বৈরাগ্যতে নিলাম আশ্রয়।

জাপানী ফানুষ প্রেম ছিঁড়েছে আমার ;
নিভেছে মোমের বাতি।
ছোট ছোট মোম,
লাল-নীল-পীত-সাদা,—
জ্বেলেছিনু আমি
তোমারি বেদীর তলে, দেবতা আমার।
যে দেউল আলো করে চন্দ্র-সূর্য্যভাতি ;
বিশাল যজ্ঞের শিখা দীপ্ত বহ্নিমান
যে দেউলে নভোগামী ;
সেই দেবালয়ে
ছোট ছোট, নানারঙা মোমবাতি-সাজে
উজ্জ্বল করিতে আমি, চেয়েছি, ঈশ্বর !
যে প্রেম অনন্তকাল নিজের শোণিতে
পতিতের মুক্তিকামী,
সেই প্রেমশিখা
জাপানী ফানুষে আমি
চেয়েছি ধরিতে
ক্ষুদ্র-বর্ত্তিকার মাঝে !
হে প্রেমের দেব,
আজি বৎসরের শেষ,—খৃষ্টীয় বৎসর—
সারা চিত্ত ব্যগ্র হয়, চাহে অবতার—
—প্রেমের প্রতীক্ চায় !
মুগ্ধ চিত্ত ধায়
ভুলি জাতি-বর্ণ-দেশ ধরিতে তোমায়।

প্রেম অবতার
তোমার শোনিতে জন্ম লভিবে আবার।'

পাঁচ

(আমার প্রেমের গীতি আজও চিরঞ্জীব,
তারায়-তারায়-গাঁথা বিরহ-বিলাপ,
ধরাতে ফিরিয়া আসে, ডুবে যায় সুর,
বৎসরের শোভাযাত্রা, বিরহে আমার।
পরায়ে দিয়েছি বন্ধু, যেই কণ্ঠহার,
আরক্ত গোলাপ-গাঁথা বাসনা-রঙীন,
সে ফুল ঝরেছে আজ ম্লান ধূলিলীন,
কেকের কামড়ে ফেরে স্মৃতি-পিপীলিকা।
বিদেশী ভাবেতে মুগ্ধ বিদেশীর প্রেমে,
বৎসরে বন্দনা করি অন্তর-বাহিরে,
একজনে ভালবেসে করেছি জাহির।
সে প্রেম মিলালো আজ,---হায় মরিচীকা।)
আমার আশার পাখী এক ডানা ভাঙা।
কেন তুমি ফিরে এলে, হে বর্ষ আবার?
নিয়ে এলে নীলাকাশ স্মৃতিরাগে রাঙা,
নিয়ে এলে সেই ফুল প্রেমে জন্ম যার।'

শেষ

শীতের হিমানী-সিক্ত পাহাড়ে পাহাড়ে
বাজে আজি মেঘমন্দ্রে—শোন কি যে বলে—
'নূতন দেবতা এস নবছন্দোসুরে,
প্রাচীন, বিদায় নাও, নব খ্রীষ্ট এস।'
তোমার দেবতা আজ আমারও দেবতা,

হে বিদেশী ;
প্রাণ মম খুলেছে মৈত্রীতে,
সমগ্র জগৎ আমি চাহি বক্ষে নিতে.
আমার প্রেমের শিখা আজি সর্ব্বগামী !
ফুল যদি ঝরে যায়,
বিদায়-সভায় যদি মোব গীতি গায়
প্রেমের বিদায়.
যায় যাক্ তুচ্ছ প্রেম, জানি নব প্রেম
আমারে চাহিয়া আছে দিগন্ত-সীমায়।
বৎসরের জীর্ণ ভস্মে জাগো, জাগো আশা,
ভালবাসা তুচ্ছ—গাও জীবনের ভাষা ॥

সমালোচনা—"সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়মপি।"

"A critic is not to say all he can, but only all he ought"—

সমালোচনা

প্রমথ চৌধুরী

যদি লিখি—'সুদীর্ঘ আটাত্তর বৎসর পরে সাহিত্য জগতের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কক্ষচ্যুত হইয়াছে। স্বকীয়তা, নির্ভীকতা ও মৌলিকতার দ্বারা স্বর্গগত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহার পূরণ আদৌ সম্ভবপর কি না তাহাতে সন্দেহ আছে।'—তখনই কলম নিস্তব্ধ হ'বে। কারণ, মনে মনে জানব 'চার ইয়ার' এবং 'নীল লোহিতের' জন্মদাতা প্রমথ চৌধুরীর সম্পর্কে কিছু লিখবার ভাষা এবং প্রণালী এ নয়।

সাহিত্যে আমরা নগণ্য নবাগত মাত্র। রোলস-রয়েসের পাশে ছ্যাকরা গাড়ী চালাতে যে সঙ্কোচ হয় তারই সেভাবে কখনও প্রমথ চৌধুরীর নিকটবর্তী হ'বার প্রচেষ্টা করিনি। সুতরাং তাঁর বিষয়ে আমি যা লিখব তা সম্পূর্ণভাবে তাঁর সাহিত্যের উপর নির্ভরশীল হবে। মানুষ হিসাবে তাঁকে দেখে কোন নূতন আলোকপাত আমার সাধ্যাতীত। তবে, সাহিত্যিকের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচনা সমূহে, একথা স্বীকার্য।

সাহিত্য পাঠের সময় মন বহু সময় আলোকচিত্রধর্মী হয়ে ওঠে। প্রমথ সাহিত্যে আমার মন আলোকচিত্রে গ্রহণ করেছে তাঁর ঝক্‌ঝকে-চকচকে ভাষা, এবং সেই ভাষার পশ্চাতে একটি ব্যঙ্গ ও বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত মন। সেই মন এতই স্পষ্ট যে ছাপার কালির আড়ালে সে কোথাও অন্তর্হিত হয়নি। সেই ভাষা এতই শক্তিশালী যে পাঠমাত্রে পাঠককে আবিষ্ট করে। তাই আজ আমার ভাষাও আমার নিজের ভাষা থাকতে চাচ্ছেনা, প্রতি মুহূর্তে 'বীরবলী ঢং' এর অক্ষম অনুকরণের মোহে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ছে।

প্রমথ-সাহিত্যে অনুসন্ধিৎসুর তাঁর রচনার শোভন সঙ্কলন নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌লে চল্‌বে না, লাইব্রেরীর ধূলিমলিন তাক থেকে অনাদৃত 'সবুজপত্র' খুঁজে নিতে হ'বে। পরে অন্য পত্রিকা সম্পাদনা করলেও আজও প্রমথ চৌধুরীর নাম উল্লেখ মাত্রে সাহিত্য রসিকের চিত্তে স্বতঃই 'সবুজ পত্রের' নামও উদিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে ১৩২১ সনে ২৫শে বৈশাখ 'সবুজ পত্রের' প্রথম সংখ্যা ২০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের 'কান্তিক প্রেস' থেকে প্রকাশিত হওয়ামাত্র বাংলার সাহিত্য জগতে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়।

প্রায় দুই বৎসর রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্র' ভিন্ন অন্য কোন পত্রিকায় কিছুই লিখতেন না। সম্পাদক ছিলেন স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী। 'বীরবল' নাম গ্রহণ করে এই সময় তিনি অজস্র রচনা করেন। একটি বিশেষ ভাষা ও ভঙ্গির উদ্ভব প্রমথ চৌধুরীর দান, সেই ভাষা 'বীরবলী ভাষা' নামে তখন খ্যাতি-অখ্যাতি দুই-ই অর্জন করেছিল। 'সবুজপত্রের' প্রায় প্রতিটি সংখ্যা ও সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকাব স্বনামধন্য পণ্ডিতদের এই ভাষাকে কেন্দ্র করে বাদ প্রতিবাদ পাঠ করলে বিস্ময়ের সঙ্গে প্রচুর শিক্ষার খোরাক পাওয়া যায়।

'সবুজপত্রের' এক একটি সংখ্যায় প্রমথ চৌধুরীর অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হ'ত। সেই রচনাগুলি এত স্পষ্ট যে তাঁর সাহিত্যিক আদর্শে কোনরূপ কুহেলি-গুণ্ঠন ছিল না। প্রমথ চৌধুরী কেবল লেখক ছিলেন না, তিনি মনে-প্রাণে প্রকৃত সাহিত্যিক ছিলেন। বিধাতাদত্ত লেখন-প্রতিভার অধিকারী হয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় তিনি লেখনী পরিচালনা করেননি। অনুশীলন দ্বারা সেই প্রতিভার চরম উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। তাঁর রচনাবলীতে তাঁর উচ্চশ্রেণীর বিস্তৃত সাহিত্যানুশীলনের ছাপ পড়েছিল। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক এবং কলাবিদ্যাকুশল। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অনেক লিখে গেছেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় প্রতিটি বিষয়েই তাঁর নিজস্ব বক্তব্য আছে। প্রমথ চৌধুরীর অপরিমিত রচনাশক্তি এবং রচনাউৎস ছিল। তাঁর মৃত্যুর পরেও কয়েকটি পূজাসংখ্যা সাময়িকীতে তাঁর তাঁর নিবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে দেখেছি। তিনি গদ্য ও কাব্য উভয় রচনাতেই অভ্যস্ত ছিলেন। গদ্যে তিনি গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন, কাব্যে সনেট ও সাধারণ কবিতা।

'সবুজপত্র' পত্রিকাটি প্রায় দশ বৎসরকাল সাফল্যের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম চার বৎসরের পত্রিকা মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে যে কোনও অনবহিত পাঠক পর্য্যন্ত প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য সাধনাপথের সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত পাবেন। তারপরে সেই সব মতামতের ক্রমান্বয়ে পুনরাবৃত্তি হয়েছে। বস্তুতঃ মনের মধ্যে অনেক বলবার কথা জমেছিল এবং নূতন কথা ছিল বলেই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন শাখায় এই 'সবুজপত্রটি'র আবির্ভাব হয়। সম্পাদক

বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে নিজের ধারণায় একটি সত্যেতে উপনীত হয়েছিলেন। সে সত্য তাঁর কাছে এতই সুস্পষ্ট যে প্রকাশের পথ অবশ্যম্ভাবী। প্রথম সংখ্যা 'সবুজপত্রের' 'মুখপত্র' দেখা যাক—

"সাহিত্য মানব জীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয় নিদ্রার অধিকার হ'তে ছিনিয়ে নিযে জাগরুক করে তোলা। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ভোরের পাখীরা যদি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সবুজ-পত্র মণ্ডিত সাহিত্যের নব শাখার উপর এসে অবতীর্ণ হন, তাহ'লে আমরা বাঙালী জাতির সব চেয়ে যে বড় অভাব তা কতকটা দূর করতে পারব। সে অভাব হচ্ছে আমাদের মনের ও চরিত্রের যে কতটা অভাব, তারি জ্ঞান।... দেশের অতীত ও বিদেশের বর্ত্তমান, এই দুটি প্রাণশক্তির বিরোধ নয়, মিলনের উপর আমাদের সাহিত্য ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।... আবশ্যক আর্ট, কারণ প্রাণশক্তি একমাত্র আর্টেরই বাধ্য।...বড়কে ছোটর মধ্যে ধরে রাখাই আর্টের উদ্দেশ্য।'...

এখন দেখা যাক 'ভোরের পাখী' এই সাধনা সিদ্ধির জন্য কি পথ অনুসরণ করেছিলেন। বিষয়বস্তুর দিকে মন দেওয়ার পূর্ব্বে ভাষাভঙ্গির দিকেই মন দেওয়া আবশ্যক। কারণ এই বিশিষ্ট ভাষাভঙ্গিই বঙ্গসাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান

এই ভাষাভঙ্গির নাম হচ্ছে 'চলিত ভাষা' অথবা মৌখিক ভাষা। অধুনা আধুনিক সাহিত্য যে ভাষার আশ্রয় নিয়ে বর্দ্ধিত হচ্ছে সে ভাষা নিজ স্বরূপ লাভ করেছে প্রমথ চৌধুরীর কলমে।

..."আমি বহুকাল হ'তে এই কথা বলে আসছি যে বাংলাসাহিত্য বাংলা ভাষাতেই রচিত হওয়া উচিত...বাঙালীর ভাষা বাঙালীর চৈতন্যের অধিষ্ঠান। বাঙালীর আত্মাকে সংস্কৃত ভাষার দেহে প্রবেশ করিয়ে দিলে হাস্যকর দুর্দ্দশা হবে, বিশদভাবে লেখক সেটি 'সবুজপত্রের' দ্বিতীয় সংখ্যায় দেখিয়েছেন। এই সূত্রে তাঁর অন্যান্য মতামত উদ্ধৃত করি—"মৌখিক ভাষার স্বরাজলাভের তৃতীয় পরিপন্থী হচ্ছে পুঁথিগত কৃত্রিম ভাষা—অর্থাৎ সাধু ভাষা।"

"আমরা লেখায় সকলকে মুখের ভাষার অনুসরণ করতে বলি, অনুকরণ করতে নয়,—তার কারণ লেখার ভাষা মুখের ভাষা হতে বিচ্ছিন্ন না হলেও বিভিন্ন।"

"সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বিপদ, উৎসাহ, আশা, নৈরাশ্য, অনুরাগ, বিরাগ প্রভৃতি যে সকল মনোভাব আমাদের নিতান্ত অন্তরঙ্গ, সে সকলের প্রকাশের জন্য আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য শব্দ সকলই বিশেষ উপযোগী, আর আমাদের বাহ্য মনোজগতের যে অংশ সংস্কৃত ভাষায় গড়া, তার কথা কাব্যে আনতে হ'লে উপযুক্ত সংস্কৃত শব্দই আমাদের ব্যবহার করতে হবে, যাতে করে তার Association এর ঐশ্বর্য্য আমরা না হারাই—"

"সাহিত্যের ভাষা" প্রবন্ধে সংস্কৃত ভাষা মিশিয়ে মৌখিক ভাষাকে সম্পদশালী করে নূতন লেখ্য ভাষা বাংলা সাহিত্যে প্রচলন করবার বহু নির্দ্দেশ দিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন। তাঁর লেখার সঙ্কলনগুলি পাঠ করলে উদ্দেশ্য ও প্রণালী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হওয়া যাবে।

মোট কথা হচ্ছে, কৃত্রিম সাধুভাষা বর্জ্জন করে মৌখিক ভাষায় রচনা লিখে বাংলা ভাষাকে গড়ে তুলতে হবে। অথচ সেই মৌখিক ভাষা নিছক অনুকরণের বস্তুরূপে কুশ্রী গ্রাম্য প্রাদেশিক ভাষাতে যাতে পরিণত না হয়ে পড়ে সেদিকেও দৃষ্টি রাখা সমীচীন। সুতরাং সংস্কৃত ভাষায়, বিবেচনা পূর্ব্বক, মৌখিক ভাষার অঙ্গরাগ করা প্রয়োজন। এক কথায় সাধুভাষা এবং মৌখিক ভাষার উপযুক্ত মিশ্রন আবশ্যক।

এই মতামত 'সবুজপত্রের' সাহিত্যিক জগতে নিদাঘে আইসক্রীমের মত সাদরে গৃহীত হ'ল। এমন কি,—"রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমী রীতি পরিত্যাগ করিয়া 'সবুজপত্রের' সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবলের আদেশে বা অনুপ্রেরণায় চলতি ভাষাকে লেখ্য ভাষার একমাত্র অবলম্বন করিয়া গ্রহণ করিলেন।" ('বাংলা বুলি'—শনিবারের চিঠি,) 'সবুজপত্রের' প্রথম বৎসরের চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ এই 'বীরবলী ভাষা' গ্রহণ করেছেন। তারপর 'গল্পগুচ্ছ' তৃতীয় খণ্ডের কিছু কিছু গল্প ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসখানি এই ভাষাতে লিখিত হয়ে 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয়। এই ভাষারই ক্রম-বিবর্ত্তন দেখি 'শেষের কবিতা' ও 'মালঞ্চে'।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর ভাষার পার্থক্য এই যে, প্রমথ চৌধুরীর ভাষা একটি বিদ্যুৎস্ফূরণ। রবীন্দ্রনাথের হাতে কবির ভাষা, বীরবলের ভাষা প্রধানতঃ ব্যঙ্গরসিকের।

এই আশ্চর্য্য ভাষার সাহায্যে প্রমথ চৌধুরী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন

সমালোচনা, বিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। ভাষা তাঁর হাতে যন্ত্র-গাড়ীর মত যে কোন পথে চালকের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হ'ত। কখনও এই নবগঠিত 'চল্‌তি ভাষাতে' দৈন্য দেখা যায়-নি। আজ আধুনিক সাহিত্যে এই ভাষারই জয়গান। প্রকৃত পক্ষে, আধুনিক সাহিত্য বীরবলের নিকট সর্ব্বতোভাবে ঋণী।

বীরবলীয় ভাষার পূর্ব্বেও অবশ্য এই চল্‌তি ভাষা ছিল, এ ভাষা ভুঁইফোঁড় নয়। শতাব্দীর সঞ্চয় আত্মসাৎ করতে পার্‌লে তবে এক একটি ভাষার জন্ম হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাচার নক্সা' সম্পূর্ণভাবে কথ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ। পুস্তকের ভূমিকা পড়লে জানা যায় সেই সময় থেকেই ভাষা নিয়ে নানারূপ পরীক্ষা চলছিল, (১২৮৪ শকাব্দ)। ১২৮৫ সালের 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যে কথিত ভাষার প্রবেশ দেখে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। 'বাংলা সাহিত্যে প্যারিচাঁদ মিত্রের স্থান' নামধেয় ক্ষুদ্র নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কথ্যভাষা ও সাধু ভাষার সংমিশ্রণে যে আদর্শ ভাষা জন্মলাভ করে এবং করতে পারে সে বিষয়ে আশ্বাস দিলেন, যথা—"আলালের ঘরের দুলালের পর হইতে বাঙালী লেখক জানিতে পারিল যে এই উভয় জাতীয় উপযুক্ত ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয় ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা আদর্শ বাংলা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।' বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী রচনাগুলিতেও এই 'প্রকৃত' অর্থাৎ 'কথ্য বাংলা' ভাষার বুলি মিশ্রিত দেখি।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাবিষয়ক মতামত ও তৎকালীন লেখকের প্রচেষ্টা বিশদ্‌ বর্ণনা করলে কতটা প্রমথ চৌধুরীর ঋণ অথবা কতটা তাঁর মৌলিকতা সেই আলোচনার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় এবং বঙ্কিমী যুগ থেকে 'ক্রিয়াপদে' প্রমথ চৌধুরী কতটা অগ্রসর হয়েছেন বোঝা যায়। কিন্তু প্রয়োজন কি? এমার্সনের মতে মৌলিকতাই প্রতিভার একমাত্র পরিচয় নয়। বিগত অতীতকে হৃদয়ে গ্রহণ করে আগত নবযুগের প্রতি সজাগ দৃষ্টিক্ষেপ করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। বিভিন্ন দেশের জ্ঞানসম্পদ্‌ ও দেশের সাহিত্যের অতীত অভিজ্ঞতা একত্রিত হয়েছিল তাঁর রচনায়। সুতরাং প্রথমে উদ্ধৃত 'সবুজপত্রের' উদ্দেশ্যের সার্থকতা তাঁর সাহিত্য-সাধনায় পাওয়া যায়।

'সবুজপত্রের' যুগ রবীন্দ্রনাথের নোবেলপ্রাইজ পাবার পরের যুগ। বিশ্বসাহিত্যে অত বড় আসন লাভ করার পরে বিশ্বের প্রতি কৌতূহল

বাঙালীর জাতীয় জীবনে স্বাভাবিক। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' মনকে নাড়া দিলেও সম্যক্ তৃপ্তি আসে না। অথচ ভাষার সেই আধুনিকতম ভঙ্গি আধুনিকের মনে প্রাণে গৃহীত হয়েছে। জগতের আসব আরও বিস্তৃত ; হুতোম নিজের জগৎ বর্ণনা করেছেন। বাহিরের জগৎ যে আমরা তখন দেখতে চাই!

সেই সময়ে একদল পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি স্বদেশের সাহিত্যে অনুরক্তি দেখান। তাঁদের রচনাবলী প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। অন্ধ অনুকরণ তাঁরা করেন-নি, বিদেশের জ্ঞানকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। যে গুণের জন্য মধুসূদন আজও অমর সেই গুণ তাঁদের ছিল—assimilation. যে পাঠকের মন জেগে উঠেছে, যে অনেক চায়, সে পাঠক তৃপ্ত হ'ল!

এই দলের অন্যতম বিদগ্ধ লেখক প্রমথ চৌধুরী। তিনি ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান্ পড়েছেন, পাশ্চাত্য ক্লাসিকের আদর্শ গ্রহণ করেছেন, সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন করেছেন। তাঁর হাতে সাহিত্যিকের সাহিত্য রচিত হ'ল। পরিমার্জিত ও উজ্জ্বল তার রূপ।

—"লেখাপড়া মোর পেশা, লেখাপড়া মোর নেশা,
কাজ আর খেলা—" ('পত্র')

ভাষা ও ভঙ্গিতে সম্পূর্ণ নূতনত্ব, বাংলার সাহিত্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ দ্বারা বক্তব্য বিষয় বর্ণিত হ'তে লাগল, অভূতপূর্ব বাচনভঙ্গির সঙ্গে সংযুক্ত হ'ল শব্দ চয়ন। শব্দই ভাষার প্রাণ। 'আত্মকথা' থেকেই আমরা জানতে পারি নানা শব্দ নানা শ্রেণীর লোকের কাছ থেকে গ্রহণ করে প্রমথ চৌধুরীর ভাষার 'মূল পুঁজি' বাড়াবার দিকে ঝোঁক ছিল। তিনি বলেন, "আমার ভাষার বনেদ্ হচ্ছে সেকালের কৃষ্ণনাগরিক ভাষা"—'মুস্কিলআসান' সনেটে দেখা যাক তিনি অবাঙালা শব্দ কেমন আত্মসাৎ করেছেন —

"আজিও নিরাশা বুকে চাপালে পাষাণ
কানেতে না পশে মোর দুনিয়ার হাল্লা
হৃদয়ে ফকির জপে "লা-আল্লা-ই'লাল্লা,"
আকাশেতে শুনি বাণী "মুস্কিল-আসান"!"

(সনেট-পঞ্চাশৎ)

এই 'শব্দ' কথাটি ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর দ্বিতীয় অবদানের কথা আলোচনা করবার ক্ষেত্র পাই। সেই অবদান তাঁর অনন্য-সাধারণ ভাষাভঙ্গি ও বাচনভঙ্গি। উপযুক্ত শব্দ সমাবেশ করে প্রমথ চৌধুরী এই ভঙ্গির গঠন করেছিলেন। কোলরিজ বলেন—"Good prose is proper words in their proper places; good verse is...the most proper words in proper places.' প্রমথ চৌধুরীর রচনায় এই proper words এর সমাবেশ দেখি। তিনি কখনও বাহুল্য ও অর্থহীন শব্দে নিজের ভঙ্গিকে ভারাক্রান্ত করেন-নি, কখনও এমন শব্দ ব্যবহার করেন নি যার সেই স্থানোপযোগী ব্যঞ্জনার অভাব আছে। তার ফলে তাঁর রচনার কাঠামো অতি সুনিবদ্ধ, স্বল্প পরিসরে সম্যক্ প্রকাশিত। স্থানে স্থানে তাঁর গল্প ও কবিতায় এমন কথা পাওয়া যায় যা প্রবাদবচনের মত শাণিত ও সংক্ষিপ্ত জীবনসত্য। আরনল্ড-এর মতে এটি সাহিত্যের প্রকৃত লক্ষণ; কারণ একে 'Criticism of life' বলা চলে।

"বিশ্ব সনে দিন রাত শুধু বোঝাপড়া,
সে ত নয় ঘর করা, করা সে ঝগড়া।' (সনেট পঞ্চাশৎ)

"একটি বর্ণচোরা দৈহিক প্রবৃত্তিই যে পুরুষের নারী-পূজার মূল, একথা অবশ্য তোমরা কখনও স্বীকার করনি।' ('চারইয়ারী কথা') "আধমরা সরস্বতীই যে লক্ষ্মী, একথা ত এদেশে সর্ববাদী সম্মত—" ('পত্র')

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দুই একজন লেখকের কলমের চমৎকার ভঙ্গি দেখি; সেজন্য এই সব লেখকের রচনায় অন্তঃসারশূন্যতা প্রতীয়মান হলেও শুদ্ধ বাচনভঙ্গির জন্য তাঁরা সাহিত্যিক জগতের উচ্চ মঞ্চে সমাসীন হতে পারেন বলে সাধারণের বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের বাংলা ওই ভাষা নয়! সুতরাং মনে করি, এই আধুনিক সাহিত্য নূতন কিছু এনেছে, যা এ দেশে ছিলনা—অর্থাৎ ভঙ্গিতে এই Banter, কিন্তু, যখনই প্রমথ চৌধুরীর রচনায় ফিরে যাই তখনই উপলব্ধি করি এই ভঙ্গি বাংলা সাহিত্যে অনেক পূর্বেই প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, এই বাচনভঙ্গি, যার সর্বাঙ্গীন অনুধাবন হয় মস্তিষ্কে, তার জন্মের জন্য বীরবলকে ধন্যবাদ।

এখন প্রমথ সাহিত্যের স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করে দেখালে বোঝা যাবে আধুনিক সাহিত্যে কতটা প্রমথপ্রভাব পড়েছে:—

—"তারপর কলম হাতে নিয়ে দেখি যে, আমার মাথার ভিতর এখন আর কিছুই নেই—এক কংগ্রেস ছাড়া। আর কংগ্রেসের গল্প আমি পারি শুধু পড়তে, লিখতে নয়। কেননা, দিল্লীতে আমি যাই-নি।"—'সে লাড্ডু আকারে ভাঁটার মত, আর সে চিজ দাঁতে ভাঙ্গবার যো নেই, গিলে খেতে হয়, আর তা গেল্‌বার জন্য গলার নলী হওয়া চাই ড্রেন পাইপের মত মোটা। আর "পুরি?" তার একখানা ছুঁড়ে মারলে নাকি প্রেসিডেন্টকে আর দেশে ফিরতে হ'ত না"— ('নীললোহিতের সৌরাষ্ট্র-লীলা')

"হাঁ।—এদেশের ভক্তিযোগীরা, অর্থাৎ কবির দল, কাঁচাকে কচি করতে চান। এরা চান যে আমরা শুধু গদগদভাবে আধ-আধ কথা কই।"—('সবুজ পত্র')

—পশ্চিমের প্রাণবায়ু যে ভাবের বীজ বহন করে আনছে, তা দেশের মাটীতে শিকড় গাড়তে পারছে না বলে, হয় শুকিয়ে যাচ্ছে, নয় পরগাছা হচ্ছে। এই কারণেই "মেঘনাদ বধ" কাব্য পরগাছার ফুল। অর্কিডের মত তার আকারে অপূর্ব্বতা এবং বর্ণের গৌরব থাকলেও, তার সৌরভ নেই খাঁটী স্বদেশী বলে "অন্নদামঙ্গল" স্বল্পপ্রাণ হলেও কাব্য; এবং কোন দেশেরই নয় বলে "বৃত্রসংহার" মহাপ্রাণ বলেও মহাকাব্য নয়।"—('মুখপত্র—সবুজপত্র')

—"ছোটলোকী বড়মানুষীর এমন চোখে আঙ্গুল দেওয়া চেহারা বিলেতে বড় একটা দেখা যায় না।"

—"সে চোখ যেমন বড়, তেমনি কালো, যেমন নিশ্চল, তেমনি নিস্তেজ। এ চোখ দেখলে সীতেশ ভালবাসায় পড়ে যেত, আর সেন কবিতা লিখতে বসত। তোমাদের ভাষায় এ নয়ন বিশাল, তরল, করুণ প্রশান্ত। তোমরা এ রকম চোখে মায়া, মমতা, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি কত কি মনের ভাব দেখতে পাও কিন্তু তাতে আমি যা দেখতে পাই, সে হচ্ছে পোষা জানোয়ারের ভাব।"—

—"এই রমণীটির শরীরের গড়নে ও চল্‌বার ভঙ্গিতে শিকারী চিতার মত একটা লিক্‌লিকে ভাব আছে।"—

"ঐ গেরুয়া রঙের মিনে-করা মুখের পিছনে কি ধাতু আছে"—

—"তার মুখের আধখানা ছায়ায় ঢাকা পড়াতে বাকি অংশটুকু স্বর্ণমুদ্রার

উপর অঙ্কিত গ্রীক্‌রমণী মূর্ত্তির মত দেখাচ্ছিল, সে মূর্ত্তি যেমন সুন্দর তেমনি কঠিন।"—

"তুমি এলে দেখতে পেতে যে, আমার চেহারা ঠিক Botticelliর ছবির মত হয়েছিল। হাতপা গুলি সরু সরু আর লম্বা লম্বা, মুখ পাতলা, চোখ দুটো বড় বড়, আর তারা দুটো যেমন তরল তেমনি উজ্জ্বল। আমার রং হাতির দাঁতের রংয়ের মত হয়েছিল, আর যখন জ্বর আসত তখন গাল দুটি একটু লাল হয়ে উঠত।"—

"সেদিনকার সেই রাত্রির ছায়ায় তাঁর প্রকাণ্ড দেহ অষ্টধাতুতে গড়া একটি বিরাট বৌদ্ধ মূর্ত্তির মত লাগছিল"—

—"কিছুক্ষণ আগে যে চোখ হীরার মত জ্বলছিল এখন তা নীলার মত সুকোমল হয়ে গেছে।"—

"—নিজে পুতুল সেজে আর একটি সালংকারা পুতুলের হাত ধরে এই পুতুল-সমাজে নৃত্য করবার কথা মনে করতেও আমার ভয় হত"—

—"এই ঢেউ খেলানো জ্যোৎস্নায় দিগদিগন্ত ফেনিল হয়ে উঠেছিল-সে যেন শ্যাম্পেনের ফেনার মত আপন হৃদয়ের আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে"—

—"কত ফুলের মত কোমল, কত তারার মত উজ্জ্বল স্ত্রীলোক দেখেছি"—

"গলা থেকে-পা পর্য্যন্ত আগাগোড়া কাল কাপড় পরা একটি স্ত্রীলোক লেজে ভর দিয়ে সাপের মত ফণা ধরে দাঁড়িয়ে আছে"—

"এই স্পর্শে আমার শরীর মনে আগুন ধরিয়ে দিলে—"

"তুমি আমার কাছে আজ বসন্তের হাওয়ার মত এসেছ, আমার মনের মধ্যে আজ ফুল ফুটে উঠেছে—"

"এ বর্ষার আধখানা উপর থেকে নামে আর আধখানা নীচে থেকেও ওঠে, আর দুইয়ে মিলে আকাশময় একটা বিশ্রী অস্পৃশ্য ব্যাপারের সৃষ্টি করে ...এ রকম দিনে ইংরাজরা বলেন, তাঁদের খুন করবার ইচ্ছে যায়; সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের যে আত্মহত্যা করবার ইচ্ছে হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?"

"এমন কলে তৈরী রসিকতাও যে মানুষে পয়সা দিয়ে কিনে পড়ে এই ভেবে অবাক হলুম—" ('চারইয়ারীর কথা')

উপরোক্ত কোটেশনগুলি থেকে প্রমথ চৌধুরীর ভাষাভঙ্গী সবিশেষ প্রকট

হচ্ছে, যা সহজে কথা বলে বোঝানো যাবে না। প্রমথ চৌধুরীর এই আশ্চর্য্য ভাবাভঙ্গীই তাঁকে চিরকাল বঙ্গ সাহিত্যে অমর করে রাখবে সন্দেহ নাই। তাঁর মানসিক দৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও মৌলিক। যে কোন বিষয়েই হোক তাঁর বক্তব্য বিষয়ের হাস্য-পরিহাসের আভাস দেখা যায়, সেই জন্যই তাঁর রচনা পরিহাস ও বিদ্রূপধর্ম্মী কিন্তু এই বিদ্রূপে কোথাও ক্রোধের জ্বালা নাই। ঠাট্টা করতে করতে সত্য কথা বলে যাওয়া তাঁর Satireএর ধর্ম্ম। সে পাঠক সত্য বলে স্বীকার করুন আর নাই করুন ভঙ্গির মাধুর্য্যে রসগ্রহণে বাধা হয় না।

প্রমথ চৌধুরী প্রধানতঃ চিন্তাশীল লেখক, স্থানে স্থানে চিন্তার সঙ্গে প্রবল ভাবুকতাও মিশেছে। ('যৌবনে দাও রাজটিকা')

এই অন্তর্নিহিত ভাবুকতা কবিত্বের সঙ্গে সন্ধি করে প্রমথ চৌধুরীকে উল্লেখযোগ্য কবি করেছে। অবশ্য তাঁর 'পদচারণ' গ্রন্থের কবিতাগুলি সত্যই "গদ্যের কলমে" লেখা। সহজ সাবলীল ভাষা ও প্রকাশ কবির ঈপ্সিত ছিল।

থাকে না কবির সাজান ভাষায়
ফুলের প্রাণ,
পড়ে না কবির সাজান পাশায়
মনের দান।" ('পদচারণ')

'সনেট পঞ্চাশৎ' বই খানিতে আমরা কাব্যের উপাদান বেশী পাই। সনেটের বাঁধাধরা ইতালীয় কাঠামো থেকে কবি ইংরাজী ও ফরাসী সনেটের পথে মুক্তি অনুসন্ধান করেছিলেন। পুস্তকের মুখবন্ধে পেত্রার্ককে মধুসূদনীয় প্রথায় বন্দনা করলেও কবি যে পেত্রার্কের অনুসৃত সনেটের বাঁধাধরা রূপ অনুসরণ করেন নি একথা দিনের আলোর মত স্পষ্ট। চৌধুরী-সাহিত্যে স্বাধীনতাপ্রিয়তারও এই একটি উদাহরণ। এই সূত্রে বক্তব্য যে সেনেটের সঙ্গে বিভিন্ন বিদেশীছন্দকেও কবি তাঁর সাহিত্যে শ্রেণীভুক্ত করে গিয়াছিলেন, ('ত্রেপাটী' Terza Rima' ইত্যাদি)

কাঠামো শিথিল হ'লেও কবিত্ব ও মাধুর্য্যে প্রমথ চৌধুরীর সনেটগুলি সুখপাঠ্য। রূপ ও রসের সন্ধি 'ভুল' সনেটটিতে দেখি—

"ভাল তোমা বেসেছিনু, মিছে কথা নয়।
সে দিন একেলা তুমি ছিলে মোর সাথী,
বকুলের তলে বসি রসে মন গাঁথি।

বকুলের গন্ধ বল কতক্ষণ রয় ?
সে দিন পৃথিবী ছিল অন্ধকারময়,
ঘন মেঘে ঢেকেছিলো নক্ষত্রের বাতি,
সে তিমির চিরেছিল বিদ্যুৎ-করাতি।—
বিদ্যুতের আলো কিন্তু কতক্ষণে রয় ?" ইত্যাদি।

কবিতাটির মূল্য সনেট হিসাবে নয়, নিছক কবিতা হিসাবে।

তবু প্রমথ চৌধুরীর বিশেষত্ব বেশী পরিলক্ষিত তাঁর গল্পে। প্রবন্ধগুলি বিদ্যুতের কলমে লেখা। গল্পগুলিতে গল্পাংশ আছে, চরিত্র আছে, গতি আছে, তবু তাদের মর্য্যাদা যেন ওসব কিছুতে নয়, যতটা ভঙ্গি ও ভাষায়। লেখক লৌকিক, অলৌকিক এই উভয়েরই সুন্দর পটভূমিকা একত্রে অঙ্কিত করতে পারেন। কখনও বা অতীন্দ্রিয়ের স্থানও দেখা যায়, ('আহুতি')। কিন্তু তবু বলতে ইচ্ছা করে,—"অন্য কোনখানে", "অন্য কোনখানে"। অর্থাৎ চৌধুরী সাহিত্যের মূল্য অন্য কিছুর উপর নিহিত। যদি ভাষাভঙ্গি বাদ দেওয়া যায় সে সাহিত্য পঙ্গু হয়ে যাবে। তাই প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় গল্পগুলি যেমন স্বাবলম্বী হ'তে পেরেছে ক্রিয়েটিভ রচনা তত হয় নি। কেন ?

'আত্মকথাতে' (১৮ পৃঃ) দেখি,—'আমার লেখার ভিতর যদি বাক্‌চাতুরী থাকে ত তার জন্য আমি কৃষ্ণনগরের কাছে ঋণী।" বাক্‌চাতুরীকে প্রমথ সাহিত্যে বড় স্থান দেওয়া হয়েছে। বাক্যকে মার্জিত করে, উপযুক্ত শব্দ চয়ন করে প্রকাশের কাঠামোকে উৎকৃষ্ট করে তোলা হয়েছে। এতে, যে কথা বহুবার বলেছি,—ভাষা ভঙ্গির এক অনন্যসাধারণ উন্নতি সাধিত হয়েছে। গোড়াতে একেই তিনি 'আর্ট' বলেছেন। যখন পড়ি বীরবল কোন লেখা সম্পর্কে বলেছেন যে, এ সুকুমার সাহিত্য তো নয়ই, কুমার সাহিত্য অর্থাৎ ছেলেমানুষী; তখন বীরবলীয় রচনার মর্ম্মকথা বুঝতে বিলম্ব থাকে না।

এই লাইনটি যেমন কান তৃপ্ত করে, তেমন প্রাণকে করে না। মনে হয় 'কি চতুর', কিন্তু মনে হয় না 'কি তত্ত্ববান', অর্থাৎ নূতন কিছু জানলাম। এতো জানা কথাই, শুধু বলবার ভঙ্গিতে নূতনত্ব নিয়েছে। এর মধ্যে গভীরতা অথবা সার কোথায় ?

ঠিক এইখানেই প্রমথ-সাহিত্যের অপূর্ণতা। গভীরতা ও দিব্যদৃষ্টির

অভাব। তাঁর দৃষ্টি বহিঃ এবং অন্তঃ জগতে সীমাবদ্ধ। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁর কাম্য ছিল। তিনি অন্তরে ফরাশী।

বিভিন্ন দেশের সাহিত্য পাঠ করতে করতে সহসা কোন না কোন জাতিতে নিজের মনের অ্যাফিনিটি খুঁজে পাওয়া মানব ধর্ম। ফরাসী সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী প্রবল অনুরক্তি স্বীকার করে গেছেন। এ ছাড়া, তাঁর রচনার বৃহত্তর অংশ ভালভাবে অনুধাবন করে গেলে ফরাশী সাহিত্যের দিকে প্রবণতা দেখা যাবে। ভাষা-ভঙ্গির স্পষ্টতা, তীক্ষ্ণতা; আবেগহীনতা, পরিহাসপ্রিয়তা সমস্ত লক্ষণ মিলে যায়, তা ছাড়া নির্মাণ কৌশল ও বহিরঙ্গের দিকে একান্ত মনোযোগও ফরাশী পালিশের ইঙ্গিত দেয়। ভলতেয়ার, মোপাসাঁ, আনাতোল ফ্রাঁসে, মলিএয়ার প্রভৃতি ফরাশী লেখকের সহধর্মী বলে প্রমথ চৌধুরীকে আমার মনে হয়।

এখন দেখা যাক উল্লেখিত লেখকদের বিশেষত্ব কি? তা হ'লে সহজেই প্রমথ চৌধুরীর তাঁদের সঙ্গে সাদৃশ্য প্রকট হ'বে।

মোপাসার লেখায় পাই হ লুক সুরে সত্য বলা সিনিসিজমের রংএ। তাঁর টেকনিক ও পর্য্যবেক্ষণ নিখুঁত। কিন্তু, গভীরতা ও কল্পনার অভাবে সমস্ত লেখাগুলো পাঠ করবার পরে একরকম অতৃপ্তি মনে জাগে। প্রতিভার অনুরূপ দিব্য দৃষ্টির অভাব বলেই একটা অতৃপ্তি অনুভূত হয়।

মলিএয়ারের ধর্ম ঠাট্টাতামাসার মধ্য দিয়ে জীবনের গলদ ও ত্রুটিগুলি উদ্ঘাটন করে লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরা যাতে সামাজিক সংস্কার হয়। 'লুতোম প্যাচার' নকসারও মোটিফ তাই। বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে সত্য বলা মলিএয়ারের বিশেষত্ব। প্রফেসার গ্রীণ বলেছেন, কমেডির প্রকৃত উদ্দেশ মলিএয়ার বুঝেছিলেন—'The author must seize & fix the universal & eternal truth, which lies at the root of human conduct. This Moliere achieved." কিন্তু মলিএয়ার বীরবলের মত জীবনের সত্য রূপকে দেখিয়েই ক্ষান্ত হন নি, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশেরও নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন।

'বীরবল' নাম প্রমথ চৌধুরী গ্রহণ করেছিলেন, "লোকের অন্তরে মিছরীর ছুরি ঢুকিয়ে দিতে," ('আত্মকথা' পৃঃ ১৯)। "বিদূষকের বেশে মনোরঞ্জন করার' ছলে তিনি দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন আমাদের মনের ও চরিত্রের

কতটা অভাব। বীরবলের সাহিত্য সাধনায় পথ কখনও বামমার্গে হলেও তিনি আগাগোড়া সে সাধনায় সত্যসন্ধ ছিলেন।

আনাতোল ফ্রাঁসের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর মিল প্রধানতঃ ভাষাভঙ্গিতে। সমসাময়িক লেখক আনাতোল ফ্রাঁসের (১৮৪৪—১৯২৪) প্রভাব চৌধুরী সাহিত্যের ভঙ্গিতে পড়াই স্বাভাবিক। আনাতোল ফ্রাঁসের ভঙ্গিতে এমন একটি ভাব আছে যাতে তাঁর মনের প্রকৃত ভাব—নিন্দা বা প্রশংসা, সারল্য অথবা ব্যঙ্গের ইচ্ছা সহজে বোঝা যায় না। প্রমথ চৌধুরীর রচনাতে প্রায়ই এ ভাব দেখা যায়। আনাতোল ফ্রাঁসের একটি কথা অনুবাদে দেখা যাক :—

—"I was eating a pâte de Chartres, which is alone sufficient to make one love one's country."—('Le Crime de Sylvestre Bonnard'.)

ঠিক এই ভঙ্গি, প্রকাশ হচ্ছে প্রমথ-সাহিত্যে "বড় বাবুর তাদৃশ সৌন্দর্য্য বোধ না থাকলেও তাঁর স্ত্রী যে সুন্দরী, শুধু সুন্দরী নয়, অসাধারণ সুন্দরী, এ বোধ তাঁর যথেষ্ট ছিল।" ('বড়বাবুর বড়দিন')

এ ছাড়া, হার্ণএর কথা শুনি—"His (Anatole France's) light grace of emotional anaylsis, his artistic epicureanism and the vividness and quickness of his sensations are French as his name." এই গুণগুলি প্রমথ-রচনায় পাই।

ভলতেয়ারের পালিশ (প্রধানতঃ ভাষা ও ভঙ্গিতে) দেখি প্রমথ চৌধুরীতে—ভাষাকে মার্জিত এবং তীক্ষ্ণ করবার অনুশীলনে এবং বিদ্রূপের সঙ্গে বৈদগ্ধের সমাবেশে।

সাধারণে কেন প্রমথ চৌধুরীর রচনা মনে প্রাণে গ্রহণ করে নি? কারণ, তিনি ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল লেখক। তাছাড়া, "সংস্কারলেশহীন দৃঢ়, ঋজু মনের ঈষৎ বাঁকা বহিঃপ্রকাশ", (শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত) সর্ব্বসাধারণের আদরণীয় বস্তু নয়। তাঁর রচনা সত্যই মনকে অস্বস্তিকর ভাবে 'জাগরূক' করে তোলে। ('মুখপত্র' দ্রষ্টব্য)

আর্টের মত সত্যের সংজ্ঞা, বিভিন্ন দেশ কাল প্রভৃতিতে যা একভাবে গ্রহণীয়। সেই সত্য অনেকের, সকলের; তাতে 'অহমের' স্থান নেই। প্রমথ চৌধুরীর রচনায় অহংকার না থাকলেও অহম্ আছে। কোথায় যেন অন্তরে

আঘাত লাগে। তিনি যেন বলছেন: আমি যা দেখেছি সেই দেখাই দেখা। কিন্তু তখনই সে সত্যে মালিন্য আসছে, নয় কি? সহানুভূতিশীল পাঠকের মন তাঁর অভ্রভেদী আত্মপ্রত্যয় ও ক্ষুরধার বুদ্ধির কাছে যেন প্রতিহত হয়ে ফিরে আসছে। তাই এই লেখায় সার্ব্বজনীন আবেদনের অভাব।

রাত্রি মধ্য, ঘড়িতে বারোটা বেজেছে। কলমে খাপ পরাতে পরাতে মনে হল শিশুপাঠ্য ভূগোলে পৃথিবীর সংজ্ঞা। একটি কমলালেবু বলে ভূগোলকার পৃথিবীর সম্বন্ধে বর্ণনার দায় এড়িয়েছেন। সংক্ষিপ্ত সমালোচনার প্রণালী ঠিক তাই।

প্রহসন-চিত্র—"প্রহসন সামাজিক উপপ্লব ও অশান্তির নিদর্শন।"

প্রহসন অথবা Farce রচনার মূলগত উদ্দেশ ছিল প্রধান নাটকের অংশ হিসাবে ছোট ছোট হাস্যাত্মক বা ব্যঙ্গাত্মক নাটীকার সংক্ষেপ অভিনয়। সেই অর্থ এখন নেই, এখন হাস্যরসাত্মক অথবা ব্যঙ্গ-রসাত্মক যে কোন নাটীকাকেই 'প্রহসন' বলা হয়। প্রহসনের সংজ্ঞা: "A style of comedy, marked by low humour and extravagant wit."

বঙ্গভাষায় প্রথম প্রচলিত প্রহসন মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।' অনাচারীদিগের চিত্র অঙ্কন করে বিদ্রূপের কষাঘাত দ্বারা সমাজ-সংস্কার এই জাতীয় রচনার উদ্দেশ ছিল।

নোয়েল্ কাওয়ার্ড্, একজাতীয় হাল্কা রচনা লিখেছেন—Revue বলা হয়। নৃত্য-গীত-বহুল শোএর মধ্যে অভিনেতাদিগের বিরাম বা অভিনয়ের সুবিধার জন্য ছোট ছোট অংশ লেখা হ'ত কয়েক মিনিট অভিনয়ের জন্য। 'রেভ্যু' যদি 'Spectacles, starring current events' হয় তাহ'লে এই হাস্যরসাত্মক প্রহসন-জাতীয় অংশকেও মূলের সুরে ধরে রেখে লেখা সমীচীন। Revue সম্পর্কে আলোচনায় নোয়েল কাওয়ার্ড একটি বড় কথা বলেছেন: "The biggest laugh must be on the last line before the black-out."

'স্মৃতি-সভা' প্রহসন মূলগত অর্থে। বড় নাটীকা বা Revueএর অংশবিশেষ মাত্র এই ক্ষুদ্র চিত্রটী, অবশ্য ভাব ও ভঙ্গীতে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রহসন

স্মৃতি সভা

(ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে ছয়টা বাজিল। মালতী গুন্‌গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে হঠাৎ থামিল)

মালতী—আচ্ছা মল্লিকা, ছ'টা বেজে গেল, অথচ সভার সুধীবৃন্দের সাক্ষাৎ নেই!

মল্লিকা—কি জানি, দিদি। মাও তো সেই ঘরে দোর দিয়ে টয়লেট্ করছেন, এখনও বেরোবার নামটি নেই। আমি তাড়াতাড়ি হাতের কাছে যা পেলাম তাই প'রে এলাম। এই কাল শাড়ীখানায় আমাকে বিশ্রী দেখাচ্ছে, নয়?

মালতী—যোগ দিচ্ছিস তো স্মৃতি-সভায়। এত সাজসজ্জার চিন্তা কেন?

মল্লিকা—পরের বেলায় তো খুব বলছেন। অথচ নিজে এই দামী শাড়ীখানা পরে এত সাজ করেছেন কেন, মালতী দেবী? সুশান্ত দে আসবেন বলে, নয়?

মালতী—নিজের দিদির সঙ্গে ইয়ার্কি করতে লজ্জা করে না, মল্লিকা?

(তাহাদের মাতার প্রবেশ)

মা—তোমরা দু'জনে এখানে দাঁড়িয়ে করছ কি, বাছা? মল্লিকা, চায়ের যোগাড় দেখগে।

মল্লিকা—যাচ্ছি মা, যাচ্ছি।

(প্রস্থান)

মা—দেখ মালতী, যাতে নাটক-অভিনয়ে ওঁরা তোমাকে একটা ভাল পার্ট দেন সেই চেষ্টা কোরো।

মালতী—(আহ্লাদের সুরে) বা রে, আমি কি করব?

মা—সবটাতে বেশ উৎসাহ দেখাবে, মুরুব্বিদের কাছাকাছি বসে কথাতে সায় দেবে। তার পরে যা করবার আমি করবো। আর দেখ, এরি মধ্যে সময় করে সুশান্তকে বলবে যে তার নূতন কবিতাটা জায়গায় জায়গায় তুমি বুঝতে পারোনি সে যেন একদিন এসে বুঝিয়ে দেয়।

মালতী—আচ্ছা মা। এই যে সব লোকজন আসতে আরম্ভ হয়েছে।

(বহু লোকের প্রবেশ। 'কেমন আছেন', 'অনেক দিন
পরে দেখা', 'বাঃ, আপনিও যে এখানে'
ইত্যাদি মিশ্র ধ্বনি উত্থিত।)

(মল্লিকার প্রবেশ)

মল্লিকা—দিদি, আমি বেয়ারাকে চায়ের জল করতে বলে চলে এলাম। দেখ দেখ, ঠ্যাকারে বিভা সেন আসছে। সঙ্গে এ মেয়েটি কে? এই যে বিভাদি, এসো। ইনি কে?

বিভা—ও ভাই আমার পিসতুতো বোন আন্নাকালী। কলকাতায় বেড়াতে এসেছে। সবই দেখা হ'ল, এটাই বা বাদ পড়ে কেন? তাই ওকে বললাম যে কবি বিরূপাক্ষ বট্‌ব্যালের স্মৃতিরক্ষাকমিটীর আজ একটি সভা হবে, চল তোকে দেখিয়ে আনি। অসুবিধে নেই তো কিছু। তোমাদের বাড়ীর ড্রইং-রুমেই সভা। (হাস্য)

মালতী—মল্লিকা, বিভা চুপ। সুশান্ত দে বক্তৃতা দিতে উঠেছেন।

সুশান্ত দে—আজ স্বর্গীয় কবি বিরূপাক্ষ বটব্যালের স্মৃতিরক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার উদ্দেশে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। স্মৃতিরক্ষাকমিটী থেকে আমরা ঠিক করেছি তাঁর রচিত নাটক 'পুষ্পমঞ্জরী' সবাই মিলে অভিনয় করে টাকা তোলা হবে। (হাততালি) তাঁর গানগুলির মাধুর্য……তাঁর গানগুলির……

বিভা—এই মল্লিকা, 'পুষ্পমঞ্জরী' নাটক পড়েছিস?

ম—বাঃ, তুমি হচ্ছো সাহিত্যিকা বিভাদি, তুমিই পড়োনি! আমি আবার কি পড়বো?

সকলে—চুপ, চুপ।

সুশান্ত দে—……এখনও সমস্ত বাঙালীর শ্রবণমন আচ্ছন্ন করে আছে। সেই গানগুলি গাওয়া হবে। আহা, সেই গানগুলির কথা মনে করলে হৃদয় মধুর রসে আপ্লুত হয়—

জনৈক যুবক—সুশান্ত দে বেশ বলেছে। স্মৃতিরক্ষাকমিটির সেক্রেটারী সুশান্ত দে-কে নির্ব্বাচিত করে ভাল হয়েছে।

অপর যুবক—বেশ বলছে, না ছাই। লিখে মুখস্থ করে এসেছে। ফ্যাসান দেখ চুলের! হাতনাড়ারি বা ঘটা কি? কুমার কার্ত্তিক।

৩য় যুবক—ওহে, কুমার কার্ত্তিক যে এই বাড়ীতেই বাঁধা পড়েছেন, সে খবর রাখ কি?

১ম—কি ব্যাপার?

সকলে—হিয়ার, হিয়ার।

২য়—একি, সুশান্ত এতক্ষণ কি বললো! সবাই চীয়ার করছে কেন?

৩য়—কি জানি, ঠিক শুনিনি।

জনৈক বালক—কি করে শুনবেন মশায়! সর্ব্বক্ষণ বক্‌বক্ করছেন!

৩য়—কি আস্পর্দ্ধা এইটুকু ছেলের!

২য়—বাপের বয়সী লোককে বলছে, দেখ!

২য়—এমন চীজ না হলে কি এখানে জোটে?

বালক—আপনিও তো বেশ জুটেছেন, মশায়।

২য়—চোপরাও ছোকরা, বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি—

সকলে—সাইলেন্স্।

সুশান্ত—আমাদের অদ্যকার সভাপতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত নরসিংহ কাঞ্জিলাল মহাশয় প্রস্তাব করেছেন যে কেউ দয়া করে কবি বিরূপাক্ষ বটব্যালের একটি কবিতা আবৃত্তি করুন। তারপরে গৃহস্বামিনী মিসেস বসু সবাইকে চা পানে আপ্যায়িত করবেন।

পরে শ্রদ্ধেয় সমালোচক মাণিক্যধন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় নাটক অভিনয়ের ভূমিকাদি সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করবেন।

(হাততালি)

বিভা—আজ হঠাৎ কিপ্টে বোসগিন্নি চা খাওয়াচ্ছেন কেন?

২য় যুবক—আহা, মিসেস্ বোসের রাবিশ বই-খানার একটা ভাল সমালোচনা হওয়া চাই যে।

বিভা—ওমা, কি বুদ্ধি! তাইতো। আচ্ছা, ‘প্রগতি’ কাগজের এডিটোরিয়াল বোর্ডে তো আপনি আছেন? আমার একটা প্রবন্ধের টাকা ওরা এখনও পাঠায়নি। কি আশ্চর্য্য লোক, টাকা ঠিকমত দিতে চায় না—টাকা—

সুশান্ত—কেউ একটি কবিতা আবৃত্তি করুন দয়া করে। মোটামুটি মাঝে মাঝে থেকে বল্লেই হবে। ওহে অজিত, তুমি তো অভিনেতা। তুমিই বল। ওঠ, ওঠ।

অজিত—এই মণিমেলার মধ্যমণি তুমি সুশান্ত। তুমি থাকতে আমি? তুমি-ই বলো। দেখছ না জ্যেষ্ঠা কুমারী বোসের সকাতর দৃষ্টিক্ষেপ?

সুশান্ত—আঃ, স্মৃতি-সভায় ওসব কথা কেন? তোমার কাণ্ডজ্ঞান বড় কম, অজিত।

মালতী—দেখেছিস মল্লিকা, অজিত লাহিড়ী আমাদের দিকে তাকিয়ে সুশান্তদাকে কি সব যেন বলছে।

মল্লিকা—ভারি খারাপ লোক ওই অজিত লাহিড়ী, দিদি! সুশান্তদা ওকে দেখতে পাবেন না। তিনি বলেন ও নাকি খালি সুশান্তদাকে অপদস্থ করতে চেষ্টা করে।

মালতী—হিংসুক!

অজিত—সত্যি আমার কাণ্ডজ্ঞান বড় কম, সুশান্ত, তা নইলে এই বিচিত্র সভায় উপস্থিত হই! যাই হোক, তুমিই একটি কবিতা বল।

সুশান্ত—আরে, আমার বিরূপাক্ষ বটব্যালের কাব্য এত ভাল করে সমস্ত পড়া আছে যে কোনও বিশেষ কবিতা মুখস্থ বলা সম্ভব নয়।

অজিত—সত্যি সুশান্ত, সভাপতি তোমাদের বড় বিপদে ফেলেছেন। কবিতা আবৃত্তি করতে বলবেন আগে জানালে তোমরা বই হাতে প্রস্তুত হয়ে আসতে, না?

সুশান্ত—তুমি বড় বাজে বকো, অজিত। বিরূপাক্ষ বটব্যালের মত কবির কবিতা যে তাঁর স্মৃতিরক্ষা-কমিটীর সদস্যদের কণ্ঠস্থ আছে সে কথা সভাপতি জানেন। তোমাকে বিশেষ করে বলছি এইজন্যে যে তুমি অভিনয় কর। তোমার পক্ষে আবৃত্তি সহজ হবে।

অজিত—ঠিক বলেছ, সুশান্ত। অভিনয়ের এমন সুযোগ আর পাব না। তুমি তো খুব ভাল করে কবি বিরূপাক্ষের কাব্য পড়েছ। সেই কবিতাটি বলি, কেমন? হে ঈশানী শোন—" ?

সুশান্ত—'হে ঈশানী শোন?'··· 'হে ঈশানী শোন?'···

অজিত—সে কি, এমন প্রসিদ্ধ কবিতাটা তোমার মনে পড়ছে না? সেই যে, 'হে ঈশানী শোন, ক্ষোভ নাই কোন?'

সু—তাই বল! হ্যাঁ, হ্যাঁ। চমৎকার কবিতাটি। অতি উচ্চদরের। বিরূপাক্ষকাব্যে একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। এইটিই হোক।

অ—তবে এইটাই বলি। (উঠিয়া) আমি আজ স্বনামধন্য কবি বিরূপাক্ষের একটি কবিতা আপনাদের শোনাব। শ্রীযুক্ত সুশান্ত দে এটি মনোনীত করেছেন।

(হাততালি)

অ—(আবৃত্তি) হে ঈশানী শোন,
ক্ষোভ নাই কোন।
এই নিরাশার দ্যুতি মিলাবে সহসা,
আসিবে ভরসা
যুগান্তের ক্লান্ত দিনা বুকে।
হেরি সকৌতুকে
ধূসর ম্লানিমা ভেদি জাগে কোলাহল;
পাণ্ডুর কান্তের মত চাঁদের প্রকাশ;—
শকুনীর শ্বাস
বিষণ্ণ করেছে হায়, বাতের আকাশ।

সকলে—চমৎকার, চমৎকার। (হাততালি)

সু—এবার মিসেস বোস আপনাদের পাশের ঘরে যেতে অনুরোধ করছেন। চা দেওয়া হয়েছে।

(একটা হুড়োহুড়ির শব্দ। 'ও মশাই, পা-টা যে মাড়িয়ে গেলেন,' 'ওহে, এটা আমার জুতো', ইত্যাদি কথা শোনা গেল।)

১ম যুবক—বাঁচা গেল। এখন ভাল মন্দ কিছু খাওয়া যাবে।

বিভা—ওরে আন্না হাবি, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? এ হচ্ছে কলকাতা শহর। এগিয়ে যেতে হয়। আয়, আয়। শেষে গেলে দেখবি সব শেষ।

বালক—উঃ গেলাম, গেলাম। (হাসি)

২য় যুবক—ওহে ডেঁপো ছোকরা, এমন গড়াগড়ি দিয়ে হাসছো কেন?

বালক—পেট গেল, পেট গেল! উঃ, আর হাসতে পারি না। ও মশায়, কি বোকা হলেন আজ আপনারা সব! (হাস্য)

৩য়—তার মানে?

বালক—উঃ, ওই কবিতাটা মশায়, সেই কবিতাটা!

১ম যুবক—বেয়াদপ ছোকরা! জানো ওটা বিরূপাক্ষ বটব্যালের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা?

বা—ওটা মশাই, আদৌ বিরূপাক্ষবাবুর লেখা নয়, ওটা অজিত বাবুর নিজের লেখা কবিতা।

২য় যুবক—ক্ষেপলো নাকি ছোকরা?

বা—আমি জানি মশায়। আমাদের পাড়ার সাহিত্য-সভায় এই কবিতাটিই পড়ে অজিতবাবু মেডেল পেয়েছেন। হাঃ হাঃ।

তিনজন যুবক (সমস্বরে)—কি সর্ব্বনাশ! (যবনিকা)
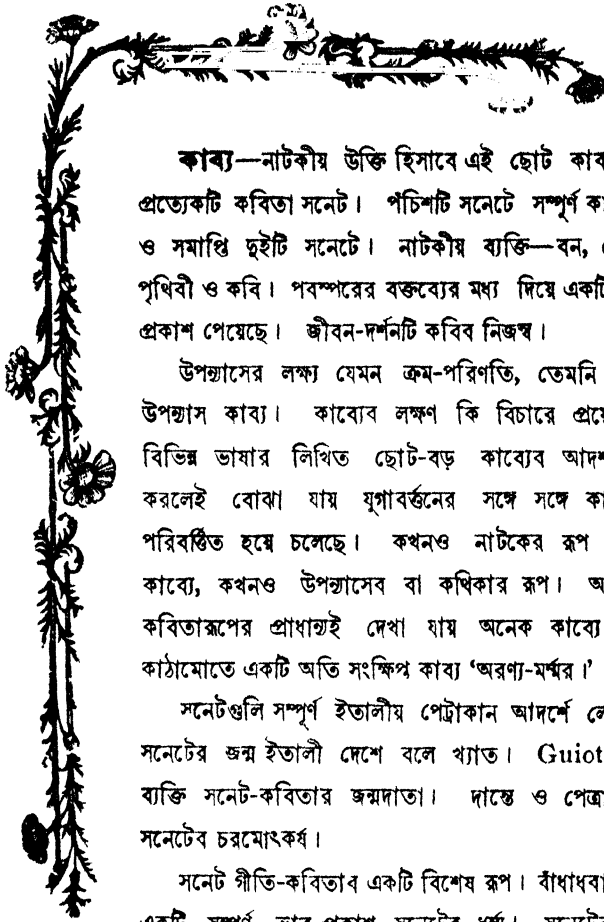
কাব্য—নাটকীয় উক্তি হিসাবে এই ছোট কাব্যটি গ্রহনীয়। প্রত্যেকটি কবিতা সনেট। পঁচিশটি সনেটে সম্পূর্ণ কাব্য। সূচনা ও সমাপ্তি দুইটি সনেটে। নাটকীয় ব্যক্তি—বন, পোড়োবাড়ী, পৃথিবী ও কবি। পবস্পরের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে একটি জীবন-দর্শন প্রকাশ পেয়েছে। জীবন-দর্শনটি কবিব নিজস্ব।

উপন্যাসের লক্ষ্য যেমন ক্রম-পরিণতি, তেমনি ছন্দে গাঁথা উপন্যাস কাব্য। কাব্যেব লক্ষণ কি বিচারে প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন ভাষার লিখিত ছোট-বড় কাব্যেব আদর্শ পর্য্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায় যুগাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যেব রূপও পরিবর্ত্তিত হয়ে চলেছে। কখনও নাটকের রূপ প্রধান হচ্ছে কাব্যে, কখনও উপন্যাসেব বা কথিকার রূপ। আবার গীতি-কবিতারূপের প্রাধান্যই দেখা যায় অনেক কাব্যে। আধুনিক কাঠামোতে একটি অতি সংক্ষিপ্ত কাব্য 'অরণ্য-মর্ম্মর।'

সনেটগুলি সম্পূর্ণ ইতালীয় পেট্রাকান আদর্শে লেখা হয়েছে। সনেটের জন্ম ইতালী দেশে বলে খ্যাত। Guiotony নামক ব্যক্তি সনেট-কবিতার জন্মদাতা। দান্তে ও পেত্রার্কের হাতে সনেটেব চরমোৎকর্ষ।

সনেট গীতি-কবিতাব একটি বিশেষ রূপ। বাঁধাধবা কাঠামোতে একটি সম্পূর্ণ ভাব-প্রকাশ সনেটের ধর্ম্ম। সনেটের আঙ্গিকের বিশেষ রূপ , কখ খক, কখ খক, গঘঙ, গঘঙ (ab ba, ab ba, cde, cde) চতুর্দ্দশ লাইনের চতুর্দ্দশ অক্ষরের কবিতা। প্রথম আট লাইনে একটি ভাবের সমাপ্তি (Octave), দ্বিতীয় ভাগ ছয় লাইনেব Sestetএ নূতন ভাববিন্যাস। মধুসূদন দত্ত প্রথম বাংলাভাষায় সনেট আনেন ও নাম দেন 'চতুর্দ্দশপদী'।

কাব্য

অরণ্য-মর্মর

সূচনা

আজ এই রাত্রে আমি ঘুমাব এমন।
মস্তিষ্কের কোষে কোষে ঢালি দিবে ঘুম
স্মৃতির পল্লব আর স্মৃতির কুসুম।
আজ এই ক্লান্ত চোখে নামিবে স্বপন।
সহসা শ্যামল করি আমার জীবন
লেগেছে, লাগছে আহা, ফুল-মরশুম!
সে কটি দিনের স্মৃতি মনের কুঙ্কুম
জমা থাক, জমা থাক পাথেয় যেমন।

হে বন, আজিও কি তুমি কাঁপ থরথর?
হে সুন্দর, অশ্রু ঝরে আজো অভিমানে?
আজো সে সহস্র শাখে স্পর্শ প্রতীক্ষায়
আমার মনের কোণে জাগাও মর্মর,
ভঙ্গিতে ভঙ্গিতে বাঁধা বিষাদের টানে;
সভ্যতার ধ্বংসলীন নাগরিকতায়॥

বনের গান

তবুও শীতের তীব্র হিমানী এড়ায়ে
ফুটেছে গোলাপ গাছে একটি কুসুম;
প্রতিটি পরাগে তার যদিও বা ঘুম,—
তবু সে জেগেছে বন্ধু, মাধুরী ছড়ায়ে।

আমের মুকুলশাখে অলক এলায়ে
ফুটাল কি বনলক্ষ্মী সোনালীর চুম।
নূপুর বাজিছে শোন, রুম ঝুম-রুম,
বাতাপির শাখে শাখে, সে লক্ষ্মীর পায়ে।

তবুও হৃদয়ে কেন জড়ের কুয়াশা;
ঝাউয়ের কম্পনব্যথা জমা স্তরে স্তরে;
নাই নাই কোনখানে বনের ইশারা;
মধুমাসে নামে না তো মাধবীর আশা,
দোলে না বঙনছায়া শিলীবেদী 'পরে;
বসন্তে এ মন আজো হিমানীর কারা॥

দুই

কাঁপায়ে সহস্র কোটি পাতার আঙুল,
এত কি আঙুল আছে!—নিল মোরে ডাকি
সবুজ বনেতে আহা, বনানীর শাখী;
এক পথে যেতে যেতে পথ হ'ল ভুল।
পায়ের নীচেতে দেখি কত ঘাসফুল,
কানে কানে গেয়ে গেল কত ছোট পাখি,
হিমকণা মেখে মেখে ফুলবাস মাখি
সহসা বেড়িল মোরে বাতাস আকুল।

আধুনিক মন গেল কত দূরে স'রে!
খুঁজিলাম বনে বনে রাজার কুমার,
বনে বনে সাড়া যায় গাছে গাছে লেখা।
অশ্রুতে ফুটিল ফুল পথের কাঁকরে,
দেখিলাম পায়ে পায়ে পদচিহ্ন তার,—
নিবিড় বনের বুকে উনমনা একা।

তিন

আমারে ডাকিল বন দিগন্তের পারে,
যেখানে শুয়েছে সুখে নীলার পাহাড় ;
যেখানে পান্নার চিক দেবদারু-সার,
গোলাপের চুনি কাটে হীরা-রবি ধারে।
যে বন নিশ্চল ছিল শীতের প্রহারে,
বসন্ত জাগাল প্রাণ রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার ;
গলানো সোনার ছাপে কাটিল আঁধার ;
নুয়ে পড়ে কচিশাখা পল্লবের ভারে।

লালের প্রাচীর ঠেলি অশোক-পলাশে,
নেবুফুলে মাতোয়ারা রাঙা পোড়ামাটি,
একদিন দেহভস্মে আছিল শ্মশান,
আজ সে উদ্ভিন্ন তৃণে শিশুমুখে হাসে ;
আজ শ্যাম লতাগুচ্ছে ফুল পরিপাটি ;
শৈবালে ঢেকেছে তার নিষ্ঠুর পাষাণ॥

চার

'নিজেরে চেন না তুমি ?'—কানে কানে বলে,
যে আজ গোপনে রহে পত্র ঝরোকায় ;
'তুমি চাও একদিন প্রেমের চুমায়,
সহসা আমারি মত সাজ ফুলে-ফলে।
বসন্তের দীর্ঘশ্বাসে ধমনীর তলে
নবীন রসের জন্ম সবুজ পাতায় ·
প্রেমের নিশ্বাস যেন তোমারে জাগায়,
সহসা অজানা বাণী প্রাণে আসে চ'লে।

হে নারী, হৃদয় খোল আমারি মতন
তবে কেন শীত আজো অন্তরে তোমার ?

আত্মারে গুণ্ঠন কর দ্বিধা বেদনাতে ?
ঝরাও পুরানো পত্র, খোল তো গুণ্ঠন ;
জাগাও বনের প্রাণ মনের মাঝার ;
নিজেরে বিলায়ে দাও বসন্তের হাতে ॥"

পাঁচ

হে প্রেম, শিখেছি আমি আত্ম-সমর্পণ,
শিখেছি তোমার ভাষা বনের শিক্ষায় :
সহজ হয়েছি কত শ্যাম বনচ্ছায়,
সভ্যতার পাশ কাটি বনেরি মতন !
অরণ্যের মর্মবাণী আজি চিত্তে শোন ;
সে যেমন জেগে ওঠে যবে ডাক পায় ;
প্রতিটি কোষেতে তার জীবন জাগায়,
ডালে ডালে কুঁড়িরূপে দুরন্ত যৌবন ।

আজ আমি পা রেখেছি লতার তলাতে,
আজ আমি বুকে ধরি গোলাপের লাল,
কলার পাতায় পড়ি প্রেমের লিখন ।
বসন্তে যেমন বন উৎসবেতে মাতে
তেমনি সহসা ফিরে নিজেরে পেলাম ;
দেখিলাম প্রেমও আছে পাশে অনুক্ষণ ।

পোড়ো বাড়ির গান

বহুদূরে আকাশেতে তুলিয়াছে শির
লালের আমেজমাখা সবুজের পাতা,
নীল আকাশের নীচে সবুজের ছাতা,
ইউক্যালিপটাস্ করে আকাশেতে ভিড় ।
ঝন্‌ঝন্ বাজে পাতা বাতাসে অধীর ;
আশেপাশে দেখা যায় চিলেদের মাথা ;

জড়ায়ে ধরেছে তারে লতাগাছ সাদা ;
শুঁয়োপোকা হেঁটে চলে তলে বিটপীর।

কত পাখি আসে যায় ছোট পাখা মেলে,
সকালে নয়ন খুলে যবে চেয়ে দেখি,
বনের অন্তরে বাজে পাখিদের সাড়া।
আকাশে দাঁড়ের মত কালোপাখা ফেলে,
দিনরাত দলে দলে আসা-যাওয়া এ কি।
বসন্তের আমন্ত্রণে এসেছে যে তারা॥

দুই

বিকালের দীর্ঘ ছায়া নামে গাছে গাছে ;
সপেটার ফলে ফলে জমিছে আঁধার ;
সহসা বাতাসে হেলে কলাকাঁদি সার ;
সন্‌সন্‌ ডালে ডালে হাহাকার বাজে।
নিজেরে গুটায়ে চিত্রখোলসের মাঝে
যে শামুক তৃণগুল্মে হ'ল আগুসার,
মানুষের পায়ে পায়ে নিষ্ঠুর প্রহার
ঠেলিয়া এনেছে তারে ইঁদারার কাছে।

পোড়ো বাড়ি বাটালির ঘায়ে থর্‌থর্‌ ;
বেলকেঁদ খ'সে পড়ে কুড়ুলের চাপে ;
বনের মর্ম্মেতে তারা জ্বালাল অনল ,
বনের মৃত্যুতে বাঁধি মানুষের ঘর।
অপুষ্ট খেজুরগুচ্ছ আতঙ্কেতে কাঁপে।
বনভূমি আঘাতের বেদনা-বিহ্বল॥

তিন

সহসা নিশ্বাস এক ওঠে আলোড়িয়া
গোলাপের দল হ'তে করবীর 'পরে,

আমার ললাটে চোখে গেল স্পর্শ ক'রে
সমগ্র কাননভূমি হৃদয় মথিয়া।
'কেন যাবে, কেন যাবে? যেও না চলিয়া',
হলুদ ঘাসের ফুল পায়ে পায়ে ধরে,
পথভোলা ঝরা পাতা বাতাসেতে ওড়ে,
ডাকে অশথের গুঁড়ি অর্ধেক পুড়িয়া।

বনে তো অনেক স্থান, আঁধারে শীতল,
তবু কেন চ'লে যাবে আলোর পীড়নে?
এখনও বনানী দেখ, ছায়াময় কত!
স'রে এস—যারা দিল এ বুকে অনল,
যারা চায় বাঁধিবারে ইঁটের শাসনে,
তুমি তো, তুমি তো নও তাহাদের মত॥'

চার

কাঠের ধোঁয়ায় গায় জলের কেট্‌ল্—
'কত লোক এসেছিল, কত লোক যায়,
এখনও তাদের স্মৃতি রাতের পাখায়
এ বাড়ির কোণে কোণে করে চল্‌বল্।
কত লোক এই ঘরে তাতায়েছে জল,
সে সব লোকের স্মৃতি কোথায় মিলায়!
ক্ষণ বিরামের এই পথিকশালায়
কে তুমি গানের সুরে জ্বালালে অনল?

শিখার ধোঁয়ায় আমি হয়ে যাব কালি,
বহ্নি তো নিবিয়া হবে ভস্ম-অবশেষ।
পাতা-ফুল সব কিছু মিশাবে ধূলিতে।
তোমার অনলে তবু নিত্য শিখা জ্বালি,
বাজিবে ভুবনে ওই সঙ্গীতের রেশ;
ঊর্ধ্বে সে ভাসিয়া যাবে নক্ষত্রে মিলিতে॥

পাঁচ

'টিক্ টিক্ টিক্ টিক্'—বলে টিকটিকি,
'হলুদপাতার ভস্মে পুরাতন দিন,
ধুলার মাকড়জালে হয়ে থাকে লীন,
মুমূর্ষু নিশ্বাস তার ভাঙা ইটে লিখি।
তারকার মুখ থেকে এলে গান শিখি ?
যে গানেতে মাথা তোলে চারায়া নবীন,
যে সুরেতে বেজে ওঠে ফুল-ফোটা বীণ,
পোড়ো বাড়ি সেই সুরে আজ গেল বিকি।'

অনেকে এসেছে, তাবা জ্বালে নি তো আলো,
আজও তাই ভিতে ভিতে নিবদ্ধ তিমির,
ঘাসের চোখেতে তাই শিশিরের ব্যথা।
সহসা আলোর গানে আঁধার ঝরালো,
উড়ে গেল ব্যর্থ দিন বাদুড়ের ভিড়।
কে তুমি শোনালে নব জীবনের কথা ?'

ছয়

গাছের ছায়াতে ঘোরে আজও টিপপোকা,
কাল সেও চ'লে যাবে অতীত মিছিলে,
কুন্দের সাদাতে লাল ল্যাভেণ্ডার মিলে
সাজাবে না বেশিদিন ফুলের ঝরোকা।
আজ এই আম লিচু-পেয়ারার থোকা
কাল তো শুকায়ে যাবে গোড়া কেটে দিলে।
ব্যাঙেরা পালায়ে যাবে দূর খালে বিলে ;
কালের খাতায় এরা নাহি লেখা-জোকা।

তবু আজও ডালে ডালে বেজে ওঠে গান,
তবু আজও কাঁচপোকা চলে অভিসারে

পাখা মেলে বুকে চায় কারে বনভূমি ?
নারিকেল-পেয়ারার বিনিময় প্রাণ।
রেণু হ'তে নবজন্ম পল্লব মাঝারে।
ধ্বংসের পটেতে প্রেম, তবু জয়ী তুমি ॥

পৃথিবীর গান

'আমি তো দেখেছি বহু',—বলিল পৃথিবী,
কানে কানে চুপি চুপি চোরের মতন ;
ঘাসের সমান আমি দাঁড়াছু যখন
বুকের কাছেতে তার ;—বলিল পৃথিবী।
'শোন কথা, বহুদিন দেখেছে পৃথিবী'—
পৃথিবীর কণ্ঠে আজ ভীরু আবেদন,—
'কেও তো দেখে না তবু আপনি আপন
গড়াই রূপের সোনা—আমি যে পৃথিবী

আমার রূপের রীতি ফুলের বিলাস,
বৃন্তে ফোটে, শাখে ফোটে নবজন্ম লভি,
কেউ তো আসে না কাছে—তবু দিনযামি
চামেলী-চম্পক-কুন্দে বিলাই সুবাস।
ব'স এইখানে যদি এলে তুমি কবি,
শোন অন্তরের বাণী—বলে যাই আমি ॥

দুই

ঝোপে ঝোপে বাতাসেতে দোলে লেবুডাল,
আমের মুকুল করে স্বর্ণ বরিষণ,
কাঁঠালের কলিগন্ধে মাতে সারা বন,
অলকে পড়ুক খসি প্যান্‌সির লাল।

এইখানে লতা আর শালের আড়াল
পাতায় পাতায় গৃহ করেছি বন্ধন,
শোন আজ কান পেতে মাটির ক্রন্দন,
তৃষিত মাটির ভাষা সুপ্ত চিরকাল।

বাতাপি যুগলে দোলে প্রতি শাখে শাখে;
ভাঁটফুলে মউমাছি বসেছে বিহ্বল।
এই বনে বুক রেখে শোন কথা বলি,
পেঁপের মিনার যবে নীচে চাহি থাকে;
প্রজাপতি রং দেখে হয়েছে পাগল;
প্রতিটি কথায় মম ফোটে পুষ্প কলি।

তিন

সভ্যতার ধাপে ধাপে হয়ে অগ্রসর
[illegible]-দণ্ডে কত লোক বেঁধেছে আমায়।
কখনো প্রাসাদচূড়ে; কুটিরের ছায়,
লভেছি সহস্র রূপ দেশ-দেশান্তর।
কারখানা, শিক্ষালয়, নৌকার বহর,
বিজলির জোয়াল তো বেঁধেছি গলায়।
ফেলেছি নিশ্বাস, গ'লে চিমনি-ধোঁয়ায়।
আবার হয়েছি ফুল, হয়েছি অম্বর।

তখনি ফুলের শ্বাসে, আকাশের নীলে
পৃথিবীর কত রূপ তোমার অন্তরে
ধরেছে নিমেষে জানি, গড়েছে তো ছবি।

এইখানে নীল আর সবুজের মিলে
আদিম অরণ্যে শেষে আসিলাম স'রে।
তোমারে ডাকি তাই, হে আমার কবি॥

চার

বাদামের পাতা ঝরে তবু কাল হবে,
ঝরিবে সজিনাপাতা ডাকেতে মাটির ;
পাখির ডানার গতি হয়ে যাবে স্থির,
পাকা ফল মাটি হয়ে মাটিতে মিশাবে।
তুমিও ঝরিয়া যাবে একদিন যবে—
কোমল-করুণ সুর শুনি পৃথিবীর ;
'এইখানে বুক পেতে—এই নদীতীর—
ভুলে যেও একদিন চলেছিলে কবে।'

ঘুম-পাড়ানিয়া সুরে বলিল পৃথিবী,—
'তাই তো ডেকেছি কবি, ঘুমাবে যখন
মাটি হয়ে এ মাটিতে শ্রান্ত মনপ্রাণ।
সেদিনও রহিব জাগি আদিম পৃথিবী।
বনের ঘুমের গান মনে মনে বান।
ঘুমাবার আগে শুধু গেয়ে যেও গান।'

পাঁচ

আমার উদাসী বক্ষে চৈত্রের সন্ন্যাস,
সহস্র ফুলের চুমা তবু পদতলে !
ঘাসেতে রোদের সোনা শান লেগে জলে,
বুকেতে এঁকেছে ক্ষত তবুও পলাশ !

হে কবি, গানেতে তাই ধাঁধার প্রকাশ,
জীবন ঝরিছে তবু নব বীজ ফলে,
রহস্য-নির্ণয়ে বুঝি কাঁদ পলে পলে
খাতাতে খুলিতে চেয়ে নব মধুমাস ?

আমার একটি খাতা আদি হতে খোলা,
একটি অঙ্কেতে সব জমা বুকে রাখি ;
প্রতিটি নিমেষ মম যুগ হয়ে বাজে ;
অতীতের সুতো দিয়ে বর্তমান তোলা ।
অধরা ধরেছি আমি মাটি দিয়ে ঢাকি,
হে কবি, আশ্রয় নাও মৃত্তিকার মাঝে ॥'

আমার গান

আমার গানের তারা আকাশ ফোটায়,
পৃথিবীর ফুল তারে দেয় না তো প্রাণ।
পৃথিবী, চেয়েছ তুমি শুনিতে এ গান,
খাঁচা ভেঙে গান মম উড়েছে পাখায়।
বনে বনে, ফুলে ফুলে পৃথিবীর গান—
ক্যানাফুলে, বকফুলে, প্যান্‌সি, জবায়,
চাঁদের হীরার ফুলঝুরির ঝরায়,
নদীর দু'কুল ছেপে জলের উজান।

আমারে ধরে নি কোন মাটির কুসুম,
কোন বনানীর শাখে শ্যামল পাতায় ;
ধরে নি আমারে প্রেম, হে পৃথিবী শোন,

মাটি হয়ে মিশে-যাওয়া এ মাটির ঘুম।
চায় না আমার গান ধরণী-সীমায় ।
এ গানের ভাষা তুমি শেখ নি এখনো ॥

দুই

হে পৃথিবী, বুকে কত শ্যামল স্বপন ;
আমের মুকুল-ঝরা কত তৃণদল ;
ভাঁটির ঝোপেতে কত পতঙ্গ বিহ্বল,
ছায়াঢাকা রোদমাখা সকালের ক্ষণ !
কচি-লাল আমপাতা নাচায়ে পবন
ব'য়ে গেল দোলা দিয়ে বাতাপির ফল ;
সুবাসের ভারে ল'য়ে বন টলমল ;
বসন্তের ফুলঘ্রাণে, পতঙ্গ উন্মন ।

এরি মাঝে ঝোপেঝাড়ে বেঁধেছ কি পাতি,
বিভ্রান্ত কবির লাগি নিরালা আবাস ?
তোমার বুকের ঘন অঞ্চল শিথিল
হে পৃথিবী, সেথা সুপ্ত মায়াবিনী রাতি ।
আমারে ডাকিল কাছে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস,
জন্মান্তের গূঢ় এক সম্বন্ধ জটিল ॥

তিন

অবোধ্য রহস্যে কোন্ পাতা ঝরে যায়,
পুরাতন বৎসরের কঙ্কাল যেমন ;
দীর্ণ পত্ররাশিতলে প্রবল যৌবন
নূতন পাতার প্রাণ আবার ফলায় ।
ফুল ফোটে গুচ্ছে গুচ্ছে ; ফলেরে পাকায় ;

আতাফলে, নোনাফলে রস-প্রস্রবণ ;
মাটি ঠেলি মাথা তোলে নবীন জীবন।
মুকুলের ভারে আম পল্লব নোয়ায়।

জন্মরহস্যের এই গোপন ভাণ্ডার
আজি হ'ল উন্মোচিত নয়নের পাতে ;
বীজ হতে অঙ্কুরিত দেখিলাম ফল
গন্ধের ইঙ্গিতে আসি বুকেতে তোমার ;
ধ্বংস সৃষ্টি এক সাথে বাঁধা হাতে হাতে,
স্তরে স্তরে উন্মোচিত প্রাণের দ্বিদল ॥

চার

দুই হাতে ডাকে মোরে, 'আয়, আয়, আয়,
উদাসী, বনের বুকে মৌনপদ ফেলে।
সহসা হয়েছে বন সব শোভা মেলে।
পোড়ো বাড়ি শ্যামলিত সবুজ মায়ায়।
ভাঁটিফুলে আল্পনা গাছের তলায় ;
বোঁটা খসে ঝিঙেফুল কাছে স'রে গেলে ;
সবুজ হলুদ ফুল ওঠে ঘাস ঠেলে ;
সুবাসিত লেবুফুল সুবাস বিলায়।

তবু আমি পাতা নই, নই আমি ফুল।
হে পৃথিবী, মানুষ যে কতবড় আরো।
পাতার নিশ্চিহ্ন লুপ্তি মাটির অন্তরে,
সে মাটির বুকে নাই মানুষের মূল।
লতার আড়াল শুধু বৃথাই বিস্তারো,
ভালবাসি, তবু আমি যাব দূরে স'রে

পাঁচ

সহসা সূর্যের আলো বোঁটার মতন
আঁধারে খসায়ে ফেলে যে বনের বুকে,
প্রজাপতি কাঁচপোকা বসে মুখে মুখে,
সে বনও আমার বাসা করে নি রচন।
শান্তির নীরব ভাষ্য পড়িবার মন
মানুষের জীবনের নিরঙ্কুশ দুখে
অর্জন করি নি আজও আপনার সুখে।
তাই বুঝি চলে মম ব্যগ্র অন্বেষণ।

আমি চ'লে যাব দূরে প্রদীপ জ্বা'লায়ে—
সবুজ আঁধারে এই অস্থির নয়ন
কতটুকু শান্তি তুমি পা[illegible] দিতে?
শুধু পাব শিকড়ের শিকল পরায়ে
জাগ্রত রবে বন্দী ব্যথা আদিম মরণে।
জীবনেরে পার তুমি নির্বাণে নিতে॥

ছয়

হে পৃথিবী, দিক্‌হারা পাখিদের ঝাঁক
সন্ধ্যায় সকালে করে আকাশেতে ভিড়;
ডানার কম্পিত চাপে বাতাস অধীর;
পাখিতে ভরেছে আর ও-নদীর বাঁক।
'এইজন পথহারা, ডাক্‌ তারে ডাক,'
বন-টীয়া ব'লে দিল নাচ'ইয়া শির;
শালিকের বুলি শুনি কিচিব-মিচিব;—
'তবে আয়, এইখানে পা দুখানি রাখ্‌।'

আমি ইথারের মত, বাতাসের মত
দূর থেকে আসিয়াছি, দূরে যাব ভেসে,

মাটি মোর ঘর নয়—পাতার আসরে
আমি রহিব না জেগে ফুলেদের মত।
আমারে পাবে না তুমি পাখিদের দেশে।
হে পৃথিবী, ঘর মোর আকাশেরও 'পরে ॥

সাত

পূর্ণিমা অতন্দ্র জাগে বনের প্রেয়সী ;
ডালিমের বীথিকায় আলোছায়া-খেলা ;
চাঁদের জোয়ারে বহে পাতে-গাঁথা ভেলা ;
আসিছে বনের বাণী বাতাসে সঞ্চরি।
আসন্ন ফাগুয়া যেন দুই মুঠি ভরি
ডালে ডালে রঙ্গিনী ছড়ায় চঞ্চলা ;
সুবাসে মাতাল বাগে যাবো রাত্রিবেলা,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে সুবাস নিঙাড়ি।

তবু আমি দূরে যাব, ওগো অরণ্যানী,
ফিরে আর ফুল দিয়ে বেঁধ না আমায়।
আমার চলার পথ বহুদূরে খোলা।
নদীপথ কি—চিরদিন থেকে যাব জানি।
ডুবে যাব বিস্মরণী পদ্মের নেশায়।
তাই গো বিদায় চাই— চাই আমি ভোলা ॥

শেষ

শেষগান গাও কবি, বিদায়-বেলায়,
কাঁঠালিচাঁপার বুকে রবে প্রতিধ্বনি।
এইখানে ভাঁটিঝোপে ভাঁটিফুল গণি'
বনের আলস্য তুমি নিয়েছ হিয়ায়।

তবু পৃথিবীর ডাক বাঁধে নি তোমায়,
তৃণের প্রতিটি শীর্ষে কুসুমের মণি,—
ডালে ডালে প'ড়ে গেলে পাতার জীবনী,
তবু পড়িলে না বাঁধা—হায় বন্ধু, হায়।'

'হে পৃথিবী, নক্ষত্রের আমি চিরসাথী,
তবু বসন্তের দিনে মম বাতায়নে
নামহীন ছোট ফুলে বিজয় তোমার :
যেমন উল্লসি ওঠো বসন্তেতে মাতি,
তেমনি উল্লাস মনে আন অকারণে।
মাটির মায়াতে মুগ্ধ মানি আমি হার॥

রঙ্গ—"এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গে ভরা"!

—ঈশ্বর গুপ্ত

নীলা ঝী

এক

যাই বল বাপু, এমনধারা বাড়ীতে কাজ করা চলে না, হ্যাঁ। ফরমাসীই এদের বেশী-বেশী, সময় নেই, অসময় নেই। ভর দুপুরে চোখটি মোদার যো নেই। সকল সময় 'নীলে, নীলে' হাঁক লেগেই আছে। খাওয়া-দাওয়া ছাই করনটোল হ'বার পর থেকে এমনধারা কমে গেছে! খারাপ হয়েছে বড্ড। মেজদাদাবাবু কাজ ছেড়ে বাড়ী বসে থাকাতে আবার এদের খরচার টানাটানি দেখছি। আগে রোজ নিত্যি দুরগম করে মাছ আসত, এখন মাত্তর একরগম, তাও একটুখানি। এক কুচি পেলাম কি পেলাম না। আগে তরকারী দিবি এই এমনটি দিত। এখন ছিটেফোঁটা একটুর আগা মাত্তর। ডালে খোট্টা বামুন জল দিয়ে দিয়ে পাতলা করে ফেলে—সাঁতরে পার হব না কি, মাগো! প্যাঁজ একটু চাইলে পাওয়া দায়, আগে হাতের গোড়ায় থাকত, যে যত পার খাও। গিন্নী এখন তেল সাবান চোখে চোখে রাখেন। বউদের বাস-সাবান দিয়ে যে গরমের দিনে চান করব তা হয়ে ওঠে না। লোকজন কমিয়ে মাত্তর চারটি পেরাণী আছি, বামুন, আমি, ভুতো আর সীতেরাম। খাটতে খাটতে গা-গত্তর টাটিয়ে গেল, মাগো! এমন কষ্ট আর সহ্যি হয় না। এরা আমার মুখের দিকে না চাইলে আমিই বা থাকব কেনে? হলামই বা পুরনো নোক, কিসের অপিক্ষেয় ধরে-পরে থাকব? সব বাড়ীতে আমায় খাতির করে। গেলেই 'নীলে, নীলে' করে বসায়। কত কথা কয়, কত কি জিজ্ঞেস করে! যে বাড়ীতে যাব সেধে রাখবেখুনি। এখানে আর থাকার ইচ্ছে নেই। ভাল খাওয়া-পরার অভ্যেস আমার। বাড়ীর নোকের মত থেকে এসেছি, এখন চাংরা ছেলে বউএর চোখ-রাঙানী আমার সহ্যি হয় না। দু'চারটে বাড়ীতে সেধে থাকার কথা কয়ে দেখি। এমন দিনে মাথায় করে আমায় রাখবেখুনি। আজই বিকেলে

কালীঘাট যাবার নাম করে গিন্নীর কাছে ছুটী নোব। যখন চলে যাবই দেরী করে কাজ কি?

দুই

ওমা, দেখ দেখ দত্তবাড়ীর নীলা-ঝি আসছে। কেমন হেলতে দুলতে মোটা হাতীর মত থপথপে পা ফেলে আসছে দেখ। বাবাঃ একখানা গাড়ীর চাকা গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে যেন। দিনরাত বসে বসে খায় আর পাড়া বেড়িয়ে বেড়ায়। আচ্ছা মা, ওরা কিছু বলে না ওকে?

হলই বা পুরনো লোক। ঝি তো। অত আস্পর্দ্ধা ওর কিসের? যেন ধরা সরা দেখেছে। আর দেখ মা, আমাদের বাড়ী এসে কেমন সমান-সমান ভাবে মেশার চেষ্টা করে? যেন ও সাধারণ একটা ঝি মাত্র নয়, যেন ওর মধ্যে অনেক কিছু বস্তু আছে। রাশভারীভাবে শাদা ধপধপে কাপড় পরে বেড়ায়। এই দিনে এত সাবান ওর মনিবেরা জোগায়। কি ভাল লোক মা দত্তেরা। এমন গুণের ঝি আমাদের বাড়ী থাকতে এলে দুর্‌দুর্ করে আমরা তাড়িয়ে দিতাম। ছুতোয় নাতায় এ বাড়ী ওর আসা চাই—ই। কি করি, দত্তদের ঝি, কিছু বলা চলে না।

তিন

ও দিদি, দত্তবাড়ীর নীলা-ঝি ব্যানার্জ্জি বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আমাদের বাড়ী আসছে। দরজাটা খুলে দাও না, ভাই। ভারী মজার গল্প করে লোকটা। মনিব বাড়ীর ঘরের সমস্ত কথাখানি যেদিন আসে ঢেলে দিয়ে যায়। অথচ ওদের নুন খেয়ে কত দিন আছে। পাড়ায় পাড়ায় কেবল মনিবদের নিন্দে করে বেড়ায়। দত্তেরা জানলে তাড়িয়ে দিত। আমার এমন ঝি হ'লে ঝাঁটা মেরে দূর করে দিতাম। মুখে একটু আলগি দিয়ে ওর পেটের কথা টেনে বার করে ফেলি। এমন মজা লাগে সব শুনতে। সেদিন বড় বউয়ের সঙ্গে ছোট বউয়ের ঝগড়া এমন গুগড় করে বলছিল! যত সব নোংরা কথা বলে মনিবদের নামে বেটী। খাওয়া কি? যেন রাক্ষস! এধারে আবার হাত-টানও আছে। দত্তেরা বলেই ওকে এখনও রেখেছে।

চার

নীলা-ঝি বিমনাভাবে ঘরে ফিরে এল। কিছু কাজ হ'ল না, কেবল অনভ্যাসে বেশী হাঁটাহাঁটি করে পায়ে বাত চাগিয়ে উঠল। ছোট একখানি ঘর তার নিজস্ব, পরিষ্কার মানুষ সে দিব্য সাজিয়ে রেখেছে। কল থেকে হাত-পা ধুয়ে হাতপাখার বাতাস স্থূল দেহে লাগাতে লাগাতে ঝি তার তক্তপোষের বিছানাতে বসে নিজের কর্ম্মজীবনের কথা গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগল।

আজ বারবছর সে দত্ত বাড়ী আছে, বড়লোকের বাড়ী থেকে অভ্যাসটা বেশ বড়লোকী দাঁড়িয়ে গেছে। এ বাড়ীতে কাজ করবার সুবিধা এই যে এক-খানি ঘর পৃথক পাওয়া গেছে, অন্যবাড়ীর ঝি' চাকরের মত সিঁড়ির তলায় কিম্বা বারান্দার কোনে তোলা বিছানা পেতে কুকুর বেড়ালের মত থাকতে হয় না। কলও ঝি চাকরের আলাদা। দত্তবাড়ীর মত দক্ষিণ-খোলা বড় বাড়ী পাড়াতে একটিও নেই। চাকরদের ঘরগুলোও চমৎকার। মাইনে বার বছরে নীলা-ঝিএর বেড়ে বেড়ে পোনেরোতে দাঁড়িয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার পরে নিত্য বিশ্রাম, চা-জলখাবার, বিনামূল্যে ডাক্তার ওষধ, পয়লাতে বেতন, অগ্রিম মাইনে ইত্যাদি। একজন এম-এ পাশ বেকার যুবকের শুনে লোভ হয়। তবু নীলা-ঝি আজ অন্যত্র কাজের প্রত্যাশায় সারা বিকেল হন্য হয়ে ঘুরে হাত-পা টাটিয়ে এল।

কিন্তু, আশ্চর্য্য, কোথাও কাজ সে পেল না। যারা বাড়ী গেলে আদর করে তাকে বসিয়ে কথা বলে আবার আসতে বলে দেয়, সেইসব গৃহিণীরাও কেউ তাকে রাখতে রাজী হল না। দত্ত বাড়ীর বিভিন্ন দৌত্য কার্য্যে বিভিন্ন বাড়ীতে গিয়ে সে সমাদর পেয়েছে। কিন্তু হায়, আজ তার অর্থনৈতিক মূল্য কেউ দিল না। দুই-এক বাড়ীতে ঝি-চাকর অভাবে ব্যাকুলা গৃহিণী তাকে আপাততঃ রাখতে রাজী হলেও বেতন ও টার্মস শুনে সে রীতিমত অপমানিত বোধ করলে। ভাল বাড়ীতে ভালভাবে থেকে এখন গলিঘুঁজির বাসা বাড়ীতে নোংরা কলতলায় বাসন-পেষা আর যার হোক নীলা-ঝিএর পোষাবে না। রাশভারী মন হয়ে গেছে তার, বাজে লোকের বাড়ী বাজে কাজে রুচি আসে না! অনেক বাড়ীতে আবার লোক রাখে একটি মাত্র। অথচ, লেখাপড়া জানা চোস্ত আয়াগিরিও সে পাবে না—গেঁয়ো ভূত সে। সুতরাং নীলা-ঝিএর অসন্তোষপূর্ণ স্বার্থপর মন. নিজের কর্ম্ম জীবনে কোনও সাফল্য না দেখে

ম্রিয়মান হয়ে পড়ল। তার ধারণা ছিল ভাগ্যের রূপোর চামচে বোধহয় জন্মক্ষণে বিধাতাপুরুষ তার মুখে লাগিয়ে দিয়েছেন। এই বাড়ীতে এত সুবিধা সে পাচ্ছে, অন্যত্র নিশ্চয় আরও বেশী পাবে। যুদ্ধের বাজারে যার যা করে নিচ্ছে, সে-ই বা চেষ্টা করে দেখবে না কেন? যুদ্ধ ব্যপদেশে শ্রমিক শ্রেণীর গভীর অসন্তোষ দত্ত বাড়ীর নীলা-ঝিকেও স্পর্শ করেছিল নিসন্দেহে।

কিন্তু, সোণার স্বপ্ন তার বাস্তবে মিলিয়ে গেল। কিসের আশায় পথে পথে বিফল মনোরথে সে ঘুরে এল তা সেও জানে না। এমন একটা কিছু তার ধারণায় ছিল যার বাস্তব পরিণতি সম্ভব নয়, সুতরাং, 'পরিণাম নিরাশা'।

নীলা-ঝি হাতে পায়ে বাতের তেল মালিশ করতে বসল, কিন্তু তার আজ বিস্ময়ের অবধি নেই। যারা তাকে এত আদর করে তারাও এই চরম পরীক্ষার ক্ষণে তাকে ফেল করলে? কেউ তাকে আশ্রয় দিলে না। কেন? তবে?— সহসা নীলা-ঝিএর আত্মচেতনাহীন, অশিক্ষিত ইতর মনে একটা সন্দেহ ঈষৎ অবচেতন ভাবে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল—তবে কি তার নিজের কোন পৃথক মূল্য নেই? দত্তবাড়ীর ঝি হিসাবেই তার মর্য্যাদা?

তখনি দত্তগৃহিণীর উচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল—"ও নীলা, বেড়িয়ে ফিরে ঘরে বসে আছ কেন? আমার পানটা ছেঁচে দিয়ে যাও।"

সঙ্গে সঙ্গে নীলা-ঝির বিষণ্ণ আত্মচেতনা রূপান্তরিত হল ক্ষতিগ্রস্তের অস্ফুট গজগজানীতে—

"বাবাঃ, বাবাঃ, কি লোক এরা! এক মিনিট হাত পা যোড়া করে বসার জো নেই। চলে যাব আমি।"

ইঁদুর

গণতান্ত্রিক গল্প নয়—যে ইঁদুর গোলা-ঘরে সিঁধ দেয়, তার কথা বলতে বসিনি। যে ইঁদুর মুখে করে শস্য বয়ে বিরাট সঞ্চয়ে একদিন গোলাদারের আপশোষ ঘটায়, সে ইঁদুরকে আমি চিনি না। সেই সব অসমসাহসী ইঁদুর, মসৃণ চিকচিকে শরীর নিয়ে যারা গুণ্ডামী করে বেড়ায়, আমি তাদের দূরেই রাখি। সম্প্রতি একটা লিকলিকে দেহ, মরকুটে ইঁদুর দাগা দিয়ে গেছে। তার কথা স্মরণ করে আমার কলম আর্ত্তনাদ করে উঠতে চায়। সেই ইঁদুরের কাহিনী আপনাদের শুনিয়ে—আসুন মনোভার নামাই।

বেশ ছোট-খাটো ঝরঝরে মেয়েটা, একমুঠো ফুল না হোক পল্লবের মত; গালটা রোগার দরুণ ভেঙ্গে গেছে, চোখ হয়েছে জ্যোতিহীন। চেহারা পাতলা রোগাটে। সোজা চুল পরিপাটি খোঁপাতে বাধা। বয়স একুশ কি কুড়ি হবে। অফিসে কেরানিগিরি করে। সব সময় একটা ভীরুভাব। কেমন একটা অসহায় দৃষ্টি। দেখে সত্যি বলছি, মায়া হয়েছিল।

আমার নামটা ধরুন রাগিণী। আমি রাগিণী চক্রবর্ত্তী, ছোট বাড়ী নিয়ে এ সহরে থাকি। ছোট ভাই কলেজে বি, এ, পড়ে। রাগিণী চক্রবর্ত্তী গাইয়ে। রোজগার তার যথেষ্ট।

রাগিণী চক্রবর্ত্তী, ওরফে আমি, বেশ গৃহস্থ মানুষ। বাপ পাড়াগেঁয়ে জমিদার। প্রয়োজনে অর্থ পাওয়া যায়। নিজের রোজগার নিজের কাজে ব্যয়িত হয়। বাসাখরচ বাবা পাঠান। সুতরাং বেশ গুছিয়ে বসেছি আমি। বন্ধু-বান্ধবও মাঝে মাঝে আসে। কারণ, বাজারে আমার গাইয়ে নাম আছে। বলতে কি, এই গানের জন্য মীরাবাইয়ের মত ঘর ছেড়েছি। জানি, এ গলার মূল্য পাড়াগেঁয়ে জমিদার বাপ দিতে পারবেন না। মা তো জন্ম থেকে বিয়েই খুঁজছেন। ওখানে গান শেখবার সুযোগও বিশেষ ছিল না। সামান্য দু' একটা গেঁয়ো গাইয়ে, স্বরলিপির বই আর রেডিও ছিল আমার শিক্ষার উৎস। তবু বলতে কি, নিজের মুখেই বলছি, গান আমার হয়েছিল। কলকাতার লোকজনের যাতায়াতে, কিম্বা নিজেদের কলকাতাতে আসা-

যাওয়াতে সহরে মানদণ্ড আমার গানের প্রকৃত মূল্য নির্ণয় করেছিল—সে মূল্য প্রতিভাবই প্রাপ্য।

যাই হোক্, সুযোগ খুঁজছিলাম। এক মেয়ে অনেক ভাইএব মধ্যে। তাই স্বাধীনতা ছিল। ছোট ভাইএর যেই গেঁয়ো কলেজে পড়া শেষ হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ ঝোঁক ধরে বসলাম, কলকাতায় বাসা করে ও পড়াশুনা করুক, আমি ওব তত্ত্বাবধানে থাকি। আমারও গানটা ভালভাবে হোক্। ছোট ভাইকে হষ্টেলে রাখবার সাহস আর বাবার ছিল না। আমাব বড দু'ভাই হষ্টেলে বিদ্যা অর্জ্জন করতে এসে অবিদ্যাই অর্জ্জন করে গেছে। জমিদারী নেড়েচেড়ে খাচ্ছে। তাস পাশার আড্ডা খুলেছে। বি, এ,-র গণ্ডী উত্তীর্ণ না হলেও বাবা বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। তবে দুই বউএর শূন্য ঘর আগুলে বাসরশায়ন বিফলেই যায়। তবু মানিনীদের ভাবন কত? স্বামীর সঙ্গে এক নাগাড়ে দু'তিন দিন পর্য্যন্ত দেখা না হো'লেও, প্রসাধনে ত্রুটি নেই। একটু কটা রং আছে কিনা, তাই ধবাকে সরা দেখেন। ঠ্যাকারে মাটিতে পা-ই পড়ে না। এই চুল নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাজাব বার পাতাকাটা, এই পা-ঘষে নূতন করে আলতা পরা, দিনে দশবাব গয়না-শাড়ী পালটানো। আ-মরণ, কবিস কার জন্যে? একদিন বলেছিলাম চিপটেন কেটে, "মানভঞ্জনের গিবিবালা"। ব্যস আর যাবে কোথায়? শ্রীমতীরা মানাগারে দ্বার দিলেন। দাদাবা আবার ব্যাপার শুনে আমাকে দুষতে লাগল। দেখুন কাণ্ড? স্ত্রীব সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলেও স্ত্রৈণ হতে বাধে না।

আমাকে বিয়ে দেবার চেষ্টা হলেও আমি এত বয়স পর্য্যন্ত অনূঢ়া রয়ে গেছি, কারণ একটু আছে। প্রকৃতপক্ষে রন্ধ্রপথে শনি প্রবেশের মত ওইটুকু ছিদ্রেব মধ্য দিয়ে ইঁদুর আমাব সর্ব্বনাশ করে গেল। সে রহস্য এখন গোপনই থাক। বিয়ের প্রবৃত্তিও ছিল না আমার। পাত্র জুটছিল যা, তা পছন্দ হচ্ছিল না। তা ছাড়া বড় গাইয়ে হ'বাব স্বপ্ন ছিল মনেব কোণে কোণে। তাই অবশেষে আমার জিদেব কাছে হার মানতে হোলো মা-বাবার। কলকাতায় চলে এলাম লেকের ধারে বাসা বেঁধে।

আমার বয়স? ধরুন পঁচিশ। শুনেছি এখানে মেয়েরা শুধু নয়, ছেলেরাও দশ-পাঁচ কিম্বা দুই বছর গোপন করে তবে বয়স বলেন। পুকুর চুরি করতে পারলাম না, ঘটিই চুরি করছি। অনায়াসে বয়সে দুই যোগ করে নিন।

আমার বিদ্যা? হ্যাঁ, ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়েছি। পরীক্ষাটা দেওয়া হয়নি। ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠে শুনলাম সহপাঠিনীরা আমাকে হাড়গিলা' বলে ডাকছে, আমি আবার একটু রোগা কিনা! সেই যে কেঁদেকেটে—বিদ্যায় ইতি দিয়ে বাড়ী এসে বসলাম, আর এগুনো হ'ল না। আমার দরকারই বা কি? এক ডাকে লোকে আমাকে চেনে।

কিন্তু বকে মরছি কেন? আমার গল্প, কাত্যায়নী চক্রবর্ত্তীর গল্প শিকেয় তোলা থাক। নিজের নাম রেখেছি নিজেই—রাগিণী। রাগিণী চক্রবর্ত্তীর কথা শুনুন।

রাগিণী চক্রবর্ত্তী বেচারী সাজগোজ করে যথেষ্ট। কিন্তু কিছুতেই তাকে যেন মানায় না। অথচ যার যেটি ভাল দেখে সেটি তার চাই। রেডিও অফিসে কোন মহিলা শিল্পীর পায়ে সে দেখলো লাল টুকটুকে ভেলভেটের চটী—ওই যে গো গোড়ালী উঁচু চটী, যেগুলো নূতন উঠেছে। সে চটী কোথায় পাওয়া যায়? ধব্‌ধবে পায়ের পাতা মেয়েটির, কিউটেক্স দেওয়া নখগুলো ঝক্‌ঝক করছে। কি শোভাই হয়েছে টুকটুকে চটীতে! সেই লাল রং রাগিণীর মনে আগুন ধরিয়ে দিল। গেঁয়ো মানুষ, সবে এখানে এসেছে, দোকান পাটের হদিশ জানে না। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করে? অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব নেই—সব সামান্য 'কেমন আছেন?' গোছের আলাপ।

এই সময়ে ইঁদুরের সঙ্গে আলাপ হল···আহা, ওই সেই মেয়েটা বুঝলেনই তো! ইঁদুর নামেই ওকে মানায় বেশী।

ইঁদুর ওকে চটীর দোকানের সন্ধান দিল, এমন কি নিয়েও গেল। সেই চটী কিনে পরা হ'ল। আরে রামো, রামো! ছি, ছি! দেখা গেল যেন টীকেতে আগুন ধরেছে। খুলে রেখে দিল রাগিণী। দেশে যাবার সময়ে বৌদিদের উপহার নিয়ে যাবে।

কিন্তু ইঁদুর ততক্ষণে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। নিরাসক্ত, নীরস রাগিণী চক্রবর্ত্তী, গান ছাড়া যার কোনো গুণ নেই, গান ছাড়া যার অন্য কোন আসক্তি আছে বলে বোঝা যায় না, সেই রাগিণীর দুর্ব্বলতা ইঁদুর ধরে ফেললো। যেখানে যে ছিদ্র আছে, ইঁদুরের যে সেদিকেই নজর। সেইটুকু ধরে তার হানা দিতে হবে। রাগিণীর সুন্দরী সাজবার বাসনা প্রবল—প্রায় চিত্রাঙ্গদার তপস্যা বললেই হয়। তখনও অবশ্য পার্থ রঙ্গমঞ্চে আসেন নি। তাতে কি? তপস্যায় বাধা নেই।

চিত্রাঙ্গদার মত ভগবান রাগিণীকে রূপ দেন নি। চিত্রাঙ্গদার অসামান্যতা রাগিণীর কণ্ঠে সঙ্গীতরূপে ধরা দিয়েছে। 'হাড়গিলে' ছিল যার নাম যৌবন-উন্মেষে, ভাঁটা-ধরা দিনে আর সে কি হ'তে পারে? লাভের মধ্যে কাল রং হ'ল খসখসে, দাঁতগুলো বেরিয়ে গেল। 'অরক্ষণীয়া' জ্ঞানদার মত গাল দুটো কে যেন চড়িয়ে ভাঙলো! বিদ্যার অভাবে কথাবার্ত্তা উজ্জ্বল হ'ল না। জীবনে যে কিছু পেল না তার তো তিক্ততা আসবেই। স্বভাবে মাধুর্য্য এল না। জগতের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত থাকলেও রাগিণীর তাতে রুচি নেই—সে শিক্ষা হয়নি তার। অথচ শিল্পী রাগিণী, সৌন্দর্য্যকে চায়। আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছে সেই—বহির্জ্জগত থেকে গুটিয়ে শামুকের মত আপন সত্তা ও গুণবত্তার আশ্রয় নিয়েছে। বাহির ভাল নয়—তার শত্রু, তাকে দেখলে হাসে, বিদ্রূপের হাসি। কেউ তাকে ভালবাসলে না। তাই রাগিণী নিজেকেই ভালবাসলে—নিজেকে সুন্দর করে তোলার চেষ্টায় পাগল হয়ে গেল।

যত ইংরেজী-বাংলা প্রসাধন পত্রিকা রাগিণী সংগ্রহ করে করে একটা শেলফ ভরিয়ে ফেল্লে, কয়েকখানার গ্রাহক হ'ল। একজনের মুখে শুনেছিল ইংরাজীতে প্রসাধন বিষয়ে নানা আলোচনা থাকে মেয়েদের কাগজগুলোতে। তক্ষুনি বই-এর দোকান থেকে ছোট ভাইকে দিয়ে রাগিণী আনিয়ে নিল। ভাই দিদির মনের কথা বুঝে খিটখিটে দিদিকে সন্তুষ্ট করবার আশায় আরও খান দুই তিন 'Woman and Beauty' 'Woman and Home' 'Ladies Journal', 'Eve' ইত্যাদি এনে দিল। অভিধান দেখে দেখে কষ্ট করে রাগিণী পড়ে নিত। বাংলা যা যা বই পাওয়া যায়—তাও দেখতো কিনে। মাসী-পিসীর ঘরোয়া মুষ্টিযোগেও তার বিশ্বাস ছিল প্রচুর। সেই এক মুষ্টি-যোগের প্রয়োগ দেখেই তো ইঁদুর ধরে ফেল্লে রাগিণীর রাগ কোথায়। একদিন অপরাহ্নে ইঁদুর বেড়াতে এসেছে। রাগিণীর বসবার ঘরে সোফার পেছনে একটা কালো পাথরের বাটী লুকোনো ছিল—বোধহয় লোকের সাড়া পেয়ে রাগিণী লুকিয়ে ফেলেছিল—ইঁদুরের ধূর্ত্ত দৃষ্টি এড়ালো না। সেই সোফাটাতেই সে বসলো। কথা বলতে বলতে যেন আপসে পা-খানা তার চলে গেল সোফার নীচে "ওমা, এটা কি লাগলো পায়ে?" নীচু হয়ে ইঁদুর টেনে বার করে নিল বাটী। দই—দই মত, শশার কুচি দেওয়া। ইঁদুর অবাক্

হল। সে ভেবেছিল রাগিণী বোধহয় গলা ভাল রাখবার কোন ওষুধ খাচ্ছে। জেনে রাখলে গাইয়ে বন্ধুদের কাছে নাম কেনা যাবে। "এ কি, রাগিণীদি ?"

অপ্রতিভ হয়ে রাগিণী স্বীকার করল যে ও হচ্ছে মুখের চামড়ার রং উজ্জ্বল করবার অব্যর্থ মুষ্টিযোগ। বৌদির মামী শিখিয়ে গেছেন। কাঁচা দুধে শশার কুচি ফেলে রাত্রে রাখতে হ'বে। সকালে দেখা যাবে দই জমেছে, সেই দই হচ্ছে ঔষধ।

চোখদুটো চক্‌চকে হয়ে উঠল ইঁদুরের, মুখে খেলে গেল একটা আভা। গোপন সুড়ঙ্গ পথে ঢুকবার সময়ে যে আভা দেখা দেয় চোর ইঁদুরের মুখে-চোখে। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, নিজের চোখে দেখেছি। পাড়াগাঁয়ে বাড়ী আমার। গোলাবাড়ীতে ইঁদুরের ছড়াছড়ি, ভাঁড়ারে, রান্নায় সর্ব্বত্র ইঁদুর। দেখে দেখে এতই অভ্যস্ত যে, কলকাতা সহরে ভদ্রলোকের ভিড়ে ইঁদুর পেলেই ধরে ফেলতে পারি।

ইঁদুর তাড়াতাড়ি মুখের ভাব গোপন করে বলে উঠল, "তা রাগিণীদি, এত হাঙ্গামা কেন ? মুখের ভাল পুলটিশ বেরিয়েছে, yeast pack. দোকানে পাওয়া যায়। গুলে নিয়ে মুখে প্রলেপ দিলেই হয়।"

"কোন্ দোকানে, ভাই ? সে কি ভাল জিনিষ ?"

অবাক হয়ে ইঁদুর বলে, "বাঃ, সব দোকানেই তো পাওয়া যায়। বলেন্ তো আমি এনে দেব।"

"বাঁচালে !" গেঁয়ো মানুষ রাগিণী। বেশী বয়সে সহরে এসেছে, রপ্ত হয়ে ওঠেনি কিছু, পথ-ঘাট, দোকানপাট চেনে না সে। মনে সখ, হাতে পয়সা, এইমাত্র আছে, তার ; সেটাই ঢের, কি বলুন ?

সেই দিন থেকে ইঁদুরের জয়ধ্বজা উড়তে আরম্ভ হ'ল। গোপন পথের সিঁধ পেল সে। ধীরে ধীরে একটু করে সে কায়েমী হয়ে বসল। কোথায় ভাল কাটের জামা, কোথায় সস্তার শাড়ী, কোন পাউডার মাখলে ফর্সা দেখাবে— এসব তথ্য ইঁদুরের কাছ থেকে আহরণ করে রাগিণী রীতিমত অভিজ্ঞ হয়ে উঠল। ইঁদুর কল্‌কাতার মানুষ, বহু বন্ধু-বান্ধব তার। বোনেরা বড় ঘরে পড়েছে—ফ্যাশনেবল সেটের ধারে-কাছে ঘোরে সে। অফিসে বন্ধুও অনেক। সুতরাং, এ জ্ঞান ইঁদুরের নখাগ্রে। আরও অবহিত হয়ে উঠল সে রাগিণীদির শ্রীকার্য্যে।

ইঁদুরের কি লাভ? রাগিণী অভ্যাগতদের এককাপ চা পর্য্যন্ত দেয় না। চায়ের সময় তার বিরল বন্ধুদের কেউ এসে পড়লে তাদের বসবার ঘরে বসিয়ে রেখে ভিতরে গিয়ে একা একা চা খেয়ে আসত। মুখ মুছে বলত, "চাকরটাকে একটু রান্না বলে দিয়ে এলাম।" কোন ক্ষুধার্ত্ত বন্ধু এসে পড়লে রাগিণী খাবার আনাবার অভিপ্রায়ে দেরাজ খুলে পয়সা বার করে আবার ঢুকিয়ে রাখত। তার মনে হ'ত—ওই পয়সায় এক গজ লেস কেনা যাবে। একে তো চেহারা খারাপ, তাতে অত ছোটলোকী! রাগিণীর আশেপাশে যেন এক চাংড়া বরফ। কাছে এলে রক্ত জমে যায়। পরম গম্ভীর মুখ, বুড়োটে ভাবের চলাফেরা দেখে কারুরই বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছা করত না, প্রেম তো দূরের কথা। দ্বিগুণ আগ্রহে রাগিণী নিঃসঙ্গতাকে ভুলতে চাইত রং-চং মেখে। শুধু গলার জোরে আর কত চলে?

আচ্ছা, এ হেন রাগিণী, দেহ-মনে, স্বভাবে কৃপণ, তার কাছে কেন ইঁদুর এত আসত? সারাদিন অফিসে কলম পিষে, সন্ধ্যার পরে কিছু কি উৎকৃষ্টতর করবার ছিল না তার? সে আসত আশায় আশায়। রাগিণী বড় গাইয়ে, একডাকে তাকে লোকে চেনে। ইঁদুরের মত নগণ্য লোকের রাগিণী বন্ধু। বলেও গৌরব। তায় রাগিণীর বাবা জমিদার, অবস্থা ভাল, দরকার হ'লে ধার পাওয়া যেতে হয়ত পারে। রাগিণীদির মনোরঞ্জন করে চললে রাগিণীদি কি ফেলতে পারবেন? রাগিণীদির অনেক—'তুতো' ভাই, মাঝে মাঝে আসে খবর নিতে। অফিসের কাজে বিরক্তি বড়, ভবিষ্যৎ সীমাহীন শূন্যতা। কিছুদিন পূর্ব্বের অসার্থক প্রণয় ইঁদুরের মনে-প্রাণে দাগা দিয়ে গেছে। রাগিণীদির দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে তাঁকে হাত করতে পারলে, চাই কি অফিসে কাজ করে খেতে হ'বে না—মধ্যবিত্ত গৃহলক্ষ্মী সাজা যাবে।

হন্তে হয়ে দৌড়তে লাগল ইঁদুর মরি-বাঁচি করে।—"রাগিণীদি, অফিস থেকে ফেরবার পথে দেখলাম হোয়াইট-অওয়েতে সেল্ হ'চ্ছে। চলুন আপনাকে নিয়ে যাই।"—"রাগিণীদি, কমলালয়ে সস্তায় জুতো দিচ্ছে। আপনার চটির দরকার, বলছিলেন না? পায়ের মাপ দিন, এক জোড়া এনে দি।" "ও রাগিণীদি, এক জায়গায় কি সুন্দর রুমাল পাওয়া যাচ্ছে, ভাই!" পড়িমরি করে রাগিণী ইঁদুরের সঙ্গে ঘুরতে লাগল সেলে-সেলে, দোকানে-

দোকানে। জামা-কাপড়, ছাতা-জুতো, ব্যাগ-টয়লেট, স্তূপ হয়ে উঠল রাগিণীর ঘরে। আলমারী একটা কিনতে হ'ল তার। কিন্তু হায়! যে পরবে ওগুলো, সে যে সে-ই রইল। লাভের মধ্যে ঘোরাঘুরির ফলে রোগা হয়ে গেল আরও, রংও আর একটু কাল হ'ল।

ইঁদুরের এসব অভিযানে কি লাভ হ'ত? একদিন অতি কষ্টে একখানি সিল্কের রুমাল কিনে রাগিণী উপহার দিয়েছিল তাকে। হাসি চেপে অভিভূত ভাব দেখিয়ে ইঁদুর সেটা নিয়েছিল। দু'দিন পরে দ্বিগুণ দামের একশিশি এসেন্স কিনে রাগিণীকে পাল্টা দিয়ে বলেছিল, "রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি আপনার গায়ে সুগন্ধি মাখাচ্ছি। তাই এটা এনেছি, রাগিণীদি। নেবেন না— বলবেন না যেন।"

রাগিণী 'না' বলবার লোক নয়। সুদে আসলে রুমালের দেড় টাকা উঠে এল দেখে স্বস্তি পেল। মনের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করছিল তার। ইঁদুর কি তা বোঝে নি? কিন্তু ক্রমে ক্রমে রাগিণী ইঁদুরকে চা দিতে আরম্ভ করল। প্রথমে নিজের থেকে কম দুধ-চিনি মিশিয়ে'—পরে সমান, শেষে বেশী। ইঁদুর মনে মনে ইঁদুরে হাসি হেসে নিল।

কিন্তু আবার বাজে বকে মরছি কেন? রাগিণীর গল্প তো আরম্ভ হ'ল, তখন থেকে, যখন চিত্রাঙ্গদার জীবনে পার্থ এল। জামা-জুতো-পাউডারের সাধনায় তন্ময় রাগিণী দেখল সাধনার শেষ। পার্থের কথা হোক।

এক বিষণ্ণ বর্ষার বিকেল। মেঘে আকাশ অন্ধকার, পথ ভিজে। রাগিণীর দরজার কড়া নড়ে উঠল। চাকর দোর খুলে দিল! কার্ড ভেতরে পাঠিয়ে আগন্তুক তরুণ বসবার ঘরে বসে চারিদিক চেয়ে দেখতে লাগল। চোখে মুখে তার মুগ্ধ বিস্ময়। চারপাশেই বাদ্যযন্ত্র।

রাগিণী শোবার ঘরে ততক্ষণ পড়ে নিয়েছে কার্ডটা। নামের নীচে যা পরিচয়, তা বিশিষ্ট লোকের। এই বিশিষ্ট ব্যক্তির রাগিণীর সঙ্গে কি কাজ থাকতে পারে, বিশেষতঃ যখন সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই? এমন লোক তো এমন ভাবে কখনও রাগিণীর কাছে আসেনি। রাগিণী পরদার আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল, কি রূপ! বিস্ফারিত উজ্জ্বল চোখ—আর একটু বিস্ফারিত হ'লে·

জ্যাবজেবে দোষের হ'ত। এখন হয়েছে চোখে পড়ার চোখ। সবল দীর্ঘ দেহ, গৌরবর্ণ।

রাগিণী দৌড়ে গেল প্রসাধন করতে। সব চেয়ে মানানসই শাড়ী-জামা পরে, আপাদমস্তক রং মেখে যখন আয়নার সামনে দাঁড়াল, তখন নিজের চোখে নিজেকে সুন্দর দেখাল খুবই। এক শিশি এসেন্স উজাড় করে সর্বাঙ্গে ঢেলে দিল। কৃপণ মন তার, আজ এ অপচয়ে ক্ষতি বোধ করল না। যার জন্য সঞ্চয়—সে তো এসেছে। সমস্ত সঞ্চয় তারি চরণে উজাড় করে দাও। রাগিণীর সাধা কণ্ঠে গান গুঞ্জরিত হ'ল :—

"তব চরণতলে হৃদয় আমার
চায় মিশাতে মধুর রাতে—"

পাপিয়ার মত গলা—বাইরের ঘরে পৌঁছতে লাগল ভ্রমর-গুঞ্জনের গুন-গুনানিতে। পার্থ চকিত হয়ে শুনতে লাগল। নাম সার্থক বটে। রাগিণী !

দরজার চৌকাঠে দাঁড়াল রাগিণী, নীল খদ্দরের যবনিকা পেছনে ঝুলছে তার। হাল্কা সোনালী ইণ্ডিয়ান্ সিল্ক, সোনালী ব্রোকেটের জামা কাল রংয়ে পালিশ এনেছে কিছু। চুল ফাঁপিয়ে রোল করা। ইতুর শিখিয়ে দিয়েছে।

পার্থ তাকাল, মুখে ফুটে উঠল কি ভাব ? নৈরাশ্য অথবা প্রমাদ ? একটু ক্ষণের মধ্যে সামলে নিয়ে পার্থ নমস্কার করে জানাল, "আমি আপনার কণ্ঠের একজন ভক্ত। রেডিওতে রোজ শুনি। শেষে থাকতে না পেরে ঠিকানা জোগাড় করে দেখা করতে এসেছি। আপনাকে বলতে এসেছি।"

রাগিণীর পাথরে পাঁচ কিল। যার গলায় মধু আছে, তার চারপাশে মধু-মক্ষিকার অভাব হবে না। এতো জানা কথা। কিন্তু আকারে-প্রকারে রাগিণীর অশোভনতা এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে, মৌমাছিবৃন্দ তার মৌচাকে মৌ থাকলেও সযত্নে পরিহার করেছিল। এ ব্যক্তি নিশ্চয় গাইয়ে-মহলে নবাগত। আহা, ডাইনী মাসীর বাড়ীতে পথ ভুলে এসে পড়েছে বাছা !

মনটা উলসে উঠল রাগিণীর। বয়স হয়েছে; নিঃসঙ্গ জীবন, তাতে শিল্পীর মন। পুরুষের সঙ্গ চাইত সে। সমস্ত সাজগোজ, সব কিছুর পশ্চাতে ছিল প্রতীক্ষা। 'দুই বোনের' শর্মিলার মত একজনের উদ্দেশে

নিবেদিত ছিল উপচার। সে লোক আসেনি। কিন্তু যাকে-তাকে চায়নি রাগিণী চক্রবর্ত্তী। তার কণ্ঠে অসামান্ততা আছে। অসামন্ততা সে চেয়েছিল। অবশেষে এল পার্থ তার দ্বারে।

চা-খাবারের হুকুম দেবার আগে আর একটু জানা দরকার। অভিভূত মন কৃপণতা ত্যাগ করার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অভ্যাসমত ইতস্ততঃ করল। কথাবার্ত্তা আরম্ভ করে দিল রাগিণী, শিক্ষা দীক্ষার চরম উৎকর্ষ যা ছিল সমস্ত মস্তিষ্কে সংহত করে। কৌশলে জেনে নিল, পার্থ এখনও কুমার, বর্ম্মার ব্যবসা গুটিয়ে কলকাতায় এনেছে। নবাগত।

খপ্ করে উঠে গেল রাগিণী, চরম বেহিসাবী হয়ে উঠল সে হঠাৎ। আস্ত দুটো টাকার লোভনীয় খাদ্য ও চা সেরা কাপ-ডিসে সাজিয়ে নিয়ে এল সামনে নিজ হাতে। চাকর ত্রিপদী টেনে দিল। নামিয়ে রেখে আধ-আধ স্বরে রাগিণী অনুরোধ করল—"একতু চা কান।"

চা খাওয়া হল—পার্থ উস্‌খুস্ করছে বুঝে ব্রীড়াজড়িত কণ্ঠে রাগিণী বলল, "আপনি নিজে এসেছেন আমার গান শুনে। রেডিওতে শুনেছেন। খালি গলায় একটি শোনানো উচিত।"

পার্থ পুলকিত—"সত্যি বলতে কি, সেইজন্যই এসেছি"। চতুর দৃষ্টি হেনে রাগিণী উঠল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। নীল আলো জ্বালিয়ে রাস্তায় ওপরকার দোর বন্ধ করল। অর্গানে গিয়ে বসল। সবচেয়ে বাছা গানটি তার ধরল। চক্ষের নিমেষে কুশ্রী-রাগিণী মূর্ত্তিমতী রাগিণীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

তারপরে এই ধারা চলল। পার্থকে নানাভাবে আকর্ষণ করতে লাগল রাগিণী, নানা ছুতোয় ডাকত, অসম্ভব আদর যত্ন করত। টাকাকে টাকা জ্ঞান করতেও ভুলে গেল সে সাময়িকভাবে। সঞ্চিত সজ্জা লোপাট করে সাজতে লাগল নিত্য নূতন।

পার্থ কিছু আকৃষ্ট হ'ল। কারণ, সে ছিল নিঃসঙ্গ। বর্ম্মাতে আত্মীয়-বন্ধু অনেক সব ছিল। বহু মারা গেছেন যুদ্ধের দুর্ঘটনায়। যাঁরা বেঁচে আছেন, ছড়িয়ে গেছেন। নিকটজনের মৃত্যুতে তরুণ প্রাণে ব্যথা লেগেছে পার্থের। রাগিণীর কণ্ঠমদিরা শোক ভুলিয়ে দিত তার। কুশ্রী, অনাকর্ষণীয় রাগিণী। যখনই ভাল লাগত না—তখনই যেন মন্ত্রবলে বসে গান

ধরত রাগিণী। 'হস্ত থাকিতে কেন মুখে কহ কথা?' আবার ভুলে যেত পার্থ।

কিন্তু, ইঁদুর হচ্ছে গল্পের মুখ্য ব্যক্তি। তার কথায় আসা যাক। এসো ইঁদুর, এসো। 'হ-য-ব-র-ল'-এর রুমাল থেকে বেড়াল বেরোনোর মত তুমি সহসা এসে অধিষ্ঠান কর পার্থ-চিত্রাঙ্গদার প্রেমোপাখ্যানে।

কিছুদিন থেকে ইঁদুর রাগিণীর ভাব-বৈলক্ষণ লক্ষ্য করছিল। আগের মত সে গেলে খুসী হন না রাগিণীদি। চা-খাওয়ানো আবার ছেড়ে দিয়েছেন। তখনও ইঁদুরকে অবশ্য মাঝে মাঝে লাগত প্রসাধনী-সংগ্রহে। কিন্তু, রাগিণী স্পষ্ট বলে দিল তাকে, "দেখ ভাই, সন্ধ্যার পর এসো না। আমি তখন গানের রেওয়াজ করি। ভোরে শুধু হয় না। গলা বসে যাচ্ছে। তুমি বরঞ্চ ছুটিছাটার দিনে দুপুরে এস, বা সকালে এস।"

প্রথমে বিশ্বাস করেছিল ইঁদুর। গানের জন্য রাগিণীদি প্রাণ ছাড়তে পারেন সে তা জানত। কিন্তু, ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস হারাল সে। মনে এত আনন্দ কেন রাগিণীদির? বেগুন-পোড়া চেহারাখানাও যেন একটু ফেরা-ফেরা হয়েছে। তাছাড়া, হঠাৎ তার ওপর টান কমে গেল কেন? রকমটা ভাল লাগল না ইঁদুরের। সবে হাতে প্রায় এনে ফেলেছিল রাগিণী চক্রবর্ত্তীকে, এমন সময় কি অঘটন ঘটল? কৌতূহল চাগিয়ে উঠল ইঁদুরের। সঠিক ঘটনা জানতে ইঁদুর বদ্ধপরিকর হ'ল।

রাগিণীর বাড়ীর আশে-পাশে ওঁৎ পেতে ছিল ইঁদুর, দেখল পার্থকে। বলা বাহুল্য, ভাল লাগল। কিন্তু, সত্যি বলতে কি, ওর মনে আত্মসাতের প্রবৃত্তি জাগলেও ও আমল দিল না। রাগিণীদি মানুষ হিসাবে যত অখাদ্যই হন, জমিদার-দুহিতা গাইয়ে রাগিণী চক্রবর্ত্তী সুপাচ্য। আই-এ ফেল, নগণ্য, হতদরিদ্র, স্বাস্থ্যহীন কেরাণীর প্রতিযোগিতায় নামা চলে না। কিছুকাল পূর্ব্বে আকাশের চাঁদ চাওয়ার ফল হাতে হাতে পেয়েছে ইঁদুর। রাজার দুলাল তার ঘরের সম্মুখে পথ দিয়ে চলে গেছে রথ না থামিয়ে। এখনও রাগিণীর কণ্ঠে এই গান শুনলে ইঁদুর চোখে জল রাখতে পারে না।

"অচল চাহিয়া উচলে চড়িনু,
পড়িনু অগাধ জলে—
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল—"

তাহ'লে রাগিণীদির জুটেছে। কিন্তু অত রূপ যার, সে পুরুষ কি ক'রে রাগিণীতে মোহিত? দেখা যাক। পায়ের ধূলো ঝেড়ে ধূমকেতুর মত ইঁদুর উদয় হ'ল রাগিণীর গগনে।...

'এলাম, রাগিণীদি।"

মদন-ভস্মের ভ্রূকুটি নিয়ে তাকাল রাগিণী। সবে পার্থ জীবন-কাহিনী সুরু করেছে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায়। এই তো উপযুক্ত সময়। সহানুভূতি দেখিয়ে কায়েমী স্বত্ব নাও। ছন্নছাড়া জীবনে রাগিণী আনো। হঠাৎ ইঁদুর!

দূর-দূর করে ইঁদুরকে তাড়িয়ে দিতে পারত রাগিণী, সে ইচ্ছাই হয়েছিল তার। কিন্তু পার্থ চেয়ে আছে যে। এখনি তার সামনের কোমলা কর্কশা হয়ে উঠলে তো চলবে না। অগত্যা মুখে কাষ্ঠ হাসি এনে রাগিণী আড়ষ্ট সুরে দায়ে সারা অভ্যর্থনা জানাল, "এসো"।

নির্লজ্জ ইঁদুর সোফা চেপে বসল। ইঁদুরে চোখে কুট্‌কুট্‌ করে দেখতে লাগল সব। তখনও শান্ত ছিল সে। রাগিণীব অতি সজ্জা, ন্যাকা-ন্যাকা আহ্লাদে খুকীপনা আর পার্থের জলে নামি-নামি-গোছ ধরণ দেখে শীর্ণ থাবার মত হাতের আড়ালে হেসে নিল ইঁদুর। রাগিণীদি কি বোকা! স্বচ্ছল ব্যবসায়ী, রূপবান তরুণ কখনও রাগিণী চক্রবর্ত্তীকে সহধর্ম্মিণীব মর্য্যাদা দেবে না একথা জানে ইঁদুর পূর্ব্বতম অভিজ্ঞতা থেকে। নিঃসঙ্গ পুরুষের সঙ্গিনী চাই, তাই। তবে হাঁ, গানের ঘোর লেগেছে বটে। নাঃ, রাগিণীদির বুদ্ধি আছে। গানের চার ফেলে সুপক্ক রোহিতটিকে তিনি ছিপে তুলতে চাইছেন। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ইঁদুরের দৃষ্টি। করুণ সুরে রাগিণী গাইছে:—

"আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান,
তার বদলে আমি চাইনি কোন দান—"

না-চাওয়া দানের প্রার্থনায় রাগিণীর গলা কাঁদছে। পার্থ বুঝি গলে পড়ে। ইঁদুর হাসি চাপতে ভেতরে উঠে গেল।

রান্নাঘরে বিরাট কাণ্ড! বাপপিতামো আমলের পাকা রাঁধুনী ঠাকুর নানা জলখাবার তৈরী করে সাজাচ্ছে রূপোর রেকাবে। আজকাল এই বুদ্ধি ধরেছে রাগিণী। ঠাকুরকে দিয়ে জলখাবার করিয়ে বলে, "সারাদিন বসে করেছি আপনার জন্যে।" সেবা-যত্নে ভোলানো চাই যে পুরুষকে। এখন

রাগিণীর শেল্ফ-গ্রন্থাগারে প্রসাধন-পুস্তিকার চেয়ে বেশী দেখা যাচ্ছে, 'Men, How To Manage Them' জাতীয় বই। একটা দোষ ছিল ইঁদুরের। যে কোন জন্তু জানোয়ারের তাই থাকে। সেটা ইঁদুরের স্বভাব। সুখাদ্য দেখলে ইঁদুর সামলাতে পারত না। খেত সে যথাসাধ্য রাক্ষসের মত। হ্যাংলা বুভুক্ষু চেহারা দেখলে মনে হ'ত বুঝি শ্রীমতী না খেয়ে থাকেন। আহা, উহু, মরে যাই! কিন্তু খোরাক সাংঘাতিক ইঁদুরের। সব চেয়ে বড কথা, ও সর্ব্বদা ক্ষুধার্ত্ত থাকত। খেয়ে উঠেই মনে হ'ত খাইনি। অজীর্ণ রোগের দারুণ লক্ষণ, ক্ষীণ স্বাস্থ্যের কারণ।

আজও আহার-সম্ভার দেখে ক্ষেপে উঠল ইঁদুর। এইমাত্র যে সে অফিস-ফেরৎ দই-চিঁড়ে-কলা দিয়ে এক জামবাটী ভর্ত্তি ফলার সেরে এসেছে, সেকথা বেমালুম বিস্মৃত হ'ল। রাগিণীদির বাড়ীতে আহারাদির আয়োজন সে পূর্ব্বে দেখেনি। রাগিণীদি যে কতদূর প্রেমে তলিয়ে গেছেন, তা সাজানো রেকাবের প্রাচুর্য্যে ইঁদুর বেশ বুঝতে পারল। মনে আশা জাগল তার, যাক্ ভাল মন্দ জুটবে। তাড়াতাড়ি বসবার ঘরে ফিরে গেল সে।

আবার অশুভ মুহূর্ত্ত। রাগিণীর গান শুনে পার্থ যে দৃষ্টিতে তার প্রতি চেয়েছিল ইঁদুবের প্রবেশে সে দৃষ্টি ডুবে গেল ভদ্রতার-কূপে হীরের আংটির মত।

শান্ত-শিষ্ট ইঁদুর বসল থাবা গেড়ে প্রতীক্ষায়। এখনি খাদ্য আসবে। কিন্তু, আসে না যে! ঠাকুরকে নির্দ্দেশ দেওয়া আছে যে, না বল্লে খাবার পাঠাবে না, সাজানো থাকবে। সামান্য একটু খাদ্য ইঁদুরকে দিলে চলত। উচিতও ছিল। এতদিনের পোষা ইঁদুর! কতটুকু খরচই বা লাগত? কিন্তু, কৃপণ মন রাগিণীর। সে অপেক্ষা করতে লাগল কখন ইঁদুর উঠে যাবে। তারপর প্রথামত পার্থকে ভুরি-ভোজন করানো হবে। পুরুষের অন্তরে প্রবেশ করতে হ'লে জিহ্বার দ্বার দিয়ে যেতে হয়। নব শিক্ষা পেয়েছিল রাগিণী।

ঘড়ির দিকে তাকাতে লাগল রাগিণী ঘনঘন, অসহিষ্ণুভাবে ইঁদুরের দিকে। ইঁদুর, চিরকালের ভদ্র ইঁদুর আজ মরিয়া। বুঝেও সে বুঝল না। এখনি খাবার আসবে।

পার্থ অবাক। অন্যদিন এতক্ষণ চা-খাবারে ডুবে সময় কাটে তার।

আজ সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। সুখাদ্য ভোজনে অভ্যস্ত রসনা অধীর হয়ে উঠেছে। না-কি রাগিণী আজ খাওয়াবে না? কোনদিন তো এমনটি ঘটে না। বিলম্বটা যে ইঁদুরের উপস্থিতির হেতু সে কথা পার্থ অনুধাবন করতে পারল না। চমৎকার মেয়ে রাগিণী, রূপ না থাকলেও সে তো নীচ হ'তে পারে না। যা হোক্, ইঁদুরের সঙ্গ ভালই লাগছে। একঘেয়ে দু'জনে মুখোমুখীতে হাঁপিয়ে উঠেছিল পার্থ। রাগিণী ভিন্ন আকর্ষণ নেই রাগিণীর।

অবশেষে পরিস্থিতি সহ্য করতে না পেরে রাগিণী সোজাসুজি ইঁদুরের দিকে ফিরল "তোমাকে আর ধরে রাখবো না। কাল খোঁজ নেবো তোমার। এঁর সঙ্গে একটু কথা আছে।"

পার্থ আবার অবাক হ'ল। অবমানিত ইঁদুর বাধ্য হয়ে বেরিয়ে গেল। পাশেই এক বন্ধুর বাড়ী। দরকার পড়লে টাকা ধার পাওয়া যায়। চারটে টাকা ধার করে ইঁদুর ঢুকল চায়ের দোকানে। এখনি কিছু খাওয়া চাই তার। মুখের গ্রাস থেকে ছোটলোক রাগিণী তাকে বঞ্চিত করেছে। ওঃ, কি সব চমৎকার খাবার হয়েছিল!

ধার করা টাকায় হালু-হালু করে ভেজাল খাদ্য খেতে খেতে ইঁদুর প্রতিজ্ঞা করল সে প্রতিশোধ নেবে।

তারপর চলল প্রতিশোধের অধ্যায়। 'Vendetta' মারি করেলি যে আবেগ নিয়ে লিখেছিলেন ঠিক ততটা আবেগেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ইঁদুর। রাগিণীর বাড়ীর পাশাপাশি বন্ধুর বাড়ী, সেখানে অপেক্ষা করত। রাগিণীর বাড়ীর চারপাশে ঘুরে বেড়াত চোখ মেলে। পার্থ এলেই হাজির হ'ত। কিছুক্ষণ থেকে বিরক্তি ঘটিয়ে সুর কেটে দিয়ে গুড়গুড় করে চলে আসত। খাবারের আশায় অবশ্য আর প্রতীক্ষা করত না। রাগিণী খুব বিরক্ত হচ্ছে বুঝলে দু'একদিন বাদ দিত। কিন্তু যেত ঠিক। ক্রমে ক্রমে পার্থও রাগিণীর ভক্তরূপী ইঁদুরকে স্বয়ংসিদ্ধ উপস্থিতি হিসেবে গ্রহণ করল।

রাগিণী আজ তন্ময় হয়ে গল্প করছে, কুটকুট করে সিঁধ কেটে ঢোকার ধরণে হীল-উঁচু জুতোর শব্দ তুলে এল ইঁদুর। একটুক্ষণ বসে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা রাগিণীদি সুশীলা দত্তকে চেনেন?"

"হ্যাঁ, কেন?"

"ওঁর সঙ্গে দেখা হলো পথে। আপনার কথা বল্লেন কিনা। আপনাদের

গ্রামের মেয়ে তো। আচ্ছা, ওর বয়স তো বল্লেন ছাব্বিশ, কিন্তু আপনার চেয়ে নীচে পড়তেন। এটা কি রকম ?”

চরম বিরক্তি গোপন করে রাগিণী কটুস্বরে বলল, “জানিনে, ওঁর বয়সের ঠিকুজি রাখিনি।”

ইন্দুর যেন মলিন হয়ে পড়ল। ঈষৎ কাঁদ-কাঁদ হয়ে পার্থের দিকে দু’চার বার চাইল। তারপর ধীরে ধীরে, “আজ আসি রাগিণীদি”, বলে উঠে গেল। রাগিণীর রুক্ষতায় পার্থ অস্বস্তি বোধ করল।

আর একদিন। পার্থ গল্প করছে, “আমি রোগ দেখতে পারি না। এটা অবশ্য আমার দোষ, কিন্তু জীবনে মাথাটিও ধরেনি আমার। তাই রোগে বড় ভয়।”

মাথা নামিয়ে রাগিণী বল্ল, “আমারও তাই। আমি রোগা হ’লেও স্বাস্থ্য ভাল রেখেছি।”

ইন্দুর যথানিয়মে উপস্থিত ছিল। এখন মাঝখানে বলে উঠল, “রোগ সত্যি ভাল নয়। ও রাগিণীদি, সেই বড়িগুলো খেয়ে যাচ্ছেন তো ? আপনাকে মনে করিয়ে দি। ডাক্তারবাবু বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন।”

পার্থ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। রাগিণীদি অতি কষ্টেও ধৈর্য্য রাখতে আর পারল না। কর্কশকণ্ঠে বলল, ‘তোমার মাথাব্যথা করতে হ’বে না। আমার কি দরকার আমি জানি।” পার্থের দিকে চোখ পড়াতে রাগিণী চুপ করে গেল। একদৃষ্টিতে সে রাগিণীর রুক্ষ মুখভাব দেখছে, কান রয়েছে রাগিণীর রাগিণীহীন কটূক্তিবর্ষণে।

চকিতে ইন্দুর যেন ভেঙে পড়ল। অপরাধীর মত চোখের পাতা ওঠানামা করতে করতে করুণকণ্ঠে বলল, “আমি—আমি আপনার শরীরের কথা ভেবেই বলেছিলাম। আপনার শরীরে এত বড় রোগ”—

রাগিণী হঠাৎ ক্ষেপে গেল। বাধা দিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, “দেখ, তোমার উপদেশ বন্ধ কর। সব সময় কথা বলতে যাও কেন সকলের কথার মধ্যে ?”

ইন্দুর মাথা নামিয়ে রুমাল তুলে চোখের কোণ মুছল। তারপরে উঠে চলে গেল। সে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কৌতূহলী পার্থ প্রশ্ন করল, “কি

অসুখ তোমার, রাগিণী? কই, কোন দিন বলনি তো?" সম্প্রতি 'আপনি' নেমেছে 'তুমিতে'।

রাগিণী ব্যস্ত হয়ে উঠল, "আপনিও যেমন! ওর অমনি সর্দ্দারী করা স্বভাব। আমাকে ডাক্তারবাবু—এই ভিটামিন বড়ি খেতে বলেছেন। খাবারের সঙ্গে আমি কোনদিনই যথেষ্ট পরিমানে ভিটামিন নিতে পারি না কিনা।"

পার্থ আশ্বস্ত হল, "ওঃ' এই!" তারপরে রাগিণীকে প্রচ্ছন্ন তিরস্কার করল, "আচ্ছা, ওই বেচারীকে অমন করে কথা বলো কেন? ও তোমার ভক্ত একজন। ছেলেমানুষ, বড় ভাল মেয়ে। তুমি কি জন্যে যেন ওকে দেখতে পার না?' দৌড়ে দৌড়ে তবু আসে ও।"

রাগিণী অসহিষ্ণু হয়ে বল্ল "দেখুন না, এমন ভাব দেখায় যেন আমি গঙ্গাযাত্রী একটি। রাগিণীদি, আজ কেমন আছেন?' 'রাগিণীদি, ওষুধ খাচ্ছেন কিনা?" 'রাগিণীদি, আপনার নীচু ক্লাশের মেয়ের বয়স ছাব্বিশ।' দেখুন না?" আবদেরে খুকী হয়ে উঠল রাগিণী।

পার্থ স্নেহের হাসি হাসল, "তাতে কি? তুমি আমি তো ও-বয়সের মেয়েদের কাছে বুড়োই হ'ব।"

আগুনে জল পড়ল—"তুমি—আমি!" রাগিণীর অবচেতন মনে কিন্তু একটি অস্বস্তি পীড়া দিতে লাগল, দৌড়ে দৌড়ে পার্থের উপস্থিতিতে আসে ইঁদুর! কেন? এসব বলে কেন? একটা অকল্যাণ সম্পর্কে রাগিণীর মন সজাগ হয়ে উঠতে চাইল। রাগিণী স্থির করলে সে ইঁদুরকে 'বাড়ী বন্ধ'করবে। কিন্তু, হায়! তার পূর্ব্বে যে শেষ অঙ্কের অভিনয় হয়ে গেল।

আর একটি মেঘলা দিন, পার্থের প্রথম আবির্ভাবের দিনের মত। সস্তা বর্ষাতিমোড়া ইঁদুর পা টিপে টিপে রাস্তার দিকে রাগিণীর বসবার ঘরের জনালার কাছে দাঁড়াল। ঘর বন্ধ, পার্থ আসেনি আজ। অবশ্য এ প্যাচপেচে বর্ষাতে সে সহজে আসে না। পাশের ঘর রাগিণীর শয়নকক্ষ। ঘরের একটা জানালা রাস্তার দিকে পড়ে। সেখানে আবার কান পেতে দাঁড়াল ইঁদুর। উৎসুক কানে ভেসে এল একটি হাপরের মত শব্দ। চক্ষের পলকে লুকোচুরি, ভীতুভাব চলে গেল ইঁদুরের্। সিধে হয়ে যোদ্ধার মত দাঁড়াল সে।

মুখে খেলে গেল গুণ্ডামীর বেপরোয়া আলো। হ্যাঁ, ইঁদুর রক্তপথ পেয়েছে।

খিড়কী দরজা দিয়ে বাড়ী ঢুকে হাজির হ'ল ইঁদুর, শোবার ঘরে রাগিণীর। "কখন থেকে হ'ল, রাগিণীদি ?"

বিছানার তাকিয়া আঁকড়ে ছটফট করছিল রাগিণী, অতি কষ্টে টেনে টেনে কথা বল্ল, "সকাল থেকেই। খোকা ডাক্তার ডাকতে গেছে। ইন্‌জেকশন নেয়া দরকার। আর সহ্য করতে পারছি না যে!" চোখে জল রাগিণীর, অসহায় ভিক্ষায় ইঁদুরের দিকে তাকাল।

"দেখছি আমি। বন্ধুর বাড়ী থেকে ডাক্তারকে তাড়াতাড়ি আসতে টেলিফোন করে দিচ্ছি।"

পাশের বন্ধুর বাড়ী থেকে সত্যাই ইঁদুর টেলিফোন করল। কিন্তু ডাক্তারকে নয়, পার্থকে। "শিগ্‌গির চলে আসুন। রাগিণীদি বড় অসুস্থ। আপনাকে ডাক্‌তে বল্লেন। এক মিনিট সময় নষ্ট করবেন না, ট্যাক্সি করে আসুন।"

সুতরাং ডাক্তারের ইন্‌জেক্‌শনের সূচ বেঁধাবার আগেই পার্থ হন্তদন্ত হয়ে এসে পড়ল।

সে কি দৃশ্য! পাখা হাতে ইঁদুর, ঔষধ হাতে ভাই, গরম জল হাতে চাকর, সিরিঞ্জ হাতে ডাক্তার। বিছানা ঘিরে রয়েছে সকলে। প্রকাণ্ড খাটে বসে রাগিণী, আলুথালু বেশ, রুক্ষ চুল বাতাসে উড়ছে। চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে, হাপরের মত শব্দে ঘর ভরে উঠেছে, হাঁ করে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টায় ছিনে গলার শিরা ফুলে উঠেছে, মুঠো পাকিয়ে বিফল চেষ্টায় শূন্যে ঘুঁসি মারছে রাগিণী। কাল রংয়ে কালঘাম দেখা দিয়েছে। জলজ্যান্ত হাঁপানী মূর্ত্তিমতী।

রাগিণী চক্রবর্ত্তীর গল্প এখানেই শেষ হল। হাঁপানী রোগী কাত্যায়ণী—আমি লজ্জায় ঘেন্নায় দেশে ফিরে গেলাম, কিছুদিন গা-ঢাকা দিতে। তাছাড়া, হাঁপানী ওঠবার পরে দিন পনেরো গান গাওয়া চলত না। তারপরে পূজো এল। মা-বাবা ছাড়লেন না। গেঁয়ো পূজো দেখে ফিরতে ফিরতে মাস দুই হয়ে গেল। এসে শুনি শ্রীমান বিয়ে করে ফেলেছেন। মেয়েটির রূপ-গুণ কিছুই নেই। তবে

পাত্রী 'নিখিল ভারত ব্যায়াম প্রতিযোগিতায়' কুস্তি করে 'পালোয়ান' নাম পেয়েছে। যাক্‌গে, যার যা পছন্দ।

কিন্তু, দেখুন তো, ইঁদুর আমাকে ডোবাল শেষ মুহূর্ত্তে, প্রায় যখন সাতডিঙি মধুকর ঘাটে এনে ফেলেছিলাম। হাঁপানী রোগটুকুই আমাব রন্ধ্র। ওই পথ দিয়ে ইঁদুর সিঁধ কেটে শনির মত ঢুকে আমার সর্ব্বনাশ করে গেল। ওহো, ভাবতেই পারিনে। এত ভালবাসা দিয়ে যাকে পোষ মানালাম শেষে সেই আমার এই করল!

কেন এ কাজ করলি, ইঁদুর? একবার বিয়ে হ'লে, হাঁপানী ধরা পড়লে সে তো ফেলতে পারতো না আমাকে। তুই তো পেলি না, তবে "ডগ্‌ ইন্ দি ম্যান্‌জার' হলি কেন শুধুশুধু?

সত্যি কথা, ইঁদুরের ব্যবহারেব কাবণ খুঁজে পেতে গেলেই সেই হিতোপদেশের নীতিমূলক ছড়ায় ফিরে যেতে হয়:—

"উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহাব,
যাহা পায় সব কেটে করে ছাবখাব।

পূর্ণচ্ছেদ

দাঁড়ি যা টেনেছি, ভেবোনা কখনো
সে দাঁড়ি আবার রবার দিয়ে
ঘষে তুলে পুন প্রেমের খেলায়
মাতিব হে প্রিয়, তোমায় নিয়ে।
অনেকে এসেছে, অনেকে আসিবে,—
যতদিন আছে আসায় আশা,
ভেবোনা কখনো পুরণো ডালেতে
বাঁধিব আবার প্রেমের বাসা।

অনুশাসন

প্রজাপতিপনা মেয়েদের নাকি ভাল নয় শুনি সকলে বলে,
শুঁওপোকা তবে ভাল নাকি বল, এঁকেবেঁকে যারা মাটিতে চলে?
পাখায় গজালে হরেক বরণ,
ভালো নয় সেটা শুনেছি কানে,
মাটির ছায়ায় মাটি হয়ে থাকা—
শোঁ'পোকা বুঝি ভালো তার মানে?

স্বর্ণসীতা

মাটির পুতুলে মানুষের স্বাদ
পাওয়া যে যায় না সকলে জানে,
মাটি আর মাসে প্রভেদ অনেক,
সত্য কথাটা সবাই মানে।

কলিকাল

বাপরে বাপ!
প্রকাণ্ড সাপ!
মাঠে করে আনাগোনা, চলে চট্‌পট্‌,
বোকা-বোকা পোকাগুলো খায় ঝট্‌পট্‌।
ও বৌদি ভাই,
সাপের চোখেতে যেন জ্বলে রোসনাই!
যদি সাপ কাটে
পুকুরের ঘাটে,
ডেকে তাই নিয়েছিনু সুবিমলদাদারে
পুকুরের পাড়ে।
তা, ছেলে এমনি বোকা,
সাপ শুনে পেল ধোঁকা;
মিছেমিছি খুঁজে খুঁজে হ'ল নাজেহাল,
পুরুষ এমনি হাবা!—হায় কলিকাল!

বেশ ভালো আছি

বেশ আছি, বেশ আছি,
বেশ ভাল অছি ;
সামনেতে ছোট বাড়ী, তুমি তার ছেলে
আমি থাকি এপাশেতে—
বেশ ভাল আছি।

সামনেতে বাংলোটা, টালি-গাঁথা ছাদ,
সবুজ জানালা দিয়ে তুমি থাক চেয়ে,
আমি বাংলোর মেয়ে,—
হয় চোখোচোখি,
কভু দেখি সাইকেলে, কভু ছাতা হাতে।
তুমি দেখ দিনরাতি আমি ঘুরিফিরি—
বিদেশী বুনোর দেশে বেশ আছি মোবা।

সাম্‌নে হলদে বাড়ী, তারকাঁটা বেড়া,
খেলা করে আশেপাশে জাপানী কুকুর ;
জিনিয়ার রাঙা আভা, মোরগের ডাক,—
শুনি দূরে উচ্চ হাসি ভাইবোন দলে।
চকিতে গেটেতে আসি,
চোখে ভালবাসি,
আসে হাসি অধরেতে প্রতিবেশী ভাবে।

ইঁদারা হয়নি শেষ,
ভারীর জলেতে স্নানের আরাম নেই।
তপ্ত মাঠ বেয়ে,
হাতেতে লেডিস্ ছাতা, চটী জুতো পায়ে
পুকুরে প্রত্যহ গতি।
হয় দেখাশোনা,
স্লিপিং স্যুটের কাঁধে রঙীন তোয়ালে,
তুমি হাস, আমি হাসি —
বেশ আছি দোঁহে—

মাঠে মাঠে দেখাশোনা, আমি বলি কভু—
"পথেঘাটে বারে বারে আপনার সাথে
কতবার আজ দেখা! দেখব কি গুণে?"
ফুলের সহজ ভাষা তোমার নয়নে;
শান্ত দিঠির স্নেহ বুলায়ে শরীরে
বলো তুমি তুচ্ছ বুলি,—"পৃথিবীটা গোল।"
ল্যু বহে বন্যদেশে, তেতে ওঠে বালি,
সুশীতল ছায়া তবু তোমার নয়নে।
বলিবার কিছু নাই, শুনিবারও নাই,
ভুলে যাব দূরে গেলে—তবু বেশ আছি।

নাইবা আসিলে তুমি মহানগরীতে;
ড্রয়িংরুমেতে নাই হল আলাপন;
নাইবা শুনিলে তুমি আর্গিনে গান;
নাইবা জানিলে তুমি আমি কাব্য লিখি?
হয় নাই পরিচয় সিনেমার ধাঁচে;
শোননি বিদেশী বুলি চোস্ত মোর মুখে;

বিজলীর আলোতলে,
সোফা-সেটী ভিড়ে,
ভদ্রতার বৈদেশিক আবহাওয়া মাঝে
মিলি নাই—তাই কথা সুর হয়ে বাজে
আমি মেয়ে তুমি ছেলে—এই পরিচয় ;
দুইটি মনের দেখা—
বেশ ভাল আছি।

উপন্যাস—

"In which the greatest powers of the mind are displayed, in which the most through knowledge of human nature, the happiest delineation of its varieties, the liveliest varieties of wit and humour, are conveyed to the world in the best chosen words".

Jane Austen.

উপন্যাস

উপসংহার

এস, তোমাকে গল্প শোনাই। রাজনীতি-কণ্টকে খচিত সাধনাপথের কাহিনী নয়, আদর্শবাদের সংঘাত-সঙ্কুল বস্তুতন্ত্র-আখ্যান নয়। ধর্ম বা দর্শনকে দূরেই রেখে দিলাম। আজ আমি কাউকে বিদ্রূপ করব না, কোন বাস্তবচিত্র অঙ্কনে আমার উৎসাহ নেই। আমি যে ক্লান্ত, আমরা যে ক্লান্ত। বড়, বড় ক্লান্ত আমরা।

যে জীবন আপনার গতিবেগে আজ মুমূর্ষু, যার চোখে আশার আলো নিভে গেছে, যার হৃদয়ের সকল অনুভূতি মৃত, সেই ক্ষয়িষ্ণু জীবনের উত্তরাধিকারী আমরা। হাত পেতে নিয়েছি বৈফল্যের দান। সৌন্দর্য্যহীন পারিপার্শ্বিকে স্বপ্নহীন জীবন আমাদের অতি বাস্তব। সে জীবন প্রতিফলিত হয়েছে বহুবার আমাদের সাহিত্যে, আমাদের সঙ্গীতে। তবু, কেন পিপাসিত মুহূর্তে, নিরালা অবসর-ক্ষণে অতৃপ্ত মন উন্মুখ হয়ে ওঠে কোন লাবণ্যময় মুহূর্তের অপেক্ষায়? কেন অতীন্দ্রিয়ের পথে সমগ্র সত্তা উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে, যুগান্তব্যাপী পিপাসা নিবৃত্ত করতে চায়? আমি চাই, আমরা চাই কল্পব্যতীত সৌন্দর্য্য-প্রতিমা। কিন্তু, সে স্বপ্ন তো স্থায়ী হয় না, তার শেষ আছে।

এস নির্জ্জন নদীতীরে, বকুল-বিছানো বঙ্কিম বনপথে। নগরীর কোলাহল দূরে রেখে এস, দূরে রেখে এস যান্ত্রিক সভ্যতার যন্ত্রপাতি। এখানে সময় নেই, দুঃখ নেই, অভাব নেই, হতাশা নেই। দূর থেকে আমরা দেখব পেছনে ফেলে আসা নগর, তার কয়েকটি কক্ষ। আজ আমাদের গল্পের পটভূমিকা অতি ক্ষুদ্র পরিধি চায়। কয়েকটি বর্ষারাত্রি, কয়েকটি বসন্ত দিন চায় সে, তোমার জীবন থেকে মাত্র ততটুকুই তাকে দাও। এতই কি বেশী? তোমার অগণ্য দিন, অসংখ্য রাত্রি তো পড়েই আছে। থাকবেও, যাদের অর্থহীন একঘেয়েমির বেড়াজাল তোমাকে হত্যা

করছে। আমরা পলে পলে মরছি প্রাণহীন কঠোরতায়, প্রেমহীন জীবনে। তাই আমাদের বিগত বা অনাগত বসন্তের গান শোনাই, এসো।

তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি চাই না এখানে। বিশেষ কিছু আমার বক্তব্য নয়, অতি সাধারণ মানুষের জীবনের সাধারণ একটি গল্প মাত্র। সেই অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা। প্রথমেই বলে দিচ্ছি গল্পের ছক। আমি লেখক, যাদুকর নই। মনকে সম্ভাব্য অসম্ভাব্যের ঘোড়দৌড়ের মধ্য দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় দৌড় করিয়ে হঠাৎ তাজ্জব কিছু দেখিয়ে অবাক করে দেওয়া আমার ধর্ম্ম নয়। আমি নূতন কিছুই বলতে পারব না। নূতন কিছু নেইও পৃথিবীতে। আমি যা বলব সে তো তুমি জানো। সে তো তোমারই কথা। আমার মধ্য দিয়ে শতবার শত আখ্যায়িকায় তুমিই তো প্রকাশিত হচ্ছো। তোমার মধ্যে আমি পাচ্ছি অনাদি অতীতের প্রবহমান ধারাকে। অতীতের সঙ্গে আমার যোগসূত্র তুমি। আমার লেখা তুমি পড়ে নিজেকেই তো দেখো, দেখো বারেবারে নিজের স্বিরীকৃত সত্তার খণ্ড-খণ্ড অংশকে। কথা তো একই যুগ যুগ ধরে। বলবার ভঙ্গিটা পৃথক এইমাত্র। তবে কেন লিখছি, যদি কোন নূতন আস্বাদ নাই দিতে পারি? লিখছি কেন, যা সকলেই লেখে, অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা? লিখছি মানবমনের সেই মুহূর্ত্তের জন্য, যখন মানুষ ব্যাকুল হয়ে খুঁজে বেড়ায় অধরাকে, সহস্র অবান্তর দিনরাত্রির গণ্ডির বাইরে সে ব্যগ্রকর প্রসারণে খুঁজে বেড়ায় তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে—প্রেমকে: যে জীবনে একবারই আসে অথচ যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিধর। ব্যাকুল বিভ্রান্ত মানবমনকে উদ্দেশ করে লিখে যাব এই পুরাতন কাহিনী। জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রহর, আত্মার শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য প্রেম। প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন, যদিও সে পৃথিবীর মতই পুরাতন। আমার এ কাহিনীতে তোমার জীবন থেকে একটু সময় দাও। নিরাশার আবর্ত্তনে, এস, একটু ভুলে থাকি।

এক নিমেষে আত্মাকে যে চরম ঐশ্বর্য্যবান করে তোলে, সমগ্র কুশ্রী ব্যবহারিকতার উপরে মোহন স্বপ্ন বিস্তার করে, সেই প্রেমের কথাই আমি বলব আজ। নিষ্ঠুর প্রেম নয়, অবৈধ আসক্তিপীড়নের দহনে যে প্রেম তৃপ্তি খোঁজে, আজ তো সে প্রেম আমি জানি না। মনঃসমীক্ষণের ক্ষেত্রচারী নয় এ আখ্যান, এ শুধু একটি বসন্ত দিনের গান।

আমি বলব তিনজনের কথা, সেই eternal triangle. ত্রয়ী। এ তো তুমি জান। কত এমন ঘটনা দেখেছ তুমি। হয়তো বা তোমার নিজের জীবনেই ঘটে গেছে। কে জানে? এক আইভি-লতা বিকশিত হয়ে উঠেছিল যৌবন-সমীরে, পরিমল ছিল তার বক্ষে। আর এক বৈদেহী মূর্ত্তি তাদের পাশে। সে প্রাণ পায়নি। যেমন নিশ্চিন্ত আলস্যে রূপকথা বলে, তেমনি করে বলে যাব এদের কথা।

একজনের নার্সিসাস্ আত্মার কথা বলব, সে নিজের রূপে ছিল তন্ময়। কেমন করে হ'ল তার জাগরণ, প্রতিচ্ছায়াকে খুঁজে মরল সে, সেই কথা শোনো। শোনো সমস্ত বসন্ত দিনের পরিণতির কথা। জীবনের অনিবার্য্যতার কথা।

আমি জানি, তোমার চোখে ভাসছে বিরাট রঙ্গমঞ্চ—পুতুল নাচের মঞ্চ। সেখানে পুতুলের মত দড়িগাঁথা মানুষ ঘোরাফেরা করছে। অদৃশ্য শক্তির নির্দ্দেশে তাদের চলাফেরা। অলক্ষ্য দেবতা লিখে গেছেন উপসংহার। তাকে অতিক্রম করবার সাধ্য নেই মানুষের। তবু, দেখছ পুষ্পভূষণ, সুকুমার মূর্ত্তি, সেই ত্রিলোকের ত্রাস মন্মথকে। যার অগোচর শরাক্ষেপ অসহায়ের মর্ম্মপীড়ায় দগ্ধ করে। হে মনোভব, তোমাকে প্রণাম করি। বিধাতার উপরেও বিধাতা তুমি।

এক

বৈদেহী রায়—

শোনা গেল গায়িকা যবনিকার অন্তরাল হ'তে গান গাইবেন। অদ্ভুত খেয়াল; কিন্তু খেয়াল কি না, সুতরাং গুণীজনোচিত। দামোদরবন্যার ত্রাণ উদ্দেশে সখের দল গান বাজনার আয়োজন করেছে কলিকাতা মহানগরীতে। মোটামুটি ভালোই বলা চলে। অন্ততঃ, বহু সখের দলের মত এখনও বাজনার তার ছেঁড়ে নি, অথবা গানের পদ ভুল হয়ে যায় নি।

শ্রীমান্ পরিমল লাহিড়ীও এসেছেন শ্রোতা হয়ে। অসংখ্য বন্ধু-বান্ধবের কল্যাণে একখানা টিকেট কিনতে হয়েছে তাব। বন্ধু-পরিবৃত অবস্থায় আছে সে। সুন্দরী রাধা যদি 'ব্রজরমণীগণ-মুকুট-মণি' হন, তবে পরিমল নক্ষত্রকুলে পূর্ণচন্দ্র। অপরূপ, অপরূপ সে। সে রূপের তুলনা নেই। মনে হয়, আমার জগতে এতদিন এ কোথায় ছিল? কোথায় ছিল এর ভ্রমর-গঞ্জন আকর্ণ অক্ষির সন্ধানী দৃষ্টি? কোথায় ছিল ওই আরক্ত অধরোষ্ঠের বিলাস বিভ্রম? কাকপক্ষ কেশ, মর্ম্মরফলক ললাট কোথায় ছিল? আহা, ও আমাব স্বপ্নের রূপ ধরে যদি এল, এত দূরে কেন?

কিন্তু, কাছে এসে দেখা যাবে অনেক কিছু। ওয়াটারকালার ছবির মত দূরে ধরে তাকে দেখতে হয়। সে সৌন্দর্য্যের মধ্যে সামান্য একটু অমার্জিতভাব মিশে আছে কিনা। চোখ অনুপম, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই অলস। বঙ্কিম অধরের মোহন ভঙ্গিকে নষ্ট করেছে ব্যঙ্গমিশ্রিত চপল হাস্য। একটু অসন্তোষ, বিদ্রূপ, চাপল্যজড়িত সে রূপ। হৃদয়হীন কোথাও গোপনে বাস করছে। সুতরাং, পরিমল লাহিড়ী, আমি তোমাকে দূরেই রাখবো।

হাতের বর্ম্মাচুরুটের ছাই ঝেড়ে পরিমল বলে উঠল "বৈদেহী রায়! বৈদেহী রায়! নামটা শোনা। আমি এ নামের একজনকে চিনি। তার চেহারা আমি ভুলব না। যত কুশ্রী মানুষ হ'তে পারে, সে তাই।"

গান আরম্ভ হ'ল। গায়িকাকে দেখা গেল না বটে কিন্তু শোনা গেল। শ্রাবণ আকাশের ব্যাকুল বর্ষণ আবৃত করে সেই মোহময়ী মল্লার রাগিণী ষড়-সপ্তকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। ভেঙে পড়ল সে সুর বিশাল কক্ষের

চতুর্দ্দিকের বায়ুস্তরে। দেখা গেল না গায়িকার মুখ, তাতে কি? এমন গান যার, নিশ্চয়ই সে মুখে আছে অসামান্যতা, তাই বোধহয় লোকলোচনের অন্তরালে খেয়ালীর অবস্থিতি। তবু, এ সুর তো শুধু শুনবার নয় দেখবারও। দেখবার, এই সুরের সৃষ্টি করছে কোন সুর-প্রতিমা? তানসেনের আহ্বানে মূর্ত্তিমতী মল্লার রাগিণী নেমে এলেন বুঝি। এমন গান সহজে শোনা যায় না। এই কণ্ঠ কারুর জীবনে হয়তো একবারই কাণে আসে। নিমেষে সে ধন্য হয়ে যায় সৌন্দর্য্যের পরম প্রকাশ শ্রবণে ধরতে সক্ষম হয়ে! কারুর জীবনে এমন কণ্ঠ কখনও শ্রুত হয় না, এ যে সম্ভব, সে তা অনুভব করতে পারে না কখন। এ দুর্লভ কণ্ঠ।

সহচর চঞ্চল পরিমলের কাণের কাছে বলল, "পরি, এ নিশ্চয় সে মেয়ে নয়। এত মিষ্টি গলা যার, সে কি দেখতে বিশ্রী হ'তে পারে?"

পরিমল কোন উত্তর দিল না। তার অলস চোখ প্রশংসায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

গান শেষ হ'ল। একটি মাত্র। ব্যবস্থার অনুরোধ সত্ত্বেও বৈদেহী রায়ের পাপিয়াকণ্ঠ আর ঝঙ্কার দিয়ে উঠল না।

পরিমল জোরে চুরুটে টান দিয়ে বলল, "আঃ! এরকম গান তো শুনিনি। গায়িকাকে দেখতে হচ্ছে।"

চঞ্চল আস্তে আস্তে আবৃত্তি করল:—

"কেন শুধু বাঁশরীর সুরে
ভুলায়ে লয়ে যাও দূরে
যৌবন-উৎসবে ধরা দাও
দৃষ্টির বন্ধনে।"

গায়ের রেশমী চাদরটা এলোমেলো কায়দায় ঠিক আছে কিনা দেখে নিতে নিতে পরিমল হাসল, "শুধু দৃষ্টির বন্ধনেই ধরতে চাই। ক্ষতি কি?"

সম্মেলক সঙ্গীতের পরে আসর ভঙ্গ হ'ল। বৈদেহী রায়ের গানের খ্যাতি মুখে মুখে ফিরতে লাগল। পরিমল প্রথমেই প্রবেশ দ্বারের পাশে অপেক্ষা করছিল। বৈদেহী রায়কে না দেখে তারা আজ যাচ্ছে না।

একজন স্বেচ্ছাসেবকের পাঞ্জাবীটা টেনে ধরে চঞ্চল হঠাৎ বলে উঠল, "মশাই, বৈদেহী রায়টি কে বলতে পারেন ?"

ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে একটা কিছু বলতে গিয়ে পরিমলের মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেলেন। রাত্রির কাল অন্ধকার পটভূমিকায় বর্ষণ-সঙ্কুল রজনীতে ফুটে উঠেছে নক্ষত্রের মত দীপ্ত সেই মূর্ত্তি। পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরের জয়পত্র তো তার ললাটে লেখা। স্বেচ্ছাসেবক সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, "ওই কালো গাড়ীখানা বৈদেহী দেবীর। এখনই তিনি আসবেন ওঁর বাবার সঙ্গে।"

পরিমল এক দৃষ্টিতে গাড়ীখানার দিকে চেয়ে রইল, বৈদেহী রায়ের তা'হলে মিষ্টি গলার সঙ্গে টাকারও অভাব নেই। একখানা মিনার্ভা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরেই মালিক এসে গেলেন।

ওঃ! পরিমল এই বৈদেহীর কথাই বলেছিল। অফিসের কাজে সে কিছুদিন এলাহাবাদে থেকেছিল। তখন এই বৈদেহী রায়ের সঙ্গেই আলাপ হয়। সেই অদ্ভুত কুশ্রী বৈদেহীই তাহলে কলিকাতার গায়িকা প্রধানা? এতক্ষণ এরই কণ্ঠের মোহিনীমায়া সাময়িক ভাবে পরিমলকেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তাইতো যবনিকা, তাইতো অন্তরাল। সুর-প্রতিমা নয়,—দানবীয় ভয়ংকরতা না থাকলেও কুশ্রীতা আছে বৈদেহীর মুখে। ঈশ্বর একদিকে কার্পণ্য করেছেন অন্যদিকের ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠলেন। চঞ্চল টীটকারী দিয়ে বলল, "পরি, তোমার গায়িকাকে দেখে নাও। আহা!

"বৈদেহীর মত দেখিতে তাহারে
বৈদেহী যাহার নাম—"

পরিমল অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। উত্তর দিল, "তাইতো দেখছি।"

তাদের উচ্চ হাস্য তীরের মত বৈদেহীর কাছে চলে গেল। সে ফিরে চাইল গাড়ীর দিকে চলতে চলতে। পরিমলকে দেখে নিমেষে তার মুখ পরিচয়ের আলো লেগে উজ্জল হয়ে উঠল, পরক্ষণেই সে আলো নিভে গেল ব্যঙ্গছায়া দেখে।

বৈদেহী মুখ ফিরিয়ে গাড়ীতে উঠে বসল।

দুই

পরিমলের গৃহ। বিধাতা এখানেও বিচক্ষণ। দেহে পরিমলের প্রচুর রূপ দিয়েছেন, তাই বাক্সে দেননি রৌপ্য। জীবন-বীমা ফার্মের দালালী করে পরিমল। তুচ্ছ কাজ, তুচ্ছতর পারিশ্রমিক। তবে গৃহে মা ছাড়া দ্বিতীয় স্বজন নেই। দু'জনের কুলিয়ে যেত। কখনও মোটা দাগের দুই একটা আয় হ'লে ওরি মধ্যে যুটে যেত সৌখিন বিলাসিতা। কিন্তু দুই ব্যক্তির সঙ্গে তৃতীয়ের যোগ হ'লেই চক্ষুস্থির।

শ্রান্ত পরিমল বিরস মুখে বাড়ী ফিরল। বেলা দ্বিপ্রহর। পুত্রের শ্রান্তি আর বিষাদ দেখে মায়ের বুঝতে বাকী রইল না যে মনোজগতে কোন বিপ্লব ঘটেছে। পরিমলের মনোজগতে একমাত্র বিপ্লব ঘটাতে পারে যে, সে সুন্দরী চন্দ্রলেখা। পরিমলের দরিদ্র বাহুপ্রসারণের উর্দ্ধে ফুটেছে সে ফুল। আইভি চক্রবর্ত্তী ঈঙ্গ-বঙ্গ সমাজের মেয়ে, ব্যারিষ্টারদুহিতা। পরিমল ও তার মধ্যের ব্যবধান কতকগুলি রৌপ্যচক্র। কিন্তু সামান্য ব্যবধানটাই অসামান্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিমল প্রত্যেকবারই চেষ্টা করে' ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসত হতাশায়।

যে কোন সুন্দরীকে বার বার ফিরে দেখা পরিমলের অভ্যাস, এককালে সে বহু তরুণীর সঙ্গে প্রেমখেলাও করেছে। অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্বকে ধরবার সাধ্য কারও হয়নি, বিধাতার ললাটিকা নিয়ে বিজয়ী ফিরত সে। নিজের রূপের ধ্যানে তন্ময়চিত্ত সে রূপের জোড়া পায় নি। একদা দেখা হ'ল আইভির সঙ্গে অতর্কিতে। এ পরের কাহিনী। পরিমল খুঁজে পেল রূপের প্রতিচ্ছায়া।

আইভি ভালবাসত পরিমলকে, কিন্তু পরিণয়ে ধরা যাচ্ছিল না তাকে। সে বলত ভালবাসার খাতিরে বড় ত্যাগ স্বীকার করলে ভালবাসাই বিস্বাদ হ'য়ে যাবে।

মা পরিমলের হাত ধরে ডাকলেন, "খোকন, স্নান করে খেয়ে নে বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল। রান্না অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।"

পরিমলের অন্তকে 'খোকন' বলে ডাকবার বয়স এসে গেলেও মা তার খোকন নামটা ছাড়লেন না। অতি স্নেহে মমতাময়ী একমাত্র সন্তানের শৈশবকে ধরে

রাখতে চান প্রাণপণে নামটি ধরে ডেকে। ফিরে পান মুহূর্তের জন্য সুন্দর শিশুকে, যে মা ছাড়া জানে না। আজ তার জগৎ মাকে বাদ দিয়ে গড়ে উঠেছে, মায়ের মুখাপেক্ষী নয় সে। পরিণত যুবক নিষ্প্রভ জননীমূর্ত্তির কাছে চায় না কিছুই। বিধবা পূজার ঘরে, রান্নার আয়োজনে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন।

মা ছেলেকে ডাক দিয়ে ভাত বেড়ে রাখলেন। কিছুদিন আগে একটা ঠাকুর ছিল, কিন্তু তাতে খরচপত্র অত্যন্ত বেশী হতে লাগল, পরিমলের পাকযন্ত্র গেল বিগড়ে আর ভাঁড়ার থেকে কতকগুলো জিনিষের কমতি পড়তে লাগল। তাই মা ঠাকুরকে বিদায় দিয়ে নিজেই রাঁধতে লাগলেন।

থালায় নানা সুখাদ্য ছিল। পরিমলের মেজাজটা কিছুকাল হ'ল ভালো যাচ্ছিল না, তাই মা প্রায় প্রত্যহ পুত্রের প্রিয় রান্না একটা দুটো করে যেতেন। মাছ রান্না করতেন শেষে তোলা উনুনে। রান্নার শেষে স্নান করতেন। ছেলেকে খেতে দিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে কাপড় ছেড়ে নিজে বেলায় খেতে বসতেন। কোন কোন দিন বেশী ছোঁয়াছুয়ি হয়ে গেলে স্নানও করতে হ'ত। একটি মাত্র ঝি, রাতদিন বাড়ী থাকলেও ফাঁকির কামাই নেই। মা বুড়ো বয়সে একহাতে রান্না, ভাঁড়ার করে উঠতে পারেন না। নিজের পূজো-আচ্চাও আছে তা-ছাড়া। ছেলের যত্নও ঠিকমত হয় না, ঘরদোর গুছিয়ে উঠতে পারেন না। সর্ব্বোপরি সারাদিন একা একা কাটানোতে অসহ্য হয়ে উঠেছে জীবন তার। তিনি চান উপযুক্ত ছেলের বিবাহ দিয়ে উপযুক্ত পুত্রবধূ ঘরে এনে সংসার গুছিয়ে দিতে। একের পর এক সম্বন্ধ আসছে ছেলে ফেরৎ দিয়ে দিচ্ছে। ছেলের মন যে কোথায় তা জানতে জননীর বাকী নেই। তবু, সাধ যায় তাঁর কত। অল্প বয়সে স্বামীহারা রমণী। ওই একটি মাত্র সন্তান কোলে বিধবা হয়ে বঞ্চিত অন্তরের ব্যর্থ পিপাসা ঢেলে দিয়েছেন ওর উপরে। কখন মামার বাড়ী, কখন কাকার কাছে মানুষ হয়ে মফঃস্বল কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করল সে। কলকাতায় এল—চিরকাল ঝোঁক ছিল নাগরিক হ'বার। কিন্তু নগর তার কান্ত রূপ সপ্রতিভ ব্যবহার পছন্দ করলেও দিলনা তাকে প্রশ্রয়। জীবিকা-অর্জ্জনের ক্ষেত্রে কোন সুবিধা হ'ল না। তবে সুন্দর চেহারা, মনোহারী কথাবার্ত্তার গুণে জীবন বীমা কম্পানীতে মাইনে-করা দালালীর কাজ পেল

একটা। দেশী কম্পানী, মাইনে বিদেশী কম্পানীর মত আশানুরূপ নয়। তবে মাঝে মাঝে উপরি জোটে। মা'কে নিয়ে কলিকাতায় আজ নয় বছর বাসা বেঁধেছে পরিমল।

কত সাধ যায় মায়েব! অমন টুকটুকে ছেলে, রোজগারপত্র করছে। বয়স হয়েছে, মূর্খ নয়। একটি টুকটুকে বৌ হ'লেই মানায়। ছেলে সংসারী হ'তে চায় না। অথচ মায়ের প্রাণ তো। লক্ষ্মী ঘটকীকে তিনি লাগিয়ে রেখেছেন। বিস্তর সম্বন্ধ আসছে। আজও একটু আগে লক্ষ্মী এসেছিল একটা বিশেষ ভাল সম্বন্ধ নিয়ে। এমনটি যে হাতছাড়া করলে আর পাওয়া যাবে না, একথা লক্ষ্মী ক্রমাগত বলে মাকে বুঝিয়ে গেছে। বড়লোকের সুন্দরী মেয়ে। দেবে-থোবে ভাল।

লক্ষ্মী চলে গেলে মা একটুক্ষণ চুপ করে ভাবলেন। ছেলে তাঁর ভাল খেতে ভালবাসে। তাই, প্রত্যহ অসুস্থ দেহ নিয়েও তিনি রন্ধনবিলাস করতেন। কোন কোন দিন দুরূহ পর্ব্বের নানা রন্ধন সমাপ্ত করতেন ছেলের উদ্দেশে। কাল ঘরে ছানা কেটে ছিলেন, ছানার ডালনা হয়েছে, মোচার চপ ভেজেছেন। দু'টোই সে ভালবাসে। নারিকেল-কোরা দিয়ে ছোলার ডাল, বেগুণের সর্ষে চচ্চড়ি রান্না করে মাছের পাট রাখেননি আজ। ভেবেছিলেন এতেই হ'বে। লক্ষ্মী ঘটকীর সঙ্গে আলোচনার পরে ভেবে-চিন্তে বুড়ী ঝিকে বাজারে পাঠিয়ে দুটো হাঁসের ডিম আনিয়ে নিলেন। বিধবার পক্ষে ডিম ছোঁয়া মহাপাপ। কিন্তু, কি হবে? ছেলে ওসব খেতে ভালবাসে, অথচ বেঁধে দেবার লোক নেই। ঠাকুর রাখা হয়েছিল এই দুঃখে। শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না মায়ের। অম্বলের ব্যারাম চাগিয়ে উঠেছে আবার। ছেলের খরচের আশঙ্কায় এতদিন চেপেই ছিলেন। আর তো চাপা যায় না, বিকেলবেলা অর্দ্ধেক দিন জলটুকু পর্য্যন্ত মুখে দিতে পারেন না। সকালে বিছানা ছেড়ে সংসারের কাজ দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। দিনের বেলায় যা একবার পাতে বসেন, তাতেও অরুচি। দেখবার লোক নেই। ছেলে তো সংসারের দিকে কোন লক্ষ্য রাখে না। ভাগ্যি রাখে না, নইলে মায়ের দেহের অধোগতি অবশ্য চোখে পড়ত। চিকিৎসাপত্রে ব্যয় করতে হ'ত অজস্র। একেই বাছার খরচ কুলোয় না। এক এক মাসে এত কম টাকা সংসার খরচে দেয় যে মায়ের তো

ভাবনায় পড়তে হয়। অবশ্য, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, স্বীকার করতে হয়, ছেলের সৌখিনতা আছে। আহা, করুক, করুক। সারাজীবন পরের দোরে মানুষ, যোয়ান বয়েস, কত সখ আহ্লাদ যায়! মায়ের বোঝা তো ঘাড়েই আছে।

ছেঁড়া একটুকরো কাপড় পরে, বারান্দায় তোলা উনুনে ডিমের কালিয়া রাঁধতে রাঁধতে মা ভাবলেন, আজ ছেলের রসনার তৃপ্তির দ্বার দিয়ে মনে প্রবেশ করবেন। এই পাত্রীটি ছাড়া মূর্খতা হ'বে। পাত্রীর বাবা নাম-করা ব্যবসাদার। হয়তো জামাইএর কাজকর্মের সুবিধা করে দেবেন। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই দেবেন। ঘটকী বলেছে এটি ছোট মেয়ে, বড় আদুরে। মেজ জামাইটি হয়েছে কাল, বডটির জামাইও সুন্দর হয়নি। গিন্নী কোট ধরেছেন ছোটর বেলায় চাই সাক্ষাৎ ময়ূর-ছাড়া কার্ত্তিক। লক্ষ্মীর মুখে পরিমলের রূপের কথা শুনে তাঁরা লুব্ধ হয়েছেন। লক্ষ্মীর কাছে মা গোপনে পুত্রের একটি ছবি দিয়ে রেখেছেন। সকলের ছেলের নানা কৃতিত্বের তালিকা, তাঁর ছেলের ওই। ছবি কন্যা-পক্ষের খুব পছন্দ হয়েছে। এমন কি, খোদ কন্যা পর্য্যন্ত ছবি দেখে হেসে দৌড়ে ঘরে পালিয়ে গেছে। অর্থাৎ, ঘোর পছন্দের লক্ষণ। তাইতো এদের এত আগ্রহ, নইলে কলকাতায় নিজের বাড়ী নেই বলে কর্ত্তার আপত্তি ছিল।

একটা গলদ আছে। মেয়েব বয়স মাত্র ষোল। লক্ষ্মী বলেছে ধরণধারণে মনে হয় বারবছরের খুকুমণি। একেবারে 'টুক্‌টুকে বৌ' হ'বে। লেখাপড়াও যা ওই বাড়ীতে করেছে। ওদের স্কুলে যাওয়ার রেওয়াজ নেই। যাবেই বা কেন? ওরা তো মাষ্টারী করে খাবে না। শুধু শুধু স্কুলে-কলেজে ছোটাছুটী করে বুড়োটে মেরে যাওয়ার কি দরকার?

কথাগুলো লক্ষ্মীর বেশ যুক্তিযুক্ত হলেও গোলমাল তো ওখানেই। ছেলের বয়স আটাশ যে। অত ছোট মেয়ে শুনলেই চটে যাবে। ইতিপূর্ব্বে চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশীর সঙ্গে বিবাহপ্রস্তাব তুলে মাতা লাঞ্ছিতা হয়েছেন। সুতরাং, তিনি স্থির করে ফেললেন পাত্রীর বয়স চড়িয়ে আঠারোতে দাঁড় করান হবে। বেশী বলা চলে না। মেয়েটির ছবি দেখেছেন তিনি। জমকালো বেনারসী আর জড়োয়া গয়নায় মোড়া অবস্থায়

চেয়ারে বসে আছে উঁচু-হীলের জুতো পায়ে। সুতরাং ফ্যাসানে জ্ঞান নেই কেউ বলতে পারবে না। চুলগুলো ফাঁপিয়ে প্রকাণ্ড খোঁপা ঘাড়ের কাছে। পায়ের নীচে ডোরা কাটা সতরঞ্চি পাতা, পেছনে আর একখানা ঝোলানো। হাতের কাছে টেবিলে প্রকাণ্ড ফুলের তোড়া। একটু রোগা মেয়েটি। লক্ষ্মী বলেছে ও কিছু নয়—ছেলেবেলায় কৃমির ধাত ছিল, তাই। আঠারোর ওপরে তোলা যাবে না বয়স। লেখাপড়াও জানে না। ছেলের আবার লেখা-পড়া জানা মেয়েদের সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ। তা' হোক, বিয়ের কথা তো তাদের কারুর সঙ্গে হয় না। বিয়ের জন্য চাই স্বঘরের মেয়ে। ছেলের বিয়ের ইচ্ছা না থাকলেও মা চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এমন ছেলে তাঁর? রূপ দেখলে আকাশের সূর্য চাঁদ নেমে আসতে চায়, তবু তেমন ভালো সম্বন্ধ আসে কই? কলকাতার লোকেরা তো ছেলে চায় না, চায় বাড়ী-গাড়ী, বড় চাকুরী। ছেলের তো সে সব কিছু নেই।

এই পাত্রীটি ছাড়া হবে না। ডিমের কালিয়া ঢাকা দিয়ে রেখে মা স্নান করতে গেলেন। 'ডিম' জিনিষটা এত অশুচি লাগে যে রান্নার পরেই স্নান করে ফেলতে হয়। বাটিটা ধরে দিয়ে কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করলেই হ'বে।

পরিমল আসবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মা সুখ চিন্তায় নিমগ্ন রইলেন। বৌ আসবেই ঘরে তাঁর। আঃ, কি আরামের দিন! সারাজীবনটি কেটে গেল হাঁড়িহেঁসেল নিয়ে। ধর্ম্ম-কর্ম্ম করা হয় নি। বৌ-এর হাতে সংসার দিয়ে ধর্ম্ম করে বেড়াবেন, বেড়িয়ে বেড়াবেন তিনি। ছেলের যত্ন হবে, স্থিতি হ'বে।

মেয়েটি আর একটু সুন্দরী হ'লে ভাল হ'ত। চকিতে চোখের সম্মুখে বেনারসী-জড়োয়া-জড়িত মেয়েটিকে আবৃত করে জেগে উঠল একটি মুখ। আশ্চর্য্য সুন্দর সে মুখ! তাঁর ছেলের মুখের পাশে ওই একটি মুখই জগতে মানায়।

মা আইভিকে দেখেছিলেন। একবার এসেছিল সে এ বাড়ীতে। অন্তরঙ্গতা দুই বাড়ীর মধ্যে জাগাবার আশায় পরিমল একদিন ট্যাক্সি ভাড়া করে নিয়ে* গিয়েছিল মাকে আইভির জবরদস্ত জননী মিসেস্ চক্রবর্ত্তীর

সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে। মুখে খারাপ ব্যবহার না করলেও, মিসেস্ চক্রবর্ত্তী বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ভবিষ্যতে মেলামেশা সম্ভব নয়।

"The East is East, the West is West,
And the twain shall never meet"—

সুতরাং, সে আশায় পরিমলের ইতি পড়েছিল। আইভিও দ্বিতীয় দিন আসেনি। শুধু কি অনাত্মীয় কুমারের বাড়ী বলে? মা তো তো স্যাপেরন রয়েছেন উপস্থিত। আইভি তো সম-শ্রেণীয় যুবকদের বাড়ী যায়। প্রকৃত কারণ, ওই "East is East" ইত্যাদি। পূর্ব্ব-পশ্চিমের ব্যবধান।

মায়ের অনুরোধে পরিমল স্নান করতে উঠল। আজ অফিস যেতে হ'বে না। তাই অসময় হ'লেও প্রভাতেই শ্রীমুখ-দর্শনের আশায় পরিমল গিয়েছিল আইভি-কুঞ্জে। এমনি সে যায়। লক্ষবার যায়। বিনা কারণে যায়। কখনো আদর, কখনো অনাদর পায়। আজ মিলেছে হতাদর।

মন যতই বিরস হোক, রূপ-পরিচর্য্যা ভোলে না পরিমল। ওইতো একমাত্র ঐশ্বর্য্য তার। ব্যায়াম সেরে স্নানের ঘরে ঢুকল। সুগন্ধি তেল ও সুগন্ধি সাবান সহযোগে দীর্ঘ স্নান শেষ করে মুখে বিদেশী রূপটানের রং ছড়িয়ে রান্নাঘরে খেতে বসল। মা ভাত ধরে দিলেন।

খাবার আকৃতি দেখে, বলা বাহুল্য, পরিমল প্রীত হ'ল। মন যতই বিরস হোক না কেন, উদরে সরস্ বস্তু গ্রহণে তার অভিরুচি থাকে প্রবল। তাই মায়ের মনোরঞ্জনের প্রচেষ্টা কতকটা সফল হোল।

মা ছেলের পাতে আরো খানিকটা ছানার ডালনা দিয়ে পাশে বসলেন ছেলের মুখের দিকে লক্ষ্য করে আস্তে বললেন, "আজ আবার লক্ষ্মী ঘটকী এসেছিল।"

পরিমলের ভ্রূকুঞ্চিত হ'ল, "ও বেটীকে তুমি আবার বাড়ী ডেকে এনেছ?

"না, না, আমি ডাকবো কেন? নিজেই এসেছিল। খুব ভাল একটা সম্বন্ধ এনেছে। আমার দিন তো ঘনিয়ে এসেছে, তোর বিয়েটা দেখে"—

দপ্ করে পরিমল জ্বলে উঠল, এতক্ষণের সঞ্চিত বিরাগ প্রকাশের ক্ষেত্র পেল, "তুমি মনে করলেই তো বিয়ে আমার হ'বে না। আমি তোমাকে

দেখাবার জন্তে একটা বোঝা ঘাড়ে বইতে পারব না। হাজার বার বলেছি আমি বিয়ে করব না, তাতেও তুমি শোন না। ঘটকীর সঙ্গে কথা চালাচ্ছ ফের ? তোমার পছন্দমত দুগ্ধপোষ্য খুকী বিয়ে করে পরকালের পথ পরিষ্কারের ইচ্ছা আমার নেই।"

এতক্ষণের আশা মায়ের ভূমিসাৎ হয়ে গেল ছেলের রুক্ষ কথায়, ক্রুদ্ধ মুখভাবে। সারা বেলা ধরে সুখাদ্য রন্ধনের কোন সুফল পাওয়া গেল না। ছেলে এধারে থাকে ভাল, কিন্তু রাগ উঠলে জ্ঞান থাকে না। চাষার মত গোঁয়ার স্বভাবটি উত্তরাধিকার পেয়েছে পিতার কাছ থেকে। এক একদিন রাগ হ'লে চণ্ডাল মূর্ত্তি ধারণ করে সে।

তাড়াতাড়ি ছেলের মনোরঞ্জনের উদ্দেশে মা বললেন, "আমার পছন্দমত কেন বিয়ে করবি ? তাতো বলি না আমি। তোর যাকে পছন্দ তাকেই কর।"

"হ্যাঁ, সে আমার গলায় মালা দেবার আশায় হাত বাড়িয়ে বসে আছে, আর কি ! বাবা যখন কিছুই রেখে যেতে পারেন নি, যখন ভিক্ষার ঝুলি হাতে দিয়ে পথে বসিয়ে গেছেন, তখন আইভিকে স্বপ্ন দেখাও আমার পক্ষে পাপ।"

মা হয়তো এর উত্তর দিতে পারতেন, কিন্তু সন্তানের মনোগত ইচ্ছা ও একমাত্র কামনাকে বিদ্রূপ করে কোন কথা বলতে তাঁর মায়ের প্রাণ সায় দিল না। শুধু ক্ষীণস্বরে সান্ত্বনা দিলেন, "বাধা তো ছিল না। একজাত।"

পরিমল উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল "কে বলে একজাত ? সে, আমি একেবারে আলাদা জাত। সে হচ্ছে বড়লোক আমি গরীব। পৃথিবীতে আর জাত আছে নাকি ?"

মা চুপ করে রইলেন। হঠাৎ পরিমল উঠে দাঁড়াল, ডিমের বাটীটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল, "আর খাব না। যথেষ্ট হয়েছে, এত অশান্তির চেয়ে হোটেলে খাওয়া ভালো।"

ডিমের ঝোল উছলে মায়ের পায়ে পড়ল। অশুচিস্পর্শের ঘৃণা ভুলে ছেলের হাত চেপে ধরলেন তিনি, "আমার মাথা খাস, খোকন, মুখের ভাত ফেলে উঠিস না। আর কখনো তোকে বিয়ের কথা বলবো না, বাবা।" বুড়ী-ঝি খন্ খন্ করে উঠল, "ছিঃ, বাবা লক্ষী, মায়ের ওপর রাগ করে

না। বুড়ী মা রাজ্যির রান্না তোমার নেগে রেঁধেছে। মায়ের মনে দুঃখ দিলে ভগমান গোঁসা করেন।"

পাশের বাড়ীর জানলা খুলে গেল, অপ্রতিভ পরিমল আবার আসনে বসে পড়ল। বিরক্তভাবে ডিমের কালিয়া পাতে ঢেলে নিয়ে বলল, "বিয়ের কথা ছাড়া কিছু তোমার বলবার থাকলে বল। নইলে চুপ করে থাক।"

মা মরমে মরে গিয়েছিলেন। ছেলের দয়া উদ্রেকের আশায় যে কথা কখন বলেন না তাই বললেন, "আমার শরীরের কথা বলব ভাবছি তোকে। অম্বলটা বড় বেড়েছে। কবরেজ ডেকে একটা ওষুধ খাওয়া দরকার।

অন্যমনস্কভাবে পরিমল বলল, "হুঁ, তা ডেকো কবরেজ। পাড়াইতেই তো আছেন।"

ছেলের ব্যবস্থার পারিপাট্য দেখে মা চুপ করে রইলেন। পাড়ায় কবিরাজ আছেন বটে, তবে অন্তঃপুরিকা তাঁর কাছে যাবে কেমন করে? ভাবলেন, হজমী বড়ি একশিশি তৈরী করে নেবেন। তাতেই হ'বে, টাকাও বাঁচবে।

ছেলের মন অন্যদিকে টানবার আশায় মা বল্লেন, "জানিস খোকন, আমাদের পেছনের রাস্তায় ওপাশের বড বাড়ীতে লোক এসেছে কয়েকদিন হ'ল।"

পরিমলের সে কথায় কোন আগ্রহ না থাকায় সে মুখ নীচু করে খেতে লাগল। কোন মনোযোগের চিহ্ন দেখাল না। মা বললেন। "সেই যে এলাহাবাদে প্রসন্ন রায় থাকতেন, খুব বড় এটর্নী, আমাদের বাড়ীর পাশে তো তাঁর বাড়ী ছিল—তিনিই এসেছেন এই বাড়ী কিনে। আজ সকালে—

সমস্ত শ্রবণ-মন আচ্ছন্ন করে আবার বেজে উঠল সেই সকরুণ মোহময় মল্লার রাগিনী। সেই বৈদেহী রায়?

পরিমল মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, "ওই যে যাঁর মেয়ে খুবই ভাল গান গায়? তিনি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনি। মেয়েটা বেশ। আজ সকালে এধার দিয়ে যাচ্ছিল পার্কে বেড়াতে। আমি তখন ভোর বেলায় দোরগোড়ায় জলের ছিটে দিচ্ছিলাম। আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে কথা কইলে। বললে, 'আজ, আর ঢুকব

না। আর একদিন শিগ্‌গির এসে আপনার সংসার দেখে যাব।' তোর কথা জিজ্ঞাসা করল।"

পরিমল বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, "কি? আমার কথা কি জিজ্ঞেস করল?"

"এই তুই এখন কি করিস, এই সব।"

পরিমল বলল, "হুঁ"। তারপরে মা ও ছেলেতে রায়পিতাপুত্রী সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হ'ল। অবশেষে পরিমল উঠে মুখ-হাত ধুয়ে কি জানি কি ভেবে আয়নায় নিজের চমৎকার চেহারাটা দেখল একবার। মা পুনরায় স্নান করতে গেলেন। ছেলের রাগের প্রায়শ্চিত্ত!

যেদিন পরিমল বাড়ী থাকে সেদিন সে পান খায় প্রাণভরে। আজও মিঠে পানের ডিবে প্রস্তুত ছিল। জরদা-সহযোগে তাম্বুল ভক্ষণ করতে করতে সে চিন্তা করল, দিবানিদ্রা আবশ্যক। বিক্ষিপ্ত মনকে সংযত করবার শ্রেষ্ঠ উপায় নিদ্রা। অবশ্য, যদি নিদ্রা নির্দয় না হ'ন। আজ ভর-পেটে নিদ্রা-কর্ষণ বিচিত্র নয়। দোর জানালা বন্ধ করে পাখা পূর্ণগতিতে চালিয়ে পরিমল শয্যাশ্রয় করল।

উপাধানে মুখ রেখে ভাবতে লাগল সে। বিবাহ সে করতে চায় না জানিয়ে মায়ের কাছে মিথ্যা বলেছে। চায় সে, প্রতিমুহূর্ত্তে চায়। নিঃসঙ্গ জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে। কাজের জোয়ালে বাঁধাদিনে তার অবসর কোন সুমধুর সমাপ্তিতে নয়। প্রাণ চায় তখন নারীর বাহুডোর। সামান্য চাকুরী করে সে, বিদ্যায় অসামান্য নয়, গরীব ঘরের ছেলে। তার উপযুক্ত পাত্রী সুলভ বাংলাদেশে। বাড়ীতে আসবে সাধারণ একটি মেয়ে, সর্ব্বাংশে উপযুক্ত তার। রান্না করবে, ঘর গুছোবে, প্রয়োজন হ'লে বাসন মাজতেও হ'তে পাবে। পতিপরায়ণা সতী স্বামীর সেবায় তৎপর থাকবে। নিশ্চিন্ত আরামে দশজনের মত কেটে যাবে দিন তার।

এইতো ছিল ভবিতব্য। ইন্‌সিওরেন্সের দালাল পরিমল লাহিড়ীর অনিবার্য্য পরিণতি ছিল এই। তবে কেন বিধাতা উপহাস করলেন তার সঙ্গে! এমন রূপ কেন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আশ্রয় নিল তার? শুধু একমাত্র সেজন্য স্বতন্ত্র হ'ল সে। রাস্তা দিয়ে গেলে সবাই তাকিয়ে দেখে। মেয়েরা অবোধ পতঙ্গের মত রূপবহ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করতে উদগ্রীব হয়ে থাকে।

পোষাক-পরিচ্ছদ চাই রূপেরই উপযুক্ত। ধরণ-ধারণ, ব্যবহার অসামান্য আশা করে সকলে। মুখ খোলামাত্র প্রত্যাশা করে এমন কোন কথা বলবে সে, যা চেহারারি সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে। সাধারণের প্রত্যাশা বজায় রেখে, দৈহিক আকৃতির উপযুক্ত ব্যবহার দেখাতে কত কৃচ্ছ সাধন করতে হয়, পরিমল একা জানে। ছিটকে পড়েছে সে এমন সমাজে, এমন পরিবেশে, যা ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ দেখেনি। রূপই মূল তার অশান্তির, তার যন্ত্রনার, নইলে, কেন আকাশ-কুসুমে লোভ হবে? গরীবের ছেলের এ ঘোড়ারোগের জন্য দায়ী সৃষ্টিকর্ত্তা নিজে।

মুখ গুঁজে ভাবতে লাগল পরিমল। নার্সিসাসের মত নিজের রূপ-বিহ্বল ছিল দিনগুলি। যখনি অনুভব করল সে সাধারণ নয়, জন্মলগ্নক্ষণে অসামান্যের অধিকার নিয়ে জন্মেছে সে, তখনি মন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল আত্মোপলব্ধির গৌরবে। সংসারের পথে চলেছিল মোহমত্ত নার্সিসাসের মত। কি চমৎকার সে দিনগুলো! আকাশে-বাতাসে তারি জয়সঙ্গীত। চারিপাশে পুরাঙ্গনার স্তুতি তারই জয়গান। পথের দু'পাশে ভগ্নহৃদয় ছড়িয়ে বিজয়ী পরিমল লাহিড়ীর জয়যাত্রা চলেছিল। অধরা কোনদিন ধরা পড়বেনা, এটাই জানা ছিল। রূপের উপযোগী বাহ্য শিক্ষা-সংস্কার অর্জ্জন করেছিল সে, উচ্চ সমাজে অবাধ মেলামেশার অধিকার পেয়েছিল। ভেবে-ছিল এমনি দিন কেটে যাবে। কামনার গহন অরণ্যে যে দুর্লভ রক্তপুষ্প বিকশিত হয়, তার অঙ্গে অনেক কাঁটা থাকে। সুতরাং, আরাম-লোভী, আয়েসীর ও পথ বর্জ্জনীয়। হৃদয় দেবার ব্যথা-বেদনা ভোগ করতে হবে না তাকে।

রুদ্ধ ঘরে পাথার বাতাসে রজনীগন্ধার গন্ধ। এনেছিল কিনে দু'দিন আগে। উপযোগী পরিবেশটি প্রেমের, কিন্তু কোথায় প্রেমিকা? শূন্যশয্যা, শূন্য হৃদয় পথ চেয়ে বিভাবরীর বৃথাই কাটায়। দিবাস্বপ্ন খুঁজে মরে তাকে; কিন্তু, হায়, কোথায় সে দুর্লভা?

লতাগুল্মে ঢাকা জীবনের পথ। বাকে বাঁকে কি অপেক্ষা করে আছে বোঝা যায় না। চলেছিল রূপাভিমানী নার্সিসাস। সহসা দেখিল নিজের প্রতিচ্ছায়া, স্বচ্ছ তড়াগসলিল ফেরৎ পাঠিয়ে দিল তারই মুখ—সেই অতুলনীয়ের তুলনা। অপূর্ব্ব ছায়ার পশ্চাৎধাবন করে পাগল ফিরছে

এখনও। আয়াস-আরাম ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। নির্লিপ্ত উদাসীন মন মোহগ্রস্ত। এই ভালবাসা! সহজ সাধারণ দিনযাপন অসাধারণ হয়ে উঠল। গর্ব্ব ধুলায় অবলুণ্ঠিত হ'ল। জীবন-মরণ অর্থহীন অথবা অর্থপূর্ণ হয়ে উঠল ব্যক্তিতার সরাগ বা বিরাগ ব্যবহারে।

বেশ ছিল সে, ছিল পরিমল লাহিড়ী। মায়ের আদর-দত্ত আহার্য্যপুষ্ট কমনীয় দেহ, শত সুন্দরীর ঈপ্সিত সে কান্তি, অপরাজিত মানস নিয়ে। কেন এমন হ'ল তার? মধ্যযৌবনে দেখা পেল একজনের, যে তাকে পরাস্ত করল, কিন্তু ধরা দিল না। সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবনে এ অভিজ্ঞতা কেন? সুখ না পেলেও স্বস্তি পেত সে। জীবনে তারই মত অন্যান্য গরীবের মত অল্প আয়োজনে তৃপ্ত দিন অনায়াসে কেটে যেত তার। প্রলয়ের আবর্ত্তে প্রেম কেন জীবনে এল?

নার্সিসাসের পরিণাম নিশ্চয় তার ভাগ্যে আবার লিখেছেন বিধাতা। নিজের ছায়ার ব্যর্থ অনুসন্ধানে বিফলতা। উপসংহারে পরিমল লাহিড়ীর ভাগ্যে 'পরিণাম নিরাশা'। জোড়া জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা। এ ওর হৃদয়ের সন্ধান পেলেও জানে কি উপসংহার জীবনের? ইচ্ছামত কি তারা পারে জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে? পুতুল-নাচের দড়ির টানে যে মানুষ ওঠা-নামা চলা-ফেরা করে তারা তো সেই মানুষ মাত্র। অমরত্বের অধিকার হৃদয়ে ধারণ করেও তারা পারেনি তিলমাত্র ভাগ্যের চক্র ফেরাতে। কলুর চোখবাঁধা বলদের মত জীবন-চক্রে গাথা চলছে তারা একই আবর্ত্তনে। কিন্তু, তারা ভাগ্য-নিয়ন্তা নয়। ঘানির শেষে পুরস্কার কি তিরস্কার বরাদ্দ, জানে না তারা। বিধাতা অলস মুহূর্ত্তে সৃজন গড়েছেন—সৃজনকে চালাবার উদ্দেশে চালাচ্ছেন অন্ধ নরনারীকে নিজের ইচ্ছামত। বিধাতা তো সবচেয়ে বড় 'autocrat', তাঁকে কই সিংহাসনচ্যুত করতে আসছে না কেউ? দৈবের সঙ্গে সংগ্রাম কি না!

পরিমল বালিস থেকে মুখ তুলে ঘড়ির দিকে তাকাল—বেলা তিনটে। একটু পরেই মা চা তৈরী করে দেবেন। আজ যাওয়া যায় কোথায়? সকালে তো আইভির বাড়ী হয়েছে। একদিনে দু'বার যাওয়া চলেনা, তা সে প্রেম যতই দুর্ব্বার হ'ক না কেন। এখন বেরোতে দেরী আছে, আকাশ-ভরা রোদ না পড়লে যাওয়া চলবেনা। ভেবেছিল সে নিত্য নিয়মিত

ছুটীর দিনের প্রথায় একটু ঘুমিয়ে নেবে। পুরুষেরও তো Beauty sleep প্রয়োজন হয়। আজ সকালের উত্তেজনার শাস্তি বহন ক'রে দিন কাটাল সে। ঘুম আর এল না।

ঘুম আর এল না। আহা, যদি এখন আইভি থাকত এখানে? পরিমলের রক্তে আগুণ ধরে গেল। আইভি যদি থাকত ওই চেয়ারটাতে বসে, কাঁধ পর্য্যন্ত কাটা চুল পাখার বাতাসে আন্দোলিত হ'ত বাতাসে শস্তকাণ্ডের মত। যে তীব্র ভায়েলেটের সুবাস আইভিকে ঘিরে থাকে, সে সুবাস ঘরের বাতাসে মূর্চ্ছিত হয়ে থাকত। লালচটীপরা পদ্মের সমান দু'খানি রক্তাভ পদপল্লব সঙ্গীতের তালে তালে ধরণী স্পর্শ করে থাকত। দুই চোখে সে মাধুরী দেখে কুলিয়ে ওঠা যেত না। নাঃ, অতদূরে কেন? এইখানে, এইখানে। এই বিছানায় ব্যাকুল বাহুবন্ধনে চাই তাকে। বিজয়ীর সযত্নে বক্ষিত মন তারই আশায়। এই রূপ-যৌবন তারি জন্য। সে তুলে নিলেই ধন্য হ'বে।

বিগত চুম্বনস্মৃতি, বিগত আনন্দ মনে পড়ে দেহমন অবশ হয়ে এল। পরিমলের অধরের নীচে নরম সেই মনসিজগঞ্জন অধরোষ্ঠ। দেহ যেন নবনী, আলিঙ্গনে যখন ধরা দেয়, মনে হয় জগতে এত নরম, এত কমনীয় বস্তু নেই কিছু। অনাস্বাদিত নয় এ রস পরিমলের, তবু আইভি যেন নূতন অর্থ দিয়েছে দৈহিক সংযোগের। পূর্ব্বকৃত অভিজ্ঞতা নিমেষে মলিন হয়ে গেছে এ অভিজ্ঞতার কাছে। বাড়ীতে একজন বৈষ্ণবী ভিক্ষা করতে আসত পদাবলী গেয়ে। বৈষ্ণবীর মুখে শোনা পংক্তি মনে পড়ে গেল :—শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নারী আছেন, কিন্তু "কোই নই রাইকো সমানা।" শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র গোপিনী ছিল, যদিও শ্রেষ্ঠা রাধা। কিন্তু, আইভিকে দেখবার পরে পরিমলের জীবনে দ্বিতীয়া নারীর স্থান হয়নি।

পরিমল পাশবালিশে মুখ লুকিয়ে কামনা-ক্লিন্ন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। উপায় নেই। সেই অপরূপ চুম্বন, সেই উন্মাদনাময় আলিঙ্গন পাওয়া যাবে না। প্রত্যহ সুযোগ হয় না—আইভিও মেজাজে থাকে না। যেদিন থাকে সে, উজাড় করে নিজেকে ছেড়ে দেয় পরিমলের হাতে। কিন্তু, অতি ক্ষণস্থায়ী সে আত্মসমর্পণ। চরম মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে আত্মসংবরণ, বন্ধনবিহীন সম্পর্ক। তবু, সে নিমেষগুলি কালের কাল যবনিকায় উজ্জ্বল সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে আছে।

আইভি! আইভি! না, একটা কিছু করা প্রয়োজন সাময়িক উত্তেজনার নিবৃত্তির নিমিত্ত। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পরিমল। এখনি আইভির স্মৃতি-কণ্টক-পীড়িত গৃহ ত্যাগ করে চলে যাবে সে যেদিকে হ'ক। ভোলা চাই, নইলে পাগল হয়ে যাবে পরিমল। ভোলা চাই। যেমন করেই হ'ক। অন্য নারীর সাহচর্যে ভোলা চাই।

সহসা আকাশ অন্ধকার করে মেঘ নেমে এল। ভাদ্রের খররৌদ্র তিরস্কৃতা কিশোরীর নয়নের সজলতা ধারণ করল। বৃষ্টি আসেনি, কিন্তু বাতাসে আভাস বৃষ্টিবিন্দুর। সহসা কাণের কাছে করুণ মল্লার রাগিণী ভেসে এল :—

"গানগুলি মোর কাঙালের মত তোমার দুয়ার পাশে
বার বার যায় বৃথা অভিসারে, বেদনায় ফিরে আসে।
রবে কি তাহারা সীমাহীন পথ-পান্থ,
নীড়হারা পাখী, ঝঞ্ঝা-বিবশ ক্লান্ত ?
ঊর্দ্ধে আঁধারে ঘন-গরজন, নিঠুরা চপলা হাসে।
নৃত্যছন্দে রিমিঝিমি ঝরে ধারা,
গানগুলি চির-অগীত কি রবে তারা ?
হায়, মিলন-পিয়াসী বিরহবাদলে
আঁখিধারে শুধু ভাসে।"

গান ছাপানো হয়েছিল অনুষ্ঠান-পত্রে। গায়িকার বিশুদ্ধ উচ্চারণে কথাগুলো মনে আছে। চেতনা আচ্ছন্ন করে আজও বাজছে মোহময় শ্রাবণ রজনীর মল্লার গান ? আশ্চর্য্য।

এইতো গানের সুর পথ দেখাল। নয় কেন ? রাস্তা পার হ'লেই গায়িকার বাড়ী। তাদের পাড়ায় এসেছেন প্রসন্নবাবু। এলাহাবাদে বিদেশে যথেষ্ট উপকার করেছিলেন তাদের। পরিমলের খবর নেওয়া উচিত।

ওই কুশ্রী বৈদেহীর সাহচর্য্য! মন বিরূপ হয়ে উঠতে গান বেজে উঠল আবার :

"গানগুলি চির অগীত রবে কি তারা ?"

ঐ সঙ্গীত, অপার্থিব সঙ্গীত আছে সেখানে, তার কণ্ঠে। এখন যে মন

ব্যবহারিক জগতের উর্দ্ধে কামনা-ভরে আকুল হয়ে উঠেছে, অধরাকে প্রার্থনা করে ব্যর্থ যাচনায় বারে বারে লুন্ঠিত হয়ে পড়ছে ধূলায়, সে মন হয়তো সাময়িক তৃপ্তি পাবে গানের আবেদনে। হয়তো সঙ্গীত তাকে পথ দেখাবে ব্যর্থ কামনার তৃপ্তি কোথায়।

তিন

বৈদেহী তার তেতালা ঘরের একটা জানালা খুলে পরিমলকে দেখছিল। পরিমল তাদের বাড়ী তার বাবার সঙ্গে পুরোণো আলাপটা ঝালিয়ে নিতে এসেছে। সুন্দর চেহারা বটে, পুরুষোচিত সৌন্দর্য্যের সঙ্গে একটা সুকোমল লাবণ্য পরিমলের দেহকে আশ্রয় করে আছে। প্রশস্ত, প্রশান্ত, রেখাহীন ললাট থেকে দীর্ঘ কালো চুল উপরে তুলে আঁচড়ানো। ভ্রূ বোধ হয় একটু বেশী ঘন কিন্তু সেটা তার দোষ না হয়ে গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতি গৌর-বর্ণের ওপর ওই ভ্রূ আর মেয়েদের মত ঘন কালো পক্ষ্ম দেওয়া চোখ বড় মানিয়েছিল। পরিমলের নাকটা গ্রীক, রোমান আর আমাদের কবি বর্ণিত "খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল" এই তিনের মত না হলেও মনোহর। ওর অধরোষ্ঠ, মনে হয় যেন শতদলের দুটো পাঁপড়ি।

পরিমলের উন্নত, সৌম্য দেহের দিকে চেয়ে চেয়ে বৈদেহীর কেবল আজ বেশী করে নিজের রূপহীনতার কথা মনে পড়ছিল। আমরা মুখে বলি "রূপেতে কি করে বাপু, গুণ যদি থাকে?"

কিন্তু কবি পর্য্যন্ত বলেন—

"চোখের দাবী মিটলে পরে তখন খোঁজে মন,
তাইতো প্রভু! সবার আগে রূপের আকিঞ্চন।"

বৈদেহী দেখছে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মুখে এত রূপের বিকাশ হয়! কখন হাসিতে উজ্জ্বল, কখন বিনয়ে নম্র, কখনও বা ভাবমাধুর্য্যে পূর্ণ! পরিমলের কোন কথা তার কাণে এলনা কিন্তু পরিমলের অধরোষ্ঠের মোহন ভঙ্গিমায়, মুখের প্রত্যেকটী পরিবর্ত্তনে বৈদেহী পরিমলের কথার ধরণ বুঝতে লাগল। বৈদেহীর বাবা পরিমলের পিঠ চাপড়ে কি যেন বল্লেন তাতে পরিমলের মুখ নবীন শোভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে যে কৃতজ্ঞ হয়ে কিছু

বলছে তা তার মুখের উজ্জ্বল রেখায়, অধরের সহাস্য ভঙ্গীতে, চোখের কমনীয়তায় দেখা যাচ্ছে। কি সুন্দর! বৈদেহী রোজ মানুষ দেখে, কিন্তু মানুষের মনের প্রকাশ বোধহয় কারো মুখে লক্ষ্য করে না। আজ বৈদেহী মুগ্ধ হ'ল। গানের জলসার দিনে যে এই মুখেই ব্যঙ্গচ্ছায়া দেখে সে মর্ম্মাহত হয়েছিল, মনেও রইল না তার। চোখ সেদিন ভুল দেখেছিল, ভেবে নিল বৈদেহী।

চাকর এসে জানাল বাবু দিদিমণিকে ডাকছেন, সুন্দরপানা একটি বাবুর সঙ্গে কথা কইছে। বৈদেহীর বুকের ভিতর দোলা লাগল। পরিমলের সামনে দাঁড়িয়ে সে কি কথা কইবে। তার রূপহীন দেহটা রূপের রাজার কাছে কেমন করে বার করবে? বৈদেহী কলেজে পড়ত। তার আজ নতুন করে সুন্দর। সহপাঠিনীদের কথা মনে পড়তে লাগল। আঃ, যদি সে রেণুর মত দেখতে হত। অমনি পুষ্পমঞ্জরীর মত দীর্ঘ, সুঠাম দেহ, অনুপম মুখশ্রী নিয়ে দাঁড়ালে হয়ত তার বাবার টাকা আর তার নিজের কণ্ঠের সুর-লহরীর সঙ্গে পরিমল তাকে পছন্দ করত।

বৈদেহী নিজের মনে ভাবল, "কি যে ভাবছি। অন্য লোকের পছন্দ দিয়ে আমার কি হবে? তবে ভদ্রলোকের সামনে যাব, একটু পরিস্কার হ'তে হবে।

বৈদেহী চুল খুলে নীচু করে সমস্ত কপাল ঢেকে এলোখোঁপা বাঁধল। কানে দিল লম্বা কর্ণভূষণ। কাঁপা হাতে ঝাজড়ামুখদেওয়া কাঁচের পাউডারের শিশি থেকে পাউডার বের করতে যেয়ে দিল ফেলে। কালো আবলুস কাঠের ড্রেসিং টেবিলের ওপর রূপোর গুঁড়োর মত পাউডার ছড়িয়ে পড়ল।

প্রসাধনপর্ব শেষ করে সবুজ ধানের চটি পরে বৈদেহী বসবার ঘরে গেল।

-পরিমল বাঁকা কটাক্ষে বৈদেহীর দিকে চেয়ে দেখল। তুমি করেছ কি বৈদেহী? প্রসাধন যে তোমার দেহকে শোভা দিতে পারে-নি, লজ্জাই দিয়েছে। যার কাছে শোভন হ'তে এসেছ, তার পুষ্পডালিতে তোমার মত অপরাজিতার স্থান কোথায়?

পরিমলের নমস্কারের প্রতিদান দিয়ে বিব্রত বৈদেহী একখানা চেয়ারে বসে পড়ল। বসবার সময়ে আঁচল লেগে পাশের টিপাই থেকে ফুলের তোড়া

পড়ল মেজের। একটা গোলাপ ছিট্‌কে পরিমলের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। বৈদেহী অজানিতে বুঝি পরিমলের পায়ে অঞ্জলি দিল'।

পরিমল সাহসী, নারীর মন সে ভোলাতে জানে। সে কথার ব্যবসাদার, কেমন ব্যবহার চিত্তহারী হয় তা তার জানা আছে। সে নত হয়ে তোড়াটা তুলল, ফুলটা তুলল, আঘ্রাণ করে তোড়াটা বৈদেহীর হাতে দিয়ে বলল, 'মিস্ রায়, ফুলটা কিন্তু আপনি এসে আমার পায়ে পড়েছে, এটা আমার পাওনা।'

প্রসন্নবাবু প্রসন্ন দৃষ্টিতে পরিমলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই তো বৈদেহী, ও তো তোমাকে চেনে, বসে ওর সঙ্গে কথা বল বাবা, আমি আসছি। নীচে বিস্তর লোক অপেক্ষা করছেন। এক্ষুনি আসব।"

পরিমল ভাবল, আর একটি মেয়ে! যদিও সে অতি কুরূপা তবুও সে তো মেয়েদেরই জাত; তাকে নিয়ে একটু সময় কাটাতে দোষ কি? সকালের ব্যর্থতা, দ্বিপ্রহরের উত্তেজনা এদিকেই ইঙ্গিত পাঠায়। একজনকে ভুলতে যে চাই অন্য; হ'কনা কেন কুরূপা সে। নাই বা মনোহারিণী সে হ'ল। ভুলিয়ে শুধু রাখুক সে আমায়। দোষ কি?

পরিমল একটুখানি চুপ করে থেকে আবার বললে, 'মিস্ রায়, এলাহাবাদে আলাপ বেশী জমতে পারে-নি এবার কলকাতায় সেটা করা যাবে। কাছাকাছিই তো বাড়ী।"

বৈদেহী কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে পরিমলের দিকে চেয়ে ভাবল সুন্দর লোকের সবি সুন্দর! কি চিরপরিচিতের মত কথা বলবার সহজ ভঙ্গী? আর সে নিজে একটা কথাও বলতে পারছে না। প্রাণপণ চেষ্টা করে বৈদেহী বল্লে, "আপনার মা ভালো আছেন?"

"হ্যাঁ, তিনি আপনার সঙ্গে শীগ্‌গীর দেখা করতে আসবেন।"

বৈদেহী ত্রস্ত হয়ে বলে উঠল—"হ্যাঁ—না—কিন্তু আমারই আগে যাওয়া উচিত।"

পরিমল চকিত দৃষ্টিতে তারদিকে একবার চেয়ে বললে, "ওঃ! আচ্ছা!"

পরিমল অন্যমনস্কভাবে গোলাপটা ছিঁড়ছে, সূক্ষ্মাগ্র অঙ্গুলীর ত্রিকোণাকার নখর হীরের মত চক্‌চক্ করছিল। বৈদেহী পরিমলের সুদৃশ্য আঙুলগুলো দেখল, আঙুলের ওপর গোমেধ-বসানো আংটিটা লক্ষ্য করল। পায়ের ভেলভেটের গ্রীসিয়ান্ স্লিপার, গায়ের মুগার পাঞ্জাবী আর ধুতির চিকন

কালো পাড় কিছুই বৈদেহীর চোখ এড়াল না। পাঞ্জাবীর নীচের পকেটে যে পরিমল সোনার ক্লীপ্ লাগানো নীলরঙের একটা 'লেডিস্ জুনিয়র' পার্কার আটকে রেখেছে সেটা পর্য্যন্ত বৈদেহীর অজ্ঞাত রইল না।

আর পরিমল কটাক্ষে চেয়ে দেখল বৈদেহীর মত কুশ্রী দেখা যায় না। চোখ তার সাধারণ, ভ্রূরেখা নেই বল্লেই হয়। গড়ের মাঠের মত কপালখানা ঢেকে স্বল্প কয়েকগাছা চুল নাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, বাকী চুল-গুলো দিয়ে পেছনে বড়ির মত ছোট খোপা করা। নাক তার সুউচ্চ গণ্ড-দেশের মধ্যে অবস্থিত হয়ে যেন আরো ছোট দেখাচ্ছে, কালো কালো পুরু অধরোষ্ঠ অত্যুচ্চ দন্তশ্রেণীকে ভাল করে আবৃত করবার বৃথা প্রয়াস করছে। সংক্ষিপ্ত চিবুক মুখকে একটুও রূপ দিতে পারে-নি, আর রং তো অমাবস্যার আকাশে কালী ঢাললে যা হয়। পরিমল ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবল, মানুষ এত কুচ্ছিৎ হয়!

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে পরিমল অনুনয়ের সুরে ডাকল, "মিস রায়!"

বৈদেহী আগ্রহের সঙ্গে তাকাল। পূর্ব্বের মতই মিনতিপূর্ণ স্বরে পরিমল বলল, "আপনার গলার সুর আজো ভুলতে পারি-নি। এলাহাবাদে সেবার যা শুনেছিলাম এবার এখানে এসে তার শতগুণ ভালো গলা শুনলাম। সেদিন ইনস্টিটিউটে তো আপনি আর গান গাইলেন না। এখন যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয়—যদি আমার চাওয়াটা অসঙ্গত না হয়—তবে একটা গান শোনান।"

বৈদেহীর মন আনন্দের সপ্তম-স্বর্গে যেয়ে উঠল। পরিমল তার গলার সুর ভুলতে পারে নি! পরিমল তার গানের কথা ভাবে! পরিমল তার গান শুনতে চাইছে! বৈদেহী পুলকিত কণ্ঠে বলল, "আমি আর কিই বা গান করি।"

'হ্যাঁ, ফুল জানেনা তার কতটা গন্ধ আছে।"

বৈদেহীর মন উল্লাসে চমকে উঠল। পরিমল তাকে কেন ফুলের সঙ্গে তুলনা করে? চুপি চুপি চেয়ে দেখল পরিমল তারি দিকে তাকিয়ে আছে। এ সুখচিন্তাকে এখনকার মত চাপা দিয়ে উঠল সে গান গাইতে। পিয়ানোর সামনে বসে একটু ভেবে বৈদেহী গান ধরল—

"কাজল চোখে চাইলে চোখে,
মন ভোলালে, অপরাজিতা,
স্নিগ্ধ-মধুর অধর তোমার
অমনি আমায় বলল 'মিতা।'
আমি চাইনি, জানি চাইনি
গন্ধ রঙের গরবিনী,
চাদের আলোয় মাতাল হিয়া
চিনল তোমায়, অনিন্দিতা।
কে জানে কোন ভাগ্যদোষে ভাঙল স্বপন, চমকে দেখি,
বাহুর বাঁধন শিথিল করে পালিয়ে তুমি গেছ, একী!
রাখছে ঘিরে আজকে আমায়
চম্পা-গোলাপ-কমল-বেলায়,
এখন তুমি ব্যথার স্মৃতি,
কল্পলোকে প্রতিষ্ঠিতা।"

বৈদেহী প্রাণ দিয়ে গাইছিল। এমন গান কখন বৈদেহী গায়-নি, পরিমলও শোনে-নি। দুঃখের সুরে দরদ দিয়ে গাওয়া দুঃখের গান এমন আর সে কারো মুখে শোনে-নি। এমন কণ্ঠে মধুর দ্রবতার আভাষ, সঙ্গীতে রোমাঞ্চ কারো গানে ফুটে ওঠে-নি। প্রত্যেকটি শব্দ উচ্চারণের কি উদার ভঙ্গী! গানের ভিন্ন ভিন্ন ভাব এই মেয়েটির গলায় যেমন সহজলীলার সঙ্গে বিকশিত হ'ল এমন বিকাশ আর কারও কণ্ঠে হয় নি।

পরিমল চঞ্চল হয়ে বৈদেহীর মুখে তাকাল। একি! এ মুখে তো ভাববৈচিত্র্য নেই! পাথরের মত ভাবহীন, স্তব্ধ মুখ আনত করে বৈদেহী গান গাইছে। পরিমল আশ্চর্য্য হ'ল, তার মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। একি, তবে কি বৈদেহী যন্ত্রের মত অনুভব না করে গান গেয়ে যাচ্ছে! কিন্তু এই গানের প্রত্যেকটি টানে, প্রত্যেকটি কথা উচ্চারণের সুকুমার ভঙ্গীতে গায়িকার কি অখণ্ড হৃদয়ের সম্পূর্ণ ভাব-লহরী একান্তভাবে ফুটে উঠছে।

গান শেষ হ'ল। বৈদেহীর মুখে পাথরের ভাব কেটে যেয়ে সজীবতা প্রকাশ পেল, চেয়ার থেকে হাসিমুখে সে পরিমলের দিকে ফিরল।

পরিমল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, "এমন গান কারো মুখে শুনিনি বললে কি বিশ্বাস করবেন? কবি হয়ে জন্মাইনি, তাহলে প্রশংসার ভাষা হারিয়ে ফেলতাম না।"

বৈদেহী কৃতার্থ হাসি হাসল।

পরিমল প্রশ্ন করল, "কিন্তু গানটার কথার মধ্যে সনেটের মত পরস্পর বিরোধী দুটো ভাব দেখলাম। এ ধরণের গান কোথায় শিখলেন?"

বৈদেহী হাসিমুখে উত্তর দিল, "আমাকে যিনি গান শিখিয়েছেন তিনি বলেন ভিন্ন ভিন্ন ভাব গানে থাকলে তবে গানের যথার্থ বিকাশ হয়। এক ভাবের গানগুলো সোজা। তিনিই আমাকে এটা শিখিয়েছেন।"

পরিমল বললে, "এমন ছাত্রী পেলে অনেক শিক্ষকেরই প্রতিভার বিকাশ হয়।' বৈদেহী পরিমলের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল, কোন প্রতিবাদ করল না।

পরিমল তিনটের সময় এসেছিল। সাতটার সময় প্রসন্ন বাবু ও বৈদেহীর সঙ্গে গল্পগুজব করে প্রচুর জলযোগের পরে বের হয়ে যেতে যেতে ভাবল "দিনকতক মেয়েটাকে নিয়ে বেশ মজা করা যাবে।"

হ্যাঁ, এখনও পরিমল লাহিড়ীর মনে-মুখে এমন অমার্জিত ভাব আসে। নিজের বহিপালিশ, উচ্চ সমাজের অন্তরঙ্গতা, আইডিয়ল প্রেম তার জন্মগত দৈন্যকে আবরিত করতে সক্ষম হয়-নি। চরিত্রগত নিষ্ঠুরতা যুক্ত হয়েছে! নার্সিসাস একাকে তো চিরকাল প্রত্যাখ্যান করে এসেছিল। প্রতিচ্ছায়ার প্রতি প্রেম তো অন্য নারীকে ভালবাসতে শেখায় না। যে সংস্কৃতি থাকলে নারীমাত্রকে সম্মান করা যায়, সে সংস্কৃতি পরিমল লাহিড়ীর নেই। নিজের জগতে বেশ ছিল একা, কেন নার্সিসাসের সঙ্গে দেখা হ'ল? সুমধুর প্রতিধ্বনির স্বর-লহরী বনের শাখায় শাখায়, ফুলে ফুলে ছড়িয়ে পড়ত। সঙ্গীতময়ী ছিল নিজের মনে। সে সঙ্গীতময়ী নিজেকে ভুলে গেল নিষ্ঠুরের অন্বেষণে। কণ্ঠ হ'ল নির্বাক, চরণ মুখর। হায় একো!

আর বৈদেহী অনুভব করল পরিমলের কথা ভাবতেও তার ভালো লাগে।

চার

"খোকন" মার ডাকে পরিমল উঠে বসল। মা বল্লেন, "অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিস এখন ওঠ, তোর না আজ কোথায় ইনগেজমেণ্টো আছে"—ছেলের কল্যাণে মা কথাটার মানে শিখেছিলেন কিন্তু উচ্চারণ শেখেন নি এখনও।

পরিমল উঠে বসল। যৌবনোদীপ্ত মুখের উপর বিষাদের স্তিমিত ছায়া ক্ষণেকের জন্য পড়ে মুখ যেন একটু কোমল হয়ে গেল। আবার আইভির বিদ্রূপ, সংযমের কঠোর সাধনা।

মা বল্লেন, "আইভিদের বাড়ী যাবি তো।"

আইভি। আইভি! নামটা যেন পরিমলের মনে মন্ত্রের কাজ করে। পরিমল আলস্য-জড়তা ফেলে উঠে বসল। শ্রান্ত সূর্য্য পশ্চিম গগনে ঢলে পড়েছে। পরিমল আজও ছুটীর দিন বলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আজ আইভি তাকে সিনেমা যাবার নিমন্ত্রণ দিয়েছে।

আয়নায় চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে পরিমল শ্রান্তির নিশ্বাস ফেলল। শীতের বেলা, ঘুমিয়ে পড়ে বড় শরীর খারাপ লাগছে। দিগন্তশেষ আজ তার মনকে মায়াপাশে বদ্ধ করেছে বুঝি। প্রশস্ত, মর্ম্মর-শুভ্র ললাট হ'তে চুল ব্রাশের সাহায্যে তুলতে তুলতে পরিমল ভাবল, যেখানে অন্য মেয়ে তাকে পেলে ধন্য হয়, সেখানে আইভি তাকে কেন ঘোরাচ্ছে। আর তো ভাল লাগে না।

পরিমল এই বিষাদক্লিষ্ট ভাবটা মনে নিয়ে একটু ম্লানমুখেই বাহির হ'ল। বৈদেহীদের বারান্দা থেকে রাস্তা দেখা যায়। সেই বারান্দায় বৈদেহী দাঁড়িয়েছিল। বৈদেহী রাস্তার দিকে চেয়ে দেখতে পেল যে পরিমল আসছে। প্রতি অঙ্গে তার যেন একটা দারুণ শ্রান্তির বৈক্লব্য। বৈদেহীর এখন যে অবস্থা তাতে পরিমলের ম্লান মুখ দেখে তার দুঃখিত হওয়া উচিত কিন্তু বৈদেহী হ'ল সুখী। সে তার বাবার কাছে শুনেছিল যে পরিমলের দিন বেশ স্বচ্ছন্দে যায় না, টাকাকড়িরও অভাব হয় মাঝে মাঝে। তাই আজ বৈদেহীর মনে হল হয় তো' টাকাকড়ির টানাটানিতেই পরিমলের ফুলের মত মুখ শুকিয়ে গেছে!

তা'হলে পরিমল এক অংশে তার চেয়ে অবনত আছে। নিজের ক্ষুদ্রতার অসহ্য ব্যথা যেন বৈদেহীর কাছে লঘু হয়ে এল।

আমি বলি বৈদেহীর ভালবাসায় ঈর্ষা আছে। প্রেমাস্পদের পরম যোগ্যতায় তার মনে অনাবিল আনন্দ জেগেছে বটে কিন্তু তার সঙ্গে ঈর্ষার সমাবেশ হয়েছে। সে নিজে কেন এত রূপে ক্ষুদ্র হ'ল আর পরিমল কেন রূপের রাজা হ'ল? কেন এক অংশেও পরিমলের অপেক্ষা বৈদেহী বড় হ'লনা? রূপের অভাব সে কিসে পূর্ণ করবে?

আজ যেন একটা কিছুর সন্ধান পেয়ে বৈদেহী হৃষ্ট হ'ল। পরিমল এগিয়ে আসছে, এক্ষুনি সে বৈদেহীর দিকে তাকাবে। বৈদেহী চকিত দৃষ্টিতে একবার নিজের বেশ লক্ষ্য করল' ঠিকই আছে! হাত দিয়ে চুল ঠিক করে বৈদেহী আগ্রহের সঙ্গে নীচের দিকে চেয়ে রইল। তার মনে হ'ল যেন তার কাণ লাল হয়েছে, চোখমুখ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, বুকের ভিতরে দ্রুততাল আরম্ভ হ'ল। না জানি কেমন করে পরিমল তার দিকে তাকাবে? কিন্তু কিছুই আশ্চর্য্য ঘটল না। পরিমল প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল না। একটু ম্লান হেসে চলে গেল।

পরিমলের হাসিটা কি সুন্দর। আইভির কথা ভাবতে ভাবতে সে বৈদেহীর দিকে চেয়ে হাসল। বৈদেহী যে মুখ কেবল আনন্দে ভাস্বর দেখেছিল আজ সেই মুখ বিষাদের ছায়ায় করুণ দেখে স্তম্ভিত হ'ল। আকুল কামনায় তার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল। তার এত ঐশ্বর্য্য আর পরিমল এই শীতের সন্ধ্যায় বিষণ্ণ মুখে কোথায় যাচ্ছে রিক্ত ভাবে? অনটনে চিন্তিত হয়তো সে। কিসের অভাব পরিমলের? কিন্তু সে একবারও ভাবল না যে পরিমল সুন্দরীর দ্বারে বন্ধক দেওয়া চিত্তের সুদ দিতে যাচ্ছে!

"এসে পৌছতে পেরেছ পরি? Too late। তোমার জন্যে Seventh Heavenটা আজ আর দেখা হ'ল না। একেরে অকেজো তুমি!

পরিমল হাতের রিষ্টওয়াচটার প্রতি চেয়ে বলল, "কই, বিশেষ দেরী কি হয়েছে?"

"না তাকি আর, মাত্র আধ-ঘণ্টা যাক্ চল Sunrise-টাই দেখে আসিগে।"

ড্রেস সার্কেলে দুখানা জায়গা নিয়ে পরিমল বসল, আইভির পাশেই। আইভির গোলাপী শাড়ীর আঁচলখানা উড়ে এসে পরিমলের মুখে লাগছে। আলো নিভানো হয়েছে, অন্ধকারের মধ্যে আইভির কানের ও গলার হীরেগুলো জ্বলে উঠল। একখানা গান হচ্ছিল, কিন্তু পরিমল কিছুই শুনতে পেলনা; তার মন তখন চিন্তাবিষ্ট।

আইভি সুগন্ধাকুল এমব্রয়ডারী করা রুমালে মুখ ঢেকে বলল, "পরি ? সিলি গান ? না ?"

"কি জানি।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরিমলের দিকে চেয়ে আইভি বলল, "Hallow ! what's the matter with you ? সিনেমা তোমার ভাববার জায়গা নয়, যা দেখতে এসেছ দেখ। পরে যতখুসী আকাশপাতাল ভেব।"

কোন কথা হ'লনা আর। বিরামের সময়ে আইভি গম্ভীর হয়ে বসে রইল। তারপরে আলো নিভলে আস্তে সরে এল পরিমলের কাছে। চেয়ারের হাতলে রাখা পরিমলের হাতের ওপরে আঙ্গুরের মত নরম হাত এসে পড়ল—যেন ক্লান্ত বিহগী কুলায়ে ফিরে এল। আইভি ধীরে ধীরে ডাকল, "ডার্লিং !"

পরিমল চকিত হয়ে তাকাল। আলো না থাকায় আইভির মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তবু মনে হ'ল আইভির হীরার মত দীপ্ত মুখ মুক্তার মত কোমল, করুণ হয়ে এসেছে, সহানুভূতি-বিধুর স্পর্শ আইভির, কণ্ঠ মৃদু।

নড়বার সাধ্য হ'লনা। হয়তো এ মায়াজাল একটু আঘাতেই ছিঁড়ে যাবে। হয়তো বা এই একত্ববোধ, সংযুক্ত হস্তের মধ্য দিয়ে যা দেহের প্রতি অংশে সঞ্চারিত হচ্ছে, নিমেষে দ্বিত্ববোধে পরিণত হয়ে যাবে। দেহের শোণিতবিন্দু সিন্ধুর আবেগে লুটিয়ে পড়তে চায় প্রেয়সীর দেহতটে। সে পাগল করে শুধু, ধরা দেয় না। এই পাণির ইঙ্গিত মনেপ্রাণে অসহ উত্তাপ সৃষ্টি করে, চায় দেহমন আরো নৈকট্য। কিন্তু আইভির খেলাই এই। যৌবনের বনবনে ইসারায় ডেকে নিয়ে সে পত্রপ্রচ্ছায়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। উন্মাদের ব্যাকুলতায় খুঁজে মরে পরিমল।

অধর দংশন করে নিজেকে সংবরণ করে নীরবে পরিমল বসে রইল। পুষ্পসুকুমার হাতে এত শক্তি! অন্তরাত্মাকে নিমেষে সংহত করে দিতে

পারে আইভির স্পর্শ। উত্তাল যৌবনের অশান্ত আবেগে গেল বুঝি পরিমল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে! এখনি সংযমের বাঁধন ভেঙ্গে যাবে। সংহত আত্মরক্ষার লক্ষ্য একদিকে। জগৎ লুপ্ত হয়ে গেছে, জীবনের কোন উদ্দেশ নেই। এখনি জনতা বিস্মৃত হয়ে, প্রকাশ্য স্থান ভুলে সে বক্ষে গ্রহণ করবে বসন্তের মূর্তিমতী প্রতিমা আইভিকে। আর বোধহয়, রক্ষা হয় না।

আইভির হাত পরিমলের হাতে চাপ দিল সজোরে—নিমেষে সমগ্র উত্তেজিত দেহমন সুধায় প্লাবিত হয়ে গেল, দেহজ্ঞান লুপ্ত হ'ল অমৃত—সাগরে। পৃথিবী ধোঁয়ায় মিশিয়ে ধোঁয়া হয়ে গেল—জেগে রইল শূণ্যতার পাথারে দুইটি অণুমাত্র—আইভি, পরিমল।

সৃষ্টির আদিম প্রহর ছিল এমনি তমোবৃত। এমনি অন্ধকারের রাজ্যে আদি প্রেমিক-প্রেমিকা, অ্যাডাম-ইভ। সভ্যতার সুবিধা পায়নি তারা, পায়নি তেমনি সভ্যতার পীড়ন-প্রখরতা। ছবির পর্দ্দায় ছায়ামূর্ত্তি চলাফেরা করছে, চোখ মেলে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দেখছে তারা শত যোজন দূর থেকে—অন্য জগতের পার থেকে যেন। পরিমল মনে মনে কামনা করল, চিরকাল যেন এমনি সুকোমল তমো কঠোর বাস্তবকে আবৃত করে থাকে। চিন্তার প্রয়োজন নেই—অন্ধকারের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলবে তারা।

কিন্তু, আবার আলো জ্বলল। লীলাময়ী কৌতুকপারা আইভি আবার নিজের রূপে ফিরে এল।

গাড়ীতে বসে পরিমল সন্দেহাকুল চিত্তে আইভির দিকে তাকাল। আংটি-পরা সরু আঙুলগুলো দিয়ে আইভি চুল ঠিক করছে।

"কেমন লাগল, আইভি?" নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে পরিমল প্রশ্ন করল।

মুখ বক্র করে আইভি উত্তর দিল, "মাঝামাঝি, গল্পটা প্রথম দিকে বেশ হচ্ছিল, শেষের দিকে একটা আদর্শবাদ খাড়া করে সব মাটী করে ফেলল।"

পরিমল গায়ের শাদা চাদরটা টেনে নিয়ে বলল, "বেশ তো মিলনান্ত হ'ল।"

"আমার মিলনান্তে অরুচি ধরে গেছে—those commedies! সেই বাড়ী, সেই ঘর, সেই সব। আদর্শকে বজায় রাখতে যেয়ে আর্টকে নষ্ট করেছে। Bye the bye, পরি; তুমি যেন একটু—what shall I say,—একটু ভাবছ বেশী? ব্যাপার কি?"

পরিমল একবার চকিত সভয় দৃষ্টিতে আইভির মুখে চেয়ে বলল, "ভাবছি অন্ধকারের রাজ্যে আজ ভালই ছিলাম।"

আইভি কঠিন মুখে উত্তর দিল, "বাজে কথা বলা বন্ধ করবে?"

পরিমল একটু আহত হ'ল, তবু ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, "কি বলতে চাই, ভাল করে শোন আগে।"

"চুপ করবে তুমি, পরি?"

পরিমল নিরুপায়ভাবে আইভির দিকে তাকাল। আইভির মুখের উপর বিদ্যুতের মত ক্ষণস্থায়ী একটা রূঢ় হাসির রেখা চলে গেল। পরিমল চুপ করল।

গাড়ী আইভিদের বারান্দার নীচে থামল! ওপরের গাড়ী-বারান্দা থেকে একটা কে সরে গেল। আইভি ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল, "নীতাটা আজো বোধহয় এসে হাজির হয়েছে। তোমাকে এতক্ষণ না দেখে হয়তো নিরাশ হ'ল।"

ট্যাক্সি বিদায় করে পরিমল বলল, "আচ্ছা চললাম। ট্রাম ধরতে হবে তো।"

আইভি পরিমলের হাতটা টেনে হাত ঘড়ি দেখল, "মোটে সাড়ে আট। পরি, এসনা এককাপ কফি খেয়ে যাও।"

পরিমলের ইচ্ছা ছিল না, কারণ, বেশীক্ষণ থাকলে চিত্রগৃহের আইভি আর চক্রবর্ত্তীদুহিতা আইভি গরমিল হয়ে যাবে, একটু একটু করে যাচ্ছেও। যত বেশী সময় যাচ্ছে, তত তমসার মোহজাল দূরে অপসারিত হয়ে যাচ্ছে বাস্তবের প্রখর আলোক-পীড়নে। ব্যঙ্গনিপুণা, আইভির স্বরূপ দেখে মনে হবে একটু আগেই যে হস্ত-ধারণ করে আইভি তাকে 'প্রিয়' ব'লে ডেকেছিল সেটাও ব্যঙ্গ ভিন্ন কিছু নয়। তবু, আইভির অনুরোধ তার কাছে অলঙ্ঘ্য। সে অনুগমন করে মিঃচকের বাড়ী প্রবেশ করল।

সুসজ্জিত ড্রইংরুম, আধুনিক পাশ্চাত্য-গন্ধীসংসারে যেমন হয়ে থাকে। সোফার উপরে উজ্জ্বল নীলাম্বর পরে এক তরুণী সচিত্র বিলিতি মাসিক পড়ছিল। এক হাতে ধরা তার জলন্ত সিগারেট।

আইভি ঘরে পা দিয়েই চীৎকার করে বলে উঠল, "নীতা, নীতা, দেখ, দেখ এসেছে কে—তোমার সে।"

মেয়েটি মুখ তুলে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, "Shut up। মিঃ লাহিড়ী, আপনি কিছু মনে কোরবেন না। আইভির দুষ্টুমীর কথা আমি মাসীকে বলে দিচ্ছি।"

নীতা আইভির মাসতুতো বোন।

পরিমল সপ্রতিভ কণ্ঠে উত্তর দিল, "মনে কোরব? আইভি যা বলল, তার খানিকটা বাদ দিয়েও যদি আপনার কাছে তা হতে পারি, তবে সে আমার সৌভাগ্য।"

আইভি জেনে রেখেছিল পরিমল তার নিজস্ব সম্পত্তি, তাই সে নীতার হৃদয়-দৌর্ব্বল্য নিয়ে অসঙ্কোচে পরিহাস করত। আর পরিমল তো নিজে একজন সুশিক্ষিত প্রতারক। আইভির নির্দ্দেশে চিরদিনের অভ্যাসমত সে নারীজাতির সঙ্গে খেলায় অবতীর্ণ হ'ত এখনও।

নীতা আইভির বোন সম্পর্কে, কিন্তু রূপে বহু পরিমাণে ন্যূন। বোকার মত মুখ তার, অবশ্য পরিমলের প্রতি দুর্ব্বলতা ভিন্ন বোকামীর অপবাদ তাকে দেওয়া সুকঠিন। কণ্ঠস্বর সর্ব্বদাই তীক্ষ্ণ, রাগ প্রকাশের সময়ে তো তীক্ষ্ণ হয়ই, আনন্দ-প্রকাশের হর্ষোচ্ছ্বাসও তীক্ষ্ণতা বিদূরিত করে না। অবশ্য অনুরাগ প্রকাশকালীন কণ্ঠস্বর মোলায়েম হয়, কি আবেগে আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, জানা নেই। এ কাহিনীতে নীতা অবান্তর কিন্তু আইভির চতুষ্পার্শ্বের কক্ষমণ্ডল কেমন জানা দরকার, তাই নীতাকে একটু দেখি।

নীতা এককালে ছিল বেশ গোবেচারা, ঘরোয়া মেয়ে। আইভির মা ও নীতার মা সহোদরা হলেও, নীতার পিতৃদেব ছিলেন গোবেচারা অধ্যাপক। অর্থ-স্বাচ্ছল্য ছিল না, বিশ বৎসর কেটেছে সাধারণ গৃহস্থ বাড়ীর চালে। নীতার মা রূপসী ছিলেন না ভগিনীর মত; স্বামীর ওপর জোরও ছিল না। স্বামী-গোবেচারী হলেও জেদের অন্ত ছিল না। পদ্মাপারে বাড়ী, বাঙালের গোঁ। সুতরাং, চাল খরচের অর্থ মোটেই সুলভ ছিল না, যাতে নীতা গীতা দু'বোনের বিলাস-সজ্জা হয়। নীতার মা বহু অ্যাজিটেশন করেও ব্যবস্থা উন্নীত করতে না পেরে হতাশায় হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছিলেন। এ ধারে নীতার বিয়ের বয়স হয়ে গেল। পুরণো ফ্যাসানের মায়ের শাড়ী কয়খানি আর দু'একখানা মুর্শিদাবাদ-ঢাকাই নিয়ে নীতার বিশেষ সুবিধা হয়ে উঠল না পাত্র অন্বেষণে। শ্যামবর্ণ-সাধারণ চেহারা, রূপের অনন্যসাধারণতাও

ছিল না, যে পাত্রে মুগ্ধ হয়ে আপনি ধরা দেবে। পিতা নিজের পছন্দ অনুযায়ী পাত্র ঠিক করলেন নীতার বিবাহ-যোগ্য বয়স হয়েছে দেখে। কিন্তু, নীতা, গীতা ও তাদের মায়ের সবেগ-সাশ্রু প্রতিবাদ এক্ষেত্রে উপেক্ষা করা সম্ভব হল না পিতার পক্ষে। নীতার বিয়ে দেওয়া গেল না। যখন নীতার বয়স পঁচিশ পার হয়েছে, তখন দেখা গেল হঠাৎ মেনিন্‌জাইটিস্ রোগে পিতৃদেব দেহরক্ষা করলেন স্বীয় পরিবারকে মুক্তি দিয়ে। দেখা গেল, ব্যাঙ্কে বিস্তর টাকা। সকলে অবাক হয়ে গেল অধ্যাপকের এত টাকা দেখে। নীতার মা পর্য্যন্ত অনুশোচনায় দগ্ধ হলেন; আহা, স্বামী এত টাকার মালিক জানলে তিনি স্বামীর সঙ্গে আর একটু শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করতেন নিশ্চয়। হয়তো, স্বামী প্রসন্ন হয়ে জীবদ্দশায় অর্থের কিয়দংশ দিতেন তাঁকে। তাহ'লে, বিলাসের অবকাশ থাকত। এখন সন্থ বৈধব্য এত টাকার শাদা পোষাকে কি এমন কারুকার্য্য করা চলবে? তবু মেয়ে দু'টির ছিদ্র হ'ল উপযুক্ত পোষাকের অভাবে একজনের তো বিয়েই হচ্ছে না।

টাকা জমাবার মূলে স্বামীর কত বিনিদ্র রাত্রির নোটলেখা, কত গোপনে ছাত্র পড়ানো, কত পরীক্ষার খাতা দেখা, কত কার্পণ্য সঞ্চিত হয়ে আছে, তা অবশ্য নীতার মা জানলেন না। তবে স্বামীর সযত্ন সঞ্চয় হাতে এল তাঁর। নীতা-গীতাকে নিয়ে সুখের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন তিনি এতদিনের অবদমিত বৃত্তিকে মুক্তি দিয়ে।

কিন্তু, নীতার অবস্থা সঙ্গীন হো'ল। আঠারো বছরের তাকে সস্তা দিশী স্কুল ছাড়িয়ে মেমী স্কুলে ভর্তি করা হল। চট করে পোষাক-পরিচ্ছদ বদলে সে আধুনিক হয়ে উঠল। কিন্তু, নীতার তখন ঘড়িতে বারোটা বেজে গেছে। বয়স হয়েছে তার, সে বয়স ফেরানো যাবে না। ইংরেজ ভাবাপন্ন সমাজেও কিন্তু, বয়স চট করে হয়ে যায়। পচিশের পরে মেয়েদের সম্ভাবনা কম থাকে। তাই বয়স্কা নীতা সিফনজর্জেট জড়িয়ে জবরদগব হয়ে পড়ল। রাতারাতি এতদিনের গ্লানি মিটিয়ে অতি আধুনিক সাজবার প্রচেষ্টায় নীতা হয়ে উঠল অস্বাভাবিক। পঁচিশের পরে সিগারেট ধরে দিনকতক কেশে গলায় ধোঁয়া ঠেকে অবশেষে রপ্ত করে ফেলল সে। সিগারেট ধরে মনে হ'ল, তাহলে এতদিনের অধোগতি নীতা বুঝি এক-নিমেষে ধুয়ে-মুছে দিল।

কিন্তু হায় নীতার বোলকরা চুল, জুতোর হীল আর মুখের সিগারেট! পিতার মৃত্যুর পরে দু'বছর অতীত হয়ে গেল, কেউ তো এল না এ রমণী-রত্ন আহরণ করতে। শরীর-বারকরা ব্লাউজ কালরংকে উজ্জ্বল করতে পারল না, মুখের ম্যাক্সফ্যাক্টর পারল না তোবড়ানো গালকে নিটোল করতে। লম্বা নখে কিউটেক্সের রং মেখে শিরা ঢাকা গেল না। সাতাশের নীতা তাই বয়সের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত পোষাকে ভুবনের ঘাটে ঘাটে বিচরণ করে ফিরছে।

আইভি হেসে উঠে কফির হুকুম দিল।

কফির পেয়ালায় মুখ ডুবিয়ে আইভি পরিমলকে নীতার অগোচরে চোখের ইসারা করল। পরিমল বুঝে নিল, কারণ পরমুহূর্তে সে উঠে নীতার পাশে বসল। নীতার মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে তার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করল, "কেমন লাগল ছবিটা?

পরিমল আইভির দিকে দ্রুত তাকিয়ে বলল, "আমার তো লাগল ভালোই, কিন্তু আইভি বলছে যে ওর ভালো লাগেনি।

নীতা একটুক্ষণ কি যেন ভেবে নিল, তারপর বলল, "আমার ওটা দেখা হয়নি। একলা কি সিনেমা উপভোগ করা যায়? আইভি, আমাকে আগে বলনি কেন? তোমাদের সঙ্গে যেতাম।"

আইভি উত্তর দিল, "ব্যস্ত হোয়োনা। আমাদের একজনের সঙ্গে অন্ততঃ তুমি এখনও যেতে পার। I say পরি, তুমি কেন নীতাকে নিয়ে ছবিটা দেখিয়ে আন না একদিন?

পরিমল হতাশ হয়ে আইভির দিকে তাকালো, একএক সময় আইভি যে কি করে? সারা সন্ধ্যা নীতার সঙ্গ? অসহ্য। কিন্তু এখন নীতা সাগ্রহে মুখের দিকে চেয়ে আছে, ইতস্ততঃ করে লাভ নেই। পরিমল সপ্রতিভকণ্ঠে বলল, "বেশতো, with Pleasure। কবে যাবেন, মিস্ মিটার?'

নীতা অপাঙ্গে তাকিয়ে ব্রীড়াজনিত কণ্ঠে বলল, "ধন্যবাদ। কিন্তু, আমি আপনার ওপরে জোর করব না।"

আইভি মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করল। পরিমল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে একটু

অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলে উঠল, "কি? আমি আপনার সঙ্গ পাবার আশায় উৎসুক। আর, আপনি আমাকে প্রত্যাখান করছেন?"

নীতার মুখ বেগুণী হয়ে উঠলো। পরিমলের জবাব শুনে আইভি হাতে তালি দিল, "চমৎকার, পরি।"

এই রকম বাগচাতুরী কিছুক্ষণ চলবার পরে রাত্রি গভীর হয়ে যাচ্ছে দেখে নীতা উঠে বিদায়-জ্ঞাপন করে চলে গেল।

নীতা চলে গেলে পরিমল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আইভির মুখের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে নয়ন-তারকা স্থির নিবদ্ধ হয়ে রইল আইভির মুখে। অপরূপার অপরূপ মুখ!

আইভি অত্যন্ত বক্র ভঙ্গিতে বলল, "কি দেখছ?"

"আইভি!"

"বল না, কি বলবে?"

"একটু আগের তুমি, এখনকার তুমিতে কত প্রভেদ। আবার সিনেমা-হলের তুমি কত অন্যরকম। তোমাকে যে চিনতেই পারিনে, আইভি। মনে হয়, কত দূরের মানুষ তুমি। অথচ টেনে নিয়ে চলেছ আমাকে।"

"কি মধুর বাণী শুনলাম। পরি, তোমার সম্ভাবনা নষ্ট করছ অযথা! কবি হও না কেন? তাহ'লে তো একথার মূল্য পেতে!"

"আইভি, ঠাট্টা কোরনা। একটু আগে ডাকলে, 'ডার্লিং', এখন আবার—"

আইভির উচ্চ হাসি ঘরের স্নিগ্ধ আবহাওয়ায়, পরিমলের প্রণয়-বাণীর মধ্যে যেন ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল।—"কি বোকা তুমি! ডার্লিং তো প্রায়ই বলি। কথাটার মানে আছে না কি? বাংলা 'ভাই' কথাটার প্রতি শব্দ বলা চলে। এই তো, এখনও ডাকছি, ডার্লিং, ডার্লিং।"

পরিমলের মুখ লাল হয়ে উঠল। সে সুরে, এ সুরে কত পার্থক্য সে কি আইভি জানে না? একটু ইতস্তত করে মরীয়াভাবে পরিমল বলতে আরম্ভ করল, "আজ স্পষ্ট কথা বলি। আইভি, জান তোমাকে কত ভালবাসি—"

বাধা দিয়ে আইভি ব্যঙ্গকণ্ঠে বলল, "তুমি যে আমাকে ভালবাস এটা কতবার বলবে? এই নিয়ে ক'বার হ'ল? গুণে দেখি—" আইভি আঙুল গুণতে আরম্ভ করল।

"একবার বটানিক্সে গাছের তলায়, দু'বার লেকের পাড়ে, বার তিনেক পিক্‌নিকে, বার ছয় পিক্‌চার দেখার পরে—পরি, তুমি পিক্‌চার-এ যাওয়া ছেড়ে দাও। গেলেই বড় সেন্টিমেণ্টাল হয়ে পড়।"

পরিমল মর্ম্মান্তিক স্বরে বলল, "তুমিই সত্যিই ইচ্ছে করে বুঝবে না, আইভি।"

"সেটা সত্যি। অবশ্য ইচ্ছা করে নয়। আমি অনেক জিনিষ বুঝবই না, যেমন ল্যাটিন, হিব্রু, তেলেগু। বি, এতে দর্শন ছিল, তাও বুঝতাম না, পরি।"

পরিমল উঠে দাঁড়াল, "তাহ'লে যাই, আইভি।"

"এসো।" আইভি পরিমলকে সঙ্গে এগিয়ে দিতে নীচে নেমে এল। সিঁড়ির মুখে ঘোরানো দরজা কাঁচের। দরজা ঠেলে বাইরের চাতালে বার হ'তেই পরিমল মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে পড়লো। সেই কণ্ঠে, সেই সুরে আইভি ডাকছে, "ডার্লি!" সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির আলো নিভে গেল। পরিমলের চেতনা অবশ করে আইভির কোমল অধর পরিমলের অধরকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করল মুহূর্ত্তের জন্য। পর মুহূর্ত্তেই বিদ্যুতের মত আইভি সরে গেল।

পরিমল আকুল আগ্রহে ফিরে আসবার জন্য ফিরে দাঁড়াল। কিন্তু আইভি তখন অদৃশ্য—সিঁড়ি অন্ধকার। শুধু কাচের দরজাটা ফিরে এসে প্রবেশেচ্ছুকে রূঢ় আঘাত করে গেল।

অন্ধকারের যবনিকা স্পন্দিত করে দূর থেকে আইভির হাসির জলতরঙ্গ বাজতে লাগল ক্ষীণ মূর্চ্ছনায়।

পাঁচ

"ওগো নিঠুর দরদী, একি খেলছো অনুক্ষণ?
তোমার কাঁটায় ভরা বন, তোমার প্রেমেভরা মন।"—

গুন্‌গুন্‌ করে গান গাইতে গাইতে বৈদেহী প্রসাধন-অন্তে নিজেকে দেখল। "আজ চুল বাঁধা কি সুন্দর হয়েছে!" বৈদেহী ভাবল—"ঠিক মণিদির মত সামনে চুল এসে পড়েছে। আজ যদি আসে!"

বৈদেহী পরিমলের প্রতীক্ষা করছে। আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে সুগন্ধি পাউডার বৈদেহী হাতে গলায় মাখছে। চুলটা আর একটু ঠিক করে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকুল আগ্রহে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল বৈদেহী।

বালিগঞ্জের রাস্তা। বৈদেহীদের বাড়ীর পেছনে বাগান তারপারে অন্য একটা রাস্তা। সেখানে পরিমলের বাড়ী। মোড় থেকে আসতে দেখা যায়।

কত লোক যাচ্ছে। কাছেই প্রকাণ্ড পার্ক। সেখানে ছেলেমেয়েরা বিচিত্র বেশে চলেছে। পথ দিয়ে মেয়েরা চলেছে রূপের তরঙ্গ তুলে, পুরুষ চলেছে সেই মেয়েদের দিকে চেয়ে। রাস্তার মোড়ে কয়েকটা গাছ আছে, বৈদেহী ভাবছে কখন গাছের নীচে পরিমলের দীর্ঘাকৃতি চলন্ত মূর্ত্তি দেখা যাবে।

কখন বা দূরে একটি লোক দেখে বৈদেহীর হৃদয় সবেগে স্পন্দিত হ'ল, বুঝি তার প্রিয় আসছে। কাছে এলে বৈদেহী দেখল অন্য লোক। 'আরে দূর, কাকে কি ভাবি? এ লোক কি বিশ্রী দেখতে, ও তো কত সুন্দর। ওর সঙ্গে এর ভুল, এও কি হয়।

আবার একজনকে দেখে বৈদেহী ভাবল, 'এবারে আর ভুল নয়, এবার ঠিক। কিন্তু, ও কি আর একটু লম্বা নয়? আর হাঁটার ভঙ্গিটাও ঠিক ওর মত নয় তো। ও যেন একটু টেনে টেনে হাঁটে। না, ও নয়। চলবার ভঙ্গিটাই বা ওর কী সুন্দর।'

বৈদেহী অবশ্যই কবিতা লিখতে পারে না। একমাত্র অসামান্যতা তার কণ্ঠের সঙ্গীত। তবে কবিতায় ঝোঁক ছিল তার সঙ্গীতজ্ঞের পক্ষে যা স্বাভাবিক। সুরের কান ছিল, তাই যা পড়তো কাব্য, মনে থাকত বৈদেহীর। বাতাসে ভেসে ভেসে চলে আসত তারা বৈদেহীর কাছে। কবেকার পড়া কবিতার একটি লাইন মনে চলে এল—

"She walks in beauty like the night —

এখন 'শী' না বলে 'হি' বল্লেই ঠিক হয়। বৈদেহীর মুখে হাসি দেখা দিল। এমন রূপবান্ পুরুষ আজ বৈদেহীর ধরাছোঁয়ার মধ্যে এসেছে। প্রসন্নবাবু পরিমলের কাজ-কর্ম্মের সুবিধা করে দিচ্ছেন। জানা লোকদের কাছে পাঠিয়ে জীবন-বীমা করিয়ে দিচ্ছেন। প্রায়ই একবার করে আসে পরিমল। সুন্দর চেহারা, ভদ্র ব্যবহারে প্রসন্নবাবুকে মুগ্ধ করেছে সে।

বৈদেহী কয়েকবার গেছে পরিমলের মায়ের কাছে। তিনি এসেছেন অনেকবার। এমন কি, পর্ব্বদিনে প্রসন্নবাবুর একাধিক মোটর পরিমল-জননীকে গঙ্গাস্নানে ও কালীঘাটে নিয়ে গেছে। পরিমল-জননী বৈদেহী ও প্রসন্নবাবুর উদ্দেশে ছানার জিলিপি, ক্ষীরের সিঙ্গাড়া নির্ম্মাণ করে পাঠিয়েছেন। কখন বা বাটীতে ঢাকা দিয়ে বাঙালদেশী নিরামিষ রন্ধন এসেছে এ বাড়ী। পাকা রাঁধুনী পরিমলের মা, খেয়ে তারিফ করেছেন প্রসন্নবাবু, মেয়েকে বলেছেন শিখে নিতে। কাছাকাছি বাড়ী হওয়াতে হৃদ্যতা জমেছে অল্পদিনেই।

"জানি কেমন দেখাচ্ছে? চুলটা বুঝি গেল।" বারান্দা ছেড়ে বৈদেহী প্রসাধন কক্ষের বড় আয়নায় নিজের ছবি দেখল। পাউডারের তুলিটা হাল্কা হাতে মুখে বুলিয়ে আবার চলে এল বারান্দায় প্রতীক্ষায়।

এই বারান্দা তার সেতু। এখানে দাঁড়িয়ে দেখা যায় পরিমল আসছে যদিও বা না-ও আসে কাছে, তবু অনেকদিন দেখা যায় চলেছে সে। মোড়ের মুখে অপস্রিয়মাণ মূর্ত্তি কতদিন বৈদেহীর চোখে পড়ে গেছে। কার্য্যস্থলে হাজিরার সময় ঠিক নেই, দুঃখের বিষয়। নইলে নিত্য বুকেরেলিং বৈদেহী পরিমলের হাজিরার সময়ে হাজিরা দিত। তাও দু'চার দিন বৈদেহীর দৃষ্টি লক্ষ্যভেদ এড়িয়ে অফিসে যাওয়াও সম্ভব হত না। দেখে ফেলতো বৈদেহী। কারণ দিনের অধিকাংশ সময় আজকাল সে কাটাচ্ছিল তেতালার ঝুল-বারান্দায় তীর্থক্ষেত্র তার।

বড় গাইয়েদের স্বভাবানুযায়ী বৈদেহীর গুন্‌গুন্ গান গাওয়া অভ্যাস নেই। গান এত বড় বস্তু তার কাছে যে হাল্কাভাবে যখন তখন স্মরণ করা চলে না। কিন্তু আজকাল গান যেন আপনা থেকে এসে যখন তখন বৈদেহীর কণ্ঠে ঝাঁপিয়ে পড়ছে—রোধ করা যাচ্ছে না। তাই এখন ভ্রমর-গুঞ্জন-মধুর স্বরে বৈদেহীর গৃহ ও বারান্দা মুখর হয়ে উঠল :—

"আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্রছায়া : বর্ষা আসে, বসন্ত!"

মাঘের শেষ। বসন্তেরও আসার সময় হয়েছে। শূন্য মনে, শূন্য শয্যায় বসন্ত রাত্রি বিনিদ্র কাটাতে হবে না বৈদেহীর। কেমন করে অজানিতে জীবন তার পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

কিছুই না। কাছে আসা, গান শোনানো, কথা শোনা। কখন বা চা কি খাবার দিতে হাতে হাত লেগে যাওয়া। এই কি সব? না, আছে স্মৃতি সুখ, আছে পথ চাওয়া। পথ-চাওয়ার শেষ কি জানে না বৈদেহী, জানতেও চায় না। শুধু বোঝে, এই পথ-চাওয়া শেষ হ'লে বৈদেহীর জীবনের শেষ হয়ে যাবে। সে আসে, সে আসছে। এর বেশী চাওয়া ও পাওয়া নেই বৈদেহীর এখন। 'বী-অল্ এণ্ড-অল্' বৈদেহীর অস্তিত্বের।

"আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ"—

বৈদেহীর আজ অন্তরে আজ কেবলি ধ্বনিত হচ্ছে, 'পরিমল আসবে।' গত তিনদিন আসে-নি সে। সাধারণতঃ, দুই একদিন অন্তর আসে পরিমল। পিতার কাছে কাজে আসে অবশ্য। কিন্তু, দুহিতার গান না শুনে যায় না। গান পরিমল চিরকালই পছন্দ করত, এ-গান তো অসাধারণ। ভাগ্যি, গান গাইতে পারি।' বৈদেহী মনে মনে ভাবল।

আজ বৈদেহী শীঘ্র প্রসাধন শেষ করেছে। রূপহীন দেহকে নিয়ে চিত্রাঙ্গদার তপস্যা আরম্ভ হয়েছে। প্রসাধন-বস্ত্র মজুদ ছিল, কারণ বৈদেহীর চেতনার উন্মেষ হয়ে গেছে পূর্ব্বে। সে অন্য কাহিনী।

কি কি গান গাইবে বৈদেহী তা-ও স্থির করে রেখেছে। একমাত্র এই এক উপাচার আছে তার দেবপূজায়। এখানেই শ্রেষ্ঠত্ব তার। গানে গানে দিন ভরে দিতে পারে সে পরিমলের। গানের সময়ে মনে হয়, সে সামান্য কুরূপা মানবী নয়; তার করতলগত ধরিত্রীর ঐশ্বর্য্য। সে বরদাত্রী দেবী। পারে সে নিমেষে অসম্ভবকে সম্ভব করতে। এক বিরাট শক্তি তার আজ্ঞাবাহী দাস। ইচ্ছামত সে শক্তিকে পরিচালিত করতে পারে, পারে বৈদেহী। যা, যা ইচ্ছা তার, নিতে পারে সে। এ সঙ্গীত-প্রতিভা যেন কৃতিত্ব নয়—বিরাট শক্তি—সজীব শক্তি। এর নিজস্ব আত্মা আছে। ডুবস্ত জীনের মত আরব্যোপন্যাসের নায়িকা বৈদেহী পুষে রেখেছে এই শক্তি কণ্ঠে। যখনি প্রকাশ পায়, শ্রীহীনা বৈদেহী হয়ে ওঠে অসামান্যা। গানের সময়ে অন্য প্রাণী হয়ে যায় সে। গীতান্তে আবার সাধারণ মানবী হয়।

বেলার দিকে তাকিয়ে বৈদেহী পরিমলের আসার নির্দ্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে তুলনা করল। পরিমল আর একটু দেরী করে আসে। সুতরাং, আশঙ্কা নেই, আসবে সে ঠিক। বৈদেহীর মনের এ সাড়া ব্যর্থ হবার

নয়। এইতো আসছে, আসছে সে। আর একটু অপেক্ষা করলেই পাওয়া যাবে।

ক্রমে বেলা যত শেষের দিকে গড়াতে লাগল তত বৈদেহীর মন অস্থির হয়ে উঠল। ছটফট করতে লাগল সে ঘরে-বাহিরে। প্রাণ তার উচাটন হ'তে লাগল আশা-নিরাশার যুগল দোলায়। হয়তো এল না, এল না আর।

যাই, বারান্দায় তীর্থের কাকের মত দাঁড়িয়ে থাকব না। যদি এখন ও এসে পড়ে, আমাকে দেখে ভাববে আমি বুঝি ওরই আশায় এমন সেজে-গুজে বারান্দায় পড়ে আছি। না, ভাববেই বা কেন ও কথা? এমনিও তো থাকতে পারি।

মনে পড়ে গেল বৈদেহীর অনেকদিন এই অজুহাত নিয়ে বারান্দা ছেড়ে নড়তে পারে নি সে। পরিমলের আসবার সময় হয়েছে জেনেও। কতদিন ধরা পড়ে গিয়েছিল সে! দিন দশেক তো হবেই—না, আরো দুদিন—।

যাই আমার পড়ার ঘরে। ওখান থেকে রাস্তাও দেখা যাবে, অথচ মনে হবে আমি যেন পড়াশোনাই করছি।

কলেজে যায় না বৈদেহী, বাড়ীতে বি. এ. পড়ে। অথচ, এই অসময়ে বিনা কারণে পড়ার ঘরে বসল।

এখন পড়া অসম্ভব। সারা সকাল অধ্যাপক গিলিয়ে গেছেন। প্রকাণ্ড ঘরভর্তি বই—লাইব্রেরী একটা ছোটখাটো। সোনার জলে নাম লেখা মরক্কো চামড়ার বই-এর সারি বুককেশে সাজানো—উপন্যাস, কাব্য, নাটক। সেক্রেটারীর সামনে বইএর আলমারীতে পাঠ্য কেতাব। চামড়ামোড়া আসবাবপত্র।

বৈদেহী একখানা উপন্যাস বেছে নিয়ে জানালার পাশে চামড়া-মোড়া আরাম-চেয়ারে বসল, দৃষ্টি পথের দিকে।

বই ভাল লাগে না। অথচ নামী বই শুনে কিনিয়ে এনেছে সে। পড়া অর্দ্ধেক হয়েছে, কিছুতে শেষ হচ্ছে না। বই ফেলে উঠে দাঁড়াল বৈদেহী। জানালা দিয়ে পথের দিকে চেয়ে দেখল। লোকজনের চলা-ফেরার জনতা-সঙ্কুল পথ। শুধু একমাত্র সে-ই আসছে না, যার আবির্ভাবে জগতের সকল মানুষকেই জনতা বলে দূরে ঠেলে রাখতে ইচ্ছা হয়। মধুর

স্নিগ্ধতায় স্নান করে রমণীয় সন্ধ্যাটি পথের বাঁকে-বাঁকে নেমে আসছে। সন্ধ্যার কোমল ছায়াপাতে আলো জ্বলবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পথঘাট অচ্ছলোকের মূর্ত্তিধারণ করেছে। বৈদেহীর চোখে সন্ধ্যা বন্ধ্যা হয়েই দেখা দিল। সন্ধ্যা এল, সে এল না।

"And will he not come again ?"

'কি বাজে বই যে। সব নায়িকাদেরই কি সুন্দর হ'তে হবে? অ্যানা সুন্দর, কিটি সুন্দর। লেখকেরা কি আর কাউকে খুঁজে পান না? যারা খারাপ দেখতে তারা যেন আর নায়িকা হ'তে জানে না। পরিমল তো এখনও এল না। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।' হতাশ অন্তরে বৈদেহী আবার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আবার সরে চলে এল ব্যস্ত হয়ে। এবারে আসবে নিশ্চয়। হয়তো কোন কারণে দেরী হচ্ছে, এখনি পরিমল সহাস্যমুখে দেখা দেবে এসে। বই পড়তে ভাল লাগে না। বৈদেহী চাকরকে ডেকে একতালা থেকে চায়ের ফরমাস দিল। চাকর দিদিমণির উৎকট সাজসজ্জা অবাক হয়ে দেখতে দেখতে চা এনে রাখলো। দু চুমুক খেয়ে বৈদেহী চাটা ফেলে দিল।

একটু গান গাওয়া যাক—মনটা অন্যমনস্ক হবে। পড়ার ঘরের পাশের ছোট ঘরটি গানের। একমাত্র সন্তানের উদ্দেশে গোটা তেতালাটাই পিতা সাজিয়ে দিয়েছেন। বাদ্যযন্ত্রে ভরা ঘর। বৈদেহী অর্গানের ধারে বসে এটা-ওটা অন্যমনস্কভাবে বাজাতে লাগল। অন্যমনস্ক নির্লিপ্ততায় গান এল আপনি কণ্ঠে—

"হায়, মিলন-পিয়াসা বিরহ-বাদলে আঁখিধারে শুধু ভাসে—' এ গান কেন? কবে গেয়েছিল?

'গানগুলি মোর কাঙালের মত তোমার দুয়ার পাশে,
বারে বারে যায় বৃথা অভিসারে, বেদনায় ফিরে আসে—'

সেই বর্ষণ-মুখর শ্রাবণ-সন্ধ্যায় দামোদর-প্লাবন-ত্রাণ-জলসায় গান গেয়েছিল বৈদেহী। দীর্ঘদিন পরে দেখা হয়েছিল রূপ-দেবতার সঙ্গে। ম্লান সন্ধ্যায় প্রথম কলিকাতায় দেখা হয়েছিল। সে চিনতে পেরেছিল বৈদেহীকে—মনে রেখেছিল বৈদেহীর ন্যায় নগণ্যাকে—পরে বলেছে পরিমল। আহা, রূপ-দেবতার মুখের আনন্দ-হাসিকে ব্যঙ্গ ভুল করে বৈদেহী মুখ ফিরিয়ে চলে

গিয়েছিল। পায়ের ওপরে উপুড় হয়ে না পড়ে সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এলাহাবাদে যে রূপ বৈদেহীর তরুণ চিত্তে গভীর রেখা এঁকে দিয়েছিল, সে রূপ আজও তো রূপ গ্রহণ করেছে হৃদয়-সীমানায়। সূচনা বহন করে এনেছিল সেই শ্রাবণ-সন্ধ্যা।

"নৃত্যছন্দে ঝিমিঝিমি ঝরে ধারা,
গানগুলি, চির অগীত কি রবে তারা"—

এতক্ষণে মল্লার রাগিণী সম্পূর্ণ মূর্তি পরিগ্রহ করল কক্ষের সুর-প্রবাহে। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার আরো ঘনীভূত হ'ল, কোণে কোণে সুর ক্রন্দন করে ফিরতে লাগল। বৈদেহী চকিত হয়ে গান বন্ধ করল। না এ সুর সে কখনই গাইবে না। বহুদিন বিস্মিত হয়ে দেখেছে বৈদেহী সে মল্লার রাগিণী ধরবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, কখনও বা বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। 'আমি তানসেন নাকি?' সবিদ্রূপে বৈদেহী নিজেকে প্রশ্ন করল।

তানসেন হ'ক না হ'ক, আজ সে পরীক্ষার মধ্যে যাবে না কোন। যে কারণেই হ'ক, যদি তার মল্লাররাগিণীতে বৃষ্টি নামে, তাহ'লে পরিমলের আসবার পথ ভিজে যাবে, সে হয়তো বর্ষা বাদলে বা'র হ'বে না। মাঝে কীর্তন শিখেছিল বৈদেহী, একটি পদ গলায় এল তার—

"তরল জলধর বরিখে ঝরঝর
গরজে ঘন-ঘন ঘোর,
শ্যাম নাগর একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর?"

আবার মল্লার। না, যদিও তার মল্লার গানে বৃষ্টি নেমে তাকে তানসেনের যোগ্য উত্তরাধিকারীর সম্মান দেয়, তাও, সে চায় না; চায় প্রিয়জনের সাক্ষাৎ সামান্য কিছুক্ষণের নিমিত্ত। অমরত্বের কণাস্বাদ অপেক্ষা প্রিয় তার প্রিয়তর। কিন্তু, বড় ইচ্ছা করছে মল্লার গাইতে, সুরটা পেয়ে বসেছে! এতক্ষণ এক সুর নিয়ে চর্চা করার ফলে গৃহের মধ্যে সুর জাগ্রত হয়ে উঠেছে। সেই নিদারুণ শক্তি। কর-প্রসারণ করে বলছে: দাও আমাকে আমার প্রাপ্য দাও। দেব, দেব না। তোমার গানে মল্লারের প্রাণ আসে কি না।

দুর্দান্ত শক্তির আহ্বানে জোর করে ঠেলে উঠে দাঁড়াল বৈদেহী। তার মধ্যের ঘুমন্ত সেই সত্বা জেগে উঠেছে, জোর করে তাকে দিয়ে মল্লার রাগ

গাওয়াতে চায়। চায় তাকে পরিমলের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যেতে—অন্যপথে। যাবে না সে, গাইবে না গান। তুচ্ছ গান!

জানালার ধারে চলে এল বৈদেহী। কিন্তু কোণের ফেলে-আসা যন্ত্র তাকে টানতে লাগল ক্রমাগত। গান গাইতেই হবে; তবে মল্লার নয়—অন্য গান সে গাইবে। প্রথম দিন এ বাড়ীতে পরিমলের সামনে গাওয়া গানটা কণ্ঠে এল বৈদেহীর—হাল্কা সুরের গান পিয়ানোতে খোলে ভাল। কিন্তু, পিয়ানো বসবার ঘরে। এ ঘরে প্রয়োজন হয় না বলে রাখা হয়নি।

পিয়ানো-শিক্ষয়িত্রী মিস ইয়ং ওখানেই শিখাতেন। অর্গানের সঙ্গেই গাওয়া যাক; না, বক্সে ভাল হ'বে! কোণে ষ্ট্যাণ্ডের বুকে বসানো বাক্স হারমোনিয়ামের ডালা তুলে বৈদেহী বাজাতে লাগল। কি ভুল? মল্লার তো গাইছে না, যে কালোয়াতি সুরের জন্য প্রয়োজন হবে এ বাজনা। অর্গানই ভালো। আবার অর্গানে আরম্ভ করল গান বৈদেহী মৃদুস্বরে—

"কাজল চোখে চাইলে, চোখে মন ভোলালে, অপরাজিতা,—
—আজকে ঘিরে রাখ আমায়
চম্পা গোলাপ কমল বেলায়,
এখন তুমি ব্যথার স্মৃতি—কল্পলোকে প্রতিষ্ঠিতা।"

বৈদেহীর চোখের পক্ষ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল—অপরাজিতা কাল, রূপহীনা, তারই মত। অপরাজিতার দুঃখে বিগলিত হয়ে কবি লিখেছেন এই গান। গানের শিক্ষকের কথা মনে পড়ে গেল—বৃদ্ধ বয়সে রোগের আক্রমণে তিনি চোখ হারিয়ে ছিলেন, কিন্তু প্রাণ ছিল। ছাত্রীকে চোখে দেখতে না পারলেও অন্ধজনোচিত সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে বুঝে ফেলেছিলেন গোপন ব্যথা তার কোথায়! তাই, বিশেষ করে লেখা হয়েছিল এই গান। তবু শেষরক্ষা হল কই?

অপরাজিতা সত্যই পরাজিতা। কবি তাকে ভালবাসলেও শেষ পর্য্যন্ত ধরা দিয়েছেন ওই চম্পা, গোলাপ, কমল, বেলার কাছেই। যার রূপ নেই, গন্ধ নেই, তাকে কতক্ষণ বাহুর ডোরে রাখা যায়, হ'ক না সে প্রতীক্ষায় অনিদ্রিতা! দেয়ারফোর, স্বতঃসিদ্ধ তথ্য বীজগণিতের এল—অপরাজিতা বেচারী কল্পলোকে প্রতিষ্ঠিতা, ব্যথার স্মৃতি মাত্র হয়ে রইল। কবি গন্ধ রূপের গরবিণীদের নিয়েই উৎসবে মত্ত হ'লেন।

এই পুরুষ! যুগযুগ ধরে তারা এমনি। তাইতো ভালবাসা বৈদেহীর দীর্ঘ তেইশ বৎসরের জীবনে এল না। অপরাজিতা সে, শ্রীহীনা কালো। উদার উচ্ছাসে তাকে নিয়ে কাব্য রচনা চলে, ভালবাসা যায় না।

যন্ত্রের পর্দায় বৈদেহীর চোখের জল ঝরে পড়ল। কোন আশা নেই বৈদেহীর। ঈশ্বর যে ব্যর্থ হ'বার জন্যই তাকে পাঠিয়েছেন। তাই তো প্রেম দিয়েছেন প্রাণে, চোখে দিয়েছেন রূপের স্বপ্ন। রূপের দেবতাকে তাই তো পাঠিয়েছেন দৃষ্টির সীমানায়।

এলাহাবাদ থেকে প্রবেশিকা পাশ করবার মুখে বৈদেহী দেখেছিল পরিমলকে। তাদের প্রাসাদোপম বাড়ীর পাশে যে জীবনবীমা কম্পানীর অফিস ছিল, পরিমল সেই কম্পানীর কলিকাতা শাখার কর্মচারী। কাজে গিয়েছিল, সঙ্গে মা-ও ছিলেন। পাশের বাড়ীতে উঠেছিলেন তাঁরা। বৈদেহীদের সঙ্গে আলাপ হয়। প্রসন্ন বাবু ও অঞ্চলে বেশ নাম করেছিলেন কিনা। বাঙালী পরিমল লাহিড়ী প্রবাসে তাঁর সন্ধান পেয়ে আলাপ করেছিল, প্রসন্নবাবুর দ্বারা উপকৃত হয়েছিল সে। তখনি তার দীপ্ত রূপ কিশোরী বৈদেহীর মনে স্বপ্ন জাগিয়েছিল, কিন্তু সাহস ছিল না কাছে যেতে। নিজের রূপহীনতায় সর্ব্বদা সঙ্কুচিত থাকতো সে। গানে তখনও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। এলাহাবাদ প্রবাসিণী বাঙালীনীরা রূপ চর্চ্চায় মনোযোগিনী। অবাঙালীদের খর রূপের প্রভায় নিষ্প্রভ হ'বার আশঙ্কায় বোধহয় এ সাধনা তাঁদের, জর্জেট-জরি লিপষ্টিক-প্যানকেকের। বৈদেহীর রূপহীনতা আরও প্রকট হয়ে উঠত, বিশেষতঃ অর্থশালী বলে প্রসন্নবাবুকে সমাজের উপরের ও সব স্তরেই ফিরতে হত। রূপহীনতার বোধে কিশোর দ্বিধাও যুক্ত হয়েছিল, তাই বৈদেহী দু' চারটির বেশী কথা সর্ব্বসমেত বলতে পারেনি পরিমলের সঙ্গে প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও। দুই চার মাস পরে পরিমল চলে এলে নিঃশ্বাস ফেলে ভেবে ছিল 'ও তো যাবেই।'

আজ এক বছর হ'ল কলিকাতায় চলে এসেছে তারা প্রবাসের জাল গুটিয়ে। বিদেশে শেষ বয়সে পড়ে থাকবার ইচ্ছা হ'লনা প্রসন্নবাবুর। টাকাও যথেষ্ট হয়েছে—তাঁর ও বৈদেহীর প্রয়োজনের পক্ষে অতিরিক্ত। বৈদেহীর বয়স হয়েছে। ওর একটা ব্যবস্থা করা দরকার! তাই ওখানকার বিষয় সম্পত্তি বিক্রী করে চলে এলেন প্রসন্নবাবু বাংলার বাইরে কোনদিন তাঁর

প্রাণ চায়নি থাকতে। এসে তাঁরা ভাড়া বাড়ীতে উঠলেন, তারপরে সুবিধামত বাড়ী কিনে চলে এলেন। ভাগ্যক্রমে বাড়ী হ'ল পরিমলের পাড়ায়।

প্রসন্নবাবু পরিমল লাহিড়ীর কথা ভুলে গিয়েছিলেন। অমন কত ছেলে প্রবাসে তার কৃপাভিক্ষু হয়েচে। কর্ম্মমুখর দিনের জনসমাগমে তলিয়ে গিয়েছিল সে। কলকাতা থেকে দু'চার বার চিঠি লিখে শেষ চিঠির উত্তর না পেয়ে পরিমল ক্ষান্ত হয়েছিল। তাছাড়া বাড়ীও সে বদলে ফেলেছিল দু'বার।

প্রবাসের রূপবান তরুণ, বয়স ছিল মাত্র একুশ, সবে কাজে ঢুকেছে। এখন আটাশ বৎসরের পরিণত পুরুষ, জীবনের নানাদিক দেখেছে। অভিজ্ঞ হয়েছে আত্মবিশ্বাস এসেছে। প্রসন্নবাবু মোহিত হ'লেন। কলিকাতায় দ্বিতীয় বার প্রবাসী হয়েছেন তিনি, এখনও প্রবাস অভ্যস্ত হয়নি, যদিও নাম হয়ে গেছে কলিকাতায় তাঁর পূর্ব্ব আলাপীর সূত্র ধরে ধরে। সাদরে পরিমলকে এবার গ্রহণ করলেন তিনি।

আর বৈদেহী? ষোল বছরের ছায়া মিলিয়ে যায়নি তার। চাপা পড়েছিল মাত্র। অবচেতন সত্তা ইঙ্গিত পাঠাত কলিকাতার দিকে। সেখানে আছে সে। চলো, চলো। তাই বাবা কলিকাতাবাসের প্রস্তাব করলে সে উল্লাসিত হয়ে উঠেছিল। অনেক দিন আগে দেখেছিল একজনকে, মনে হয়েছিল এত রূপ মানুষের হয়। চলে গিয়েছিল সে মনোহর, কিন্তু ছায়া রেখে গিয়েছিল। জেনেছিল বৈদেহী আবার দেখা হবে। পুরুষরূপের আদর্শ রেখে সে গিয়েছিল কিশোরীর মনে।

অনিবার্য্যভাবে দেখা হ'ল। উৎসুক মন সঙ্কুচিত হয়েছিল প্রথম সাক্ষাতে। পরিমল আগ্রহে এগিয়ে আসেনি। তবু, যেন জানত বৈদেহী জলসা-প্রাঙ্গনে এর শেষ নয়। আরো আছে।

পরিমলের বাড়ীর কাছে তাদের নূতন বাড়ী কেনা হয়েছে জেনে তো বৈদেহী আশ্চর্য্য হয়নি। দৈবের নির্দ্দেশই সে পেয়েছিল।

চোখের জল মুছে বাজনার পর্দ্দায় ঘা দিল বৈদেহী। কম্পিত আঙুল বাজিয়ে গেল:—

"হায়, মিলনপিয়াসী বিরহবাদলে আঁখিধারে শুধু ভাসে—"

আবার সেই গান! সেই মল্লার আবার? বৈদেহী না পণ করেছে আজ কিছুতেই এ গান গাইবে না সে? এ তার জিদ একটা মনে মনে। কিন্তু

নয়নের জল তো বর্ষণের গানকেই ডেকে আনতে চায়। নাও বৈদেহী, আশ্রয় নাও মল্লাররাগিণীতে। মনের বাদল, সুরের বাদল, আকাশের বাদলে মিশে এক হয়ে যাক। সে আসবে না।

অদৃশ্য বায়ুস্রোতে তোমার-আমার চোখ দেখল একটি মূর্তি। সেই পুষ্পভূষণ, পুষ্পবাণধারী অনঙ্গ। ঈষৎ হাস্য অধরে। যেন তিনি বিদ্রূপ করছেন: জগতে সব শিল্পী প্রেমের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার আশায় শিল্পের দুর্গে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছে। ব্যর্থ প্রেমিকেরা নিজেদের চারিদিকে কাজ, আদর্শ, জনহিত ইত্যাদির প্রাকার নির্ম্মাণ করেছে। মধ্যে বাস করছে তারা, শুষ্ক তৃষিত দেহমন নিয়ে। সেই দুর্গ, সেই প্রাকারের কোন মূল্য আছে সৌন্দর্য্যের ইতিহাসে? প্রকৃত শিল্প রচনা হয় মানব-মনে। সে মন বাদ দিয়ে কি শিল্প গড়বে তুমি? প্রকৃত মহত্ত্বের জন্মদাতা প্রেম। প্রেম ভিন্ন আদর্শ, কর্ম্ম অর্থহীন শ্লোগান মাত্র। ওই পরিখা, ওই দুর্গ ধুলোর মত ধূলায় মিশে যায় আমার সুকোমল একটি মাত্র কুসুম-শরাঘাতে। বৈদেহী তোমাকেও অব্যাহতি দেব না—শিল্পী হ'বার আগে প্রেমিক হও।

যন্ত্র আর্তনাদ করে নির্ব্বাক হ'ল। বৈদেহী ছেড়ে এল যন্ত্র। জানালার কাছে আসনে বসে পড়ল বৈদেহী, দুহাতে মুখ ঢাকল। চোখে জল।

ভাল করতে বৈদেহী, সুরলোকে আশ্রয় নিয়ে। তাই তো পরম আশ্রয় তোমার, নীরবে প্রতীক্ষা করছে। দুর্ব্বল মানুষ, প্রেমের আঘাতে বিহ্বল হয়ে পড়ে, কিন্তু সেই মানুষই সৃষ্টি করে গেছে শিল্পের অবদান, ভবিষ্যতের মানুষের জন্য। যে পরিতৃপ্তি চাও তুমি সে তো মানুষ তোমাকে দিতে পারে না। ভালবাসা সাধনার প্রথম সোপান, শেষ সোপান তো ওই। তোমার মত মানুষের শেষ পথ ওখানে। যিনি তোমার কণ্ঠে দিয়েছেন অসামান্যতা, তিনি তোমার জীবনের উপসংহার লিখেছেন অসামান্যের সন্ধানে। কিন্তু, বৈদেহী পুতুল নাচের খেলার পুতুল হয়েও দড়ির টানের পথ থেকে বারে বারে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে অনঙ্গের শরসন্ধানে। চিরকাল এই তো কৌতুক তার। দেবাদিদেব মহেশ্বরের বক্ষে পুষ্পশরাঘাতে দ্বিধা হয়নি তার। ভস্ম হয়েও পরাক্রম হ্রাস হয়নি অতনু-রূপে ত্রিভুবনের ত্রাস সে—বিধাতার ওপরেও বিধাতা সে।

ছয়

সত্যি, কুরূপে বৈদেহীর যোড়া নেই। ঈশ্বর কেন যে তাকে এমন উপহাস করলেন বলা শক্ত। বৈদেহী বঞ্চিত, ঐশ্বর্য্যের সিংহাসনে বসেও সে যে জন্ম-বিধানে কাঙালিনী। জনতার সঙ্গ এড়িয়ে সযত্নে নিজেকে নিয়ে থাকে সে। জন্মাবধি সে দেখেছে লোকে তাকে নিয়ে কানাকানি করে, হাসাহাসি করে। পথে সে বার হ'লে একদৃষ্টে সবাই চেয়ে থাকে তার দিকে পরম দর্শণীয় বস্তু হিসাবে। লোকে তার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে কথা বলতে ভুলে যায় কুশ্রীতার একটা আকর্ষণ আছে কি না।

বৈদেহীর মন কোমল, শিল্পীর মনের মতই স্বাভাবিকভাবে রূপপিপাসু। তাই, সে মন মেলে দিতে গিয়েছিল জগতের দিকে, বন্ধুত্বের মাধুর্য্য-আহরণে। এক সন্তান, মা বহুদিন গত। বাড়ীতে আশ্রিত-আশ্রিতা ভিন্ন সঙ্গীসাথী নেই। তৃষিতচিত্ত ধাবিত হ'ত সমবয়স্ক মেয়েদের মাঝে, চাইতো ওদের প্রথায় লঘু পুলকে জীবনটাকে বইয়ে দিতে। প্রাইভেট পড়ে প্রবেশিকাপাশ সে করেছিল। আগে অবশ্য স্কুলে যেত। তারপরে এলাহাবাদের মেয়ী-কলেজে ভর্ত্তি হ'ল আই, এ, পড়তে। সামান্য সময় মাত্র।

একদিন অবসর সময়ে মেয়েদের বসবার ঘরে সকলে জমা হয়েছে। নানা জাতির নানা রকমের মেয়ে। সাজপোষাক দেখে মনে হচ্ছে, এটা মোটেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, বিয়ে বাড়ী। কলেজে অবশ্য নিয়ম ছিল সাদা পোষাক। কিন্তু, শাদার উপরেও কারুকার্য্য করা তো চলে।

বৈদেহী ম্লান মুখে একপাশে বসেছিল। গোলাপ-কমলের দরবারে যে সে নেহাৎ অপরাজিতা এ কথা বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় না। বেমানান সে, অতি বেমানান, তবু গভীর আকর্ষণের টানে এদের কাছেই ছুটে আসে, এদের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে বাচতে চায় সে। এদের কাছেই তার আনন্দের উপাদান লুকানো আছে।

ও কলেজে মেয়েদের প্রধান আলোচ্য বস্তু হচ্ছে রূপ ও রূপসজ্জা। কে কত ভাল দেখতে, অমুক পার্টীতে কে কি সাজ করে গেল—এই সব। আজও আলোচনাটা সেই খাতে প্রবাহিত হ'ল।

কণিকা বলল, "আচ্ছা, Suppose there is a Beauty Competition—যদি রূপ-প্রতিযোগিতা হয়, কে প্রথম হবে?"

দ্বিতীয় বার্ষিকের রূপসীতমা ছাত্রী শিরীন শ্রফ্,—একবাক্যে সকলে তাকেই প্রথম স্থান দিয়ে রাখল।

স্বরূপকুমারী বলে উঠল, "বিউটি-কম্‌পিটেশন তো হরদম হোতী হায়। বিউটি-কম্‌পিটেশনকো যানে দেও। লেকিন যব আগলি-কম্‌পিটেশন হোগী তব কৌন উসমেঁ জ্যায়দা"—

স্বরূপকুমারীর কথা হাসির রোলে ডুবে গেল। সুন্দরী রমা মধুর, বিনীত স্বরে বলল, "আমিই বোধ হয় কুশ্রীতার প্রতিযোগিতায় প্রথম হই, না ভাই?"

লিলি পেজ বলে উঠল, "Tut, tut! Fishing for Compliments!"

"ন্যাকামী দেখ? নিজে রূপসী কিনা, তাই বুঝি শুনতে চাওয়া হচ্ছে?" সখীরা রমার কথার প্রতিবাদ করল। রমার মনোভিলাষ সিদ্ধ হওয়াতে সে চুপ করে গেল।

শ্রীমতী নলিনী হচ্ছে গোলমাল বাধাতে ওস্তাদ। একপাশে নিঃশব্দে বসে থাকে, যেন ভাজা মাছটিও ওলটাতে অক্ষম। কিন্তু, দুষ্ট সরস্বতী তার স্কন্ধে প্রায় সর্ব্বদা আশ্রয় করে থাকেন। সে বলে উঠল, "আমি বলতে পারি কে পেত?" জয়ন্তীকে ডেকে নলিনী তার কানে নামটা বলল। জয়ন্তীর মুখখানা কৌতুকহাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে একবার বৈদেহীর দিকে অপাঙ্গে চেয়ে নলিনীকে একটা ঠেলা দিয়ে ভর্ৎসনা করল, "এই চুপ! বড় অসভ্য তুই।"

বৈদেহীর দিকে এই চাওয়াই কাল হ'ল। সকলে স্পষ্টই বুঝতে পারল কে হচ্ছে সেই ব্যক্তি। ফলে হাসি চাপবার ব্যর্থ চেষ্টায় সকলে এমন একটা কাণ্ড করে ফেলল যে অপমানে বৈদেহীর চোখে জল এল। সকলের হাসিতে যোগ দিতে গিয়ে,—যেন সে আসল কথাটা বুঝতে পারেনি, যেন আসল কথাটা তাকে নিয়ে নয়,—বৈদেহী মুখের ভাব আরও শতগুণে বিশ্রী করে তুলল। কি ভাবে বাকী দিনটা তার কেটে গেল তা সে বুঝতে পারল হাড়ে হাড়ে। এমন একটা হাসির কথা আবিষ্কার করে মেয়েরা সারা স্কুল কানাকানি করে বেড়াতে লাগল। দলে দলে মেয়েরা অনাবশ্যক কারণে বৈদেহী যেখানে, সেখানে ঘুরে যেতে লাগল। মুখে চেষ্টাকৃত নিরীহ

ভাবে হাসি জড়ানো। বৈদেহী বেচারী প্রায় একটা school howler এর প্রসিদ্ধি লাভ করে ফেলল এক চপলমতি বালিকার কুক্ষণে উচ্চারিত নিষ্ঠুর কথার মাহাত্ম্যে।

বিকালবেলায় বাড়ীর গাড়ী নিতে এলে বৈদেহী জানালার ভেলভেটের পর্দাগুলো টেনে নিয়ে অপমানের অশ্রু গাড়ীতেই মুক্ত করে দিল।

বাড়ী ফিরতে আত্মীয়া, আশ্রিতা, দাসদাসীর দলে সমারোহ পড়ে গেল। নেত্য চাকর হাতের বইগুলো সসম্ভ্রমে তুলে নিল, জানকীর মা নামী পশমের চটী হাতে এগিয়ে এল। লছমী আয়া মহারাজকে তাগিদ দিতে গেল পুরী বানাতে। মুক্তোমাসী একহাতে দোক্তার কৌটো নিয়ে অভ্যর্থনার হাসি হাসলেন। মোক্ষপিসী সস্নেহে অনুযোগ তুললেন, "আজ আবার টিফিন না খেয়ে ফেরৎ দিয়েছিস কেন, খুকী? মুখখানা যে শুকিয়ে গেছে।"

এরা এলাহাবাদের আশ্রিতা। কারুর ছেলে প্রসন্নবাবুর এখানে কাজ পেয়েছে, কারুর ছেলে নেই মোটে। ভাল এরা কেউ বাসে না বৈদেহী, ওরফে খুকীকে। তার কুশ্রী চেহারা, অশোভন ব্যবহার সমস্ত নিয়ে হাসাহাসি করে নিজেদের মধ্যে। তবু লক্ষপতি প্রসন্নবাবুর একমাত্র সন্তান—বিস্তীর্ণ অর্থের উত্তরাধিকারিণী, সুতরাং মৌখিক সমাদর দেখাতেই হয়। আশ্রয়দাতা, অন্নদাতার আদরের সামগ্রীকে ভবিষ্যতের আশায় স্নেহ দেখাতে হয়, করতে হয় বাৎসল্যের অভিনয়। কিন্তু, নিজেদের কন্যা বা নাত্নীর কথা ভেবে মন হয়ে যায় বিরস। এই রূপের ধুচুনী কেন এত সৌভাগ্য ভোগ করবে? কেবল জন্মের সুবিধায় এর কালো অঙ্গে হীরা-মতির ছড়াছড়ি, আর স্নেহপুত্তলীরা ছেঁড়া শাড়ী পরে বেড়ায়। অমন রূপে বানারসী-আনারসী জড়িয়ে লাভ কি? একচোখো ভগবানের বিধানই উল্টো। ভগবানের সঙ্গে ঝগড়া চলে না পরগাছাদের, চিত্তে কেবল বিরাগ সঞ্চিত হয়ে থাকে বিরুদ্ধে বৈদেহীর।

মিথ্যা স্নেহের অভিনয় এড়িয়ে বৈদেহী নিজের ঘরে চলে এল। কতদিন তৃষিত মন মিথ্যাকে সত্য ধরে নিয়ে পুলকিত হয়ে উঠত, কতদিন সে ভেবেছে মাতৃহারা, কুরূপা হ'লে কি হয়, ভগবান তাকে দয়া করেছেন স্বজনদের মনে এত স্নেহ দিয়ে। কিন্তু, এ বিশ্বাস স্থায়ী হতে পারত না,

অনুভূতিপ্রবণ মন ধরে ফেলত কাঁকি। বৈদেহীর সুখস্বর্গ ধূলায় মিশিয়ে যেত। ফিরে আসত চিত্ত নিজের কোটরে ব্যথা-বেদনার সঙ্গী হয়ে।

তবু, মন কঠিন হয়ে যায়নি তার। সিনিসিজম্ ছাপ ফেলতে পারেনি চিত্তে—কারণ সে শিল্পী, প্রকৃত শিল্পী সে, গায়িকা মাত্র নয়। গানকে সে যখন গ্রহণ করত কণ্ঠে, নবজন্ম দিতে পারত সাধনায়। শিল্পী কখনও কঠিন হয় না। তাই বাইরের জগতে বঞ্চিত হ'লেও মনের চারপাশে কঠিনতার খোলস গড়ে উঠল না বৈদেহীর। ভালবাসার, ভালবাসা পাবার প্রয়োজন রয়েই গেল। প্রতিমুহূর্ত্তে নব প্রতীকের দিকে উন্মুখ হয়ে উঠতে লাগল চিত্ত। দিয়ে যেতে লাগল বৈদেহী, নিতে পারল না যদিও।

অন্যদিন মৌখিক ভদ্রতারও ভদ্র প্রতিদান দেয় বৈদেহী। কিন্তু, আজ আর সে পারল না। লোকচক্ষের অগোচরে পলায়ন ঈপ্সিত তার।

ত্রিতলের ত্রিকোণাকার ঘরটি বৈদেহীর শয়ন-কক্ষ। মূল্যবান আসবাবে সজ্জিত, শাদা মর্ম্মরে আবৃত।

ঘরের মেজের দিকে তাকিয়ে আবার বৈদেহীর চোখে জল এল। এই মসৃন, দুগ্ধশুভ্র পাথরের ওপর কি রকম পা ফেলবে গৃহাধিকারিণী? সে চরণপল্লব শুভ্র কমলদলের সমান হলেই এ ঘরের সঙ্গে মানায়। শাদা মেজের ওপর নিজের কালো পায়ের বৈষম্য দেখে বৈদেহীর মন ধিক্কারে ভরে উঠল

ধীরে ধীরে বৈদেহী খাটের সম্মুখে বৃহৎ দাঁড়-আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আয়নার অতি সন্নিকটে নিজের মুখ নিয়ে দেখছে বৈদেহী।

কই, সে এমন কি খারাপ দেখতে? কেন যে মেয়েরা তাকে নিয়ে এমন বিদ্রূপ করল! রং তার কালো, কিন্তু তাতে তো উজ্জ্বলতা আছে। চোখ-ধাঁধানো শাদা রং অপেক্ষা চোখজুড়ানো শ্যামলিমা অনেক সুন্দর। মুখের সর্ব্বাংশ সৌন্দর্য্যের মাপকাঠিতে নিখুঁত না হ'লেও এই তো মুখে তার কেমন করুণ শ্রী—বিষন্ন, কাতর ভাব। লাবণ্য আছে তার। বৈদেহী মুহূর্ত্তের জন্য ভুলে গেল যে আয়নায় মানুষ নিজের মুখ দেখতে পায় না, দেখে এক লাবণ্যময়ী প্রতিচ্ছায়া, যাকে সে আপন মনের মাধুরী দিয়ে রচনা করেছে।

সে তো কুশ্রী নয়। বৈদেহীর থেকে কত কুশ্রী আছে পৃথিবীতে, তাদের তুলনায় সে তো সুন্দরী। পথে-ঘাটে কত কুশ্রী নিত্য দেখে বৈদেহী। তারা তো সকলেই বৈদেহীর চেয়ে ভাগ্যহীনা। বাড়ীতে যে গোয়ালিনী, ধোবানী

আসে, আয়া—ঝি প্রত্যেকে ওর চেয়ে খারাপ। বাবার মুহুরী, কর্মচারী, সকলের স্ত্রী বৈদেহীর চেয়ে অনেক খারাপ দেখতে। মুন্সী কিষেনলাল তো মস্ত বড় লোক—ওঁর স্ত্রীর কেমন দাঁত উচু, গাল ভাঙা? এ বছরে প্রথম হয়েছে সিনিয়র কেম্ব্রিজে বিদিশা ব্যানার্জ্জি। নামটি সুন্দর হ'লে কি হয়? কালো আবলুষকাষ্ঠ গায়ের রং। অথচ কত নাম ওর? জাষ্টিস মিত্রের মেয়ে মঞ্জুষা মিত্র দেখতে হতকুশ্রী, কিন্তু কিছু তো ক্ষতি হয়নি ওর? কত লোক মঞ্জুষার পিছনে পাগল! অবশ্য মঞ্জুষা সাজে যা সময় ও অর্থব্যয় করে তা সাধারণে সম্ভব নয়। সে ও তাই করবে এখন থেকে। প্রবাসে রূপ-রংয়ের ছড়াছড়ি। প্রবাসিনী বাঙালী, অবাঙালিনীরা রং আর সাজাই বোঝে। এবার থেকে ওদেরি অস্ত্রে দীক্ষিত হ'বে বৈদেহী। গাড়ী নিয়ে কালই যাবে সে, বাজারহাট করে ঘর ভরিয়ে ফেলবে।

ওদের ক্লাশের রঞ্জিতাও তো বৈদেহীর চেয়ে বহু খারাপ দেখতে—তবু কেন সবাই বৈদেহীর ভাগ্যে কুশ্রীতার সভার শ্রেষ্ঠ আসন দিয়ে রেখে দিল অস্পৃশ্যতার গণ্ডি টেনে? অনেকে তো বৈদেহীর চেয়ে খারাপ দেখতে আছে। হয়তো যারা বলেছে তারা বৈদেহীর থেকে অত বেশী ভাল দেখতে বলে অপেক্ষাকৃত অসুন্দরকে তাদের চোখে লাগেনা। বৈদেহী ভাবল হয়তো সে দেখতে ভালোই, তবে অত সুন্দরী মেয়েদের মধ্যে তাকে কুশ্রী লাগে।

এ চিন্তায় বৈদেহীর মনে শান্তি এল। কাজ কি তার অন্যের মতামত দিয়ে? সে নিজে নিজেকে নিয়ে থাকবে। তার কলেজ যেয়ে নাই বা হ'ল পড়াশোনা। বাবাকে বলে সে বাড়ীতে পড়াশোনার বন্দোবস্ত করবে।

খাবার টেবিলে বসে মাংসের কালিয়াতে লুচি ডোবাতে ডোবাতে বৈদেহী নিজের মনে হাসল। আঠারোর চৌকাটে পা দিয়েও কি তার নিজের সম্বন্ধে বিশ্বাস এল না? অন্যের কথার মাপকাঠিতে প্রতিক্ষণে তার নিজেকে মাপতে হ'বে?

মতিমাসী নিতান্ত দায়পড়া গোছের মুখ করে পাখার স্তূঁচটা উল্টে একখানা চেয়ার টেনে খাবার টেবিল থেকে একটু বেশ দূরে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে বসলেন। কি যে হিন্দুঘরের এতবড় ধেড়ে অরক্ষণীয়া মেয়ে টেবিল-চেয়ার পেতে বসে খায়! মহারাজটা যেন আবার কি সব মাংস আনে, মুখে তো বলে

ভেড়ার মাংস। প্রসন্নবাবু হাজার হ'লেও পুরুষমানুষ, কাজের লোক। সাহেবের চালে চলতে হয় ওঁর মানরক্ষার খাতিরে। উনি টেবিলে খান, সেতো স্বাভাবিক। মেয়েটার এত সাহেবী কেতায় দরকার কি? বাপের টেবিলে বসে গো-গ্রাসে না গিলে, ওঁদের খাবার ঘরে পাতাপেড়ে ওঁদের প্রথায় খেলেই পারে?

বৈদেহী খেতে খেতে হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, "মাসীমা, আপনি কি আমার মাকে দেখেছিলেন? তিনি কেমন দেখতে ছিলেন?" মতি-মাসী মনে মনে বল্লেন, কেমন আবার ছিলেন? যেমন মা, তেমনি ছা! কিন্তু একথা তো বলবার উপায় নেই, তাই একটু বিবেচনা করে তাঁকে বলতে হ'ল, "তোমার মাকে যখন দেখেছি মা, তখন তুমি পাঁচ বছরের। তার বয়েস হয়েছিল, নেহাৎ কণে-বউটি তো নয়। চেহারা বুঝবার ঠিক উপায় ছিলনা। তবে শুনেছি, বিয়ের সময়ে রং কালো হ'লেও সে দেখতে সুশ্রী ছিল।"

এইখানে একটি পুরাতন কাহিনীর অবতারণা কর্ত্তব্য। প্রসন্নবাবু রূপহীনা স্ত্রীকে নিতান্ত দায়ে পড়েই গ্রহণ করেছিলেন। নিজের পিতা ছিলেন কপর্দ্দক-হীন, নিঃস্ব। ছেলেটি বি. এ. পাশ করার পরেই বিখ্যাত এটর্ণী অমৃত মজুমদারের একমাত্র কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে শ্বশুরের পসারে বসাবার স্বপ্ন নিয়ে পিতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। প্রসন্ন রায় দেখতে সুরূপ না হ'লেও বি. এ. তে প্রথম হয়েছিলেন। তাই কৃতিত্বে ধনী জামাতা হয়ে গেলেন। অবশ্য অমৃত মজুমদারের কন্যা অতি কুরূপা। তাই ভালো পাত্র তার যুটছিল না। ঘরজামাই রাখার ইচ্ছা নিয়ে অমৃত মজুমদার প্রসন্ন রায়ের হাতে কন্যাদান করলেন। তাকে এটর্ণীশিপ পড়িয়ে মানুষ করে তুললেন। এলাহাবাদে তিনি এটর্ণী ছিলেন, জামাইকেও সেইখানে বসালেন।

প্রসন্নবাবু দরিদ্র সন্তান হ'লেও ছিলেন কবিচিত্ত। প্রেমের বাসনা ছিল তাঁর যথেষ্ট। কলেজজীবনে অনেক তরুণের মত মানসীর স্বপ্ন তিনি দেখতেন। এলাহবাদ প্রবাসী শ্বশুর, বিবাহের পূর্ব্বে মেয়ে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু, পরিচিত লোকের মুখে ভাবী পত্নীর বর্ণনা শুনেই তাঁর বিতৃষ্ণা হ'ল। জীবনে যদি পত্নী মনোনীতা না হয়, তবে জীবনে সুখ কি? তাই তিনি সহপাঠি ও সমবয়সীদের দ্বারা মা-বাবার কাছে এ বিবাহ

বিষয়ে বিস্তর আপত্তি জানিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। পিতার আদেশে বিয়ে করে বাড়ী ঢুকলেন তিনি নিজের একুশবছরের তরুণ, রূপাকাঙ্ক্ষী মনের সঙ্গে মুখ অনেকটা ভারী করে। এই মুখ ভার তাঁর ঘুচল সেদিনই, যেদিন একমাত্র কন্যা বৈদেহীকে রেখে স্ত্রী দেহত্যাগ করলেন চল্লিশবৎসর বয়সে। প্রসন্নবাবুর বয়স তখন বিয়াল্লিশ বৈদেহী দশ।

কথাটা শুনতে বিশ্রী লাগে জানি, যে সহধর্মিনী পত্নীর মৃত্যুতে কেউ প্রীত হয়। 'প্রীত' হননি প্রসন্নবাবু, ততটা হৃদয়হীন নন তিনি, তবে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তি পেলেন। কারণ স্ত্রী শুধু কুরূপাই ছিলেন না। রূপহীনতার সঙ্গে প্রেমহীনতাও ছিল তাঁর। তিনি বড়লোকের আদরিণী দুহিতা, নিজের অপূর্ণতা তাঁকে দেখতে শেখানো হয় নি। মাতাপিতার স্নেহে-যত্নে লালিতা। গরীব স্বামীকে শ্রদ্ধা করতে শিখলেন না, পিতার গলগ্রহ জামাতার পৃথক কোন মূল্য তিনি দিলেন না। বরঞ্চ স্বামীর বিতৃষ্ণা উপলব্ধি করে কলহপ্রিয়া হ'লেন। প্রসন্ন বাবুর নয়ন অতৃপ্ত ছিল, মনও অতৃপ্ত হ'ল। স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা ছিলনা, একত্রে শয়নও বিরল ছিল। যৌবনে প্রসন্নবাবু কখনও বা পত্নীর প্রতি যৌবন-সুলভ আবেগে প্রধাবিত হ'তেন, কিন্তু অহঙ্কার ও তাচ্ছিল্যের দুর্গে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসতেন। ক্রমে ক্রমে আবেগ ও ইচ্ছা চলে গেল, রইল অনাসক্তি ও মুখভার।

স্ত্রী দেহত্যাগ করবার পরে মনে মনে প্রসন্নবাবু সবিশেষ ব্যগ্র হয়ে উঠলেন একটি উদ্ভিন্নযৌবনা অনবদ্যাঙ্গীর পাণিগ্রহণ করবার জন্য। গোপনে গোপনে তিনি ঘটকী নিযুক্ত করলেন। তাঁর বয়স তখন পয়তাল্লিশ প্রায়। কন্যা তের। পাত্রী পেলেন বহু, কিন্তু পেলেন না তরুণ যৌবনের ধ্যানের মানসীকে। সে সুলভ হ'ল না দোজবরের কাছে। এ বয়সে বাংলার পুরুষ নিজেকে সুপাত্র ভাবলেও তরুণীরা ইউরোপীয় শিক্ষার সম্পূর্ণ প্রতিকূলতা করে এ বয়সের পাত্রকে ঘাটেরমড়া আখ্যায় অভিহিত করতে চায়। যারা সুলভ হ'ল, তাদের কাউকে প্রসন্নবাবুর পছন্দ হ'ল না। বন্ধুবান্ধব বিদ্রূপ করতে লাগল। ত্রয়োদশী কন্যা ঘরে প্রদীপের মত জ্বলছে। নানা কারণে প্রসন্নবাবুর বিয়ে করা হ'ল না। বঞ্চিত কামনা তিনি পরিতৃপ্ত করলেন কন্যা বৈদেহীকে অতিযত্নে লালন-পালন করে। স্ত্রীকে কোনদিন

ভালবাসতে না পারলেও কন্যাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। সে যে তাঁর কন্যা, একান্ত তাঁরি। তাঁর পৌরুষ প্রেম একে জন্ম দেবার জন্যই উদগ্র হয়ে উঠেছিল কোন এক বর্ষারাত্রে। শ্রীহীনা, অপ্রিয়া পত্নীর অনাদৃত দেহতটে আঘাত করে তাঁর জৈববাসনা জন্ম দিয়েছিল এই সন্তানকে। সেদিন পত্নীকে প্রেয়সী বলে ক্ষণিকের জন্য ভ্রম হয়েছিল। তাঁর ব্যগ্র অধরের নিরবিচ্ছিন্ন পেষণের নিম্নে রুক্ষভাষিণীর কলহ-কণ্ডুয়ন নিবৃত্ত ছিল। সহসা মনে হয়েছিল এ তাঁর পত্নী নয়, মানসী তাঁর। যৌবনুমালঞ্চে একদা এরই প্রতীক্ষায় আহ্বান-মন্ত্র বেজে উঠেছিল, আবার নির্ব্বাক হয়ে গিয়েছিল সহধর্ম্মিণীর সাক্ষাতে। সেই বর্ষারাতে প্রসন্নবাবু সব ভুলে গিয়েছিলেন। দেহমনের অবাধ মুক্তি দিয়েছিলেন। পিতার কবিমন ও প্রেমলিপ্সা নিয়ে বৈদেহীর জন্ম সূচিত হ'ল সেই উন্মাদ বর্ষারাত্রে। কুরূপা মাতা রূপহীন পিতার কন্যা অতি কুরূপা হ'ল— কিন্তু মন হ'ল তার প্রেমিক।

বৈদেহী আবার মতিমাসীকে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, আমি কি আমার মায়ের মত হয়েছি দেখতে ?"

মতিমাসী বড় বিপদে পড়লেন, কি বললে যে বৈদেহীর মনরক্ষা হ'বে সেটা বোঝা ভার হ'ল।

ইতস্তত করে তিনি আরম্ভ করলেন, "হ্যাঁ, না, তা, তুমি তো মায়ের মতই হয়েছ প্রায়"—

এমন সময়ে পরদা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন বৈদেহীর পিসী। আশ্রিতাদের মধ্যে নিকট সম্পর্ক বলে এঁর প্রতাপ আছে। অনেকক্ষেত্রে পিতা-পুত্রীর মুখ না চেয়েই মতামত দেবার ক্ষমতা রাখেন তিনি।

ঘরে ঢুকে ভারীগলায় পিসী জিজ্ঞাসা করলেন, "কি, কার কথা হচ্ছে ?" মতিমাসী বেচে গেলেন, বল্লেন, "এই খুকীকে বলছিলাম যে ও ওর মায়ের মতই হয়েছে দেখতে"—

পিসী বাধা দিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বল্লেন, না, না, ও কেন মায়ের মত হ'বে ? ওর মা'র রং কালো হ'লেও চেহারার তো ছিরিছাঁদ ছিল। ওর চেয়ে ওর মা অনেক ভালো ছিল দেখতে।"

পলকে বৈদেহী বিবর্ণ হয়ে গেল। উৎসুক চোখের তারা নেমে এল অর্দ্ধভুক্ত খাবারের ওপর।

তাহ'লে সে মায়ের চেয়েও খারাপ দেখতে? মাকে যতটা মনে আছে দেখেছে কুরূপা, শুনেছে মায়ের রূপহীনতার কাহিনী। ঘরে মায়ের যে বড় ছবি আছে তাতেও তো তাঁর চেহারা বিশেষ সুবিধার নয় ব'লে মনে হয়েছে। সে নিজে তাহ'লে কি?

মায়ের শেষস্মৃতি মনে পড়ে গেল। কালো মুখের উপর মৃত্যুর নীল ছায়া। মুখ আরও কালো, আরো শ্রীহীন দেখাচ্ছে! মায়ের মৃত্যু হয়েছিল আকস্মিক ভাবে কলেরায়। কলেরা লেগেছিল শহরে, প্রসন্নবাবু বাড়ীতে বাজারের খাবার আনা নিষেধ করে দিয়েছিলেন! স্ত্রী স্বামীর নিষেধে ভ্রূক্ষেপ না করে, স্বামীকে আঘাত দেবার উদ্দেশে গরম পকৌরি কিনিয়ে এনে খান। ফলে, রাত কাটল না। সেই মুমূর্ষু মাতার মুখ এখনও মনে আঁকা আছে বৈদেহীর। চোখের তারা শিবনেত্র হয়ে গেছে প্রায়—কালো তারায় মৃত্যুর নীল ছায়া, সাদা অংশ ঘোলাটে হয়েছে! পরদা যেন পড়ছে দৃশ্যমান জগতের উপর দিয়ে। বৈদেহীর হাত ধরে এই পিসী মায়ের সঙ্গে শেষ দেখা করাতে গিয়েছিলেন। বর্ষণমুখর আষাঢ়ের দিন, রাত্রি নয়টা। ঘরে নীল আলো জ্বলছে। বিছানায় স্বামী, মাথার শিয়রে চেয়ারে ডাক্তার বসে। নার্স কোনে দাঁড়িয়ে শেষ ইনজেকশান প্রস্তুত করছে। ঘুমভাঙা চোখ বিস্ফারিত করে দেখল বৈদেহী, দশ বছরের মেয়ে। মাতার অবস্থা দেখে কষ্ট হ'বার পূর্ব্বেই মনে হ'ল তার, কি কুশ্রী এই রমণী! মৃত্যু একে শান্ত বিষণ্ণতা দিতে পারছে না, দিয়েছে বীভৎসতা!

বৈদেহীর মা প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ মেলে চাইলেন মেয়ের দিকে। সে দৃষ্টি এখনও মনে আছে বৈদেহীর। তাঁর চোখ যেন বলতে চাইল, 'বৈদেহী, বড় দুঃখ হচ্ছে তোমার জন্যে! তুমিও যে বঞ্চিতের দলে। যদি এত বঞ্চিত হও জন্মক্ষণে, তাহ'লে ভবিষ্যতে কি আশা থাকতে পারে, বল বৈদেহী? ভেবোনা অত কুরূপের বোঝা মাথায় চাপলে তার জীবন কাটে স্বাচ্ছন্দ্যে। যত গুণই থাক, যত কৃতিত্বই দেখাতে পার না কেন, জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আপনা থেকে তোমার কাছে ধরা দেবে না। লক্ষে একজন পুরুষ তোমার মত কুরূপাকে ভালবাসতে, সঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে।

যতই না কেন গলা সাধো, ছবি আঁকো, মেডেল-বুকে বাড়ী ফেরো, এই একটি মাত্র পুরুষের কাছে তোমার মূল্য তুমি পেলেও পেতে পারো। তাও, সারা জীবনে সে পুরুষের সঙ্গে তোমার হয়তো দেখাই হ'বে না। যাদের সঙ্গে হ'বে, তারা তো তোমার গুণবাহুল্যের দিকে ফিরেও চাইবে না। তারা ছুটবে দুধে-আলতা-বরণ, হরিণ-নয়ন, মরাল-গমন, কমল-চরণ, এ সবের পশ্চাতে। অথচ তুমি চাইবে পুরুষকে—প্রেম-পরিতৃপ্তির আশায়, গৃহ ও সন্তানের বাসনায়। সুতরাং বৈদেহী, জীবনে দুঃখ-কষ্টের জন্য প্রস্তুত হয়ে থেক! দেখনা আমাকে, কিছুতেই তো স্বামীর মন পেলাম না।"

তখন অবশ্য শিশু বৈদেহী অত কথা বোঝেনি। এখন আড়ালে বসে মাতার অন্তিম দৃষ্টির স্মৃতি চিন্তা করলেই এই সব কথা পায় সে।

বৈদেহীর মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে পিসী বুঝলেন। মনটা তাঁর নরম হয়ে এল। গলার সুরে সান্ত্বনার রেখা টেনে এনে তিনি বল্লেন, "রূপ ছিল না বটে তোমার মায়ের, কিন্তু গুণ ছিল তার। আমাদের সঙ্গে কি ব্যবহার করেছে, চমৎকার! দেবদ্বিজে ভক্তি, দুঃখী-দীনে দয়া। বিদেশে পড়ে থাকলেও একটা দিন ধর্ম্ম ছাড়েনি। পেরেছে প্রসন্ন তাকে টেবিলে বসে খাওয়াতে, সাহেবী নেমন্তন্নে নিতে? এত বড়লোকের বউ! মিলের আধ-ময়লা শাড়ী পরে কাটাত। তোর মায়ের মত যেন তুই হ'তে পারিস, এই কথাই বলি। বাইরে দিয়ে আর কি হয়, বল? ভেতরটাই তো মানুষের চেনা উচিত। যাদের রূপ নেই গুণ দিয়ে তাদের পূর্ণ করা উচিত রূপের অভাবটা।" পিসীর কথাগুলোর মধ্যে প্রচ্ছন্ন খোঁচা ছিল, সান্ত্বনার প্রচেষ্টাও অবশ্য ছিল। বৈদেহী যে এত লোকজনের মধ্যে একা একা থাকে, নিজেকে নিয়ে পরিজনদের ভুলে যায়, এটা পিসী পছন্দ করতেন না। মা নেই ওর, অভিবাবকত্ব পিসীর স্কন্ধে পড়ে। কালো-কুচ্ছিৎ হ'ক, বিবাহ তো দিতেই হ'বে। পরের বাড়ী যেয়ে এমন গুমঠে থাকলে লোকে তো পিসীকেই দুষবে। তাছাড়া সাহেবী ভাবে চলবার দরকার কি হিন্দু মেয়ের? অত সাজ-পোষাকে পয়সা নষ্টও পিসী বুঝতে পারেন না। বৈদেহীর মা ছিলেন পিসীর আদর্শ—পেত্নী সেজে চিরকাল সৌখিন স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। স্বামী নিয়ে মাতা-মাতি বাল-বিধবা পিসার ভাললাগত না। সুতরাং সেদিকে বৌ ছিলেন আদর্শ। শুয়ে থাকতেন আলাদা পৃথক শয়নকক্ষে, যদিও কন্যা থাকত বাবার

ঘরে। স্বামীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করতে কেউ দেখেনি তাঁকে, অথবা সেজে-গুজে স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে যেতে। বরঞ্চ, আশ্রিতাদের মধ্যে গল্প গুজবে থাকতে ভালবাসতেন তিনি। সাজপোষাকে রুচি ছিলনা—এটিও পিসীর পছন্দ। নিজের থান কাপড়ে বৌয়ের আধময়লা মিলের শাড়ীর মিল পেতেন কিনা। নিরাভরণ দেহের মিল পাওয়া যেত মিনমিনে চুড়ী কগাছা আর সুতলী হারে। সুতরাং পিসীর আদর্শ ছিলেন বৈদেহীর মা। গরীব আশ্রিতারাও পছন্দ করতেন গৃহিণীকে। ঐশ্বর্য্যের দম্ভ মজ্জাগত থাকলেও বাহ্যপ্রকাশ তো ছিল না। নিজেদের ও ধনী গৃহিণীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য না পেয়ে তারা প্রীত থাকত। বসন-ভূষণের দীপ্তি চোখ ঝলসে দিত না। মহাত্মা গান্ধী বস্ত্রহীনের সঙ্গে নিজের পার্থক্য কটীবাসমাত্র ধারণপূর্ব্বক বিদূরিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। নিজেদের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ সামান্য দেখে দরিদ্র দেশ পুলকিত হয়ে উঠেছিল। এ-ও তাই।

পিসীর নৈতিক উপদেশ বৈদেহীর ভাললাগল না। সান্ত্বনার ভাষা সর্ব্বদা মধুময় হয় না। মুখের উপরে কদাকার আখ্যায় চিহ্নিত করে তারপরে গুণের শ্রেয়তার ব্যাখ্যান শ্রোতার কাছে রুচিকর না হ'লে অন্যায় বলা চলে না। বৈদেহীর ভারাক্রান্ত মন এ ধরণের কথায় সান্ত্বনা মানল না।

কোনমতে খাওয়া শেষ করে বৈদেহী নিজের মহলে উঠে গেল। আবার বৈদেহী আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। এবার কিন্তু, ওর সেই আত্মপ্রসন্ন ভাব নেই।

কি বিশ্রী! কি বিশ্রী! নিজের মনে মনে বৈদেহী ভাবল। মুখের প্রতিটি অংশ অসমান, সামঞ্জস্য নেই কারুর সঙ্গে কারুর। রুক্ষ, কঠোর মুখ-ভাব। নারীর কোমলতা নেই সেখানে, নেই মাধুর্য্য। কঠিনতার সাধনা চলেছে। কোথাও শ্রী নেই, শোভা নেই। 'God made human face divine'—কথাটা শোনা ছিল। এই কি সেই দেবতার মত সুন্দর মুখ?

বৈদেহীর মুখের রেখা কঠিনতর হয়ে উঠল, চোখ জ্বালাময়, দৃঢ়সম্বদ্ধমুষ্টী। এখনি যেন সে এই কদাকার দেহকে চূর্ণ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে লুপ্ত করে দেবে। এ দেহ, এ কুরূপ যেন বৈদেহীর নয়, এ একটা ফাঁকি।

কেন, কেন এই প্রভেদ? ঈশ্বর তাকে আর অন্য মেয়েদেরকে তো একই হাতে তৈরী করেছিলেন। তবে, তারা কেন লাবণ্যে, প্রেমে ঝলমল করে

উঠবে, সেই বা কেন বিশ্বের সমস্ত কুরূপ একা বহন করে বেড়াবে? এত অবিচার কেন বিধাতার?

বেদনার চরম সীমা রুদ্ধ অশ্রু-প্রবাহ। এখন বৈদেহীর চোখে জল এল না। মনের দুঃখ অশ্রু রূপে ঝরে তাকে শান্তি দিতে পারল না। প্রখর রৌদ্রালোকে অসহ অনাবৃষ্টির আকাশ তার প্রখর দুইচোখ বিদ্রোহের জ্বালায় জ্বালাময় হয়ে নিজের কুরূপকে লুপ্ত করে দিতে চাইল। জীবনে আজ প্রথম তার এই আত্মানুভূতি।

সাত

আইভি সোফার উপরে কাত হয়ে বসে 'মাদাম বোভারি' পড়ছিল। পায়ের কাছে জাপানী কুকুর ওপ্যাল কুণ্ডলী পাকিয়ে নিদ্রাগত।

"ওপ্যাল"। সাড়াশব্দ না পেয়ে আইভি বইখানা ছুঁড়ে কার্পেটের উপর ফেলে দিল। সময়ে সময়ে গল্পের বই তার ভাল লাগে না, বিশেষ করে মতে না মিললে। বেচারী নায়িকা, রূপ-রুচির বালাই নিয়ে মরল সে। অত রূপগুণের যোগ্য সমাদর কেউ করল না, আশ্চর্য্য! গেঁয়ো ডাক্তারের বৌ হয়েই জীবনটা কাটিয়ে দিল ও।

সোফার হাতলে জুতো-পরা পা দু'টো তুলে নরম কুশানের আরামে ডুবে গিয়ে আইভি গান ধরল ভাঙা-ভাঙা বেসুরো কণ্ঠে—

'I ain't nobody's darling—"

আইভি গান গাইতে পারে না। এখানে সেখানে একআধটা যা শোনে তাই নিয়ে মাঝেমাঝে গুণগুণ করে। কথা বলার কণ্ঠ আইভির মহিলা-জনোচিত মিহি ও মসৃণ নয়, একটু চাপা। ভিজে কুয়াশায় যেন ভারী। সবাই বলে ও কণ্ঠের ওই আকর্ষণ—রক্তকে উদ্বেল করে তোলে ওই ভাঙা-ভাঙা চাপা গলার কথা।

এক লাইন ক্রমাগত গেয়ে গেয়ে আইভি ভ্রূকুঞ্চিত করে পরের লাইনটি মনে আনবার যথেষ্ট চেষ্টা করল। হতাশ হয়ে কোনে ত্রিপদীতে রক্ষিত বড় ঘড়িটার দিকে চেয়ে আইভি হিসাব নিল সময়ের। চা-দেবার এখনও

আধঘণ্টা বাকী আছে। এখন সাড়ে তিনটা মোটে। বাধ্য হয়ে আবার আইভি গান ধরল,—

"I ain't nodody's darling"

এক লাইন গান আর কতক্ষণ গাওয়া চলে? শ্রান্ত হয়ে আইভি বিরত হ'ল। এমন বাড়ী আছে কোথাও? যার যখন খুশী চা খাবে তা নয়, সকলকে এক সঙ্গে খেতে হ'বে। আইভির অভ্যাস ছিল তিনটায় চা খাওয়া, ভাই সুনীলের চারটায়, মায়ের পাঁচটায়। বাবা বৈকালিক চা-পর্ব্ব মিটিয়ে বাড়ী ফিরতেন। এখন মিসেসচক্রবর্ত্তি সবের সামঞ্জস্য করে সকলের এক-সঙ্গে চা-পানের ব্যবস্থা করেছেন চারটায়। কেন, আইভি ভালো করেই জানে। এক এক সময়ে এক একজন চা খেলে নাকি খরচ বেশী লাগে, খানসামা চুরির সুযোগ পায়। For shame! ভ্রূকুঞ্চিত করে আইভি মনে মনে ভাবছে। যে সব লোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের চলতে হয়, তারা যদি এই সব ভেতরের গলদ টের পেত, তাহ'লে হয়তো আর মুখ দেখাবার উপায় থাকত না। কিন্তু, মিসেসচক্রবর্ত্তি সাবধান ছিলেন। বাহির দেখে মনেও হতনা চক্রবর্ত্তি-বাড়ীতে এই ধরণের সামান্য বিষয়ে মনোযোগ ব্যয় করা হয়।

মায়ের ব্যবস্থায় বাড়ী চলেছে চিরকাল। এ বাড়ীতে ম্যাট্রিয়ার্ক প্রথা। এ কাহিনীতে চক্রবর্ত্তিসাহেব অদৃশ্য। রূপ ছাড়া তাঁর কোন যোগ্যতা নেই। তাই সুন্দর ছবির শোভায় আমরা তাঁকে মিসেসচক্রবর্ত্তির শয়ন-মন্দিরে টাঙিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত থাকব।

সুনীল দীর্ঘকাল বিদেশে ছিল। মরি-বাঁচি করে খরচ জুগিয়েছেন মিসেস চক্রবর্ত্তি। তাঁর পুত্র 'ফিরিঙ্গি' যাবে না, হ'তেই পাবে না। তাহ'লে তো তিনি হরিজন হয়ে যাবেন। ঋণভার আরও বর্দ্ধিত হ'ল। আইভি রইল মায়ের হাতে ছাঁচে তুলে গড়ার মত মা গড়ে তুলতে চাইলেন তাকে।

বাইশ বছরের জীবন আইভির—কিছু পরিমাণে গৃহগত, মাতৃনির্ভরশীল। মা তাকে গড়েছেন, সাজিয়েছেন। নিজের অপূর্ণ জীবনের সব আশা ও আকাঙ্খা মা আইভির মধ্যে মূর্ত্ত দেখতে চান। অভাবের সংসার, তবু বর্ম্মের মত মিসেস চক্রবর্ত্তী কন্যাকে আবৃত করে আছেন। বেশভুষার অভাব, স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব কোথাও নেই। বড়লোকের মেয়ের মতই আইভি মানুষ হয়েছে, বড়লোকের মেয়ের চালেই চলছে এখনও। যাতে তার বড় ঘরের

ছেলেমেয়ের সঙ্গে সমান মেলামেশায় অধিকার জন্মে। যাতে সে উপযুক্ত বিবাহ করতে পারে। মিসেস চক্রবর্তীর প্রচেষ্টা আইভির অসামান্যতাকে তুলে ধরেছে। আজ আইভির চতুষ্পার্শে মধু-মক্ষিকার ভিড়। আইভির সান্ধ্য সম্মেলনে প্রত্যহ তরুণ-তরুণীর সমাবেশ। স্বাধীনা আইভি। মা কোন অভাব রাখেননি। একটি মাত্র গাড়ী, আইভি চাইলেই পায়। সিনেমা, পিক্‌নিক্ কোনটাতে সঙ্গী-মনোনয়নে তার বাধা নেই। কিন্তু মিসেস চক্রবর্তী একটা তথ্য বুঝতে ভুল করেছিলেন। আইভির চারপাশে জনতার ভিড়ে অবাঞ্ছিত লোকও মিশে চলে আসতে পারে। এসেছেও। কিন্তু, পূর্ব্বে কোন গোল বাধেনি। আইভির উচ্চাভিলাষী মন তাদের বিতাড়িত করেছে। কিন্তু, উচ্চাশাও তো পরাস্ত হয় প্রেমের কাছে। জনতার ভিড়ে অবাঞ্ছিত পরিমল লাহিড়ী এসে পড়েছে রূপের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে। আইভি তাকে ভাল-বেসেছে। মিসেস চক্রবর্ত্তী নিরুপায়। কন্যাকে অবাধ স্বাধীনতা দেবার ফল হাড়ে হাড়ে বুঝলেন। কিন্তু, সাবলিকা আইভি, আইভি সাহসিকা। তিরস্কার বা বল-প্রয়োগে ফল বিপরীত হবে। নরম-গরমে বোঝাবার পন্থা মিসেস চক্রবর্ত্তী গ্রহণ করলেন। অক্লান্ত অধ্যবসায়ে তিনি তা করে যাচ্ছেন।

উচ্চাঙ্গের সাহিত্য আইভি বেশীক্ষণ বরদাস্ত করতে পারে না। বন্ধু-বান্ধবদের মতই সে জ্ঞান-ভাণ্ডারের পল্লবগ্রাহী মৌমাছি মাত্র। অথচ, জ্ঞান-রূপ গহনায় তাদের দীপ্তি থাক বা না থাক, ঝঙ্কার প্রচুর। বাজারে প্রকাশিত সাহিত্য পড়া হ'ক না হ'ক, মাঝে মাঝে উদার ভাবে আলোচিত হয় স্বীয় সাহিত্য-প্রীতি প্রকাশার্থে। বিদেশী সিনেমায় আগত বইগুলির বিষয়ে এ ওকে জিজ্ঞাসা করে নেয়, "পড়েছ তো?" অশ্লীল মার্কিন সাহিত্য অবশ্য অল্প বিস্তর সবাই পড়ে। ফরাশী সাহিত্যও কখনও আদৃত হয়। তবে বড়-বড় গুরুভার বই পড়ার সময় কোথায়? তবু, ফ্যাশান যেটা, মরে-কুটে দেখে নিতেই হয়। বেচারী মাতৃভাষা কদাচিৎ আমল পায়। ফ্লোবার বেচারী ফ্যাশানে পড়েছেন। তাই ছয়মাস ধরে আইভি চেষ্টা করছে 'মাদাম বোভারি' শেষ করতে।

সমাজস্থ অন্য মহিলাকুলের প্রথায় বিদেশী সাময়িকী অবশ্য আইভির ঘরে স্তূপাকৃত আছে। পড়তে ভালবাসে আইভি। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সে সহ্য করতে পারে না! মনে হয়, নিজের জীবনে কোথাও ফাঁকি আছে, কোথাও

আদর্শের উচ্চতা নেই। কাঁচ আঁচলে বেঁধেছে সে হীরাখণ্ডের পরিবর্তে ; মন আকুল হয়ে ওঠে। তখন 'Woman and Beauty', 'Glamour', 'True Story' নিয়ে ভুলে থাকে সে। আজও 'মাদাম বোভারি' ফেলে একখানা 'Mc. Calls' পত্রিকা তুলে শ্বেতাঙ্গিনীর জামার ছাঁটকাট জানতে ব্যস্ত হ'ল আইভি।

আচ্ছা, সমস্ত মার্কিণ ও ব্রিটিশ মহিলা-পত্রে গল্পের কয়েকটির বাঁধাধরা ছক আছে—আইভি ভাবল। সুন্দরী তরুণীর হৃদয়হীনতার পাশে রূপ-হীনার গুণগরিমার ব্যাখ্যা। সুন্দরীকে বিশেষ ভাবে নির্গুণ করা হয়, যেন রূপসী সৎস্বভাবা হ'তেই পারে না। ওধারে সাধারণ নায়িকার উচ্ছসিত প্রশংসা, নীরব প্রেম ও স্বার্থত্যাগ! অবশেষে রূপসীর স্বরূপদর্শনে মর্মাহত নায়কের রূপহীনার বাহু-বন্ধনে আত্মসমর্পণ। পাঠিকা এখানে অবশ্যই চোখে রুমাল দেন।

অন্য একটি ছক! নায়িকা জানে না সাজতে—নায়ক চেয়েও দেখেনা তাকে। সুসজ্জিতা নারীর পশ্চাৎধাবন করে সে। হঠাৎ, কোন সহৃদয় ব্যক্তির কৃপায় সে মেয়ে নূতন একটি ফ্রক ও নূতন ধরণের কেশসজ্জায় রূপসী হয়ে উঠল রাতারাতি! যুগল মিলন হ'ল।

আর একটি ছক—বড় প্রিয় এটি টাইপিষ্ট ও কেরাণী মেয়েদের। কাজের ফাঁকে ও নিসঙ্গ সন্ধ্যায় গল্প পড়ে মনে কল্পনার জাল বোনে তারা! গরীবের মেয়ের অবশেষে কোটিপতিকে আকর্ষণ! টাকার পটভূমিতে কি স্বর্গীয় প্রেম! ভারতবর্ষীয়কে মূঢ় বলে যারা অবজ্ঞা করে, সেই সব বিদেশিনীরা এই ধরণের কাহিনী গোগ্রাসে গেলে! আইভির পড়ে হাসি পায়। তবু তো তার জীবনের আশাও এই—অন্ততঃ তার মায়ের আশা।

টাকা! টাকা! টাকা কি জিনিষ? অভাবে এত অশান্তি, এত দুশ্চিন্তা! অথচ সব থেকে অভিশাপ হচ্ছে অর্থহীনের সম্ভ্রান্ত হওয়া। 'ওল্ড ব্যালি-গ্যঞ্জের অন্য দশটা বাড়ীর অধিবাসীদের সমকক্ষ চলতে হয় তাদেরকে! অথচ ব্রিফ্‌লেস্ ব্যারিষ্টারের পক্ষে সে ঠাট বজায় রাখা দুরূহ ব্যাপার! অসাধ্য সাধনের ব্রত নিয়েছেন মিসেস চক্রবর্ত্তি।

পৃথিবীতে টাকা বাদ দিলে আর থাকে কি? মিসেস চক্রবর্ত্তির বহুদিন-শ্রুত উপদেশাবলী কানে ভেসে এল আইভির। তখন অগ্রাহ্য করলেও প্রাণে

বাণী গেঁথে দেন জননী। জল পড়ে ক্রমাগত পাথরও ক্ষয় হয়ে যায়। নিরালা ক্ষণে মাতার নিষেধবাণী, সতর্কভাষণ মনে চলে আসে নির্ব্বিচারে। আজ কাল প্রায়ই হচ্ছে।

চুপ করে ছাদের দিকে চেয়ে আইভি ভাবছে রজতমুদ্রা-মহিমা। বিবাহ? সে-ও অর্থের নিমিত্ত। প্রেমের জন্ত বিবাহ করে কারা? নির্ব্বোধ যারা, তারাই।

প্রেম গোধূলীর রক্ত-আকাশে একটা বর্ণচ্ছটা মাত্র। নিশীথের অবগুণ্ঠন নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যাবে। রজনীর অন্ধকার পট গড়ে থাকবে পশ্চাতের জীবনের সমস্ত আশা ও আনন্দকে অবরুদ্ধ করে।

সে ভালবাসে পরিমলকে।—এই কি ভালবাসা, মানবের অভিধানে প্রেম? তার ভাল লাগে পরিমলের কথা, পরিমলের সঙ্গ, পরিমলের রূপ। আইভির ভাললাগে পরিমলকে ভালবাসতে। আরও ভাল লাগে দৈহিক স্পর্শ। এ ভালোলাগা যে চিরদিন থাকবে, কে জানে তা? মানসিকতায় এমন বৈশিষ্ট্য নেই পরিমলের, যা নিয়ে গর্ব্ব করা চলে। চারিত্রিক উচ্চতা আইভি পায় না তো পরিমলের মধ্যে। লঘুচিত্তা, বিলাসিনী আইভি, কিন্তু তারও তো অবচেতন মনে নিদ্রিত আছে মহতের স্বপ্ন। মাতার শিক্ষায়, মাতার প্রভাবে মানুষ হয়েছে আইভি। চারিদিকে দেখেছে সুবিধাবাদীর জয়যাত্রা। শুনেছে আত্মসর্ব্বস্বের সুউচ্চ শ্লোগান। রমণীর রূপযৌবনের একমাত্র মূল্য দেখেছে পুরুষের ঐশ্বর্য্য। সেখানে হৃদয় নেই, আদর্শ নেই। অস্থির জীবন—পশ্চিমী সভ্যতার জড়-বাদী পবনে ভোগ-দেবতার মূর্ত্তি স্ফীত হয়ে উঠেছে বাঙালী-সমাজের প্রাঙ্গনে। ম্যামন ডাকছে শিকারকে। দলে দলে মহিলা পুরুষ চলেছে ঊর্দ্ধগ্রীব আকাশকুসুমের আশায়। এই দলে ভোগবাদিনী মাতার নিকৃষ্ট শিক্ষায় আইভি কিয়ৎপরিমাণে দলীয় কুমারী-বৃন্দের তুল্য হয়ে গিয়েছিল। জীবনের উদ্দেশ ভোগ—ভোগের বাহন ঐশ্বর্য্য। ঈদৃশ জীবনদর্শন গ্রহণ করে পথ চলে আইভি নির্ব্বিচারে। পিতামহ ছিলেন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, দার্শনিক ব্যক্তি। পিতামহী ভোগবাদিনী। একমাত্র পুত্র তাঁদের ব্যক্তিত্বহীন। মাতায় আবহাওয়ায় পাশ্চাত্যপন্থী। তবু, পিতামহের অনুসন্ধিৎসা হয়তো কণামাত্র ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল, তৃতীয়পুরুষ আইভিলতার মনের কানাচে। কখন কখন আইভি অনিবার্য্যরূপে মাতার ভাষায়

নীচে ঘণ্টা বেজে উঠল। ধন্যবাদ ঈশ্বর! এতক্ষণে একপেয়ালা চা পাওয়া যাবে। ঘাসের চটী পায়ে টেনে আয়নার সম্মুখে চুল ঠিক করে আইভি নীচে নামল, মুখে তার গান,

"I ain't nobody's darling,"

নীচে চায়ের টেবিলে সুনীল তখন মিসেস চক্রবর্তীর সঙ্গে তুমুল কলহ লাগিয়েছে। সুন্দর চেহারা সুনীলের — [illegible] সুপ্রতিষ্ঠিত যুবক, নীলাভ রুক্ষ চুল উপরে তুলে আঁচড়ানো। তার মুখের হাসি, চোখের চাহনী যেন মনের দ্বারে আঘাত করে আপন করে নিতে চায়।

আইভিকে দেখে মিসেস চক্রবর্তী [illegible] মিহি কণ্ঠ একগ্রাম উঁচু করে উঠল, "ডার্লিং, ইভী, [illegible] চা দিয়ে আমায় উদ্ধার করো!" সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ [illegible] পরিশীলিত হওয়ায় মিসেস চক্রবর্তী 'আইভিকে' সংক্ষেপে 'ইভী' করেছেন। আইভি নিজেদের টেবিলে পেয়ালায় চা ঢেলে টেনে নিল। "মা, চা খেয়েছ না?" কেশগুচ্ছ তুলে আইভি প্রশ্ন করল।

"না, আমি কফি খাব। বয়কে বলেছি একেবারে তৈরি করে আনতে। [illegible] এর পরে [illegible] হোটেল আনাই তো আছে।"

"আবার সেই টাক!" আইভির নিরুৎসাহে চোখের পল্লব কম্পিত হ'ল। এখনো কি একটু সুযোগ থাকতে দেবে না।

"ডিসেম্বরে [illegible] ধরিয়েছে। তোমাদের বাবা ক্রমেই আরো জড়িয়ে পড়ছেন। হাতে নেই একপয়সা, অথচ সোসাইটিতে সমান ভাবে মিশতে হবে।" মিসেস চক্রবর্তী [illegible] পেয়ালাটি খানসামার হাত থেকে নিয়ে চুমুক দিয়ে পরীক্ষা করলেন। "আলমারির সিন্দুকের গয়নাগুলোর দাম পঞ্চাশ ধারে বয়ে গেছে। কি করে শোধ হবে জানি না। ইভী, তোমার জন্মদিনে যে মুক্তোর মালা দিয়েছি, তার দাম বোধ হয় কখনও দিতে পারব না।"

অসহিষ্ণু, উত্তপ্ত সুনীল বলে উঠল, "তাহ'লে এসব জিনিসের দরকার কি, মামী? যার দাম দিতে পার, সেই সব জিনিস কিনলেই পার।"

"তুমি চুপ করো, সুনী। তোমার মুখে এ কথায় আমার আশ্চর্য হ'বার কিছু নেই। প্রেসটিজ তোমার না থাকতে পারে, তুমি যার-তার বাড়ী গিয়ে আড্ডা জমাতে পার, কিন্তু আমাদের তো মুখ রক্ষে করতে হ'বে? চার-

পাশের দরজা-জানলায় দামী পরদা। মধ্যে আমার বাড়ীতে ছেঁড়া ন্যাকড়া ঝোলালে লোকে যে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। বরঞ্চ, সস্তা কাপড় পরা চলে, পরদা কখন সস্তা টাঙ্গাতে নেই। পরদা দেখেই লোকে প্রথমটা তো বিচার করে।"

খান চারেক চায়ের কেক ক্ষিপ্রগতিতে উদরস্থ করে মিসেস চক্রবর্ত্তী আবার মুখ খুললেন,—"ইভীর মুক্তোর মালা কেন সে তুমি না জানলেও ইভী জানে। তবে জেনেও বুঝতে চায় না, এই দুঃখ। সুশোভন সরকার রোজ আসছে, এখন মন আছে ওর। আর দেরী করা উচিৎ নয়। বোকামী এখনও রাখ, ইভী। চেহারা দেখে পেট ভরে না। টাকা চাই পেটের জন্যে। আমাকে অনেক কষ্ট সইতে হয়েছে। একটা হতভাগা ইনসিওরের দালালকে বিয়ে করে ফেলে তুমি আর লোক হাসিও না।"

সুনীল সচকিত হয়ে বলল, "পরিমল লাহিড়ীর কথা বলছ, মা? ... না, লোকটার চেহারা আছে "Handsome as a Greek god."

পেয়ালার গায়ে চিত্রিত প্রাকৃতিকদৃশ্যে চার ... মায়ের তিরস্কারে মাথা নীচু করে। তার পদ্মবরণ ... প্রতিফলিত হয়েছে সোনালী পানীয়ে, বঙ্কিম অধরে তার শ্রান্তি।

—তুমি কি জানো মা, সে কি রকম করে আমার দিকে চায়। কোমল, কোমলতম দৃষ্টি আমার সারা দেহে যে দৃষ্টি ... ছড়িয়ে স্নিগ্ধ করে। অনুরাগে আরক্ত মুখ তার কপোল ছাড়ানো দাড়িমের মত মসৃণ, রক্তিম হয়, যখন সে আমার কাছে আসে। শুভ্র ললাটে তার চাঁদের ... পড়ে সে ললাটে যেন ভগবান প্রেমের ... জয়টীকা লিখে দিয়েছেন ... তার দেহ—ভগবান। বাসনার তীব্রতায় ... রক্তস্রোত দ্রুত হল, দেহে যেন যন্ত্রণা এল। তার দেহ—সেই সবল, উন্নত, ঋজু দেহ মার্ব্বেলের মিনার যেন, বাহুতে আবেষ্টন করে তৃপ্তি হয় না। গ্রীবা তার দীর্ঘ, শুভ্র সে গ্রীবা দু'হাতে জড়িয়ে কালো, নিকষ কালো চুলের নীচে শক্তিমান ঘাড়ে মুখ লাগাতে ইচ্ছা হয়।

মোটা, আধাবয়সী সুশোভন সরকার আসে রোলসে, কিন্তু সে কি এমন ভাবে আমার দেহ-মন আকর্ষণ করতে পারে? পরিমলের পৌরুষ আমাকে ডাকে, তার যৌবন আমাকে চায়। শাণিত তরবারীর মত চুম্বন তার আমাকে

কেটে দিয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে কেটে যায় আমার দ্বিধা, আমার অনিচ্ছা। তখন ভুলে যাই মা, তার টাকা নেই।

কিন্তু এভাবে আর যাকে হক, নিজের জননীকে প্রেমের গল্প বলা যায় না। তাই যদিও সমস্ত মন আইভির মুখর হয়ে উঠল, অধরোষ্ঠ নির্বাক রইল।

তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানাকুল দৃষ্টিতে মেয়ের নিরুত্তর মুখের দিকে লক্ষ্য করে মিসেস চক্রবর্তী ছেলেকে তিরস্কার করলেন

“হ্যাঁ, চেহারা গ্রীকগড্ বটে, কিন্তু পরিচয় ষ্টীলবেপারী ভিন্ন আর কি? কোন মতে বি-এ টা পাশ করে করছে দালালী। নাম বললে কেউ চেনে না সোসাইটিতে। টাকা তো গড়ের মাঠ।”

কন্যার প্রণয়ীকে সুমিষ্ট বিশেষণে ভূষিত করে মিসেস চক্রবর্তী লাগলেন ছেলের পিছনে। চেহারা। চেহারা দেখেই তো বোকা মেয়েগুলোর মাথা খারাপ হয়। তোমার চেহারা দেখেই তো লিলি দত্ত পাগল হয়েছে। নইলে তোমার কি বা কি গুণটা আছে, সুনী? কত টাকা ঢেলে পাঠালাম বিদেশে, ভূত হয়ে ফিরে এলে তুমি। এক পয়সা পারনা রোজগার করতে, এখনও হাতখরচ দিতে হয় আমাকে। অত টাকা দেনা হয়ে গেল তোমার ভবিষ্যতের আশায়। কত আশা ছিল আমার, মানুষের মত মানুষ হবে। কপালে কিছুই হল না আমার। আই, সি, এস পারলে না, ব্যারিষ্টার হতেও ক্ষমতায় কুলোল না। তোমার বাবা [illegible] হয়েছেন। দত্তরা তোমার বরাতগুণে তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়, তাও মেয়ের ঝোঁকের জন্যেই। একই মেয়ে! ব্যবসাতে বসিয়ে দেবে তোমাকে। মেয়ে কি স্মার্ট, কি অ্যাকমপ্লিশড্। অমন মেয়ে বৌ পাওয়া ভাগ্য।’

সুনীল দুষ্টু পোনির মত ঝাঁকড়া চুলে নাড়া দিয়ে সবেগে প্রতিবাদ করল, ‘নাঃ, ওই লিলি লিলিকে আমি কিছুতেই বিয়ে করব না। এ বিষয়ে জোর করা তোমার অন্যায়, মামি’

“তাতো বটেই। যত সব বাজে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হবে না তোমার, সুনী। সমাজে ক্রমেই নেমে যাচ্ছি আমরা। দত্তবাড়ী বিয়ে হলে লোকের মধ্যে আবার মুখ দেখাতে পারি। কানাই বিশ্বেস লেগেছে লিলির পেছনে, লিলি কিন্তু তোমাকেই পছন্দ করে।” একটু ভেবে মিসেস চক্রবর্তী যোগ দিলেন, “অবশ্য, কেন জানি না।”

বাজে মেয়ে? ওঃ, মানে মা সুজাতাকে ইঙ্গিত করছেন। সুজাতা বাজে মেয়ে। সুজাতা সুনীলের বন্ধুর বোন, চিত্তাকাশে অধুনাতমা ধ্রুবতারা। আর লিলি হচ্ছে আরাধনার বস্তু? লিলি? পাতলা-পাতলা আংটির মত পাকানো বিবর্ণ চুল। ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য রং-মাখা মুখ আর সে মুখে সর্ব্বদা বোকার মত দাঁতবারকরা হাসি। টাকা আছে বলে অমন একটা নির্বোধ মেয়েকে যদি কেউ ভালবাসে বাসুক, সুনীল বাসবে না।

"বাজে মেয়ে মানে তুমি বলতে চাও সুজাতা? তার মত মেয়ে তুমি দেখ নি, মামী। হতে পারে তারা গরীব, কিন্তু —

সুনীলের উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে মিসেস চক্রবর্ত্তী বল্লেন, 'আহা, চটো কেন, সুনী? বাজে মানে কি খারাপ কিছু? আমাদের সেটের নয়—তাই। ওসব মেয়ে তো এখানে চলে না, সুনী [illegible] কথা। আজ কিন্তু আমি কথা দিয়েছি লিলিদের বাড়ীতে তুমি যাবে। অন্য কোথাও [illegible] কিন্তু।' বুদ্ধিমতী মিসেস চক্রবর্ত্তী কথার মোড় ফেরালেন।

"না, না—আমি আজ যেতে পারবনা। ক্লাবে টেনিসে যেতে হবে [illegible] তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা না করে কথা দাও?

সুনীলের বিরক্তি প্রকাশে মিসেস চক্রবর্ত্তী নির্ব্বিকার চিত্তে বলে যেতে লাগলেন, "ছিঃ সুনী, সেদিনও নানা অজুহাত করে গেলে না। আজও কি তাই হয়? বিয়ে না কর, ভদ্রতা তো আছে। আর টেনিস খেলা? বেশ তো, লিলির সঙ্গে টেনিস খেলে দেখো ও কি সুন্দর টেনিস খেলে। আমি তো জানাশোনা কোন বাঙালী মেয়েকে এতো ভালো খেলতে দেখিনি। অসুবিধাও নেই, বাড়ীতেই টেনিস লন আছে ওদের, খেলার ব্যবস্থাও আছে। অনেক গুণ আছে লিলির। যা ছবি আঁকে! আর খুব ভালো পিয়ানো বাজায়। আজ ওর দু'একখানা গান শুনে এস, সুনী। লক্ষ্মীমণি, কথা দিয়েছি আমি। যাও একবার। তুমি তো কখনও আমার অবাধ্য হও না।'

ছেলের অনড় অচল মূকভাবের অবস্থা দেখে মিসেস চক্রবর্ত্তী সতীর পদাঙ্কে দশমহাবিদ্যার চামুণ্ডা মূর্ত্তি ধরলেন। পলকে মুখচোখ লাল হয়ে উঠল, নাসিকা স্ফীত হ'ল। একটি অতি দৃঢ়চেতা মহিলার মূর্ত্তি ফুটে উঠল ব্যারিষ্টার-জায়ার সহজ শৈথিল্যে।

"সুনীল, আইভি শুনে রাখ। তোমাদের যা বলবার বলেছি। আমি

অতি কষ্টে তোমাদের মানুষ করেছি। বাইরের ঠাট বজায় রেখে কি ভাবে চলতে হচ্ছে, সে আমি জানি। তোমার বাবা আমাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছেন, তোমরা আর দুঃখ দিও না। আমার মতের বিরুদ্ধে তোমরা বিয়ে করলে সেই মুহূর্তে আমি সংসার ছেড়ে চলে যাব, নীতার মায়ের কাছে। আমার সঙ্গে আর জীবনে তোমাদের দেখা হবে না।"

সুনীল আইভির ভীত মুখের দিকে তাকিয়ে মিসেস চক্রবর্তী আপোষের সুর ধরলেন, "আমি তো এখনি তোমাদের বিয়ে করতে বলছি না। তোমাদের ভালর জন্য বলছি ভেবে দেখো। সুনী, একবার লিলিদের বাড়ী যাও। মানে ওর তার হাতে আংটি পরানো। লিলির মা আমাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার কথা। তুমি বাড়ী ছিলে না, আমি বললুম, তোমাকে আজ অবশ্য পাঠিয়ে দেব। এখন তুমি যদি না যাও, আমার মুখ থাকে কোথায়? যাও লক্ষ্মী বাবা আমার, আজকের মত।"

অগত্যা অনিচ্ছার সাথে সুনীল উঠে গেল দত্তভবনে যাবার পোষাক করতে। ছেলের গতিশীল মূর্তির দিকে চেয়ে মিসেস চক্রবর্তী নিশ্বাস ফেললেন, "ওর বয়সে ওর বাবার যে চেহারা ছিল, আইভী, তোমরা তা স্বপ্নেও দেখনি। সেই দেখেই তো সব ভুলে তোমার বাবাকে বিয়ে করে আজ আমার এ দশা। তমালপুরের জমিদারকে 'না' বলে দিলাম, আই. সি. এস. প্রবাল গুহকেও মনে ধরল না। সুনীর এই চেহারা দেখেই তো লিলি এমন পাগলের মত করছে, নইলে সুনীর ভবিষ্যৎ তো তোমার বাবার মতই। একপয়সার ক্ষমতা নেই। তোমার বাবার মত রূপ না পেলেও তোমরা দু'জনেই সুন্দর হয়েছ। তাই ভালো বিয়ে তোমাদের হতে পারে।" চেয়ার ছেড়ে মিসেস চক্রবর্তী কাশিপাড় ফরাসডাঙার শাড়ীখানা হাত দিয়ে ঝাড়লেন। রূপোর চোপলাগানো পাতাকাটা চুলের থাক কপালের ওপর টেনে চটীজোড়া পায়ে ভালো করে দিলেন। চাকর ডেকে বেরবার মুখে আইভিকে অবশ্য শেষ কামড় দিতে ভুললেন না— "তাই বলি, আইভী, ভুল কোর না। তোমরা দু'ভাই বোনে ভুলপথে যাচ্ছ। ছেলে মানুষের মত কাঁচা কাজ কোরনা। বিয়েটা তো ছেলেখেলা নয়। এখন বাইরেটা দেখে ভুলে আমার মত অনুতাপ করতে হবে।"

অনুতাপ এখনও মা করেন ? দুই সন্তানের জননী, স্বামীর গৃহিণী, মাননীয়া প্রৌঢ়ার মনে এখনও এসব চিন্তা আসে ? আসে আইভি, আসে। তুচ্ছ প্রেমের জন্য ভবিষ্যৎ ভুলো না, আইভি।

দেখ, ওই ম্যামনদেবের রথ চলেছে। ভোগ-ঐশ্বর্য্য দুই ক্ষিপ্র তুরঙ্গম। পুরুষ চলেছে [illegible] নীচে নিজেকে বিলিয়ে দিতে। নারী চলেছে ম্যামনের বরপ্রাপ্ত পুরুষকে স্বাধিকারে আনতে নিজের রূপযৌবনের বিনিময়ে। যে নারীর ললাটে অত্যুজ্জ্বল রূপটীকা, সেই শুধু পারে ঐশ্বর্য্যের কোলে বসে ভোগকে গ্রহণ করতে। রূপের পরিবর্ত্ত তার। রূপ রূপ রূপ! রূপের জয়ধ্বজ উড়িয়ে চলো, চলো আইভি [illegible]।

(এবার পরিমলাকেই বিদায়)

আট

বৈদেহী কলেজ জীবন শেষ করবার আগে বাড়ীতে পড়াশোনা করেছিল। কলেজ সে ছেড়ে দিল, অমরবাবু তার [illegible] উত্তর [illegible] পেয়ে নিরস্ত হলেন। তখন [illegible] গৃহশিক্ষার আয়োজন হল। সঙ্গীতে ও চিত্রবিদ্যার ব্যবস্থা ছিল, এবার [illegible] সমাবেশ দেখা গেল।

কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে বৈদেহী সমান বিকাশ লাভ করতে পারল না মনে দীনতা থাকায়। তার মুখের দিকে কেউ তাকালেই কেন জানি না তার মনে হত এ তাকে নিয়ে বিদ্রূপ করছে মনে মনে। দ্বিধায় লজ্জায় [illegible] সঙ্গীত বিদ্যায় মনসংযোগ হ'ত না তার।

বাংলা গানের ওস্তাদ ছিলেন দৃষ্টিহীন, তাই তার কাছে লজ্জা ছিল না। ছাত্রীর অনুপম কণ্ঠমাধুর্য্যে আত্মহারা হয়ে তিনি বলে উঠতেন, 'বাঃ, বাঃ বেটী, চমৎকার !" তার দৃষ্টি তো বৈদেহীর মুখের ছবি বিচার করে দেখতে পেত না। তাই বুঝি বৈদেহীর গলায় বাংলা উচ্চাঙ্গের গান এত মনোহারী হত।

গজল ঠুংরী ও টপ্পা শেখাতেন একজন মুসলমান। ছাত্রী অপ্সরা কি হিড়িম্বা সে বোধ ছিল না তাঁর, তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন বৈদেহীর গলার সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে কিন্তু বৈদেহীর মনে হ'ত এই বুঝি উনি আমার দিকে চাইছেন, এই বুঝি উনি হাসছেন। তাই ওসব গান গলায় তার এল কম।

ইতিমধ্যে বৈদেহীর জীবনে এল প্রেম। শিল্পীর মন, যৌবনাগমে উপযুক্ত শিক্ষায় বিকশিত হয়ে উঠেছে। নারীমনের পরম কাম্য যা, সে চেয়ে যাচ্ছে অজানিতে। দাবী সেটাতেই হবে মনের শিল্পীর মন তখনও শিল্পকে আশ্রয় করে পুরুষনিরপেক্ষ জীবন যাপন করতে শেখেনি। তাই তো, প্রমাদ এল

সাধারণ একটি পুরুষ। অনল প্রসন্নবাবুর দূরসম্পর্কের আত্মীয়, মাঝে মাঝে সে আসতে লাগল। বৈদেহীর সঙ্গে আলাপ হল

অনল সৌন্দর্যশালী না হলেও যৌবনশালী ছিল। অতি সাধারণ একটি বাঙালীঘরের ছেলে, কিন্তু তার মধ্যে অসাধারণত্ব দেখতে আরম্ভ করল বৈদেহী। অনল ছিল বৈদেহীর চোখে প্রথম পুরুষ, যে পুরুষ তাকে নারীত্ব দিতে পারে। তাই অনলের কাছে লীলাময়ী রূপ ধরতে সাধ হল বৈদেহীর চিরন্তনী স্ত্রীর মত।

ধীরে ধীরে বৈদেহীর সাজসজ্জাতে অনুরাগ দেখা দিল। নিজের রূপলাবণ্য যেন সে আগের মত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে ভুলে গেল। কিংশুক আগরণ-প্রফুল্ল আঁখির মত জেগে উঠল বৈদেহীর মন একটি পুরুষের দিকে চেয়ে। সে পুরুষ যে-ই হোক, বৈদেহীর প্রয়োজন ছিল [illegible] প্রেম একজনকে কেন্দ্র করে। ভালবাসতে শিখেছে সে [illegible] জীবনে প্রথম।

অনলের চিত্তে কিন্তু বৈদেহীর কামনা কোন দোলা দিতে না [illegible] দেখেছে বৈদেহীকে ধনী পিতার কন্যা রূপে, প্রসন্ন বাবুর বাটীর একটি অনিবার্য আসবাব রূপে। বৈদেহী তরুণী কি সুন্দরী চেয়ে দেখার অভিলাষ হত না অনলের

সুতরাং আঘাত পেল বৈদেহী। অনল সহসা নিজের বিবাহের লাল চিঠি নিয়ে এল। চোখ মেলে চেয়ে দেখল বৈদেহী প্রেম তাকে বঞ্চনা করেছে। অনেকদিন পরে মনে পড়ে গেল মাতার বিয়োগ দুঃখের স্মৃতি মাতার অন্তিম দৃষ্টির ব্যাখ্যা করে মনে মনে পেয়েছে বৈদেহী যে উপদেশ, সে উপদেশ ছিল কোথায়? অনলকে নিয়ে মোহ-রচনার সময়ে আত্মবিস্মৃতির গহ্বরে ডুবে গিয়েছিল সে। বৈদেহী স্থির করল : এ পথে আর নয়।

কিন্তু, কোরকচিত্ত উন্মীলিত হয়ে গেছে—কুঁড়ির অপরিণত দিনে লীন হয়ে থাকা চলবেনা আর। উন্মুক্ত আকাশের নীচে চায় সে মধুপগুঞ্জন। পরিণতির আশঙ্কা, সাবধানতার বাণী, কিছুই কি পারে সূর্য্যমুখীকে সূর্য্যের দিক থেকে

কেবারে। রঙ্গমঞ্চে দেখা দিল পরিমল তরুণ দেবতার দীপ্ত সৌন্দর্যে জন-প্রিয় কোমল ব্যবহার নিয়ে।

সব ভুলে বৈদেহী তাকে উন্মাদের মত ভালবাসল

বিমলের বাড়ীর ভেতর দিকের বারান্দায় জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। বিজলী নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। মৃদু মুমূর্ষু এ জ্যোৎস্না প্রথম প্রেমের মত ভীরু। মাধবী-লতার বুকে চন্দ্রিমা লুটিয়ে পড়েছে প্রথমচুম্বনে কিশোরীর মত।

প্রেমের জোরে দুঃসাহসী বৈদেহী বাদুড়বাগান থেকে পরিমলের সন্ধানে এসেছে। শুধু পরিমলের সঙ্গেই অবশ্য নয়, পরিমলের বৃদ্ধা মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ। অবশ্য পরিমলেরও প্রায়ই যাওয়া আসা ওদের বাড়ী, প্রতিদানে না এলে কি চলে? এমন দুই বাড়ীতে এত মাখামাখি হয়ে গেছে যে কেউ কারুর বাড়ী বিনা নোটিশে অন্দরে যেয়ে পড়লেও ব্যতিক্রম গণ্য হয় না।

একটা গান গাইছে বৈদেহী কোমল নীচু সুরে, প্রায় গুনগুন করে। পরিমলের মা বসে আছেন সামনে শীতলপাটীতে। তাঁকেই গান গেয়ে শোনাচ্ছে বৈদেহী। পরিমলের সঙ্গে দেখা হয়নি। কয়েকদিন যাবৎ পরিমল বৈদেহীদের বাড়ী যাচ্ছেন না, তাই বৈদেহী নিজেই এসেছিল। দেখা না হলেও খবর পেল। পাড়ার মাসীর বাড়ীতে তারি মাতার সঙ্গ, সেও কোন কম লোভের নয়। এখানে বসে সে, গুনগান গায়। এই ঘর তার, প্রত্যেকটি বস্তু প্রিয়স্মৃতি জাগায়। স্মৃতি ফেলে রেখে গেছে সে এই শয্যায়, ওই চেয়ারে। বক্রদৃষ্টিতে বারান্দা থেকে বৈদেহী পরিমলের সুসজ্জিত গৃহের অভ্যন্তর দেখছিল।

"কি সুন্দর গান তোমার, মা! সত্যি বলছি এমনটি আগে শুনিনি। যেমন গলা, তেমনি শিক্ষে। খোকন কত প্রশংসা করে

উৎকর্ণ হয়ে শ্রবণে সব শক্তি সংহত করে বৈদেহী বলল, "তিনি তো কত ভালো ভালো গান শুনেছেন। তা, তিনি—কি বলেন?"

"কত প্রশংসা করে। বলে যে প্রসন্নবাবুর মেয়ের গান শুনলে মনে হয় আমরা অনেক ভালো হয়ে গেছি। বলে ও নাকি নতুন মানুষ হয়ে যায়

গৃহাধিকারিণীর সাধ্যসর্বস্ব। পাশের ঘর পুত্রের, স্প্রিংএর খাট, বৃহৎ আয়না, কাউচ সাজানো। বাইরের দিকে ছোট একটা বসার ঘরও আছে। পাশাপাশি দু'টি চিত্র। অনিবার্যরূপে মনে করায় পুত্রের স্বার্থপর, আত্মসুখসর্বস্ব স্বভাব

চকিতে মনের দ্বিধাখণ্ড দলিত করল বৈদেহী। পরিমলের এসব ছোটখাটো সংসারের খুঁটিনাটিতে মন দেবার সময় কই? মাতা কর্ত্রী, ব্যবস্থা করলেই পারেন খোঁজ। এ সংসারের সৃষ্টি তো তাঁরি হাতে। তবু, মায়ের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ভার ছেলের ওপর সে দেখেনা কেন? অস্বস্তিকর অনুভূতি খুঁৎখুঁৎ করে মনের কোণে কোণে বেদে মরতে লাগল। বৈদেহী দুঃখ চেপে ধরল তার। পরিমলের কোন দোষ নেই থাকতে পারে না। মনের কাঁটা তুলে ফেলল বৈদেহী নিমেষে। নিজ বোঝার ভাগ করল, বৈদেহী। তোমার অনুভূতিশীল শিল্পীমন লোকচরিত্র চিনবার সহজ ক্ষমতাটুকু থাকতেও অনুধাবন করে গিয়েছিল। কিন্তু, প্রেমের নির্দেশে বুদ্ধি তলিয়ে গেল মোহের গহ্বরে। সাবধানতার বাণী অগ্রাহ্য করলে তুমি, পরিমলের জীবনকে শিরোধার্য করে নিলে নিরপেক্ষ বিবেকের শুদ্ধি দিয়ে। স. ঠিকই বলেছি. প্রেম ভুলিয়ে দিল সব।

বাড়ী ফিরে বৈদেহী একটা কাণ্ড করে বসল। অদ্ভুত কিছুই নয় অবশ্য বাঙালীরা অধিকাংশ ব্যক্তি, বিশেষ করে মেয়েরা, প্রেমে পড়লেই এ কাজ করে শুনেছি। কবি মন বৈদেহীর, কবিতা অবশ্য সে লেখেনি পূর্বে। মনের আবেগ বাঙ্ময়িত করতে একটি কবিতাই লিখে বসল। মিলে সুবিধা হবেনা, তাই গদ্য কবিতাই ধরল।

কত মধু রয়েছে জমানো
ছোট সেই কয়খানি ঘরে।
নগরীর এক সরু গলি,
মোড়েতে দরজী আর চায়ের দোকান.
—অমার্জিত পথ,
উধাও, উধাও নিত্য তবু মনোরথ
বাঁকানো গলির বুকে দুইখানা ঘর।
বাতাস হাঁপানী রোগী,
শ্বাসেতে কাতর।

আকাশ সুনীল নয়,
আবর্জনা-ময়
দুইধার ,
ড্রাষ্টবিন ,
করে ঘিনঘিন
পা দিতে শরীর-মন।
তবু শুভক্ষণ
প্রতিটি জীবনে এই
স্মরণ বিহ্বল সেই সে দিনের স্বাদে
শুভ পথে মিলনেরা ইঙ্গিতে তোমার
তাই বারবার
মনে হয় কাছে যাই
কত মধু রয়েছে জমানো
তোমার গৃহের মাঝে
সংসারে তোমার
মধু খুঁজে বারা সব পরিজনকার।
পান অংশীর কাছে
কথাবার্তা তুমি,
সুখদুঃখকথা কয়ে
কাটায় সময়
আমারে সাজায়ে মিষ্ট দেন তিনি আনি,
হাসিমুখে খাবো তাই।
জীবনে কখনো খাইনি সন্দেশ বুঝি,
শর্করা কখনো এত মিষ্ট লাগে নাই।
খাবো, খাবো প্রিয়, তোমার সংসারে তাই।

চমৎকার বৈদেহী। এত এগিয়ে গেছ ? সঙ্গীতজ্ঞা তুমি, তোমার সাধনা সুররাজ্যে চমক আনতে পারে। আর তুমি ঘরে দ্বার দিয়ে রাত জেগে বসে নিকৃষ্ট কবিতা লিখছ। যদি এত হতবুদ্ধি না হ'তে তাহ'লে বুঝতে পাগল

না হ'লে মানুষ অমন কবিতা লেখে না—ওতো কবিতা নয়, ডগেরেল। শিল্পীর হাত দিয়ে কি করে বার হ'ল অত রাবিশ? ভাগ্যি, আধুনিক সাহিত্যিক হওনি তুমি বৈদেহী, তাহ'লে তো বন্ধু সম্পাদকের পত্রিকায় প্রকাশ করেই ফেলতে। লিখেছ বেশ করেছ, প্রকাশ করে বসনি যে, সেজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

Sufficient unto the day is the evil thereof"

নয়

অন্তরে অজস্র আশা।

আইভিদের বাড়ীর লন অপরিচিত ফুলসম্ভারে। মনে হবে প্রশস্ত সোপান শ্রেণী উঠে গেছে কালো মার্বেলের দক্ষিণখোলা উচ্চ বারান্দায়। তার বেতের সোফা-সেটি ইত্যাদি দ্বারা সেটি সজ্জিত। পশ্চিম দিকে সবুজ ক্যানভাসের পর্দা ফেলা আছে। বেতের আসবাবগুলি সবুজ রংএ রঞ্জিত।

সময় বসন্তের রমনীয় দিনান্ত। রোদরেখা এখনও বৃক্ষ [illegible] বিদায় নেয়নি। উন্মনা বাতাস এখানে ওখানে শুকনো পাতা [illegible]।

সাদা আদ্দির পাঞ্জাবী বাতাসে থরথর কম্পিত [illegible] নবল গ্রীবাকে বেষ্টন করেছে সাদা, নীল, [illegible] অতি পরিষ্কার। বুকের উপর হোয়াইট গোল্ডের সাদা বোতাম সার [illegible] ছ'একটি খোলা, পাঞ্জাবীর গলা একটু সরানো [illegible] পুরুষের বক্ষ। কিডলেদারের শুভ্র পাম্পশু কালো সোপানের গায়ে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে পরিমল তরঙ্গাকারে সজ্জিত চুলের উপর হাত দিয়ে বোলাল। কনিষ্ঠায় হীরকাঙ্গুরীয় রৌদ্রে বিজলী খেলে গেল। দূরে প্রাচীরের গায়ে হাস্নু-হানার গুচ্ছ। তার দিকে পাতাগুলো ভেসে আসতে চায়। ক্ষীণ সুগন্ধ অপরাহ্ণের বাতাসকে মদির করে তুলেছে।

পরিমল সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকাল। মনের অন্তঃপ্রদেশ মথিত করে স্মৃতি জাগ্রত হয়ে ওঠে। এই ফুলের গন্ধে মনে পড়ে তাকে, যে জীবনে আজ একচ্ছত্রা সাম্রাজ্ঞী, যার বাড়ীতে প্রথম আলাপের সময়ে এমনি অজস্র হেনা ফুটে থাকত।

আইভির সঙ্গে পরিমলের প্রথম আলাপ কলিকাতায় নয়, প্রকৃতির লীলা-নিকেতন দার্জ্জিলিংএ। সেখানকার বাতাস অজানা ইঙ্গিতে পূর্ণ, সেখানকার আকাশে নব বর্ণবিন্যাস।

দার্জ্জিলিংএ আইভিদের বাড়ীতে ফুটে থাকত অপরিযাপ্ত হেনামঞ্জরী। প্রথম যেদিন পরিমল আইভির বাড়ী প্রবেশলাভ করে, সেদিন গেটের পাশে এই হাস্নু-হানার গন্ধ তাকে আহ্বান করেছিল সাদরে। প্রতিটি দার্জ্জিলিংএর সন্ধ্যা আবেগবিহ্বল হয়ে থাকত হেনার গন্ধজড়ানো। পরিমলের জীবনে প্রথম প্রেমের সঙ্গে তাই মিশে আছে হাস্নু-হানা।

সামান্য সাধারণ একটি লতার উপরে অত পক্ষপাতিত্ব দেখে আইভি কারণ জিজ্ঞাসা করেছিল। কৌতুকমিশ্রিত ভালবাসায় আইভি তাদের কলিকাতার বাগানে রোপন করেছিল হাস্নু-হানার লতা তাকে তুষ্ট করতে। তাই আজও পরিমলের প্রেমের পটভূমি রচনা করে আছে হাস্নু-হানার ব্যাকুল সৌরভ।

কি করি কি হল। ফুলের গন্ধে সেদিনের কথা মনে পড়ে! মনে পড়ে যায় প্রথম দিনের আলাপ, প্রথম কলকাকলী এবং সবস্থ স্তিমিত পুষ্পসৌরভ, চন্দ্রালোকের পাণ্ডু ভাস্বরজ্যোতি, সকলই মনে আনে প্রথম দিনগুলি, কেমন করে সেদিন তার জীবনে আইভিরূপ উষাপাত হল। আজও জীবনের পটভূমি বিক্তস্ত, [illegible] স্নিগ্ধ চন্দ্রদীপ্তিতে তার প্রয়োজন নেই।

সেবারে [illegible] দিয়ে আইভির মামাতো ভাইকে খবর পাঠিয়ে বসল পরিমল প্রতীক্ষায়। [illegible] জীবনে নাটকীয় চিত্রপটে পরিমলের প্রেমের প্রথম দিনটি।

ওইগার-দিয়ে পিকনিক হচ্ছে ব্যারিস্টার চক্রবর্তী, ব্যারিস্টার কর, মিস্টার উইলিয়ামস, ম্যাজিস্ট্রেট রায়দের পরিবারের সমস্ত কিশোর কিশোরী মিলে। বুড়োর দল কেউ নেই, তাই সামাজিকতা বা কোন বাধাবন্ধন অদৃশ্য।

আইভি আই, এ, পরীক্ষা দিয়ে ছুটিতে এসেছে দার্জ্জিলিং বেড়াতে। মামাতো-পিসতুতো ভ্রাতা-ভগ্নীর সঙ্গে সে-ও গিয়েছিল শৈল বিহারে। সূর্য্যোদয় দেখার পর্ব্ব শেষ হয়েছে, আহারের আয়োজনে সকলে ব্যস্ত।

একটা শুকনো গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আইভি। চার বছর আগে আইভি ছিল এ আইভির চেয়ে অনেকটা ক্ষীণ, খানিকটা ঋজু। হাল্কা

ধোঁয়া-রংএ মিহি সবুজফুল আঁকা শিফন তার দেহলতাকে আশ্রয় করে আছে। কানে চিরদিনের প্রথায় হীরা বেষ্টন করে পান্নার পাঁপড়ি। ঈষৎ বঙ্কিম বর্ণে শীতের হাওয়ায় পাহাড়ি গোলাপের আমেজ। ঘনকুঞ্চিত কেশ আলগা বেণীতে বন্দী। গলায় একটি সোনার ফুলতোলা চিক দীর্ঘ কোমল গ্রীবাকে ঘিরেছে, হাতে সেইরকম ফুলতোলা দু'খানি কঙ্কণ। অনামিকায় একটি হীরার আংটি।

প্রসন্ন প্রভাতে হিমালয়ের বিশাল যবনিকায় ফুটে উঠেছে একটি ছবি, একটি পাহাড়ি গোলাপ। বর্ণে গন্ধে সে টলমল্ করছে প্রাণ প্রাচুর্যে তার মূর্তি রং মাখা, ভ্রু আঁকা মেয়েদের পাশে বিভিন্ন, স্বতন্ত্র। সেই অবস্থায় তাকে দেখে মুগ্ধ হ'ল, পাগল হ'ল পরিমল।

পিকনিক যখন পূর্ণবিক্রমে অগ্রসর, তখন কুমারী ইলা রায় সকলের সঙ্গে ছবিনেওয়া স্মরণ করিয়ে দিলেন। গোবিন্দ ধর নামজাদা ছবিতুলিয়ে বিদেশের ছাপে ছাপমারা। তারই ছিল ছবি নেবার কথা। কাঁধে ঝোলানো রঙীন চটের থলে থেকে ক্যামেরা নিতে গিয়ে গোবিন্দ ধর আর্তনাদ করে উঠল—

"Ah-ha! My Camera?

তরুণ কার্ণালিষ্ট সেসিল উইলিয়াম বলে উঠল, "Forgotten? What a pity!"

আইভির খুড়তুতো ভাই মণি চক্রবর্ত্তী হেসে উঠে বল্ল, "তুমি না কর্ত্তা ছবি ভোল না?"

ছবিতোলা গোবিন্দের ফ্যাসন ও প্যাশন। আশায় নিরাশ হয়ে গোবিন্দ নিষ্ফল রোষে তর্জ্জন করে উঠল, "Shut up, Chak! I know it is you. আমার knap-sackএ তুমি বাড়ী থেকে বেরবার সময়ে কি একটা খোঁজার নাম করে হাত দাওনি? Ah-ha! I have caught you, rogue."

মণি চক্রবর্ত্তী বয়সে তরুণ, অত্যন্ত রঙ্গপ্রবণ। গোবিন্দের ছবিতোলার খেয়ালকে সে মনে মনে বিদ্রূপ করে, মাঝে মাঝে বাধা দিয়ে আনন্দ পায়। হিমালয়ের সৌন্দর্য্য-ধামে এসে বিশেষ দিনে ছবি না তুলতে পারলে গোবিন্দের শিল্পী-প্রাণ কেমন অস্থির হ'বে সেটা দেখা তার পক্ষে আনন্দ। আরও একটি কারণ কুমারী কনক রায়।

সেই তো প্রথম আলাপ।

প্রথম দৃষ্টিবিনিময় শৈলশিখরে 'কুমার সম্ভবম এর' পরিবেশে। অতনু কোথাও ছিলেন নিশ্চয়। পরিমল লাহিড়ী, আইভি চক্রবর্তী দেখতে পায়নি। তবু যুগান্তের স্রোতে ভাসমান পুষ্পধনু অলক্ষিতে শরসংযোগ করেছিলেন। প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম জন্মলাভ করল।

এই তো শিথিলবেশা আইভি এসেছে। সেদিনের আকর্ষণ খর বেগে আজও উভয়ের দিকে টেনে নিয়ে যায়। উঠে দাঁড়াল পরিমল, স্থির হয়ে আছে আইভি। যেন অসময়ে অপরাহ্নের এ সাক্ষাতের জন্য দেহমন উভয়ের প্রতীক্ষায় ছিল। আইভি উৎসুকা। চারিদিকে চেয়ে দেখল পরিমল। নিরিবিলি বাড়ী, গৃহ বিগ্রহের তন্দ্রাবেশ থেকে এখনও জাগেনি। পর্দার পাশে সরে এল সে, নিবিড় আকর্ষণে আইভিকে সরিয়ে আনল। তীব্র আবেগে উভয় অধর সংযোজিত হ'ল।

একবার মাত্র। আইভি ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেকে সরে বসল [illegible], আজ মাত্র কি আরম্ভ করলে? চুপ করে বসো।

লতানো ভঙ্গিতে বেতের সোফায় নিমীলিতনেত্র আইভি। পাশে সেটিতে বসে পরিমল সতৃষ্ণভাবে বক্র অধরের দিকে চেয়ে রইল। সিগারেট জ্বালিয়ে এক হাতে ধরে অন্যহাতে আইভির কোলে চুল নিয়ে খেলা করছে।

আইভি, সমাজের কোন কোন মেয়ে যেমন [illegible] সিগারেট সেবন করে না। বঙ্কিম অধরে চুরোটিকা জ্বলন্ত দেখলে [illegible] পুরুষের মনে কেবল বন্ধুভাব উদয় হয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রণয়ীসুলভ ভাবনাও [illegible] হয়ে যায়। যতই কেন না আধুনিক হোক পুরুষ চিরদিন নারীকে কোমলরূপে [illegible] দেখতে ভালবাসে।

চুরোটিকার ধূম্রজালে আবরিত মুখ রমণীকে যেন একটু সিনিক বলে মনে হয়। মনে হয় অক্লেশে এর তীক্ষ্ণ নয়নে ভাসবে বিদ্রূপ। সিগারেটের বঙ্কিম অধরে যেন কাঠিন্য লেখা আছে। প্রেমের কোমলতার বহু ঊর্দ্ধে সিনিক মেয়েটি যেন। সিনিসিজম আর যারই হ'ক, প্রেমের পক্ষে শুভকর নয়।

আইভির হীরাখচিত করতল পরিমল অধরে তুলে ধরেছে। হাতখানা যেন অন্য কারও, এইভাবে সেদিকে লক্ষ্য না রেখে আইভি কথা বলে চলেছে নিমীলিত নয়নে।

"যাই বলো পরি, ভবিষ্যৎটা জানা থাকলে কিন্তু মজা হ'ত না। অজানা, অচেনার মোহ বেশী।"

"যেমন তুমি আমার কাছে অচেনা, অজানা, তাই তোমার মোহ আমার পক্ষে এত বেশী।" মৃদু আদরের সুরে পরিমল আইভিকে বলল।

চোখ খুলে নড়ে-চড়ে আইভি সোজা হয়ে বসল। জ্যোতির্ময় নয়নে তার ভালবাসার কটাক্ষ। হাত থেকে পরিমলের অধরের ছাপ মুছে ফেলতে ফেলতে আইভি উত্তর দিল, "আমি আবার তোমার কাছে কি অজানা রইলাম? চার বছরও কি যথেষ্ট নয়?"

"তুমি আমার ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ এখনও আমার জানা নেই।"

"আচ্ছা পরি, এই যে বারান্দায় তুমি-আমি বসে কথা বলছি, যেন একটা উপন্যাসের সেটিংএ কিন্তু, কেউ জানেনা আমাদের ভবিষ্যৎ কি রকম করে বিধাতাপুরুষ লিখে রেখেছেন। জানলে -Oh god!" -আইভি কাঁধ নাড়া দিল "হয়তো সেটিংটা এত কৌতূহল জাগাত না।"

সিগারেটের শেষ টানের সঙ্গে সঙ্গে সেটি শেষ করে ছুড়ে ফেলে দিয়ে পরিমল পকেট থেকে সাদা সুচীকর্মা রুমাল বার করে মুখ মুছল।

"তুমি উপন্যাসের উপসংহার জানতে চাও, আইভি? তাহ'লে কি এত আশঙ্কা থাকত? পাঠকের মনে আগ্রহটা থাকাও দরকার তো। সত্যি বলতে, ওইটি এর কৌতূহল সব চেয়ে দরকারী।"

"আচ্ছা বলতো, কি ভাবে উপসংহার করলে তোমার ভাল লাগে?" আইভি প্রশ্ন করল

"সেকি তুমি জান না, আইভি?" পরিমলের স্বরে অভিযোগ।

"কিন্তু মিলনান্ত উপন্যাস বড় একঘেয়ে হয়ে গেছে পরি, নয় কি? বিয়োগান্তও যে ভাল লাগেনা এই প্রথম শুনলাম। তবে কী 'অন্ত' চাও তুমি?"

আইভির চোখে স্বপ্নছায়া --"ধরো যদি 'প্রেমান্ত' হয়? মানে, আমরা ভালবেসে ছিলাম। ভালও বেসে গেলাম, এবং ইতিও সেখানে পড়ে গেল।"

"তাহ'লে দূর থেকে ভালবাসা, আর সেজন্য ত্যাগ, এই তুমি চাও? এওতো একঘেয়ে উপসংহার হ'ল!"

"তা বটে! কিন্তু ধরো 'প্রেমান্ত'ও তো অন্য রকম হ'তে পারে। প্রেম হ'ল পরিণয় হ'লনা। প্রেমের জন্য পরিণয়ের বন্ধন ছেড়ে এলাম। কেমন

লাগছে এটা ?" উৎসাহে আইভি সোজা হয়ে বসে বিদ্রূপ হাস্যে পরিমলের দিকে তাকাল।

"ছিঃ, আইভি।"

"ছিঃ কেন, পরি ? বড় নীতিবাগীশ হয়েছ, না ? মানুষ কখন কি করে বসে তার কি কোনও ঠিক আছে ? ন্যায় অন্যায়ের মাপকাঠিতে কি সব সময় বিচার চলে ? ন্যায়ের re-action অন্যায়, তার আবার প্রতিক্রিয়া ন্যায়। একটা মণ্ডলাকার বৃত্তে সব চলেছে। যা আমার মন চাইবে, শেষ পর্যন্ত আমি তো তাই করব। অবশ্য কতকগুলো চিন্তা করে অশান্তিতে তবু আমিই ভুগি। এই তো ঈশ্বরের আমাকে নিয়ে পরিহাস। আমি কাল কি করব ঠিক আছে কি ? 'পরিমল', মেয়েলী নাম তোমার। একেবারে মায়নী তুমি। নীতিজ্ঞান নিয়েই গেলে।"

অভিমানের দৃষ্টিতে আইভির দিকে চেয়ে পরিমল বলল, "কি করব, বল ? তোমার মত নিয়ে বিধাতাপুরুষ তো আমাকে গড়েন নি, ঐখানে ভুল হয়ে গেছে।"

অভিমান বুঝতে পেরে আইভি হেসে পাশ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। চুলে চোখে তার অন্তঃসূর্যের দীপ্তি।

"তাই বলছি, বিধাতাপুরুষের কি কিছু ঠিক আছে ? আমার মন যা চায়, তাতো করব, কিন্তু শেষ তো আমার হাতে নয়। আমি পুতুল ভিন্ন নই। কখন কি উপসংহার বিধাতাপুরুষ লিখে বসেন জানি না। আর ভদ্রলোকের ভুল ত্রুটিও বড্ড বেশী।"

আইভি পরিমলের সোফার হাতলে এসে বসল। পরিমলের কালো চুলের ওপর হীরকোজ্জ্বল নখররমণীয় হাত রেখে ডাকল আদরের সুরে, "পরি।"

এ ডাকে সাড়া না দিয়ে পরিমলের উপায় নেই। তুচ্ছ অভিমান দূরের কথা—এমন করে ডাকলে, এতো সবে এলো, আইভির ডাকে পরিমল ইহকাল পরকালও ভুলে যেতে পারে। তার রক্তস্রোতে বেজে ওঠে পরিচিত সুর এই আহ্বানে। এ বাহুর বন্ধনে হৃদয়প্রতিঘাত তার দ্রুত হয়।

এতক্ষণ ধরে আইভি তাহ'লে তাকে পরীক্ষা করছিল সংযমের বাঁধনে। তাই সাক্ষাতের চুম্বনকে বিলম্বিত হ'তে দেয়নি ? লীলাময়ী জোয়ারের জলকে বাধা দিয়ে বেগ দুর্বার করে তুলে উপভোগ করছিল নিশ্চয়। এখন ধরা দিতে চায়

সে। হয়তো এমনি করেই জীবনে একদিন ধরা দেবে চঞ্চলা। ভয় কি? আইভির লীলাখেয়ালে আশ্বাস আছে।

অব্যক্ত একটা ধ্বনির সঙ্গে সহসা সাবেগে পরিমল আইভিকে তার বক্ষে নিপীড়ন করে ধরল। সে মুখে এখন আর উপেক্ষা নেই, স্পর্দ্ধা নেই, আছে আত্মসমর্পণের বিহ্বলতা। বাঁকা ছোরার মত চোখে আইভির কামনার তীব্রতা, সূক্ষ্ম অধরে চুম্বনের ব্যাকুলতা।

দেহের বন্ধনে উভয় দেহে যেন আগুন ধরে যায়। জন্মান্তর ভেদ করে যৌবনবেগ সহস্রগুণ শক্তিলাভ করে তৃষ্ণার আকর্ষণে। আইভি পরিমলের জন্য সৃষ্টি হয়েছে, পরিমল আইভির জন্য।

অসহ্য আবেগে আইভিকে চুম্বন করতে করতে পরিমল ভাবল জগতের সমস্ত উপন্যাসের উপসংহারই বোধ হয় লেখা আছে এখানে তার প্রিয়ার বক্ষ অধরে

দশ

বিকেলবেলা চা খেয়ে কাপড় পরতে উঠে সুজাতা দেখল সুনীল চক্রবর্ত্তী আসছে। আর কাপড় ছাড়া হল না। পরিধানের দিকে চেয়ে দেখল বড় ময়লা শাড়ীখানা। পরে আর সবার কাছে হ'ক সুনীলের সম্মুখে বার হওয়া চলে না।

টিনের চাল, কাঠের ঘরটিতে সুজাতা তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল। বাড়ীর যত বাড়তি মাল এখানে আছে রাশীকৃত হয়ে। একপাশে একটা সস্তা আলনায় কতকগুলো শাড়ী আর বাচ্চাদের জামা নিপুণ ভাবে গোছানো।

হলুদটান দেওয়া ডুরে শাড়ীটি সুনীলের প্রিয়। এটি পরলে সুজাতাকে নাকি 'যোগাযোগের' কুমুর মত লাগে। ওই দেহের দীঘল অঙ্গে ডুরে শাড়ীর রেখার শোভাবর্ণনে কবি শতমুখ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাবুকতা জগৎবিখ্যাত, রাতারাতি সুনীলও কবি হয়ে উঠেছে।

শাড়ীর আঁচল গায়ে জড়িয়ে নিতে নিতে ভাবল সুজাতা। শুধু হাতের গুণে আর কত দৈন্য ঢাকা যায়? সুনীলের বাড়ী সে নিজে যায়নি বটে, দাদা

অসিতের মুখে বিশদ বর্ণনা শুনেছে। গাড়ীতে একদিন সুনীলকে তুলে নিতে এসেছিলেন মিসেস চক্রবর্ত্তী আইভিসহ, জরুরী দরকারে। তাদেরও সুজাতা দেখেছে। প্রেমাস্পদের সঙ্গে তুলনায় নিজের দীনতা প্রকট হয়ে ওঠে। সরলা বুঝতে পারে না ভবিষ্যতে স্বস্তি আছে কি না। অসম মিলনে সুখ হয় কি? এসব চিন্তা মনে খেলা করে যায়। কিন্তু, মিলন এসব ক্ষেত্রে আদৌ হ'তে পারে না, সে তথ্য স্বপ্নেও কিশোরীমনে জেগে ওঠে না। সান্তা কইফিটার কাহিনী পড়েছে সুজাতা। প্রেম মানেই বিবাহ।

মাসিক ষাট টাকা ভাড়ায় কলিকাতাতে এর চেয়ে ভালো বাড়ী পাওয়া যায় না। অনেক তদ্বিরে এটি মিলেছে— একনাগাড়ে বহুদিন আছে, তাই ভাড়াও বাড়ে নি। দু'খানা শোবার, একটি বসবার ঘর। আলোবাতাসও বেশ খেলে। ভাঁড়ার ঘরের একপাশে দরজার মুখে রান্না হয়।

সুজাতার দুই দাদা, বড় বিবাহিত, ছেলেমেয়ে আছে। [illegible] কেরাণীগিরি করেন দশটা পাঁচটা। বিধবা মা আছেন নীচের তলার ঘরে। ছোটদা অসিত বেসরকারী অধ্যাপক, সুনীলের সহপাঠী। সুনীল বিলেত থেকে ফেরার পরে পুনরায় ঘনিষ্ঠতা হয়েছে আর্থিক অবস্থার [illegible] ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও।

সুশোভিতা সুজাতা বেরিয়ে এসে সুনীলকে অভ্যর্থনা করল। কিশোরী সুজাতা আঠারো বছর চলমান বয়স, চম্পকগৌর গাত্রবর্ণ, কুঞ্চিত কেশ মুখে চোখে পড়ছে।

এই সাধারণ ঘরের সাধারণ কিশোরীর মধ্যে সুনীল [illegible], যুগে যুগে প্রেমিক প্রিয়ার মধ্যে তাই দেখে থাকে অসামান্যত্ব।

আইভির বংশের ওপর অদ্ভুত অভিসম্পাত আছে। [illegible]কে ভালবাসে, সে তাকে পায় না। বিশেষ করে তারা বিভিন্ন স্তরের লোককে ভালবাসে। নূতনত্বের মোহ ভিন্ন কি বলব? সুনীল সমাজস্থ মহিলাদের সঙ্গ ত্যাগ করে ধাবিত হচ্ছে দরিদ্রকন্যার প্রতি যৌবন যার সুদক্ষিণ নায়কের মত তনুলতা শ্রীমণ্ডিত করে দিয়েছে—এইটুকু মাত্র। আইভি আসক্ত হচ্ছে পরিমলের দিকে বংশমর্যাদাহীন ইন্সিওরের ভাড়াকরা দালাল। অর্থ নেই বলেই আইভি-সুনীলের সঙ্গে পরিমল-সুজাতার যে প্রভেদ তা নয়—দু'জনদের জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানদণ্ডে জগৎকে মাপে দু'জনেরা। পরিমল-সুজাতার টাকা হ'লেও

মুখের দিকে তাকিয়ে গায়ে শিথিল আঁচল টেনে সুজাতা বিদ্যুতের মত তিনের ঘরে আবার চলে গেল।

জামা ভাল করে পরতে পরতে সুজাতার চোখে জল এল। সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলে গেছে, খোঁপা এলিয়ে পড়েছে। কপালের কুঙ্কুমরাগ অদৃশ্য। সুযোগ পেলেই সুনীল তার সমগ্র শরীর নিয়ে খেলায় প্রবৃত্ত হয়। ভেবে দেখেনা সুজাতার কত ভয়, কত লজ্জা।

সুজাতা শরীরের অণুপরমাণু দিয়ে চায় সুনীলের স্পর্শ, এ স্পর্শস্মৃতি তাকে আবেশে বিভোর করে রাখে রজনী করে তোলে নিদ্রাহীন। কিন্তু, ভয় তো আছে! কেউ দেখে ফেলার কত ভয়! প্রিয়সঙ্গ তাই পেয়েও নিশ্চিন্ত হ'তে পারে না সে। যদি মা-দাদা-বৌদি জানতে পারেন, কি ভাববেন তারা? সুনীল কত নীচে নেমে যাবে তাঁদের চোখে, যার সঙ্গে বিশ্বাস করে তাঁরা সরলা-কুমারীকে মিশতে দিয়েছেন? আর, তাছাড়া অন্যায় এসব করা। বিয়ের আগে মোটেই উচিত নয়। সুনীল হাসে আর বলে, "যে ঈশ্বর আমাদের এক করেছেন, তাঁর চোখে এটা অন্যায় নয়।" সুনীলকে বিশ্বাস করে সুজাতা। তার চোখে সুনীল দেবতা, নীলাকাশ থেকে ভিখারিণীর কুটীরে নেমে এসেছে। সুনীল তাকে ভালবাসে, সুনীলের সঙ্গে বিয়ে হবে তার। কেন সুজাতা সুনীলের মনে কষ্ট দেবে?

তবে, কেমন লাগে যেন দ্বিধা আসে মনে হয়, বুঝি অপরাধ করে ফেললাম। বাঙালীমেয়ের মজ্জাগত নীতিবোধ। মধ্যবিত্ত-কন্যার দৈনন্দিন জীবনের পাপপুণ্য মুছে ফেলা কঠিন। যাকে ভালবাসি তাকে সব দেব সত্য, কিন্তু, ওই শালগ্রামশিলার সম্মুখে বামা-শ্যামা-যদু-মধুর উপস্থিতিতে এবং মূর্খ পুরোহিতের মৃতভাষার মন্ত্রপাঠে অনুমতি দেবেন দেবতা: হে নারী, তুমি যথেচ্ছ দৈহিক বিলাসে মগ্ন হও। সকাল, সন্ধ্যা, দ্বিপ্রহর, রাত্রি তোমার কাছে সব সমান হ'ক। রুগ্ন ক্ষুধিত সন্তানের বারংবার জন্মদানে তুমি নিবৃত্ত হয়োনা। পুত্রকন্যার সম্মুখে, বিগতযৌবনা তুমি, প্রৌঢ় স্বামীর শয্যা-ভাগিনী হ'তে দ্বিধা কোর না। এ-যে তোমার birth right—এতকাল সমাজের অনুশাসনে কৌমার্যধর্ম্ম পালন করেছ, এখন রাতারাতি তোমার প্রেমলীলা ফরাসী-পোষ্টকার্ড অথবা হাড়কাটাগলির পর্য্যায়ে নেমে যাক। সিঁথিতে লম্বা করে সিঁদুর টেনে দাও। অমনি তোমার হাতের জল শুদ্ধ

যায় না এই নূতন স্থনীলের। নরম ঠোঁট কেটে গিয়েছিল সেদিন, সমগ্র দেহে নীলদাগ হয়ে গিয়েছিল। শেষ মুহূর্তে সিঁড়িতে জুতোর শব্দে স্থনীল তাকে ছেড়ে দিয়েছিল হঠাৎ।

তারপরে অত উগ্র না হ'লেও আদরের মুহূর্তে স্থনীল কখন কখন পুরুষালী-প্রথায় নিষ্ঠুর হ'ত। জীবনে পুরুষসঙ্গ করেনি সুজাতা, বিস্মিত ভীত হ'ত সে আজ যেমন হ'ল।

বুকের মধ্যে ধড়ফড় করছে। চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। শিথিল কেশ-বেশ সংযত করে সজোরে জল দিয়ে মুখখানা ধুয়ে ফেলল। তবু, যেন চুম্বনের চিহ্ন উঠে যায় না কালো চোখের পাতায়, আরক্ত অধরের পাশে, রক্তিম কপোলে, ললাটের চূর্ণ অলকের নীচে এই বুঝি স্থনীলের সিগারেট বিবর্ণ ঈষৎ তপ্ত অধরের ছাপ আগুনের মত জ্বলছে তার, উচ্চস্বরে চীৎকার করে আত্মীয় পরিজনকে বলে দিচ্ছে, সুজাতা অন্যায় করেছে — অন্যায় করেছে সুজাতা।

সুজাতার ইচ্ছা করে জগতের সম্মুখে স্থনীল নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করুক বিবাহের মন্ত্র পড়ে বা [illegible] অঙ্গীকারের বন্ধন পরিয়ে। কিন্তু স্থনীল [illegible] [illegible], চাকরি নেই। সুজাতাকে বিবাহ করলে মাতৃপিতৃ বিমুখ হবে, কাজেই অপেক্ষা করতে হবে। প্রেমের বাড়াবাড়ি [illegible] [illegible]

নিশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এল সুজাতা। ভালো লাগে না [illegible] [illegible] বাড়াবাড়ি ভালো নয়। এতে অন্যায়, পাপ। স্থনীলের সঙ্গে কিছুতেই [illegible] মিল হয় না।

অবসন্নভাবে স্থনীল বিছানার ওপরেই বসেছিল। [illegible] মায়ের সঙ্গে কথাকাটাকাটি হয়ে গেছে তার — লিলিকে বিয়ে না করলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। আজ এসেছিল স্থনীল সুজাতার সঙ্গে একটু [illegible] [illegible] শুভসংকল্প নিয়ে। আপাততঃ বিবাহ [illegible] সম্ভব নয়। কিন্তু হায়! ডুরেশাড়ীমণ্ডিত তন্বীকে দেখামাত্র, তার মুখের কথা শোনামাত্র [illegible] [illegible] [illegible] সুজাতাকে বিয়ে করে কি খাওয়াবে, লিলিকে বিয়ে করলে কত ভবিষ্যৎ সব কথা নিমেষে স্থনীল ভুলে গেল।

চিরকাল দুর্বল স্বভাব তার। লরা এখনও সাগরপারে প্রতীক্ষা করছে দেশে ফেরার দিন ঠিক হয়ে যাবার পরেও স্বর্ণকেশা শ্বেতাঙ্গিনীর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারেনি স্থনীল। অবশ্য লরা ও সুজাতাতে অনেক তফাৎ।

"কেন ? তুমি যা বলেছ, স্থ তাই করছে। মুড়ি তেলনুন দিয়ে মেখে, লঙ্কা কড়াইশুঁটী কুচো-কুচো করে দিয়ে। এখনি আনছে।"

সুনীল মনে মনে হাসল। সুজাতার খাবারের কথা জিজ্ঞাসার সুযোগ হয়নি। লজ্জায় আর ঘরে ঢোকেনি সে। অথচ বৌদির কাছে স্বাভাবিক ভাব দেখিয়েছে, যেন সুনীলের কথামত খাবার তৈরি করছে। যেন সুনীলের সঙ্গে ওর এতক্ষণ এমনি বস্তুতান্ত্রিক কথাই হচ্ছিল। মধুর ছলটুকু মধুর লাগে।

সুনীল পকেট থেকে টফির সচিত্র কৌটো বার করল, "টুটু, মীরা ফেরেনি ? আজকে ওদের টফি এনেছি।"

"না, এখনও বেড়িয়ে ফেরেনি পার্ক থেকে। ওর বড় অসভ্য হয়েছে।" বৌদির কথার রেশ টেনে সুনীলের বন্ধু অসিত ফিরল কাজ থেকে- "অসভ্য' কে অসভ্য, বৌদি ?"

দেওরের আগমন প্রসন্নচক্ষে অভ্যর্থনা করে নিয়ে বৌদি পেয়ালায় চা ঢেলে দিলেন,—" এই আমার ছেলেমেয়ে খালি চাওয়া আর চর্ব্ব্য' সুনীলকে জ্বালিয়ে খেল।"

সুনীল চায়ে চুমুক দিয়ে সবেগে প্রতিবাদ করল, "Oh please don't mention it, আপনি আমাকে এতই পর ভাবেন, বৌদি ? Really, it is too much."

অসিত হেসে উঠল—"সুনীল, তোমার ইংরেজি বুকনীগুলো আর ছাড়তে পারলে না। সাহেব, ভুলে গেলে নাকি বৌদি যে ইংরেজি বোঝেন না ?

সুনীল মহা অপ্রতিভ হয়ে রুমাল বার করে ললাট মার্জ্জনা করল। সুজাতা কয়েকখানা রেকাবী কাঁসার থালায় বসিয়ে ঘরে ঢুকল, "এই যে খাবার। মা নারকেলের সন্দেশ করেছিলেন, সুনীলবাবুকে দিলেন।' প্রিয়তমের নাম প্রকাশ্যে সহজভাবে বলবার চেষ্টায় সুজাতার গলাটা একটু কেঁপে গেল

বৌদি কটাক্ষে ননদের ব্রীড়াকুঞ্চিত ভঙ্গি দেখে হাসতে হাসতে বলে উঠলেন, "রোজ বলি স্থকে, সুনীলকে একটু করে বাংলা পড়াতে।" সুনীল দুষ্টুছেলের ভঙ্গিতে বলে উঠল, "স্থ আমাকে শেখাচ্ছে না কেন তবে ? আমি কি বোকা হয়ে থাকব ?"

"শেখাবে, শেখাবে। সব ঠিক সময়ে।"

বৌদির কথার সুরে সুজাতা লজ্জিত হয়ে পড়ল কি যে করেন বৌদি ?

এ কথা এমন সুরে সুনীলের কাছে বলবার উদ্দেশ কি? পরে বল্লে কি চলত না?

পলকে সুনীলের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সে কেমন করে এই সরলা কিশোরীর মনে নিদারুণ আঘাত দেবে? কেমন করে এই হাস্যমুখী নারীকে প্রতারিত করবে? সমগ্র পরিবারটির সব সুখের আশায় তার ছাই ঢেলে দিতে হবে। মুখে সে কিছুই প্রকাশ করে বলেনি বটে, কিন্তু প্রকাশের প্রয়োজন আছে কিছু?

অসিত [illegible] মোড় ফেরাতে বলল, "চাকরটা কোথায়? সিগারেট আনতে দিতাম।"

নিরুত্তরে সুনীল সোনার সিগারেট-কেস বাড়িয়ে ধরল। বৌদি বল্লেন, "চাকরটার কাজ ছিল না, একটু বাচ্চাদেরকে বেড়াতে দিয়েছি। একি সুনীল, তুমি উঠলে নাকি?"

অসিত মহা প্রতিবাদ করে উঠল, "না, না, [illegible] আজ নতুন তাসজোড়া পাড়, বৌদি, কতদিন পরে খেলা হয়নি। আর বৌদিরও কাজ শেষ হয়ে গেছে, [illegible] তোমার [illegible] পড়ছেন, সুনীল।"

সুনীল [illegible] লাগল, সুশান্তের দিকে চেয়ে দেখল কথা না বলে [illegible] একটু থাকলে [illegible] আসন্ন সন্ধ্যার মদির সম্ভাবনাকে [illegible] কোন পুরুষ এমন অনুনয় এড়াতে পারে।

সুতরাং [illegible] দুর্বল সুনীল [illegible] মুহূর্তের মায়াপ্রাসাদে ধরা দিল।

এগার

"হে ভগবান্, টুপিটা খুলে যেন দেখি আমার সব চুল কুঁকড়ে গেছে বেশ সুন্দর হয়ে!" প্রার্থনা করতে করতে বৈদেহী আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। মাথায় তার অতি অদ্ভুত একটা লোহার টুপি শক্ত হয়ে মাথার স্বল্পাবশিষ্ট কেশকে ঢেকে রেখেছে। পাশে সাজবার ঘর, কিন্তু শোবার ঘরের আয়না বেশী বড় বলে বৈদেহী সেখানেই দাঁড়াল। ঘরের কোনে মার্বেলের টেবলের ওপর একটা বিলিতি তরলপদার্থপূর্ণ শিশি রয়েছে খোলা অবস্থায়। একখানা ছোট বিজ্ঞাপনের বই একটা বিশেষ জায়গায় খোলা। সে পাতায় এক শ্বেতাঙ্গিনীর প্রতিকৃতি, মাথায় ওই বৈদেহীর মত টুপি। পাশের অন্য পাতায় এক ব্যক্তিরই টুপিছাড়া মূর্ত্তি, একরাশ কুঞ্চিত কেশ তার।

কাজেই বেশ বোঝা যাচ্ছে যে এই ঔষধ মাথায় দিয়ে ওই টুপিদ্বারা অবাধ্য কেশপাশকে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য আটকে রাখবার পর মুক্তি দিলেই অন্যকারও প্রতিকৃতির মত হবে। তাই অপরাহ্নে বৈদেহীর এ আয়োজন।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বৈদেহী ভাবল, এখনি খুলব নাকি? যদি দেখি বেশী খারাপ হয়েছে চুল? আর, যদি দেখি ঠিক হয়ে গেছে, তাহলে কি মজাই হয়! দেখলে নিশ্চয় ও ভাল ভাববে।

একটু ইতস্তত করে বৈদেহী টুপিটা খুলে ফেলল সাহস করে। একি, একি হয়েছে! কেশ তো কুঞ্চিত হয়ইনি, উল্টে আরও সোজা হয়ে খাড়া উঠেছে

হায়, হায়, একি হ'ল? কেন পাড়ে মরতে এ কাজ করতে গেলাম! এখন এ চুল যে আরও খারাপ হয়ে গেল। ছিঃ, ছিঃ, বাড়ীর লোকজন, দাসীচাকর সব দেখলেই বা কি বলবে? ভাববে বুঝি—ছিঃ, ছিঃ!

একটু আত্মদমন করে বৈদেহী ভাবল—

আজ ও আসবে নিশ্চয়, আজই বা কেন আমি এসব পরখ করতে গেলাম আমার মত এমন বোকা—কি যে করি এখন?

বৈদেহীর মনে হ'ল হয়তো যথেষ্ট সময় টুপিটা মাথায় রাখা হয় নি। তাই সে আবার একটু তরল পদার্থ মাথায় ছিটিয়ে টুপিটা পরে ফেলল।

চৈত্রের শেষ। অতিশয় গরম পড়েছে। পাখার গতি শেষ অঙ্কে থাকলেও

কেন সাধারণ মেয়ের মত সাধারণ পুরুষের কাছে সুখ আশা করেছিলে? তোমার উচিত ছিল প্রেম দেওয়া—গায়ককে, যে প্রয়োজন হ'লে অশরীরি হ'তে পারে, যে পরিমল লাহিড়ীর মত রক্তমাংসের মানুষ নয়। সে তোমার অসামান্যতার মূল্য দিতে পারত নিজের অসামান্যতার প্রলাপে। সাধারণ নারীর পাবার বস্তু তো তোমার নয়, বৈদেহী। তবু, তোমাদের মত মেয়েরা ভুল করে সাধারণ ঘরসংসার, হাঁড়িবেড়ির মোহে অতি সাধারণ পুরুষকে আত্মদান করে। সে জীবন তোমার নয়, তার পশ্চাৎধাবন কর তোমরা। পরিণাম নিরাশা!

তন্দ্রা থেকে আচমকা যেন ধাক্কায় বৈদেহী উঠে পড়ল। স্বপ্নের ঘোরে মনে হচ্ছিল কে যেন স্পর্শ দিয়ে তাকে জেগে তুলেছে। কানের কাছে মৃদু গুঞ্জনে কে গাইছে –

আজি ফাগুন দিনে দেখ, দিবস জাগি রয়,
প্রেমের ডাক শোন, সমীর দীপ্ত বয়
কুসুম চাহি আছে,
ভ্রমরা ডাকে কাছে,
তবু সে ভুলে গেছে
বিরহ নদী বয়

চেয়ে দেখল বৈদেহী খবরের কাগজখানা উড়ে এসে গায়ে পড়েছে তার। কোনও মানুষ ঘুম ভাঙাবার জন্য কানের কাছে গান করেনি।

"উঃ!" বৈদেহী আবার শুয়ে পড়ল। সারা মাথা শিসার মত ভারী, শরীরে একটা বিশেষ ভাবের সৃষ্টি করেছে। হাত পা অবশ, নিঃশ্বাসের কাছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সারা শরীর মন্থন করে যেন সুরাসুরের যুদ্ধ চলেছে, বক্ষস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে মুখচোখ জ্বালা করছে।

অধীর ব্যাকুলতায় বৈদেহী একটানে ভারী টুপিটা খুলে ফেলল। মনে হল মাথার ওপর থেকে স্বয়ং গন্ধমাদন পর্বত নেমে গেল।

আয়নার সম্মুখে দাঁড়াতে দেখা গেল মাথার ওপরে একরাশ কুঞ্চিত চুল। তবে তো তার সমস্ত কষ্ট সার্থক হয়েছে। আনন্দে বৈদেহীর কাছে ভারী মাথাটাও সাময়িক ভাবে হাল্কা হয়ে গেল।

চুল কুঞ্চিত হওয়াতে পেছনের দিকে সরে যেয়ে মাথাটাকে একটু বেশী খালি লাগছিল। অবশ্য সেটা বৈদেহীর চোখে পড়ল না। চিরুনী দিয়ে চুল

সাজাতে সাজাতে বৈদেহী ভাবল, আজ যখন আসবে, তখন তো চুল এতই সুন্দর থাকবে। ও নিশ্চয় ভাল বলবে।

বৈদেহী চোখের সম্মুখে পরিমলের মুগ্ধ দৃষ্টি যেন দেখতে পেল। রূপহীনার অতি সন্নিকটে একযোড়া তুলীদিয়েআঁকা নয়নে্ যেন সপ্রংশস মুগ্ধভাব ফুটে উঠল। বৈদেহী গুনগুন করে এক লাইন গান ধরল—

"গোবিন্দ মুখরাবিন্দ কোটি চন্দ্র হরে"—

সত্যই তো, প্রিয়ের মুখ কোটি চন্দ্রকে লজ্জা দেয়।

পরিচারিকা এসেছিল ঘর ঝাঁট দিতে। দীর্ঘ বেলা অবসান হয়েছে। পশ্চিম আকাশে সূর্য্য গমনোন্মুখ। বৈদেহী তাড়াতাড়ি আয়নার কাছ থেকে সরে শোবার ঘরে চলে এল।

পাখা তখনও ঘুরছে। পরদা, বিছানার চাদর বন্ধনমুক্ত হ'বার প্রবল প্রচেষ্টারত। বৈদেহী পাখাটা বন্ধ করে দিল। সারামন দেহের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। একটা অলস নিরানন্দ, অহেতুক বিরক্তি।

বৈদেহী ভাবল, ভগবানের ওপর হাত চালাতে গেলেই এ দশা হয়। কেন যে চুল কোঁকড়াতে গেলাম? যেমন ছিল, তাই ভালো ছিল। এখন শরীর এত খারাপ লাগচে! আজ ও এলে ভাল করে হয়তো কথাই বলতে পারব না। গাইতে পারব না ভাল করে।

বৈদেহী মুখ ধুতে গেল। কলের ধারাযন্ত্রে সর্ব্বশরীর সিক্ত করে ঘরে ফিরে প্রসাধনে মন দিল।

সাধারণতঃ, বৈদেহী প্রখর বস্ত্র পরে, নিজেকে সেই রঙের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে। আজ মনের শান্ত বিষাদে সুর মিলিয়ে পরে নিল ভ্রমরপাড়ের সাদা সূক্ষ্ম শাড়ী। গায়ে প্রথমে হাতাশূন্য লাল সিল্কের জামা, পরে পরিবর্ত্তন করল গেরুয়া কিংখাবে। নিপুন হস্তে চোখে সুরমা লাগিয়ে পাউডারের তুলী চামড়ায় বুলিয়ে বৈদেহী প্রসন্ন হাসি হাসল। মাথাধরা ছেড়ে গেছে, শরীর লঘু বোধ হচ্ছে। ইভনিং-ইন্-পারীর সৌরভ দেহে বিলেপিত হয়ে অগুরুগন্ধের মিশ্রনে মাতাল করে রেখেছে।

কিন্তু একবারও বৈদেহীর মনে উদিত হ'ল না যে প্রিয়ের চিত্ত অধিকার করে থাকতে পারে অন্য নারী। সে তরুণীর লীলায়িত তনু। বিধাতা নিজের হাতে অপরূপাকে সজ্জিত করে দিয়েছেন। শ্রীহীন দেহকে কৃত্রিম

শোভায় সজ্জার প্রয়াস তাঁর করতে হয় না। যে মনে প্রবেশের ব্যাকুলতায় বৈদেহীর ভীত চিত্ত অনুক্ষণ নিজের দীনতায় সঙ্কুচিত হচ্ছে, সে মনে সাম্রাজ্ঞীর গৌরবে দণ্ড চালনা করছে অন্য নারী।

অজ্ঞান তিমিরে সুখী বৈদেহী আয়নার সম্মুখে সজ্জা করতে লাগল। রক্ত অধরে রঞ্জনীরাগ বিলেপিত হ'ল। ওই তো, মুখমণ্ডলে পুষ্পরেণুকা। গুরু নিতম্বে আগে ছিল মেখলা, এখন আধুনিক শাড়ীর রেখার টান। চুলে ফুল না থাকলেও গুচ্ছি আছে। উৎসুকা সজ্জা করছে প্রাচীন যুগের ন্যায় শেখরেশ্বরের ধ্যান-ভঙ্গে। কত ধ্যান ভাঙে, কত ধ্যান ভাঙে না। তবু তো প্রসাধনে নারীর রুচি। বৈদেহী, সেই সজ্জাভিসারিণীর দলে মিশে যাও। যুগে যুগে রূপের তপস্যা করে নারী। এতো স্বতঃসিদ্ধ। এখনই বহু গৃহের মুকুরে প্রতিফলিত হচ্ছে বহু উৎকণ্ঠিতার প্রসাধন-বাহুল্য। এমনি সন্ধ্যায় বল্লভ-প্রসাদনে কামিনীরা কামের আরাধনা করছেন লাবণ্যের পরিমার্জ্জনে। প্রিয়-পথ-নিরীক্ষণকারী যুগল অক্ষি কজ্জলিত হচ্ছে।

চন্দ্রালোক আবার মর্ম্মরে অবলুণ্ঠিত। যন্ত্রের সম্মুখে বৈদেহী, একটু দূরে পরিমল।

অনবদ্য শক্তি বৈদেহীর। ক্ষণিকের জন্যও শ্রোতাকে বিগলিত করে দেয়। সে শক্তি তার সঙ্গীত, সে তার সঙ্গীত। কণ্ঠের সঙ্গে যন্ত্র কখনও আদরে গলে পড়ছে, কখনও বা ঝঙ্কারে দিক প্লাবিত করে তুলছে।

প্রসন্নবাবু কিছুক্ষণ আলাপের পরে সান্ধ্য-ভ্রমণের উদ্দেশে উঠলেন। অন্য দিনের প্রথায় পরিমলকেও ডাকলেন সঙ্গে যেতে। পরিমল বলল, "আজ একটু মিস রায়ের গান শুনতে চাই। আজ বেড়োব না।"

প্রসন্নবাবু প্রসন্ন মনে একাই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এই রূপবান যুবক মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনকেও অধিকার করেছিল। চিরদিনের রূপপিপাসু তিনি। নিজে রূপবান ছিলেন না—সহধর্ম্মিণী কুৎসিৎ। একমাত্র আদরের সন্তান বৈদেহী হতকুশ্রী। তাঁর জগতে রূপের শ্রেষ্ঠ প্রতীক এসেছে পরিমল।

বেড়িয়ে যেতে যেতে মুখ ফেরালেন তিনি। শাদা কাপড়ে শুভ্রা বৈদেহীর পশ্চাৎদেশ দেখা যাচ্ছে। পরিমল বসে আছে পাশে। হঠাৎ মনের কোণে ছবি ভেসে এল পিতার—এমন কি বেমানান হ'বে? তরুণ কন্দর্পপ্রতিমকে

আমাতার আসনে বসবার গোপন লোভ ছিল তাহ'লে মনের কোণে কোণে? লোভ! ভবিষ্যৎ তিনিই গড়ে দেবেন অর্থের জোরে। কিন্তু নিরাশ হয় চিত্ত সুহিতার শ্রীহীনতার স্মরণে। অসম্ভব! এ বৈদেহীকে বিয়ে করতে পারে না। কাজ কি বৃথা স্বপ্ন-বপনে! কিন্তু, এমন কি বেমানান হ'বে?

বসবার ঘরের আলো নিভন্ত। চন্দ্রালোক লুটিয়ে পড়েছে। বৈদেহী আবার সুরের দেবী। ভক্ত মুগ্ধ পরিমল। দূরে বাতাসে চাঁপার গন্ধ, গাছের আড়ালে বসন্তের যুথভ্রষ্ট মহানগরীর কোকিলের ডাক সহসা বিস্ময়ের উপাদান যোগায়।

"গান, গান। আরো গান!"

কি গান গাওয়া যায়? কি গান গাওয়া যায়? যখন বাতায়নের বাহিরে বসন্তের মহোৎসব, মনে প্রেম, দৃষ্টিতে প্রিয়তম? গানের দল মনে ভিড় করে আসে, গানের কলি মনে পড়ে না। প্রাণ চায় গানের মধ্য দিয়ে প্রাণের কথা কানে কানে বলতে। বৈদেহী, গান করো। ভুলিয়ে দাও বর্তমান, দীর্ণ হয়ে খসে পড়ুক অতীত, ডেকে আনো ভবিষ্যৎ, সে ভবিষ্যতে তোমার আশা আছে।

ফাগুন রাত্রের সঙ্গীত বেজে ওঠ যন্ত্রে, ধরা দাও আমার কণ্ঠে। স্বপ্নের সুরে কানের কাছে বেজে উঠল স্বপ্নে শোনা গান—

"আজি ফাগুনদিনে দেখ, দিবস জাগি রয়"—

সঙ্গে সঙ্গে বৈদেহীর কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হ'ল সেই চির পুরাতন, চির নূতন সঙ্গীত :—

এসো ব্যাকুল হৃদয়ে প্রেমের বন্ধনে,
আকুল যৌবন এ দেহ-নন্দনে।
কামনা শিহরায়,
তোমারে বুকে চায়,—
—এ প্রেমে মেশামেশি পঙ্কচন্দনে।
আজি ফাগুনদিনে দেখ, দিবস জাগি রয়,
প্রেমের ভাষা শোন, সমীর ধীরে কয়।
কুসুম চাহি আছে,
ভ্রমরা ডাকে কাছে,

তবু সে ভুলে গেছে ?

—বিরহ নদী বয়।

তোমারি শুনি বাণী

আকাশে কাণাকানি ;

সাগরে ঢেউ, জানি,

তোমারি হাতছানি।

—আমারে ডেকে নাও প্রেমের প্রাঙ্গনে।

জীবনে দেখা যদি পেয়েছি, প্রিয়তম,

তবু কি দূরে রবে সুদূরে চাঁদ সম ?

দেহের সীমানায়

প্রণয় মিল চায়,

বাহুর ডোরে মাগি হৃদয়-রঞ্জনে।

আহা, প্রখর রবিতাপে বিবশ মম দিন ,

হিমানী-সিত রাতি তুষারে নিদহীন।

আর তো ফুল নাই,

ভ্রমরে কোথা পাই ?

গান তো মরে তাই,

সকলি প্রাণহীন।

তুষার-রাতি তলে

তপন-মনি জ্বলে ,

প্রখরে ম্লান করে

নয়ন-ধারা ঝরে।

—জাগিয়া ওঠে গান তোমারি চুম্বনে।

ঘুমায়ে পড়ে প্রাণ বাহুর বন্ধনে।

বসন্তসায়াহ্নের সকল রমণীয়তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়ানো। সন্ধ্যার মাদকতা-ভরা জ্যোৎস্না ভূলোকে আপন আসন বিছিয়ে নিয়েছে। শুভ্র রজতজালে বৈরোহীর বাড়ীর মাঠ যেন বেষ্টন করা হয়েছে। প্রফুল্ল যামিনীর সমস্ত কোমলতা, বসন্তের যামিনীর সমস্ত মাধুরীর বিশিষ্ট একটা রূপ বৈরোহীর সঙ্গীতে ধরা দিয়েছে।

উদাস করুণ স্বরজাল আনন্দে পরিপূর্ণ যৌবনকে উদ্বেল করে তুলল। দেহে বসন্তের বিকাশ না হ'লেও অন্তর যে বৈদেহীর যৌবনের আক্রমণে বিবশ। তার মনপ্রাণ সব সে এই সঙ্গীতে মিশিয়ে দিয়েছিল। স্বপ্নে অজানা কে তার কানের কাছে যে সুরের উদ্বোধন করেছিল, সেই সুর বৈদেহী তেমনি করে [illegible] তুলেছে নিজের পাঁপিয়া-কণ্ঠের অনুপম স্বরশিক্ষায়।

নির্ব্বাপিতদীপ-কক্ষে পরিমল গায়িকার ভাবলেশহীন, রূপলেশহীন মুখ দেখতে পারছেনা, কণ্ঠের সুর-অলকারই সন্ধান পাচ্ছে, ওই চিন্তাই বৈদেহীর মনে অপার তৃপ্তি এনেছিল। সঙ্গীতের ধারায় তাই তার হৃদয়ধারা এমন ভাবে মিশে গেল। মনের কথা গানের সুরে ভেসে গেল বাঞ্ছিতের প্রতি।

পরিমলের মনের কামনা, প্রেমের তার আকুল অভিযোগ যেন কবি নিজে অনুভব করে নিয়ে নিজের কথায় প্রকাশ করেছেন। এতো 'তারই অন্তরের অনুনয়—সেই চিরকঠিনা নারীর প্রতি। সে নারী আইভি। সে ধরা দেয়না, কেবল দূর থেকে পাগল করে রাখে।

পরিমলের মনে পড়তে লাগল দিন দুই আগে অপরাহ্নে বৃক্ষলতার নিবিড় ছায়াতলে আইভিব নিমীলিত নয়ন। সে নয়ন কি প্রণয়ের আলোকপাতে তার প্রতি উন্মীলিত হ'বে না?

—কামনা শিহরায়
তোমারে বুকে চায়—

জাগরণ চা । পরিমলের উত্তপ্ত যৌবনের উত্তাপ, তার প্রেমের উচ্ছ্বাস পাষাণীকে স্পর্শ করেনি। সে কি প্রথম প্রণয়ভীতা কিশোরী? মুখর বসন্ত-দিনের মতই পরিপূর্ণা সে, শ্রাবণের উচ্ছ্বসিতা তটিনীর মত। কোন সংকোচ, কোন অপূর্ণতার আভাসমাত্রও তার উজ্জ্বল মদিরনয়নে, ব্যঙ্গহাস্যে বঙ্কিম অধরপল্লবে, রক্তিম কপোলে দেখা যায় না।

তবু তাকে চাই পরিমলের। তার যৌবন-নিকুঞ্জে পিক উতলা হয়েছে তারই জন্ত, অন্তরের মুরলীধ্বনিও সেই পলাতকাকে অনুসরণ করে ফিরছে। এই নিবিড় বসন্ত-নিশীথে, বকুলের সৌরভ, মলয়ের বীজন, সমস্তের মধ্যে তাকে চাই। সমগ্র বসন্তঋতু পুরুষের যৌবন উন্মুখ হয়ে তাকে প্রার্থনা করছে। জাগরণ চাই!

পরিমলের আত্মবিস্মৃত চিত্তে আইভির প্রেমের সঙ্গে বৈদেহীর গান মিশে

গেল। বৈদেহীর অপরূপ সুরলহরী পরিমলের মনে আইভিকে আরও প্রকাশমান অবস্থায় জাগিয়ে তুলল।

মানুষে এত সুন্দর গাইতে পারে! একি সুরের দেবী? কি সুন্দর, কি সুন্দর! এর ভুবনভোলা মনে যে ধ্বনি-তান একসঙ্গে নৃত্য করছে, সে মন পরিমলের করতলগত। একটি কথায় এই গায়িকা পরিমলের সম্পত্তি হ'বে। এই সঙ্গীত, যা তার মনের তারুণ্যকে সম্যক্ স্পর্শ করছে, যৌবনের নিগূঢ় অর্থ নয়নসম্মুখে উন্মোচিত করে ধরেছে, সে সঙ্গীত পরিমলের জীবনকে পূর্ণ করে থাকবে চিরকাল। রূপ? সে তো তুচ্ছ জিনিষ, যৌবনের সঙ্গে শেষ হয়। কোন গান মানুষকে এত বিচলিত করে? উন্মাদ যৌবনকে এত বুভুক্ষু করে তোলে? মনের ক্ষুধা জেগে উঠছে লোলুপ গ্রাসে। কি চাই তার?

আইভি, আইভি! আইভিকেই তো তার যৌবন আহ্বান করছে—

এসো ব্যাকুল হৃদয়ে প্রেমের বন্ধনে—

এসো তুমি, এ জীবনের একমাত্র প্রিয়তমা! ব্যথিত বসন্ত কি পুষ্পসুবাসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নীরব হ'বে? এই অনন্ত ফুলের মেলা, কোথায় তোমার ফুলসাজ? ফুলের মত সুন্দর তুমি, আর দূরে দূরে থেক না।

সঙ্গীত নীরব হ'ল। মৃদু জ্যোৎস্নালোকে গায়িকা উঠে দাঁড়িয়েছে পরিমলের দিকে মুখ করে। কেবল তার সাদা শাড়ী এবং কাল চুল স্পষ্ট দেখা যায়, আর সব তার অস্পষ্ট, পরিমলের মনের কামনার মত অশরীরি যেন।

পরিমল উঠে দাঁড়াল। মন তার আন্দোলিত। অতি নিকটে এগিয়ে এল সে ব্যগ্র দু'বাহু প্রসারিত করে। অপরূপ সুন্দর মুখ তার হৃদয়তাপে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। আরক্ত সুন্দর সে মুখে অতৃপ্ত কামনা, অসীম বাসনা লীলা-খেলা করছে। জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যায় না। তবু তার চোখের অত্যুগ্র প্রণয়জ্যোতি অনুভব করে বৈদেহীর চঞ্চল হৃদয় সবেগে স্পন্দিত হ'ল। পরিমল বৈদেহীর দিকে আরও একটু অগ্রসর হয়ে এল মূর্ত্তিমান যৌবন ও প্রেমের প্রতীক রূপে। সারা দেহে তার বসন্তের সানুনয় ইঙ্গিত। বৈদেহী সেখানে দাঁড়িয়ে রইল "নগরাজাধিতনয়ার ন যযৌ ন তস্থৌ" রূপে। এখনি বোধহয় বন্যার প্রাবল্যে প্রেম নেমে আসবে তার উপরে। জীবনের প্রথম সে স্বাদ। বর্ত্তমান জীবনের গণ্ডি ভেঙে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে সুদূর প্রসরে। মনের একদিক সভয়ে বলে ওঠে:

পালাও, পালাও, বৈদেহী। এখনি চূর্ণ হয়ে যাবে তোমার আশ্রয়, ভেঙে পড়বে তোমার আড়াল। তোমার কাঠিন্য-উদাস নির্লিপ্ত তা তোমার আড়াল, তোমার গান তোমার আশ্রয়। বন্যায় ভেসে গেলে নিশ্চিত তোমার মৃত্যু। বাঁচতে চাও তো পালাও।

কিন্তু, এখনি বোধহয় ওই মোহন অধরে বিকশিত হয়ে উঠবে প্রথম চুম্বন—দ্রাক্ষার ন্যায় সরস, সম্পূর্ণ চুম্বন নেমে আসবে বৈদেহীর কুমারী অধরে। গানের চুম্বন জীবনে পাবে গায়িকা। অহেতুক উদ্বেগে বৈদেহী কম্পিত হ'ল। আঃ, প্রেমে তো শুধু সুখ নয়, শুধু আনন্দ নয়—উদ্বেগ-আশঙ্কা-ভীতি। তবু তো চাই।

একমুহূর্ত শুধু, প্রতীক্ষার ভারে দীর্ঘতর একটি মুহূর্ত। 'আইভি!' উচ্চারণ করতে গিয়ে চমকিত পরিমল এস্তপদে সরে' এসে আলো জ্বালিয়ে দিল। জ্যোৎস্না রাত্রি তার অগাধ মায়া নিয়ে বাতায়নের বাইরে মিনতি করতে লাগল। ভিতরে বৈদ্যুতিক আলোকে রূপহীনা গায়িকার দিকে তাকিয়ে অবিচলিত কণ্ঠে পরিমল বলল, "চমৎকার।"

চোখে তার মোহের সামান্য আভাসও নেই।

পাঁচ

ওই দেখ বসন্ত রাত্রির অবশেষ—বক্ষমঞ্চের বাহিরে শুষ্ক পত্রস্তূপে পদধ্বনি শোন বিগত বসন্তের। পুষ্পশবাগের আত্মাহুতি দেখ বিবর্ণ বনপথের পায়ে পায়ে। যে আরক্ত গোলাপ ফুটেছিল কৈশোর-প্রেমে, সে গোলাপকে কই তুমি তো জীবন দিয়ে সঞ্জীবিত রাখলে না? তোমার বসন্তদিনের ফুলসজ্জার কোন মূল্যই দিলে না তুমি প্রাত্যহিক দিনযাত্রায়। আপনি ফুটেছিল গোলাপ, অনাদরে ঝরে গেল। গোলাপহারা বিবর্ণ দিন রঙের স্মৃতিটিও মুছে ফেলল। আমি জানতাম।

আজ শ্রীমতী লিলির সঙ্গে শ্রীমান সুনীলের শুভ উদ্বোধনক্রিয়া শ্রীমতীর প্রাসাদতুল্য ভবনে সুসম্পন্ন হ'বে। শেষ পর্যন্ত জয় হ'ল মিসেস চকের। ধন্য মহিয়সী। হেরে গেল সুজাতা—হেরে গেল ভীরু কিশোরপ্রেম সাশ্রুনেত্রের

করুণ মিনতি নিয়ে। মিসেস চক্রবর্ত্তীর একমাত্র পুত্র নিজের কর্ত্তব্য পালন করে দেশের ও দশের মুখ উজ্জ্বল করে তুলল।

ছবির উপযোগী ফ্রেম রচনা হয়েছে নিসন্দেহে। লিলির বাইরের ফটক চক্রাকারে আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। নীল চন্দ্রাতাপের নীচে আনন্দের হাট বসেছে। কৃত্রিম জলপ্রপাত উর্দ্ধে নানারঙে ছড়িয়ে পড়ছে মৃদু সৌরভ বিকীর্ণ করে। এক কোনে শ্বেতাঙ্গ-বাজিয়ে ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে, অবকাশে দাড়ি নেড়ে মিয়াসাহেব ধরেছে শানাই। বীরত্বে, কারুণ্যে মাথামাখি। আহা! আহা!

লাল কাঁকড়ের পামাকীর্ণ পথে মহামূল্যশাড়ীলোটানো মহিলারা ধীর, ভগ্ন ভাবে অগ্রসর হচ্ছেন আড় চোখে এ ওর বেশ দেখে দেখে। হীরার বালা, মোতির মালা আলোর খেলা দেখাচ্ছে। চম্পক বেনারসীর সঙ্গে সিফনের শাড়ী মিশে যাচ্ছে, বাঙ্গালোরের সঙ্গে সবুজ ক্রেপ। রূপ ও রূপার জয়ধ্বজা উড়ছে। ওহো! ওহো!

মিসেস চক্রবর্ত্তী আগেই এসে গেছেন সস্মিতাননে। আইভি আসবে বরকে নিয়ে। মিষ্টার চক্রবর্ত্তীকে চিনি না, তাই কোথায় পালক মেলে বিচরণ করছেন তিনি, বলতে পারছি না। পারাবত-যূথে ধাড়ী বাজপাখীর মত মিসেস চক্রবর্ত্তী নিউ-মাউণ্ট চশমার ঝলক তুলে ফিরছেন। ঠিক মনে হচ্ছে শিকরে বাজের মত পায়ে পায়ে নৃত্য করছেন উনি। পরিধানে পোষাকের নীচে সাহেব বাড়ীর করসেট, প্রৌঢ়ার মাংসল তনুর শাসন। চুনকাম করা মুখে লাল বিস্তৃত ঠোঁট—বয়সের তাপে শিথিল। জামাটা রঙীন, শাড়ীটি শাদা—গুড্‌নেস্ নোস্—কি শাড়ী ওটা। পালক যে নয় সেই যথেষ্ট।

আমি বড় স্লিপাণ্ট হয়ে যাচ্ছি, না? কি করব, বল? এমন দৃশ্য দেখলে আমি যেন কেমন হয়ে যাই। প্রেমে গলাগলি- মাথামাখি—চাটাচাটি—জীবন-ব্যাপি আনুগত্যের অঙ্গীকার। বিরলে অশ্রুবিসর্জ্জন, স্মৃতির ধ্যান, চুম্বনের পিরামিড। অবশেষে, 'সমাজ সংসারই' সত্য প্রতিপন্ন, 'দু'জনে মুখোমুখি' মিথ্যা হয়ে যাওয়া। অহো, কর্ত্তব্যের বেদীতে কি বলিদান।

এ রকম ক্ষেত্রে আমার দুঃখ হয় না, লোভ আসে না, বিদ্রূপের 'ব'ও মনে জাগে না। আমার পায় হাসি। বড় হাসি পায়। মনে অনাবিল আনন্দ জাগে। মানুষের কত আশা আছে? দুর্ব্বল মানুষ তো আর দুর্ব্বল নয়, হৃদয়-বৃত্তির দাস নয় সে। শীঘ্রই দেবত্ব এল বলে।

'কই, বর কই?' জনায়ের মনোহরা ও ভেটকীর ফ্রাইয়ে পরিতৃপ্ত প্রৌঢ় ব্যক্তিরা গুঞ্জন তুললেন। যৌবনের অমিতাচার ও অতিভোজনের ফলে বাত বা বহুমূত্রের রোগী তাঁরা। তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা চুকেবুকে গেলে বাড়ী ফিরে ঢোলা পোষাকে পাখার নীচে লম্বমান হ'তে পারেন। বর পদার্পণ করবার পূর্ব্বে বিবাহবাড়ী পরিত্যাগ করাটা ভালো দেখায় না। বিশেষ করে, লিলির বিয়ে।

বর আসছেনা কেন? আচার্য্য ব্রাহ্মবিবাহের জন্য প্রস্তুত বেদীর পাশে বসে আছেন। ঠোঁটের কোণায় গুছিয়ে রাখা আছে ধর্ম্ম-উপদেশ, মায় শেষের 'ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্'টি পর্য্যন্ত। মিসেস চক্রবর্ত্তীর নিজের বিবাহ হয়েছিল হিন্দুমতেই। লিলিব দিদিমার ইচ্ছা নাতনীর ব্রাহ্মমতে বিবাহ হ'ক। মিসেস চক্রবর্ত্তী সাগ্রহে সায় দিয়েছেন—দিদিমার যে কলিকাতার প্রকাণ্ড বাড়ী-খানা পাবে নাত্নী। নিজের বাড়ীতে নিয়ে মিসেস চক্র না হয় কড়ি-খেলা-টেলাগুলো জুড়ে দেবেন। হিন্দু আত্মীয়েরা খুশী হ'বে।

বর আসছে না কেন? লাল গালিচায় লিলি বসে আছে সুসজ্জিতা বন্ধুর দলে। সোনালী টিস্যু-জড়ানো ফ্যাকাশে মূর্ত্তি প্যান-কেকেব ঘষায় আরক্তিম। কপালের পাউডারমিশ্রিত চন্দন-বিন্দু গরমের স্বেদজলে ঘেমে যাচ্ছে। পাখার দিকে চেয়ে রুমালেব পাকে স্পর্শ করে করে লিলি বলে উঠছে, "ওঃ, মাই মাই!"

বব কই, বব কই? মিসেস চকের ধাডীবাজ মুখখানায় একটু শঙ্কার ছাপ। বিস্তৃত লাল অধর গুটিয়ে ভাবছেন: কিছু হ'ল না তো? পেছুটান রয়েছে যা ছেলের! আগে এসে ভাল করিনি। সঙ্গে করে নিয়ে এলেই ঠিক হ'ত। যাব নাকি আবার? ফটকের পাশে চলাফেরা আরম্ভ করলেন তিনি উৎকণ্ঠিত ভাবে।

লিলিদেব একখানা গাডী ছুটে গেল ছেলের উদ্দেশে।

ছোট দোতালার ভাড়াবাড়ী। একখানা পাটী বেছানো। সস্তা লাল বেনারসী-পরা কিশোরী, কবির কল্পমূর্ত্তি যেন। চোখে কাজল, হাতে কাজল-লতা। লালফিতেজড়ানো এলোখোঁপা শুভ্র গ্রীবার ওপরে। এক হাস্যমুখী তরুণী অনুপম সেই মুখখানি একহাতে ধরে চন্দনের পত্রলেখা আঁকছেন—কিশোরীর দৃষ্টি লজ্জানত। একটু দূরে বাজছে—শুধু শঙ্খ। শাঁখাপরা একখানি হাত এঁকে যাচ্ছে সাদা আলপনার বৌ-ছত্র। টুকটুকে খুকী একটি টুকটুকে ফ্রক্ পরে কোঁকড়া

চুল নাচিয়ে লাফাচ্ছে। গড়েমালার বেলীর সৌরভে বাতাস ভারী, সঙ্গে একটু একটু লুচি ভাজার গন্ধ।

বর এল। লজ্জিত বাধ-বাধ উলুধ্বনিতে সারা বাড়ী খুশীর হাসি হাসল। পট্টবস্ত্রপরিহিত পুরোহিত বরের মাথার শুভ্র সুন্দর উষ্ণীশটি স্পর্শ করলেন। সম্মুখে দাঁড়ালেন দুগ্ধধবল গরদপরা অনশনপূতা বহ্নিশিখার মত হিন্দুবিধবা। তাঁর পায়ে প্রণাম করল কে? সুনীল না?

আস্তে আস্তে ছোট কলাগাছে ঘেরা আলপনার ওপরে সে দাঁড়াল। এয়োরা হেসে উঠল চুড়ি-বালা বাজিয়ে। নূপুরের শব্দে এসে দাঁড়াল বধূসুন্দরী। সম্মুখে কে তার? সুনীল?

না, না। অন্য কেউ, সুনীল নয়, সুনীল নয়। আজ নয়,—কিছুদিন পরে অন্য একজন যাবে সেখানে। সে স্বপ্ন-স্বর্গ অন্যের অধিকারে আসবে। সুনীল সে হারিয়েছে।

টেবিলের ওপরে রাখা সুনীলের মাথায় হীরকখচিত একটি হাত পড়ল। স্বর্ণাভ-কুঞ্চিত কেশে বড় ভাইয়ের হাত রেখে ডাকল আইভি, "সুনী, ওঠো। দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

সুনীল চোখ তুলে তাকাল মাত্র। দৃষ্টিতে তার সুদূর গলির বুকে সেই বাড়ীখানি—সেই অনুপমা। বক্ত চেলাঞ্চল বাতাসে উড়ছে তার বিবাহ প্রত্যাশায়। হয়তো আজও সে প্রতীক্ষা করছে। ডাকেছাড়া লাল চিঠি আজও ও বাড়ীর ঠিকানা পায় নি।

"ওঠো সুনী, বরযাত্রীদের চা-টা খাওয়া হয়ে গেছে। ওধারে লিলির বাড়ী থেকে টেলিফোন করছে দেরী দেখে। লোকও এসে গেছে। অযথা সময় নষ্ট করে লাভ কি?"

"লাভ-লাভ করেই গেলে তোমরা!" সুনীলের উষ্মা শুনে আইভি তার মাথার কাছে টেবলে বসে পড়ল। ধীরে ধীরে সে শুনল, তারই কণ্ঠে যেন মিসেস চক্রবর্তী কথা বলছেন। অবচেতনায় বদ্ধমূল হয়ে আছে মাতার এতদিনের উপদেশ-বাণীসমূহ। প্রয়োজনবশে বা'র হয়ে এল।

"সুনী, বিয়েটা ছেলেখেলা নয়। সারাজীবনের ব্যাপার। চোখের দেখায় যাকে ভালো লাগে, সে-ই ভালো হয় না। ভিন্ন সমাজের মেয়ে চলবে না আমাদের মধ্যে। তারও অসুখী হওয়া, তোমারও অসুখী হওয়া। ওঠো, জামা-টার

বোতাম পরিয়ে নাও। বেয়ারাকে ডাকব? পিসী নীচে চন্দন নিয়ে বসে আছেন।"

সুনীল নিজেই প্রসাধনের এটা-ওটা ঠিক করে নিতে লাগল নিরুত্তরে। সত্যিই তো, দেরী করে লাভ কি? এখনি সাজতে হ'বে ধনীর জামাতা, লিলির উপযুক্ত স্বামী। কোথায় বা থাকবে সুজাতা?

আইভির গলা নিশ্চিত প্রত্যয়ে বলে যেতে লাগল, "আমাদের মায়ের কথা ভেবে দেখ, সুনী। কত কষ্ট করেছেন উনি। মা নিশ্চয়ই জানেন কিসে তোমার ভাল।"

সত্যিই কি মা জানেন কিসে ভাল? আমি কি তা বিশ্বাস করি? নইলে কি করে সুনীকে বোঝাচ্ছি? মজ্জমান নাবিকের মত তৃণখণ্ড আঁকড়ে ধরল আইভি। দেখি, চেয়ে দেখি সুনী কেমন করে একজনকে ভালবেসে অন্যকে বিয়ে করে। ওকে দেখলে আমিও বুঝব আমি পারব কি না। আমার ভাই পারল, আমি পারব না? সবাই তো এই করে। যদি দেখি সুনী সুখী হয়েছে আমিও হ'ব, আমিও হতে পারব। মঙ্গগুপ্তির কুসংস্কারে গোপনে আইভির মন আঁকড়ে ধরল কল্পনাটা।

গবদের ধুতিজামা খস্‌খসিয়ে গাড়ীতে উঠল সুনীল। পাশে বসল আইভিলতা। সারা রাস্তা মিসেস চকের আত্মা আইভিলতার মুখে কথা বলে যেতে লাগল, যেন আইভি নিজের মনকেই বোঝাচ্ছে দীর্ঘদিনের আলোচিত তর্কাবলী দিয়ে দিয়ে।

"দেখতো সুনী, এ বিয়েতে তোমার কত সুবিধা। নাম, পরিচয়, টাকা। আর সেখানে বিয়ে করে পরের দিনই ছুটতে হ'ত কেরাণীগিরি কাজের জন্যে। আমাদের একটা পরিচয় আছে, যাকেতাকে বিয়ে করাটা বংশের প্রেস্‌টিজ্‌ নষ্ট করবে। বংশের নামের জন্যে এ ত্যাগটুকু তোমার করা উচিত।"

সুনীল দুষ্টু ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, "কিন্তু, লিলি—She is a silly girl."

"না, মোটেই না। লিলি একেবারেই সিলি নয়, সুনী। তুমি তো ভাল করে মেশনি। তাহ'লে বুঝতে পারতে তোমার সুজাতার চেয়ে কত ভালো।"

চাবুক খেয়ে গাড়ীর বায়ুমণ্ডল যেন ও নামে লাফিয়ে উঠল। সরে গেল তারা—অন্ধকারে ফুটে উঠল একটি মুখ, কমল-কোমল। বহুবার পরিচুম্বিত

ঈষৎ স্ফীত রক্ত-অধরে সকাতর বিনতি—'না, না। যেও না।' কিন্তু, সুনীল, নিশি যাবার আগেই চলে গেলে তুমি!

স্থির দৃষ্টিতে একবছর দশমাসের বড় দাদাকে লক্ষ্য করে যেতে লাগল আইভি। সরু আঙুলে দৃঢ় করে-ধরা সুনীলের হাত। না, তারা ডুবতে দেবে না, টেনে তুলে রাখবে শক্ত জমিতে, সেখানে প্রেমের পিচ্ছিল মসৃনতা নেই। শক্ত-শুষ্ক খট্‌খটে জমি, লাঙল চালালে ভাল রবিশস্য জন্মাবে।

গম্ভীর ভাবে আইভি বলল, "এই তো বাড়ী এসেছে, সুনী। অত গোমড়া মুখ কোরনা সুনী, here is a darling. গান গাইতে বল্লে প্রথমে বাংলা গান কোর, পরে ইংরেজি।"

সুসজ্জিত সুনীল মার্টারের মত মুখে গাড়ী থেকে নামল। হ্যাঁ, সে আর কোন দোষে দোষী নয়। বংশের মান বজায় রাখতে সে নিজেকে বিসর্জ্জন দিচ্ছে। এই চিন্তা তার মনকে লঘু করল। সচকিত হয়ে দেখল সে, তাকে কেন্দ্র করে এক বিরাট উৎসব। মায়ের স্মিতমুখ দেখল ফটকের পাশেই—এমন মুখ মায়ের গলার ওপরে জীবনে দেখেনি সে—গৌরবে ঝলোমলো। পিতার চির অপ্রসন্ন মুখে হাসি। এত টাকা লিলিদের! এত আলো, এত সজ্জা! মার্টার সুনীলের মন ক্রমে ক্রমে হাস্যতরল, পুলকচপল হয়ে উঠল। সুনীল ঠাট্টাতামসায় পুরোদমে যোগ দিল। উচ্চকণ্ঠে গান গেয়ে বাহবা পেল, এবং লিলির বন্ধুদের কাছে লিলির সজ্জিত রূপের প্রশংসা করে শ্রীমতীর প্রিয়তর হল।

আর—একটু দূরে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে [illegible]তে লাগল সব কিছু—আইভি; যেন সে দেখছে নিজের ভবিষ্যৎ। স্বতন্ত্র[illegible] নিজেকে উৎসবক্ষেত্র থেকে সরিয়ে আনল সে জীবনের চরম ও পরম মীমাংসার উদ্দেশে।

এই তো সুনী দিব্যি বিয়ে করছে। দেখা যাক, ও সুখী হয় কিনা। ও যদি হয়, আমিই বা হ'ব না কেন? একই অবস্থা তো। আমাদের তো খেয়ালের ঝোঁকে বিয়ে করলে চলে না। It must be a marriage of convinience.

গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আইভি নীল চন্দ্রাতপের নীচে বিবাহবেদী দেখছিল। সকল কুমারীর মত মনে স্বপ্ন জেগে উঠল তার অপরের বিবাহ-সভায়। নক্ষত্রের মত সুন্দরী-পরিবেষ্টিত সুনীল। দুইটি হৃদয় এক হয়ে গেছে—দুইটি শরীর এক হ'বার অপেক্ষা করছে।

যেন কার অঙ্গসৌরভ ভেসে এল বাতাসে—চুরোটাকার গন্ধ পুষ্পসারের সুবাস? কাল চুলে আইভির কার সস্নেহ স্পর্শ? পৌরুষদৃঢ় বক্ষ লাগছে আইভির পৃষ্ঠদেশে। এখনি নম্র ওষ্ঠাধরে জ্বালা এনে দেবে তার কৌশলী চুম্বন। দেহে রোমাঞ্চ হ'ল আইভির। কঠিন বাহুপাশের আরাম আইভি একবার জেনেছে—আবার চাই। এখনি চাই। এই মুহূর্ত্তে চাই পরিমল লাহিড়ীকে। অটুট যৌবন বন্যার প্লাবনে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাক নামহারা সব-হারাণোর সাগরতীরে। একটি ছোট শয্যা—জগতে দু'জনের আর কি লাগে?

তবে কি তার দেহকে ভালবাসি, তাকে নয়? তা'হলে, ভয় কি? অন্য দেহের আস্বাদে ভুলে যাব তাকে। তৃপ্তি পেলে ভুলে যাব। তাই কি শেষে? প্রেম নয়? তাহ'লে তো বেঁচে যাই।

যাই হো'ক, চাই তাকে চাই। এখনি। এক শয্যায় উতপ্ত আলিঙ্গনে চাই রূপ তার—আমার রূপ চাই তার ভোগ্য করতে। তপ্ত অধরের শানিত চুম্বন নামুক আমার অধরে—নিরবিচ্ছিন্ন পীড়নে—এক মিনিট নয়—দীর্ঘ, দীর্ঘতর হ'ক চুম্বন। এখনি চাই। চলে যাব তার কাছে। বাইরে গাড়ী আছে।

খস্ খস্ খস্। "কোথায় যাচ্ছ, ইভী, এখন এমন পাগলের মত?" মিসেস চক্ বাজপাখীর নির্ভুলতায় কন্যার ওপরে লাফিয়ে পড়লেন। "খাওয়াটা মিটিয়ে নাও; আর চোখ মেলে দেখে মনে সুবুদ্ধি আন।"

উত্তেজনা অন্তে অবসাদে আইভি গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

"এখানে বনে-জঙ্গলে কেন? ওদিকে সবাই রয়েছেন, ওধারে যাও না। আর তোমাকে নিয়ে পারি না, ইভী। দেখ, জীবনটা কি। ছেলেখেলা নয়। এই সমাজে তোমার পাশে কাকে মানায়, বুঝে দেখ। সুনীকে দেখ। ও সামান্য মুখ-ভারটুকুও এখনি মিলিয়ে যাবে। ইভী, আমার কথা শুনে চল।"

তাই হ'ক তবে। অহোরাত্র মাতার প্রহরা সহ্য হয় না আর। প্রতিটি অন্তরঙ্গ মুহূর্ত্ত মাতা অহেতুক আঘাতে চূর্ণ করে দেন নির্দ্দয় ভাবে। মনে জাগে ক্ষোভ, জাগে গ্লানি। অযোগ্যকে ভালবাসার আত্মধিক্কার মনকে দহন করে।

উভয়পক্ষের নিমন্ত্রনে এসেছে সকলে। সমাজের বিশেষ কেউ বাকী নেই। কিন্তু, পরিমল লাহিড়ীর নিমন্ত্রণ হয়নি। সে যে সেটের বাইরে। কোথাও নিমন্ত্রন হয় না তার। গোপনে প্রেম চালাতে হয়। তার সঙ্গ—একটু পূর্ব্বেই যে ঘর দু'খানায় ছুটে যেতে ব্যগ্র হয়েছিল আইভি, মাতার চক্ষে সে ঘর

ঘুঁপানার ছবি দেখে ঘৃণা বোধ করল। বৈদেহী সে ঘর নিয়ে কবিতা লিখেছিল, দারিদ্র্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য দেখেছিল বৈদেহী। আইভি দেখল কুশ্রীতা কেবল।

কেন ওকে ভালবাসলাম? লিলির টাকায় গরীব বিয়ে চলে, আমার চলে না। শিশুর মত নিজের মনকে বোঝাল আইভি—তাতে কি? ভোলা তো সহজ। মুনী পারলে আমি পারব। ওর চেয়ে মন শক্ত আমার।

—তাই তো ভয়, শক্ত মনে যে ছাপ ওঠে না।—

এই তো চাই আমি। হাসি-গান—উৎসব-প্রাধান্ত। জীবনের সার এই। সুতরাং বিদায়, তোমাকেই বিদায়!

তেরো

"বৈদেহী!"

এমনি অন্যমনস্ক হচ্ছে ও আজকাল। প্রসন্ন বাবু ভাবলেন, এর কারণ কি?

বাগানের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে বৈদেহী কাল পাথরের মূর্ত্তির মত। প্রভাত তখন লুটিয়ে পড়েছে বাগানের পাতায় পাতায়, লোহার রেলিংএর গায়ে গায়ে।

"বৈদেহী!" এবারে চমকিতা ফিরে তাকালে, দ্রুতপদে কাছে এসে ডাকল, "কি বলছ, বাবা?"

"আজ কি তুমি বিকেলে বেড়াতে যাবে? ড্রাইভার জিজ্ঞেস করছিল কখন আসতে হ'বে।"

চকিতভাবে বৈদেহী বলল, "না, না, আজ যাব না।"

আজ কি যাওয়া যায়? আজ আসবে সে, তার পরিমল। সেদিন চন্দ্রালোকিত রজনীর মোহে, গানের মোহে পরিমলের ভাবান্তর দেখে বৈদেহী ধরে নিয়েছিল উচ্ছ্বাস বৈদেহীরই উদ্দেশে তারই কণ্ঠের গান শুনে পরিমল তাকে ভালবেসেছে। সেই মুখ প্রেমের অসহ বাসনায় কেমন রমণীয় হয়ে উঠেছিল? সে নয়ন কামনায় কেমন উজ্জল, কেমন গভীর ভাব প্রকাশ করেছিল। কল্পচোখে পরিমলের অনুরাগদীপ্ত সুন্দর মূর্ত্তি স্পষ্টভাবে বৈদেহীর চোখের সামনে ভেসে উঠল। অজানা পুলকে বৈদেহীর দেহ কদম্ব ফুলের সমান কণ্টকিত হ'ল।

এ কিসের আনন্দ? যুগযুগ ধরে ভালবাসা পাওয়ার কি এতই আনন্দ? অসীম এ, সর্ব্বক্ষণ জাগরুক। মনে হয় কি যেন অতুলা সম্পদ লাভ করেছি। কি যেন পূর্ণতা আমার মনের মধ্যে জন্মলাভ করেছে সকল শূন্যতা পূর্ণ করে। এ কি সম্পদ সে সম্পদ আমার, একান্ত আমার। আমি তার সন্ধান জানি আর কেউ তার আভাস মাত্র পায় না গোপনীয় বলে বোধ হয় এ বেশী মধুর।

কন্যার ধ্যানস্থ মুখের দিকে কটাক্ষে চেয়ে প্রসন্নবাবু ঘর থেকে চলে গেলেন। ভাগ্যচক্র আপনা থেকে ঘোরে। কারও কিছু করবার নেই।

বৈদেহীর মনে রাশি রাশি কবিতা ভেসে আসতে লাগল। যথা:

"পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম,
কস্তুরী মৃগ সম।

সত্যই তো, এ আনন্দ আমাকে মাতাল করে রেখেছে, এর জন্ম তো বাইরের কোন বস্তু থেকে নয়, আমার নিজেরই একটা মনোবৃত্তি থেকে। আমি তাকে ভাল বেসেছি, সে ও আমাকে প্রতিদান দিয়েছে। সেই প্রসারিত ব্যগ্র বাহু, প্রণয় প্রোজ্জ্বল মূর্ত্তি। কিন্তু, আবার বৈদেহীর মনে এল

"হবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে, রূপ না দিলে কেন
বিধিহে,
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে বল কি দিয়ে?

আয়নায় এ কার প্রতিচ্ছায়া ফুটে উঠেছে? বিস্মিত নেত্রে চেয়ে রইল বৈদেহী। এ কি সে? কি যাদুমন্ত্রে তার এত পরিবর্ত্তন হয়েছে?

সারামুখে কিসের এ শ্রী! শুষ্কঠিন মৃত্তিকা যেমন বরষার ধারাজলে নবরূপ লাভ করে, তেমনি বুঝি তার রুক্ষ মুখখানা নূতন সৌন্দর্য্যে বিকশিত পদ্মের মত হয়েছে! কোথাও রক্তমাংসের পরিবর্ত্তন ঘটেনি সত্য, মুখের কোন জায়গায় কোন পরিবর্ত্তন ধরা পড়েনা, কিন্তু এ কোন রমণীয়তা তার মুখে? অধরে যেন রসের আমেজ দেখা দিয়েছে। চোখে যেন একটা গভীর সলাজ দৃষ্টি। কপোলে যেন আরক্তচ্ছায়া একটা! নিকষ দেহের বর্ণ প্রায় দূর্ব্বাদলশ্যাম। ভগবান বৈদেহীর আকুতি শুনেছেন। তার অসীম সুন্দর প্রণয়াস্পদের প্রেম তার দেহকেও নবীন করে তুলেছে বসন্তাগমে বিটপীর মত। সারা দেহে যেন মন্থরতা, মন আবেশে চঞ্চল। এ তার কোন পরিবর্ত্তন?

বৈদেহীর সারা জীবন ধন্য হয়ে গেছে পরিমলকে ভালবেসে। পরিমলও ভালবাসে তাকে, কোন সন্দেহ নেই। এতদিনের আসা-যাওয়া, হাসিকথা, গান-শোনা যে নির্দ্দেশ দিত, পূর্ণ পরিণতি তার দেখেছে বৈদেহী সে রাত্রির গানের পরে। তার দিকে যে মুখ ফেরানো ছিল, তাতে ছিল কামনা; যে চোখ তার দিকে চেয়েছিল, তাতে ছিল প্রেম। তারই দিকে আত্মবিস্মৃত পরিমল অগ্রসর হয়ে এসেছিল ব্যগ্র বাহুর আমন্ত্রন নিয়ে। সহসা স্বপ্নভেঙে গেল। শেষ বোঝাপড়া হয়নি। তবু, কি মধুর এই না বোঝার বোঝাটুকু!

ক্ষীণস্বর অলক্ষিতে বলে: এখনও হয়তো সময় আছে, বৈদেহী। যা তোমার পা'বার নয়, চেয়ো না। পেলেও তোমার তাতে সুখ নেই। কি প্রয়োজন তোমার সাধারণ মেয়ের মত প্রেম চেয়ে নিজেকে ক্ষয় করা? গৃহ-সুখ চেয়ে ফাঁকিতে পরছ কেন, বৈদেহী? বিধাতা তো তোমাকে অমূল্য সম্পদ দিয়েছেন। তুমি জানো না?

কিন্তু, বিধাতার ওপরেও যে বিধাতা আমি। আমার নির্দ্দেশে ওকে চলতে হ'বে। ওর বুদ্ধি, বিবেচনা কিছুই ওকে সাহায্য করতে পারবে না। ফুলধনুর অদৃশ্য ধনুষ্পানি মূর্ত্তি দেখা দিল। ব্যথা দিয়ে জানাতে হবে শিল্পের মর্ম্মকথা। ব্যথাই বিকাশের পথ। ওই সঙ্গীত আরো-আরো কত মধুর হ'বে! ভুল করছে করুক না, ভুলের মধ্য দিয়েই ফুল ফোটে।

আচ্ছা, পরিমল কেন তাকে চাইল?---বৈদেহী ভাবছে। জগতে সুন্দরীর অভাব নেই। সুন্দরের সঙ্গে সুন্দরীর সহযোগ অবশ্য ঘটেছে। কিন্তু, বিশেষ করে পরিমল ওকেই ভালবাসল কেন? তার মনের খবর পেয়ে? তার গানে?—অথবা, অনিচ্ছুক মনে ভেসে এল ঈষৎ একটা সন্দেহের আভাস,— তার বাবার টাকার জন্য? ছিঃ!

একবারও মনে হ'ল না বৈদেহীর, যে তার ধারণা মিথ্যা। রূপের রাজা হতশ্রী নায়িকাকে ভালবাসতে পারেনা। কোনও অতর্কিত মুহূর্ত্তেও তার মনে হ'ল না, যে তার জাগ্রত স্বপ্ন হয়ে আছে, সেই নিষ্ঠুরই অন্যের জন্য তপস্যা করছে।

অন্তরের প্রসন্নতা যেন সকলকে বিলিয়ে দেবার মত। বামী দাসীকে ডেকে খামোকা বৈদেহী তার মেয়ের খবর জিজ্ঞাসা করতে লাগল। বৈদেহী কোনদিন দাসীচাকরের সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতে অভ্যস্ত নয়,

কিন্তু তার যে অহেতুক বাক্যের প্রয়োজন। "তোমার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে, বামী ?"

দিদিমনির এ অযথা কৌতূহলে বামীর বিস্ময়ের সীমা রইল না। মনে মনে সন্তুষ্ট হ'ল সে। বড়লোকের নজর, দুঃখ দৈন্যের কথা বলে এই সুযোগে কিছু বার করা যাবে। "তার হ'ল কোথায়, দিদি ? গরীব লোক জানোই তো। অমন ছেলে, কিন্তু হাতে আর আর গলায় গয়না চাওয়াতে আর পারলুম না। আরো বলে, তিরিশটি লোক নিয়ে আসবে। ওদের তো খেতে দিতে হবে পাকা ফলার।"

"ছেলেটি কি করে ?"

"ইলেট্রিকের মিস্তিরি সে। তা, মাসে প্রায় টাকা চল্লিশ রোজগার করে। দেখতে শুনতে রং কাল, তবে ছিরি আছে।"

বৈদেহী বামীর সব কথাগুলো শোনেনি মন দিয়ে। তার মনে হচ্ছে পরিমল, পরিমল। এই বামী ঝি কি জানে দিদিমনির সুখের খবর ? এ রোজকার মত আসছে তার ঘর ঝাঁট দিতে, তার কাপড়চোপড় গুছিয়ে রাখতে, তার জুতোর ধুলো ঝাড়তে। কিন্তু স্পর্শমনির স্পর্শে এক মুহূর্ত্তে লৌহ স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়, তার খবর জানে কি বামী ? বামীর মেয়ের প্রতি সহানুভূতিতে বৈদেহীর মন ভরে গেল। বেগুনের মত পেছনে চিনেমাটির কাঁটা দিয়ে আটকানো সুদর্শনচক্র-গোলাকার খোঁপা, পরনে আধময়লা তাঁতের ডুরে, হাতে দুগাছি সোনাবাঁধানো চুড়ি। কালকেলো মেয়েটি। বয়স তার বছর বারো, ধরেবেঁধে মা যার হাতে দেবে, তারই ঘর করতে হ'বে ওকে। জীবনে কোন-দিন প্রেমের স্পর্শ পাবে না। পাবার আগে প্রিয়কে ভালবেসে যে সুখ, তা বামীর ছোট মেয়েটি জানবে না। যেদিন ওর তনুর মালঞ্চে যৌবন দেখা দেবে, সেদিন ও চেয়ে দেখবে বিশাল সংসারের ঘরণী ও, ছেলের মা। আর সেই 'কাল কিন্তু ছিরি ভাল' স্বামীকে নিয়ে থাকতে হ'বে ওর নির্ব্বিবাদে। পরিমলের ন্যায় অমূল্য রতন যে পৃথিবীর মানবীকে ধরাছোঁয়া দিতে পারে, সে রকম কোন কথা ও তো বুঝবে না কোনদিন।

সহানুভূতির প্রাবল্যে বৈদেহীর মন সিক্ত হয়ে উঠল। আচ্ছা, বামীর মেয়েটি কি ভাগ্যহীনা!

"আচ্ছা বামী, তুমি বোল আমাকে তোমার মেয়ের বিয়ের আগে। হাতের আর গলার গয়না আমিই দিয়ে দেব।"

"তা দেবে বইকি, দিদি তোমরা বড়লোক, হাত বাড়ালেই পয়বন্ত। দেবে বইকি। তোমাদের মেয়েদেরেই তো গরীব মানুষ হয়।' বামী কন্যাদায় থেকে অব্যাহতি পেল বৈদেহীর প্রেমের কল্যাণে।

ফুলদানীতে সাজানো গোলাপ ছিন্ন করে মেজেতে ছড়াল বৈদেহী। আবার কি ভেবে ছিন্ন দলগুলি তুলে বার্ণসের কবিতার পাশে পাশে সাজাল। কি সুন্দর কবিতা লিখত বার্ণস।

"I h e been blythe wi' comdreds dear ;
I hae been merry drinking ;
I hae been joyful gath'ring gear ;
I hae been happy thinking "

সত্যই তো, 'Happy in thinking'. স্বপ্নের পরিমলের কথা ভাবা যায়।

"Thou wilt break my hear
Thou bonnie bird"—

না, এ দুঃখের কবিতা আজ নয়

"My luv' is a like red, red rose, বার্ণসের গোলাপের মত সুন্দর বৈদেহীর প্রিয়। গোলাপ বড় ভালবাসে বৈদেহী, গোলাপসুন্দর [illegible] তাই।

বার্ণসের কবিতা এত মন স্পর্শ করে!

ছটফট করে উঠে দাঁড়াল বৈদেহী। রাস্তার ধারের বারান্দায় গে[illegible] বেলা দশটা কি সাড়ে দশটা তখন। দলে দলে ছেলেমেয়ে [illegible] চলেছে বইখাতা হাতে রাস্তা দিয়ে চলেছে তাদের দিকে চেয়ে মনে হল বৈদেহীর এককালে পরিমলও যেত এই রকম। তখনও সে কি এত লম্বা ছিল? কি ভাষায় কেমন করে কথা বলত সে তার বন্ধুদের সঙ্গে? [illegible] ব্যাডমিন্টন খেলত বৈদেহীর মামাতো ভাইদের মত? মাস্টারদের [illegible] গেলে রাগ করত? পাশের ছেলের খাতা টুকে অঙ্ক কষত কখনও?

পরিমলের বয়স এখন আটাশ, বাবার কাছে শুনেছে বৈদেহী এই আটাশটা বছর বৈদেহীর হাতের বাইরে। এই দীর্ঘ আটাশটি বছর পরিমলের জীবন কোনদিকে বয়েছে, কেমন করে কেটেছে, জানবার সাধ্য নেই বৈদেহীর, যতই ভালবাসুক না কেন সে। এই আটাশটি বছর বৈদেহীর কাছে অতীতের আবরণে আবৃত স্বপ্নজগৎ। সেখানে বৈদেহীর চরণক্ষেপের অধিকার কোথায়?

কেন সে, কেন আরও আগে পরিমলকে ভালবাসল না? সংক্ষিপ্ত মানব-জীবনে এতটা সুদীর্ঘ সময় বিফলে গেছে। কোথায় ছিল বৈদেহী, কোথায় ছিল পরিমল?

দুইটি চলন্ত তারা পাশাপাশি এসে পড়েছে, দুইটি ক্ষীণ ধারা একসঙ্গে মিশেছে।

পরিমলের জীবনের এই আটাশটি বৎসর!

আটাশটি বসন্ত পুষ্পের মালা হাতে পরিমলকে সম্বর্দ্ধনা করেছে, আটাশটি বর্ষা উন্মুখ অশ্রুবর্ষণে আকুল হয়েছে, আটাশটি শরৎ কিশোরীর সলাজ হাসির মত মধুর ও শুভ্ররূপে তার নয়ন সম্মুখে দেখা দিয়েছে। সে জগতে কোথায় বৈদেহী, কোথায় বা বৈদেহীর প্রেম?

আচ্ছা, পরিমল কি আগে কাউকে ভালবেসেছে? বেসেছিল কি? না, অসম্ভব। তার উদাসীন নির্লিপ্ত ভাবে তো কোন সকরুণ বিয়োগান্ত নাটকের স্মৃতি দৃশ্যমান নয়। পরিমল সাধারণ নারীর নাগালের বাইরে।

"চাঁদেরই মত সুন্দর সে,
চাঁদেরি মত চিরদিন সুদূরে"

হায়, একেই কি বলে রমণীর অন্ধ প্রেম?

আর একপ্রান্তে এসে দেখা যাক অপর নায়িকা কি করছে আজ। সুনীলের সংক্ষিপ্ত উপকাহিনী শেষ হয়েছে। রূপকথার উপসংহার ঘটেছে জীবনে সুনীল, শিশির; যথা: 'তারপর, তারা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘরসংসার করতে লাগল।' সুজাতার কথা আর কি বলব? বলা চলে এইটুকু যে, প্রেমাস্পদের পরিণয় পত্র পেয়ে সুজাতা আত্মহত্যা করেনি, এমন কি, নভেলের নায়িকার ন্যায় মূর্চ্ছিত হয়েও পড়েনি। তাঁরা ভালই আছে।

এখন রঙ্গমঞ্চে একা পরিমল নায়ক।

সন্ধ্যাবেলা আইভিদের বসবার ঘরে জমাট সভা বসেছে তরুণ ও তরুণীর। তরুণীর সংখ্যাই বেশী। বিচিত্ররূপিণী তারা। হয় তো তাদের দেখেই কবিই লিখেছিলেন :—

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্ররূপিণী"—

মুখ শাদা—ধবধবে—ঝকঝকে। সেই শাদার মধ্যে ক্ষতের মত জ্বলছে রক্তবরণ ছুটি ঠোঁট। কাল ভুরু-চোখের তুলীর মিশমিশে টান, চুলের ফাঁকেও রংয়ের টান শেষ হয়েছে। নখে জ্বলছে ফিকে গোলাপী। শাড়ী-জামা জুতো-ব্যাগে রংয়ের বিবোধে সামঞ্জস্য। চিত্র-বিচিত্র পাহাড়ী সাপ যেন—ছিপছিপে, লিকলিকে দেহ।

তরুণেরা, বলতে গেলে, আইভির সম্পত্তি। ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা মালিকের অনুপস্থিতিতে। এলোমেলো বেশ, মুখে ধরা চুরোটিকা। চুল হাত দিয়ে দিয়ে উল্টে দিচ্ছে। আইভি সামান্য একটুক্ষনের জন্য স্থশোভনের সঙ্গে লেকের রাস্তায় গেছে নূতন গাড়ীর ট্রায়াল দিতে।

পাখার নীচে প্রকাণ্ড সোফায় কুশনের মধ্যে ডুবে রয়েছে নীতা। বিশেষ মুখরোচক বিষয়ের আলোচনা করছে ও, সেটা বোঝা যাচ্ছে তার আত্মতৃপ্তিতে ঘুমন্ত-প্রায় মুখ থেকে, অথচ শ্রোতাদের সজাগ ভাব থেকে।

নীতার চারপাশে কয়েকটি মেয়ে হাতের ওপর মুখ রেখে উদগ্রীব হয়ে বসে আছে—চোখে অপার আগ্রহ। এক তরুণ বসেছে পাশে, হাতে জ্বলন্ত চুরোট। নীতার অলস হাতে সিগারেটের কাল হোল্ডারটি ধরা আছে বটে, কিন্তু কথায় ব্যস্ত থাকাতে মুখে সিগারেট জ্বলছে না।

"খুব জব্দ হয়েছে পরিমল লাহিড়ী। ভেবেছিল আইভি ওকে পেলে কাউকে চায় না। এই তো এল পরিমল। মুখের ওপর ওকে উড়িয়ে সরকারকে নিয়ে চলে গেল লেকে আইভি। একবার সঙ্গে যেতেও বলল না।"

"বললেও সরকার চটে যেত। স্থশোভন সরকারকে ধরতে হলে লাহিড়ীকে ছাড়তেই হবে। আজকাল সরকার পরিমল লাহিড়ীর প্রতি ঈর্ষান্বিত।" ছাঁকা বিদেশী ভাষায় বোলচাল দিলেন বোম্বাপুরী ঢং এর তরুণী এক।

"তাই তো আইভি আমল দেয় না লাহিড়ীকে। অবশ্য আইভির মা তো দুচক্ষে পরিমল লাহিড়ীকে দেখতে পারেন না। আইভিকে পাখীপড়া করে বোঝাতেন।" শ্যামলতা নামে তরুণী বলল।

"আইভি নিজে কি জানে না লাহিড়ী ওর যোগ্য নয়। আজকাল একটু একটু করে হাওয়া বদলে যাচ্ছে। লাহিড়ী বুঝতে শিখেছে সেটা। এই তো, প্যাঁচার মত মুখ করে খানিকক্ষণ বসে থেকে একটু আগে উঠে গেল।" নীতা জানাল।

নীতার সবচেয়ে কাছে যে ছিপছিপে চেহারার গৌরাঙ্গী মেয়েটি ঝুঁকে ছিল, সে এবারে ভেবেচিন্তে বলল, "ঠিক হয়েছে। যেমন পরিমল লাহিড়ী মেয়ে নিয়ে ছিনিমিনি খেলত।"

নীতার মুখ একটু গম্ভীর হ'ল। পরিমল যে তাকেই নিয়ে 'ছিনিমিনি' খেলেছে, সে খবর এর জানা নয় তো? প্রকাশ্যে নীতা প্রতিবাদ করল, "একটু মেয়েদের দিকে টান ছিল পরিমল লাহিড়ীর, কিন্তু সে তো অতীত কাল। আজ-কাল ও কোন মেয়ের সঙ্গে মিশত না পর্যন্ত। আইভিকে জয় করবার জন্যে ও কোনদিকে চোখ দিত না।"

শ্যামলতা বলে উঠল, "না, না, নীতা, কি বলছ? একথা বিশ্বাস করা যায় না। কোথাও না কোথাও লাহিড়ীর সান্ত্বনা আছে। ভয়ানক লোক ও—a dangerous fellow. It is nemesis after all. যেমন মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার করেছে ও, তেমনি শাস্তি পাচ্ছে এখন।"

"হঠাৎ আইভির অরুচি হবার কারণ কি? কিছুদিন আগে পর্যন্তও তো পরিমল ছিল প্রিয় ব্যক্তি?" আর একজন জিজ্ঞাসা করল।

"সুনীলের বিয়ের পর থেকেই এই পরিবর্তন হয়েছে। আইভি দেখছে, love is only a vague word, money is everything."

গৌরাঙ্গী তন্বীটি বলে উঠল, "আশ্চর্য বটে—সুনীল আর লিলি বিয়ের পরে ছ'মাস কেটে গেল, এখনও দুজনের কি ভাব। They are not tired of each other."

"কিন্তু, সুনীলেরও নাকি কে ছিল বিয়ের আগে?"

"আরে, যেতে দাও। কমন, কার না থাকে? লিলিরও কি ছিল না? সময় কাটাতে হবে তো। এখন দেখনা, সুনীলের মতে তো লিলি হচ্ছে আদর্শ। আর লিলি তো বিয়ের আগে থেকেই হাবুডুবু খাচ্ছিল।"

এই নিয়ে চলল আন্দোলন। কিছুক্ষণ বাদে গৌরাঙ্গী উঠে যেতে নীতা একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আরম্ভ করল গল্প, কেমন করে পরিমল তার মনোরঞ্জন করতে চেষ্টা করেছিল, কেমন করে সে তাকে বিফল করল ইত্যাদি স্বকপোল-কল্পিত কাহিনী। ওল্ডমেডের সর্ব্ব কমপ্লেক্স দেখা দিয়েছে নীতায়।

"অসীমা বলে গেল নেমেসিস্—কিন্তু কোন মেয়ে সত্যি সত্যি আমল দিয়েছে পরিমলকে? সকলের পেছনে ঘুরেছে ও, কিন্তু শুধু চেহারা ধুয়ে জল খেলে তো

চলবে না, ওদিকে যে nothing else. এইতো আমার চেহারা তো কিছুই ভাল নয়—(এইখানে ক্ষীণ প্রতিবাদ উঠল চতুর্দিক থেকে) অথচ শুনে তোমরা অবাক হ'বে লাহিড়ী লেগেছিল আমার পেছনে—পুরো একটি বছর। যেখানে যাচ্ছি চলছে পিছু পিছু। Oh, he pestered me to death !”

নীতা চারপাশে যাচাই করবার ভঙ্গিতে চাইল। কথাটা এতই অবিশ্বাস্য যে কারুর গলা দিয়ে কোন রব বেরল না। শুধু তরুণ যুবকটি সনিশ্বাসে সিগারেট ঝেড়ে বলে উঠল, ‘But he has got a very beautiful face”

পাশের মেয়েটি বক্রহাস্যে বলল, “রূপ তো অনেকেরি আছে।’

তরুণ উজ্জ্বলচোখে বলে উঠল, “সত্যি?”

রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হ'লেন আইভি সবাইকে ম্লান করে দিয়ে। দীর্ঘতনু পাতলা রেশমের শাড়ী মোড়া, হাতে, গলায়, কানে, চুলে ঝলমল করছে হীরে দিয়ে তৈরি ফুল।

দুইচোখে শ্রান্ত ভাব কিন্তু অপরূপার, স্বপ্ন ভরে বেদনার ব। সুশোভন সরকার দামী সাহেববাড়ীর পোশাকে সজ্জিত সুদেহী আধাবয়সী ভদ্রলোক। ফোলা-ফোলা আঙুলে ধরা [illegible] পাইপ, মুখের হাসি ভদ্র, চোখের দৃষ্টি অভদ্র।

আইভির জাপানী কুকুর ওয়্যাং এসে নাচতে নাচতে স্বামিনীর আগমনে। পশু ও মানুষ উভয়েই মালিক পেল এতক্ষণে।

এইতো জীবন। শ্যামলতা অমিয় গুপ্তের পিয়ানোর সঙ্গে নাচছে—নাচছে আধাবয়সী সুশোভন মোটা দেহ দুলিয়ে দুলিয়ে হাস্যকর ভাবে। আইভি নাচেনা—মনের কোণের কোন এক শুভ্র প্রবৃত্তি বাধা দেয় তাকে পরপুরুষের গায়ে-গা পায়ে-পা লাগিয়ে হাস্যকর লম্ফনকে নৃত্য নামে অভিহিত করতে। ভারতীয় নৃত্যকলার মাদকতাময় কারুশিল্প নয় - ফক্সট্রট্ অথবা শেয়াল নৃত্য, ওয়ালজ্ অথবা ওরাংওটাং নৃত্য, জ্যাজ অথবা জাগুয়ার নৃত্য। যে নাচে শিল্প সৃষ্টি হয় না, সে নৃত্যের লাফালাফি জানোয়ারের নর্তন-কুর্দন ভিন্ন আর কি? কেবল সঙ্গমের বিফল আশা গাত্রকণ্ডুয়নে নিবৃত্ত করা। শ্যামলতা চোখভুরু পাকিয়ে বলেছিল, “আইভি, বুড়োটে কথা বোলনা। নাচ কত বড় ব্যায়াম, জান? আমরা নাচের আনন্দেই নাচি, অন্য উদ্দেশে যাই না। এতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, জান?” স্বাস্থ্য যথেষ্ট ভাল থাকে- গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরে নিশীথরাত্রের তারকাকে

সাক্ষী করে নিদ্রা যাওয়া। আইভি নাইট-ক্লাব ভালবাসে না। তবু, দলের পাল্লায় যেতে হয় মধ্যে মধ্যে। সেখানে এ-ওর স্ত্রীর কাঁধ ধরে নাচে। শ্যামলতা বিবাহিতা। স্বামী থাকেন প্রবাসে। অল্পবয়সে বিবাহ হয় অভিভাবকের পাল্লায় পড়ে—একটি সন্তানও আছে ছাব্বিশের শ্যামলতার। স্বামীর পাঠানো টাকায় সংসার চলে। ছেলে একা-একা ঘোরে-ফেরে নির্জ্জন বাটীতে। শ্যামলতা সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে বন্ধুদের গাড়ীতে হাওয়া হয়—নাইট-ক্লাবে যেয়ে মনে করে মোক্ষ নিকটে। রাতারাতি চুল কাটার দলের উৎসব সেখানে।

আচ্ছা, এরা কি কোন মহত্তর জীবনের সন্ধান জানেন? স্যুটপরা সুশোভন, সিফনপরা শ্যামলতাকে পাঁজরের মেদের ওপর জুতো পরে পা-ঘষাঘষি দেখে বিতৃষ্ণায় আইভি ভাবে নাচছে এরা—নেচেই চলছে। সে নাচে স্ফূর্তি নেই। ফোস্কা পড়া পায়ের জ্বালা লুকিয়ে হাসিমুখের নাচ। মিসেস চক্ গোঁড়া ব্রাহ্ম-ঘরের নাচানাচি পছন্দ না করলেও মেয়ের আইভির নাইটক্লাবে যাওয়ায় বাধা দেন না। বরং উৎসাহ মনে তো সাহস জুগিয়ে দেন। তাঁর চাই একটি মনোমত জামাই। নিজে পাঁদিনি প্রীতি প্রেম করতে। মেয়ে কন্যাকে বয়ে যেতে দেবেন না। ছেলেদের স্বপ্ন ফেটে গেছেন, আর মেয়েকে পাবেন না? সে সাধনার সিদ্ধির জন্য দরকার হ'লে তিনি পেছপা নন। লিলির জনকপ্রদত্ত অর্থে দেনাশোধ ক'রে হারানো মানসম্মান ফেরৎ পেয়েছেন বেকার ব্যারিষ্টার চক্রবর্ত্তী-জায়া। সনীতের জ্বলন্ত উদাহরণ চোখের সম্মুখে তুলে তুলে আইভির আরও নির্যাতন হচ্ছে নিত্য। আরও তাগিদের হেতু, সুশোভন—কতকাল বইবে সে পথ চেয়ে? সাত-আট মাস হ'ল উৎকণ্ঠ হয়ে আছেন মাম্মা মিসেস্ চক। পুরুষ মানুষ, হাতে টাকা, বয়সে ভাঁটি। কত দরকার অপেক্ষা করবে? চারপাশে লেলিয়ে আছে সবাই। বীমার দালালটাকে সাধ হয় 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' করতে। কিন্তু, সাবালিকা আইভি। সুতরাং, ধীরে, ধীরে রে মন। তবে, চেষ্টা দ্বিগুণ করছেন মিসেস্। আইভির আহার-বিহার লেকচারাকীর্ণ। উঠতে, বসতে মাতার গঞ্জনা শোনে আইভি, শোনে সুশোভনের সঙ্গে বিবাহের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, শোনে পরিমলের রসাতলে গমন। সারা মন ভেঙে যাচ্ছে আইভির মাতার উপদেশবর্ষণে। মাতা বুঝিয়েছেন: জীবন অপেক্ষাও ক্ষণস্থায়ী যৌবন। একবার গেলে আর ফেরেনা। তখন কুকুরও মুখ ফেরাবে না দেখে। যা করবার এখন করে নাও, ইভী। **Make hay, while sun shines.**

বিগতযৌবনা নারীর জ্বালা বুঝে দেখ ইভী, দেখ মিস্ করকে। চল্লিশের বুড়ী সাজেন চব্বিশের ঢংএ, ফুলছাপা-জামা, লাল টুকটুকে সাড়ী পরে। তবুতো যোটে না। অথচ, ভেবে দেখ এই মিস কর একদিন বহুজনপ্রার্থিতা ছিলেন। তোমার মত এক ভ্যাগাবণ্ডের প্রেমে পড়ে আত্মহারা। বাড়ীতে ছিল বাধা, হ'ল না বিবাহ। বাছা বাছা প্রার্থীদের বিমুখ করে বসে গেলেন কুমারী। ব্যস্, আর দেখতে হ'ল না। বুড়ো বয়সে ধেই ধেই নাচছে এখন বিয়ের আশায় কেউ নেই বর।

বিবাহ! বিবাহ! বিবাহ! ওহে ইভী তো, ও রূপ তো বিয়ের জন্য। পৌরুষহস্তে দলিত-মথিত হবার জন্য ওই দেহ। তা কি জানো না? নইলে নারীজন্ম বৃথা। তোমার মনে যতই শান্তি থাক না কেন, তুমি অপরের অশান্তি।

ওগো মণি! ও রূপের পেছনে কি আছে, জানো? আয়নায় মুখ দেখ, পেছনে ছায়ার মত ছায়ার পা ফেলে চুপিচুপি আসছে ধ্বংস। থাক না দিন বয়ে? বেশ! কয়েকদিন পরেই দেখবে চুলের মধ্য থেকে হঠাৎ উঁকি দিল সাদা সুতো একটি। বুক কেঁপে উঠবে। দাঁতের গোড়ায় হঠাৎ কনকনানি। গলার পাশে চিবুকের পেশী শিথিল, চোখের কোণে রেখা। দমকা বাতাসের মত মহিলার যৌবন ক্ষণস্থায়ী। যৌবন থাকতে থাকতে মূল্য দাও তাকে, দাও মূল্য রূপকে।

ইভী, শোন, বিবাহ মানে বেকার বেগারকে নয়—ওই বীমার দালালটাকে। রূপকে একমাত্র মূল্য দেয় রৌপ্য। প্রেমের কোন মানে নেই। প্রেম করেছ তো মরেছ।

হাড়-কাটা গলির প্রাচীনতমা অধিবাসিনী জেগে ওঠে মিসেস চকের মুখ ভঙ্গিতে, চোখের চিক্‌চিকে। তেমনি উপদেশ দেন তিনি, যেমন চিরকাল ধরে সাধারণী নারী কন্যাকে সতর্ক করে দিয়েছে। প্রেম কোর না ইভী, খবরদার, খবরদার! অবশ্য আপেলের মত লাল গালে, আঙুরের মত সুকুমার অধরে দেখি বটে মাঝে মাঝে প্রেমের চিহ্ন। চোখে পড়ে আমার সব, যতই কেননা রুজলীপ্‌ষ্টিক্ ঘষো, বাছা। মায়ের চোখে ছা। কিন্তু, কিছু বলি না, অতটুকু খাওয়াতে দোষ নেই। অতি বন্ধনে বাঁধন-কাটার প্রবৃত্তি হয়। ও তুমি করতে পার, বাপু। যে বয়সের যা। কিন্তু, মা, প্রেম কোর না। ভেসে যাবে তুমি, পায়ের নীচে ডাঙা পাবে না। আহা, বিয়ের পরেও পরিমলের সঙ্গে যোগ

রেখ না হয়। কিন্তু, আখের মাটি কোর না। দেখ না সুনীল বিয়ে করে কত সুখী হয়েছে। বলেছিলাম না?

ওঃ। তন্দ্রামুক্ত জীবের চাঞ্চল্যে মন নড়ে ওঠে আইভির। সে না মনে মনে স্থির করেছিল সুনীলের বিবাহে থাকবে তার নিজের ভবিষ্যতের নির্দেশ। তাহ'লে তো বোঝাই যাচ্ছে। সুনীল সুখী হয়েছে, সে-ও হবে। সুনীল পেরেছে, সে-ও পারবে

উচ্চহাস্যের রোলে ফিরে এল আইভি বর্তমানে। এইতো জীবন! এরা কি কোন মহত্তর জীবনের সন্ধান জানে না? জানবার সুযোগ কোথায় পেল এরা? মানুষের প্রতিটি জ্ঞানবিকাশের মূলে থাকা চাই আত্মসম্বন্ধে একটা তীব্র সচেতনা। থাকা চাই অজস্র সময় নিজেকে বুঝতে। নিজেকে জানো ভাল করে, সকলকে জানবে তুমি। নিজেকে মনে কোর একটা আয়না, স্বচ্ছ যাতে সবাইকার ছাপ পড়বে ঠিক ভাবে। মনে পড়ছে রাস্কিন এই ধরণের কথাগুলো এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন।

ওই যে বসে আছে নীতা বাগচী ও কি সুযোগ পেলে এলিজাবেথ ব্যারেট্ ব্রাউনিং হতে পারত না, অথবা কামিনী রায়? হয়তো হতে পারত না, কারণ প্রকাশে কোন ক্ষমতা নেই নীতার। কিন্তু, উল্লেখিতা মহিলাদের মত ভাবাকুল, সৌন্দর্যপিপাসু চিত্ত হত না তার? কে জানে? তবে, সময় কোথায়? বৈশাখের প্রচণ্ড অগ্নিদাহের তীব্র রূপ, বর্ষার জলপাতের মাধুর্য্য কেবল চেয়ে দেখে যে চেতনা সংগ্রহ করতে পারে মানব-মন, যে রসানুভূতিতে দেহ তার শিথিল হয়ে যায়, সে সবের জন্য দরকার হয় সময়। সকাল সাতটায় উঠে নীতার এক ঘণ্টা ব্যায়াম করতে হয় শরীরের সুগঠনের নিমিত্ত, চা খেতে লাগে ঘণ্টাদেড়েক। সবাইকার সঙ্গে নানা মুখরোচক গল্পে একটু একটু করে চা-খাওয়া হয়। বিকেলে সবাই একসঙ্গে চা খেতে পায় না। যে যার তালে তাড়াতাড়ি খানিকটা তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করে বেড়িয়ে যায় টোবড়া করতে। তাকে তো চা খাওয়া বলে না, গেলা বলে প্রাতঃকালীন সুদীর্ঘ চা-পানের পরে ঘণ্টাখানেক যায় সংবাদপত্র পড়তে, চিঠি লিখতে

ন'টার সময়ে আসেন নীতার ফরাসী শেখাবার শিক্ষয়িত্রী, তিনটেয় যান তিনি। আশা নীতার কন্টিনেণ্টে যাবে, তাই ফরাসী শেখা প্রয়োজন। মধুচন্দ্রে যা'বার বাসনা আছে, কিন্তু চন্দ্রকে যে মধু করবেন, সেই ব্যক্তিটির দেখা পাওয়া যাচ্ছে না।

সপ্তাহে তিনদিন বৃদ্ধ ইতালীয়ান আসেন বেহালা শেখাতে।

সন্ধ্যা ছয়টার সময় থেকে চলে সাজসজ্জার রাজসূয়। তারপরে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত নীতা আর কারুর নয়।

মধ্যে যথেষ্ট সময় নেয় শপিং, টেলিফোন করা ও ধরা। আত্মীয়-স্বজনকে একেবারে ছাঁটা চলে না—তাদের এটা-ওটা আছে। আছে অগণিত বন্ধু, সিনেমা, নাইটক্লাব, নিমন্ত্রণ। আছে পরনিন্দা, আছে আত্মস্তুতি, আছে দুরাশা। আছে পশ্চাৎধাবন—অনেক কিছুর, অর্থের, খ্যাতির, ফ্যাসানের, পুরুষের। এই তো সোসাইটি গ্যেল। এমনটি হ'তে গেলে ভাবুক হওয়া যাবে না, কবি হওয়া অসম্ভব হ'বে। যারা সবদিকে বিকশিত হ'তে পারে তারা 'প্রতিভা'। সে প্রতিভা শতকরা একজনেও হয় না।

আইভির কুঞ্চিত ভ্রূ সরল হ'ল।

আমার জগত! কি আছে সেখানে? কি মূল্য দ্বারা জীবনকে নির্ণয় করে এরা? পুরুষের রৌপ্য, আর কিছু নয়। রমণীর রূপ। যৌবন অবশ্যই থাকবে রূপের পশ্চাতে। কাকে কত তরুণী দেখায়, এ নিয়ে রেস। মুখে একটি দাগ দেখা দিলে বজ্রাঘাত। স্বামী বারে বারে সতর্ক করে দেবেন। Mercolized Wax, Peroxide Cream-এর হাট বসে যাবে। দেহ মোটা হ'লেই চলবে ডায়েটিং। সুখাদ্য দেখলে জিভে জল এলেও খেওনা—খেওনা। অনাহারে চোখের দৃষ্টি তীব্র হ'ক ক্ষতি নেই, কটি এক ইঞ্চি বাড়ে না যেন। ফ্যাসনানুযায়ী শাড়ী-জামা চাই মুহুর্মুহু, যে করেই হ'ক। কিছু না কিনলেও একটু ঘুরে এসনা নিউমার্কেট। যে নারীর রূপ-যৌবন নেই, তাকে অশ্রদ্ধা কোর 'ওল্ড ফসিল বলে'। যে নারী ফ্যাসনের ক্রীতদাসী নয়, তার কাছ থেকে সরে যাও তোমরা। যে হড়্‌হড়্‌ করে সাহেবী-বুলি ছাড়ে না, সে তো কৃপার পাত্র। যেখানে টাকা, সেখানে রূপের ভীড়। রূপ ও রৌপ্য!

রূপকে কিনবে কে? সুশোভন সরকার। মোটা, আধবয়সী। হাতের পাথরে, পায়ের জুতোর পালিশে বন্দিনী কমলা। মধ্যবিত্তের ঈর্ষা-কাতর দৃষ্টির অন্তর্বীক্ষণে স্থির মুখাকৃতি, আত্মবিশ্বাসী সুশোভন। সমস্ত পার্টির দ্বার উন্মুক্ত ওর কাছে, খোলা অন্দরের ঝরোকা। ওর জন্যই তো লোশন-অ্যাস্ট্রিজেন্ট—টনিকে বাঁচিয়ে রাখা রূপ। ফেল টাকা, মাখ তেল। রূপ ও রৌপ্য।

সারাদিন কাটে দুঃস্বপ্নের মত। মেক-আপ্-ওঠানো রূপসী করসেট খুলে ফেলে প্রিন্ট পরে বেড়ায়। রাত্রি নামে দুরাশার জাল নিয়ে—সুখ-স্বপ্ন। আনন্দই কাজ, ভুলে থাকা রূপের পেছনে আছে জরা; যৌবনের পেছনে ধ্বংস।

জীবনের পশ্চাতে আছে মৃত্যু। সত্যই কি পরকাল আছে? কি প্রস্তুতি করি সেজন্য? না, ভুলে থাকি। ভুলে থাকি যতক্ষণ থাকা যায়। মৃত্যু আমাদের কাছে চিরসমাপ্তি। ঈশ্বর আমাদের কাছে অপরাধীর দারোগা। ভয় পাই তাঁর কথা ভাবতে। প্রেম আমরা বুঝতে চাই না, বরঞ্চ কাম সহজে বুঝতে পারি।

আমার জগতে কত একা আমি? কত নিঃসঙ্গ? কিন্তু, নিরালা ক্ষণে যখন আসে সে, পাশে বসে, নিমেষে শূন্যতা পূর্ণ হয়ে যায়। তাকে দেব না মূল্য, যে আমাকে রক্ষা করে বিফলতা থেকে?

কিন্তু, পারে কি রক্ষা করতে সামান্য পরিমল লাহিড়ী, দেহ ছাড়া কোন বিশেষত্ব নেই যার? দেহের মদিরায় তন্ময় আইভির পেছনে আর এক উদাসীনা খুঁজে বেড়ায় দেহের পরপারে অদেহীকে—নেই, সে কোথায়? পরিমল পারে না সম্পূর্ণ শান্তি আনতে। তবে কেন তাকে ভালবাসে আইভি?

না, ভালবাসার কাছে পরাজয় উচ্চাভিলাষিনী আইভি মেনে নেবে না। নিতে পারে না সে।

—চোদ্দ—

"ছিল তিথি অনুকূল শুধু নিমেষের ভুল,
চিরদিন তৃষাতুর পরাণ জ্বলে।"

বসন্তের চাঞ্চল্য শেষ হয়ে গেছে বহুদিন। এখন আর সেই অপরূপ কাল নেই, যখন মনে হয় পাওয়া জিনিস কিছু ফেলে দেবার আগে দ্বিতীয়বার চিন্তার আবশ্যক। সারা আকাশ রৌদ্রতাপে জ্বলে যাচ্ছে, একটু পরেই সে কাল হয়ে উঠবে কিশোরীর কাল নয়নের মত। মুক্ত উন্মাদ বায়ুর তাড়নায় আকাশ থেকে ঝরে পড়বে রাশি-রাশি জলবিন্দু, অসহ বেদনার প্রকাশের মত।

কে বলে ঋতুচক্র মানুষের মনকে স্পর্শ করে না? বসন্তের জয়যাত্রাকে অস্বীকার করবার কোন পথ নেই। তরুণ রক্তধারা তখন নৃত্য করে অসংযত ছন্দে, সারা মন ফুলের সুবাসের মত পাতলা কিন্তু আবেশপূর্ণ, নাম-না-জানা

সুখে ছেয়ে থাকে। মনে হয়, সারা বিশ্ব তোলপাড় করে দেখি আমার কি চাই। মনে হয়, আমার মনের এ সুখের সন্ধান কাকে দেব? অজস্র এ আনন্দ, একান্ত অকারণ, নিজে আর বয়ে একে নিতে পারি না, কোথায় বিলাই একে? একগুচ্ছ ফুলের বর্ণশোভায় তখন যে আনন্দ মনে জাগে, বাঁতাসের দ্রুত চুম্বনে, কোকিলের হঠাৎ কুহুতে যে আনন্দ; সে আনন্দকে আমরা ধরতে পারি না স্পষ্ট করে; কিন্তু মনে মনে থাকে সে নিশ্চয়।

বসন্তকে অস্বীকার করা হয়তো অনেকে ভ্রম করে ভাবতে পারেন, আধুনিকতার লক্ষণ। যে বসন্ত পৃথিবীর প্রথম জাগরণের দিন থেকে একভাবে তার প্রিয়তম হয়ে আছে, যে বসন্ত সুন্দরী দিব্যাঙ্গীদের বিলোল কটাক্ষে সহসা আবির্ভূত হয়ে চিরযোগীদের ধ্যানভঙ্গ করে এসেছে আদিমকাল থেকে, তাকে স্বীকার করলে আমরা কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে যাই যে! তাই হৃদয়ধারা যখন অসংযম আনন্দের ছন্দে চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখনও আমরা গায়ের জোরে উড়িয়ে দিই বসন্তকে। কি জানি যদি বসন্তের প্রভাব স্বীকার করলে আমরা সন্দেহ-ভাজন হই। যে আনন্দের জন্ম কেবল তারুণ্য থেকে, গতিভঙ্গির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করা ভিন্ন তার আর কি উদ্দেশ? লোকে সন্দেহ করতে পারে, কিন্তু যারা সে রসানুভূতি একবার অনুভব করতে পেরেছে, তারা জানে যে কোন প্রেমের কামনা থেকে এর উদ্ভব হয়নি, হ'তে পারে না।

•

আইভিদের বাড়ীর সেই বারান্দা—দক্ষিণের বারান্দা। কিন্তু নেই দখিন দুয়ার খোলা। বসন্তের অবসানে শেষ হয়ে গেছে উদ্যানের রমণীয়তা। লনের সবুজ ঘাস রুক্ষ পাণ্ডুটে বর্ণ ধরেছে রৌদ্রদাহে। আকাশে কালবৈশাখীর সাড়া জেগেছে রোদের ফাঁকে ফাঁকে কালচে মেঘের টুকরোয়। আজও অনাহুত এসেছে পরিমল অপরাহ্নে। সান্ধ্যসভার জনসমাগমে আইভির নাগাল পাওয়া যায় না।

আজ নেই সেদিনের মাদকতা—রসবিলাস। পরিমল আজ প্রেমিক নয়—প্রার্থীমাত্র। আইভি আজ আত্মসমর্পণ-বিহ্বলা রাধিকা নয়—মাতার উপদেশে, ভ্রাতার উদাহরণে, সুশোভনের অনুনয়ে বিগলিতা আইভি চক্রবর্ত্তী—যার কাঠিন্য অবাঞ্ছিতের কাছে মজ্জাগত।

"আইভি!" নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে পরিমল ডাকল, "উত্তর দাও একটা। সারাজীবন তোমার প্রসাদভিখারী হয়ে কাটালে বোধহয় আমার চলবে না।"

"কিসের উত্তরটা চাও তুমি ?"

"একটু আগে যা বললাম।"

কি বললে ? কি বললে ? চিরকাল পুরুষ নারীকে যা বলেছে, যা বলেছে প্রেমিক প্রেমিকাকে। গাছের নীচে, রাজপ্রাসাদে, সর্ব্বত্র তরুণ ও তরুণী যা বলেছে। পুরুষ চায় নারীকে—দূরের প্রেমিকা রূপে নয় শুধু, নিজের সম্পত্তি-রূপে। রূপসীকে চায় ঐশ্বর্য্যরূপে।

এই ভয় করেছিল আইভি। বারে বারে বলেছে সে এই কথা। তবু তো ভয় করে। মনে হয়, আমার হৃদয়ভার বহন করতে পারি না আর, প্রেমের হাতে ধরা দেই। ধরা দেই, দিয়ে ফেলি। ভয় কি ? চিরকাল ধরে প্রেমিকা তো তাই করেছে। স্বস্তি না পেলেও সুখ পেয়েছে সে। ধন না পেলেও পেয়েছে শান্তি। মন্দ কি ?

প্রতীক্ষার ভারে কম্পমান মুহূর্ত্ত। আইভি বুঝি ধরা দিল। কিন্তু—ছায়া-মূর্ত্তি মিসেস চক্রবর্ত্তী যেন এই অন্তরঙ্গ দৃশ্যের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। কালবৈশাখীর ঝোড়ো বাতাসে উড়ছে তাঁর কাঁচাপাকা সযত্নবিন্যস্ত চুল। মুখে কঠিন রুক্ষতা, অধরে রুক্ষ শাসন—কি করছ, আইভি। আমার দিকে চেয়ে দেখ। রূপ তো আমিও পেয়েছিলাম। তবে আজ অনুতাপে কেন দগ্ধ হচ্ছে আমার দিন ? আমার রাত্রি কেন অবিমৃষ্যকারিতার স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত ? শোন আইভি, মন শক্ত করে ফেল। গরীবের কুঁড়েতে সুখের ঘর কবি কল্পনায় মাত্র বাঁধতে পারেন। তুমি-আমি পারি না।

"তার উত্তর ? ওঃ।"— আইভি ঈষৎ হাস্য করল, "তার উত্তর আবার দিতে হবে ? তোমার কান বোধহয় খারাপ হয়েছে। ডাক্তার দেখাও। এ বিষয়ে, by far the best man হচ্ছেন"—

"কোথায় তুমি উত্তর দিয়েছ ?" পরিমলের স্বরে অভিমানাহত বিস্ময়। "আচ্ছা পরি, নূতন করে এর উত্তর কি জানাতে হবে, এতো জানা কথাই।"

"তবে তুমি সুশোভন সরকারকেই বিয়ে করছ ?"

মিসেস চক্রবর্ত্তীর অদেহীমূর্ত্তি আরও কাছে সরে এল। এইতো আইভির কপোলে ওঁর উষ্ণ নিশ্বাস, এইতো আইভির কানে ওঁর সাবধানতার বাণী— "আইভি, আইভি! সুশোভনের অনেক টাকা। অনেক—অনেক। গণনার সীমার বাইরে। কি সুখে, আরামে দিন কেটে যাবে! লোকের চক্ষে কত

ওপরে উঠে যাবে, বল? আর এখানে? ছিঃ, ছিঃ! হতদরিদ্র পরিমল লাহিড়ীর স্ত্রী তুমি। ধিক! তোমাকে কি ভগবান পরিমলের মত নগণ্য স্বামী-সংগ্রহে এত রূপ দিয়েছিলেন? এত শিক্ষা, এত আয়োজন, ওরই উদ্দেশে। ওতো ম্যাট্রিক-ফেল, কালোকোলো বউ নিয়ে দু'খানা ঘরে দশটাপাঁচটা করবে। ও তোমাকে রাখবে কোথায়? সারাজীবন কি তোমার চালডালের মীমাংসা করতে কেটে যাবে? ওঃ, আইভি!

আইভির বক্র অধরোষ্ঠ নিষ্ঠুর হাসিতে কুটিল হয়েছে, আইভির চোখে উজ্জ্বল ইস্পাতের মত ব্যঙ্গের ঝলক।

—"যাকেই করিনা কেন, তা দিয়ে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন বুঝি না। I am not anxious for your advice, my man. তবে ভয় পেয়োনা। কার্ডে বোধহয় নাম ছাপাবার প্রথা উঠে যায়নি। ঠিক সময়েই খবর পাবে!"

"আমি তাহলে ঠিকই শুনেছিলাম, আইভি সুশোভনকেই তুমি শেষ পর্য্যন্ত--" পরিমল আত্মদমন করে আবার বলল, "তুমি এমনি? আশ্চর্য্য! আমার কথা ভেবে দেখলে না? আমার প্রস্তাব " পরিমলের দেহমনে এতক্ষণে উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে।

"Million times no! এত বিরক্ত কর কেন আমাকে? আমার ভাল লাগে না।"

"আইভি, একবার ভেবে দেখলে পারতে, চারবছর আমাকে খেলিয়ে এখন তোমার অরুচি হলে আমি শুনব কেন?"

আইভি তাকাল পরিমলের দিকে জ্বলন্ত মুখে। আরক্ত সারা মুখে যেন তার আগুন লেগেছে আসন্ন কালবৈশাখীর উদাস হাওয়া লেগে। ওই তো মিসেস চক্রবর্ত্তীর বাণী কানের পাশে বেজে উঠছে—আইভি, ছোট কখন বড় হয় না। সারাজীবন ওকে নিয়ে থাকবে কেমন করে? ও কি তোমার মূল্য দিতে পারবে? আইভি, তুমি অভিমানী, একটি কথাও সহ্য করতে পার না! ও তোমাকে যখন ওর মত ঘরের ছেলের স্বভাবমাফিক অপমান করে বসবে, তখন—?

"তোমাকে নিয়ে খেলাব আমি? Think twice before you speak. তুমি কি যোগ্য তার? কোন যোগ্যতা আছে তোমার, পরিমল লাহিড়ী?

রোমিওএর মত মুখ করে মেয়েদের দরজায় দরজায় প্রেমভিক্ষা যার ব্যবসা— করুণ মুখে পায়ে ধর একবার, না না, হাতে নয় ?"

পরিমলের উদ্যত হস্ত সর্পদংশনের জ্বালাহত হয়ে নিশ্চেষ্ট হ'ল। "আইভি তোমার খেলায় ক্রীড়নক হয়েছিলাম, সেজন্য নিজেকে ক্ষমা করব না। চার বছরের ভালবাসা আমার, সেটাও কি আমারি মত তুচ্ছ ?"

"তোমার ভালবাসা কে চায় ? ডাষ্টবিন ওর যোগ্যস্থান। Love of a beggar, ভিখারীর ভালবাসা। কোন বড়ঘরের মেয়ে তোমাকে ভালবাসবে ? কেন কি দেখে ?" ক্রুদ্ধা আইভি আরও অনেক কিছু বলেছিল, কিন্তু কশাহত পরিমলের সর্ব্বহারা চিত্তে এক কথা বারে বারে ফিরে আসতে লাগল পিন-ফোটার যন্ত্রণা নিয়ে—"Love of a beggar ! ভিখারীর ভালবাসা।"

না, না, ভিখারী ভালবাসতে জানবে না। ভুলবে সে এতদিনের প্রেম এক নিমেষে। কিন্তু তুমি ? তুমি তো জানতে রৌপোর দেশে তার জায়গা নেই— তুমি তো জানতে তার কি আছে বা না আছে ? তবু তো, ধরা দিয়েছিলে তার উত্তপ্ত বক্ষের উপর, তার প্রদীপ্ত চুম্বনের নীচে ? কেন, কেন ? তাহ'লে কি ?—ওঃ।

"Love of a begg r ? I may be beggar but you—you are a harlot অধম বারবনিতা তুমি।

"কেন তবে আমার পিছু পিছু ঘুরেছিলে এতদিন ? নির্লজ্জ, তোমার লজ্জা করে না ? তোমাকে আমি কোনদিন ভালবেসেছিলাম ? তোমার মত রাস্তার কুকুরকে ? আমার জুতোর খরচ যে যোগাতে পারবে না, তাকে ?

যথেষ্ট। কালবৈশাখীর উন্মাদ বাতাস হাহাকার করে দু'জনের মধ্যে এসে পড়ল। প্রচণ্ড ধূলির ঝাপটা, বাতাসের অকস্মাৎ আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে আইভি দেখল পরিমল চলে গেছে।

প্রেক্ষাগৃহে বেজে উঠল আবহ-সঙ্গীতে করুণ বর্ষাঝরার গান। বসন্তের পুষ্পসজ্জার ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল দুরন্ত কালবৈশাখীর আক্রমণে। গেল উড়ে বাসন্তী আচ্ছাদনী। বিয়োগান্ত-নাট্যের ওপর নেমে এল সমাপ্তির কাল যবনিকা। বসন্ত বিদায় নিল।

কাল যবনিকা ধীরে ধীরে তুলছে। সরে যাও, যবনিকা। দেখি বসন্ত অন্যদিকে কি রেখে গেল ?

বর্ষাক্লান্ত আকাশে চেয়েছিল বৈদেহী। এইমাত্র কালবৈশাখী হয়ে গেল। এখন আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে বটে, তবু সারা প্রকৃতির এক বিরসগম্ভীর ভাব। গোধূলীর চাপা আলো মেঘের পাশে পাশে বিকীর্ণ হয়ে চারিদিক উজ্জ্বল তুলেছে স্তিমিত দ্যুতিতে।

প্রলয়ের লগ্ন যেন—মহাপ্রলয়ের।

আজ বেশভূষা করেনি বৈদেহী, কারণ অকথিত অতিসূক্ষ্ম নিয়মবশে সে পরিমলের আসা-যাওয়ার দিন সম্পর্কে অবহিত হ'তে পারত। সে জেনেছিল আজ পরিমল আসবে না, তবে বৈদেহীর বেশভূষায় প্রয়োজন কি ? আলো জ্বলেনি ঘরে। বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছে বৈদেহী জানালার বেদীর উপর।

হঠাৎ ঘরে এসে ঢুকল নিশব্দে—পরিমল। এ আগমন বৈদেহী প্রত্যাশা করেনি। একেই বলে অসময়! নিত্য যার আশায় প্রসাধন-পারিপাট্য ক'রে পথ চেয়ে থাকা যায়, সে আসে না তখন। যেদিন একটু অসাবধান হয়ে সে আসবে না বলে অসংবৃত বেশে আছে বৈদেহী অমনি সে এল সহসা আগমনের কোন আভাস না দিয়ে। আগেই বলা গেছে বৈদেহী কবিতা লিখতে পারে না, কিন্তু সে কবি-প্রকৃতি। এ তার জন্মসত্ব পিতা থেকে। বৈদেহী যা পড়ে, সে কবিতা মনে রাখে। কবেকার পড়া বিদ্যাপতির দু'টি লাইন মনে পড়ল তার—

"একেলি আছনু ঘরে হীন পরিধান।
অলখিতে আওল কমল-নয়ান ॥"

কিন্তু, কমল-নয়নের একি মূর্ত্তি আজ ? এই বর্ষণক্লান্ত আকাশের গাম্ভীর্য্যই তার ললাটে বিরাজ করছে। মুখ ঈষদারক্ত, তপ্ততপনের অস্তাচলের লোহিতরাগের মত। সারা মুখে দৃঢ়তা, কৃতসংকল্পের চিহ্ন তাকে প্রত্যহ অপেক্ষা পৃথক করেছে। কষিত কাঞ্চনবর্ণ ম্লান।

আইভির বাড়ী থেকে পরিমল যখন ফিরেছিল আপাদমস্তক বারি সিক্ত হয়ে, ঝটিকাঘাত সহ্য করে, তখন মা-ও তার সামনে এসে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

"কি হয়েছে, খোকন? এত বৃষ্টিতে ভিজে"—

"কিছু নয়।" সংক্ষিপ্ত উত্তর বাক্যালাপে উৎসাহ দেয় না।

কাপড় ছাড়বার সময়ে মা ইতস্তত করে বল্লেন, "কিছু খা এখন।" খবর দিলেন, "প্রসন্নবাবুর বাড়ী থেকে সত্যনারায়ণের প্রসাদ দিয়ে গেছে। বৈদেহী পাঠিয়েছে।"

এইতো, এইতো। আছে, আছে। একজন তাকে অপমান করে বিতাড়িত করলেও এই মুহূর্তে অন্য একজন তারই উদ্দেশে পূজা-উপাচার সাজিয়ে রেখেছে। এই যে সাদা পাথরের রেকাবীতে ফিকে গোলাপী তরমুজে, সোনালী খরমুজে, শাদা কলার কুচি, সবুজ পেস্তায় লেখা আছে অন্তরের ব্যাকুলতা পূজারিণীর। বৈদেহী এলোচুলে পট্টবসনে পূজা করেছে কি বর চেয়ে? দূরে গরদের আঁচল লুটিয়ে পড়েছে ফুলবিল্বপত্রের পাশে, মলিন গঙ্গোদকে ভিজে যাচ্ছে সেটা। কালো, কুৎসিত বৈদেহী। কিন্তু, কালো হাতে জ্বলে উঠছে ভারী ভারী সোনার চুড়, কানে দুলছে মতির ঝালর, আঙ্গুলে জ্বলছে চুনীর আংটি। কালো হাতে রূপোর রেকাবী সাজাচ্ছে সে পরিমলের পথ চেয়ে।

মন্দ কি? ভালবাসার প্রয়োজন দুপক্ষে নাই রইল? একজনের প্রেমে কি পরিমল নারীহৃদয়ের নিষ্ঠুরতা ভুলতে পারবে না? এইতো আছে, অন্য নারী আছে। এইতো রয়েছে কালো কুৎসিত বৈদেহী। ভালবাসে উন্মাদের মত — জানে, জানে পরিমল। সে ভালবাসার কথা বহু নারীর হৃদয়াবেগ-দর্শনক্ষম নয়নে দেখেছে পরিমল। বৈদেহী বিচার করে নেবেনা পরিমলকে — তার টাকা নেই, প্রতিষ্ঠা নেই, কিছুই দেখবে না প্রেমিকা। জানে পরিমল, কৃতার্থ হয়ে যাবে বৈদেহী — ধন্য হবে নিজের সম্পদ পরিমলের চরণপ্রান্তে উপহার দিতে। সে সম্পদে পরিমল বড় হতে পারবে, জগতে প্রতিষ্ঠা পাবে। দেখবে আইভি পরিমল লাহিড়ী নগণ্য নয়। সুযোগ পেলে সে-ও অর্থ-শিখরের শীর্ষদেশে যেতে পারে। না, এ সুযোগ তো পরিমল ছাড়বে না। দেখবে আইভি, দেখবে পরিমল ইচ্ছা করলেই বড় ঘরের মেয়েকে বিবাহ করতে পারে। দেখানো চাই তাকে। পাত্রী গৌণ—প্রতিশোধ মুখ্য। যে কেউ হো'ক—আজ এখনই।

বিশেষরকম সজ্জা করে পরিমল বাড়ী থেকে বেরিয়ে বৈদেহীর দরজায় উঠল। বিদ্রূপের জ্বালা-হাস্য অধরে। এইবার ঠিক হয়েছে। হৃদয়হীনাকে জব্দ করা যাবে।

আলো জ্বালাতে যেয়ে কি ভেবে বৈদেহী আর সুইচের দিকে অগ্রসর হ'ল না। আজ তো বেশভূষার পারিপাট্য নেই, যে আলোকিত কক্ষে পরিমলকে সজ্জা দেখাতে হ'বে। অনর্থক আর অন্ধকারকে বিদূরিত করবার প্রয়োজন কি? এখন পর্য্যন্ত আলো না জ্বাললেও বিসদৃশ হ'বে না। গোধূলীর মুমূর্ষু আলোকে হয়তো মনোহর দেখাচ্ছে তাকে।

"বসুন না, দাঁড়িয়ে কেন?" ভাল করে কথা বলতে পারছে না বৈদেহী। সহসা উচ্ছ্বসিত হৃদয় কণ্ঠে উঠে এসেছে।

কিন্তু, পরিমল বসল না, এগিয়ে এল সন্নিকটে। ক্রমশঃ ঘনায়মান তিমিরে সে প্রিয়তম, মোহন মুখের কোন রেখা পড়া যাচ্ছে না। বস্ত্রাবৃত মূর্ত্তির মত পরিমল অস্পষ্ট।

"বৈদেহী!" মর্ম্মান্তিক কণ্ঠে, যেমন ব্যাধ বংশীধ্বনিতে কুরঙ্গ ডেকে আনে, তেমনি স্বরে পরিমল ডাকল, "বৈদেহী, তুমি আমাকে বিয়ে কর"

পরক্ষণেই সে বুঝতে পারল কিছু বাদ গিয়েছে বলা। কিছু বলা হয় নি, যা না বললে এ অনুরোধের কোন মূল্য থাকে না। তাই অত্যন্ত সহজ সাধারণ ভাবে, বৈদেহীর দিকে না তাকিয়েই তার একখানা হাত নিস্পৃহ ভাবে গ্রহণ করে নির্লিপ্ত কণ্ঠে পরিমল যোগ দিল, "কারণ, আমি তোমাকে ভালবাসি

পরিমল লাহিড়ীর অমার্জ্জিত-নিষ্ঠুর জীবন-ইতিবৃত্তে বিচারকর্ত্তা অন্তরীক্ষে এ ঘটনাটি অন্য একটি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করলেন। ছেলেবেলায় মামার বাড়ী পড়ে থাকত পরিমল মায়ের সঙ্গে। বাবা ঘুরতেন উপার্জ্জনের ধান্দায়। অবস্থাপন্ন মামার বাড়ীতে ঘটা করে পূজো হ'ত। অনেক আগেই বলির ছাগমেষাদি কিনে রাখা নিয়ম ছিল। খাইয়ে দাইয়ে মাস তিনেক তাদের পুষ্ট করে মহামায়ার হাড়কাঠে বলি দেওয়া হোত। এমনি দুটি ছাগল ছিল, সাদা, লাল। ধলী, লালী নাম দিয়ে পরিমল তাদের পুষেছিল। কুকুরের মত তারা পরিমলকে অনুসরণ করত। একটি সপ্তমীর বলি হ'ল। অন্যটি তাই দেখে ভীত হয়ে দ্রুতপায়ে পালিয়ে গেল বনের মধ্যে। সপ্তমীর দিন তাকে নামানো গেল না, ছ্যাডাং করে। অনেক পালিত পশুর একটিকে বলি দিতে হ'ল। কিন্তু মহামায়ার নামে যে উৎসর্গীকৃত, খর্পরধারিণীর তাকে তো চাই। ধলী দুইদিনে আরও বাধ্য হ'ল শিশু পরিমলের। সঙ্গীহারা পশু অখণ্ড আনুগত্যে পায়ে পায়ে ফিরত পালকের। নবমীর দিনে

মামা অনুরোধ করলেন যাতে পরিমল ধনীকে ধরে ঘাতকের হাতে সমর্পণ করে। অষ্টমীর দিনেও তাকে ধরা যায় নি। আজ শেষ দিন। এত ক্ষিপ্র ওই পশু, সাদা সরু পায়ে তার এত গতি যে তার অনুসরণকারীর কেউ ধরতে পারেনি ওকে। ভয়ে সজাগ কর্ণ খাড়া করে অনুভূতির প্রাবল্যে পালিয়ে বেঁচেছে ও।

অবলীলাক্রমে পরিমল ডাকল ওকে বলির সময় সন্নিকট। অনুসরণকারীদের ব্যর্থ করে পালিয়ে যাচ্ছে ও হাল্কা তুলোর মত সাদা শরীর নিয়ে। পরিচিত প্রিয় কণ্ঠে ডাক—ফিরে তাকাল সে, দ্রুতগতি ব্যাহত হ'ল নিমেষের জন্য। তক্ষুনি ধরা পড়ে গেল। বলি পেলেন মহাশক্তি।

পরিমল মনে রাখেনি। সে ইতিহাস আজ ও ভুলেছে। কিন্তু বিধাতার রঙ্গমঞ্চে বার বার অভিনীত হচ্ছে সেই দৃশ্য। নিরপরাধ পশু আততায়ীকে পরাস্ত করে বনে পালিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তার পালক এসে ডাকল তাকে সস্নেহে, "আয়, আয়।" ভীরু, জন্তুজীব আশ্রয়ার্থে ফিরে এল পালকের কাছে। পালক স্বচ্ছন্দে তাকে আততায়ীর হাতে সমর্পণ করল। সে পশু, অন্যথায় হয়তো কিছুদিনের মত বেঁচে যেত। সেইদিন থেকে নির্ভুল-তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিধাতা অঙ্ক জমা করতে লাগলেন সেই সুদর্শন বালকের হিসাবে।

রক্তস্রোতে হাড়কাঠ ভেসে যাচ্ছে। যজ্ঞভূমি পরিষ্কার করে চতুষ্কোণ মাটীর বুকে গাঁথা কাঠের যূপকাষ্ঠ। সিন্দূরে লিপ্ত ঊর্দ্ধভাগ, নিম্নাঙ্গ রক্তে। মাটীর বেদী দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে ধারালো খড়গের কোপে। সদ্যকর্ত্তিত, মুণ্ডবিহীন পশুদেহ ধড়ফড় করছে মাটিতে। মুটি হাত পা চেপে ধরল। মাটীর সরায় কলা, রক্ত ধরে রাখা হ'ল প্রতিমার সামনে। রক্তের ছিটেতে লাল সাদাধুতি পরা কাপালিকমূর্ত্তি বলিদাতৃ দাঁড়ালেন। মণ্ডপ কাঁপিয়ে অনুস্বর-বিসর্গের ঝড় উঠল :—

"যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ,
তস্মা কার্য্যো বধোহবধঃ"—

অর্দ্ধনিমীলিতাক্ষি পশুর কর্ত্তিত শির কলাপত্রে রক্ষিত, মাথায় জ্বলছে সলিতা, জিহ্বা উৎঘাটিত। সম্মুখে পরিমল।

বহু হৃদয়-ঘটিত নিষ্ঠুরতা, অনেক স্বার্থপরতা একে একে জমা হ'ল সেই হিসাবে। এখনও হচ্ছে। এই হিসাবও নিশ্চিত যুক্ত হয়ে গেল যথাস্থানে।

সমস্ত অঙ্ক মিলিয়ে তবে না উপসংহার?

—পনেরো—

"খোকন, একটা কিছু গয়না কিনে দিতে হয়।"

পরিমলের ঘরে বসবার ছোট একটা সোফা এসেছিল আইভির আগমনের পরে পরে আশায় আশায়। 'দ্বিতীয় হস্ত' সোফা, মনে ছিল আশা এখানে একদিন বসবে সে।

আজ নিরানন্দ সোফার ওপর অর্দ্ধশায়িত হয়ে খবরের কাগজে দৃষ্টি সংলগ্ন করে আছে পরিমল। গায়েব ওপর একটা উত্তরীয় বাঁকাবেখায় লুটিয়ে পড়েছে বক্ষে, জানুতে, পায়ের পাতায়।

"কেনো?" দীর্ঘ করে টেনে পরিমল জিজ্ঞাসা কবল।

"আশীর্ব্বাদের দিন তো ঠিক হয়েছে। একটা সোনার কিছু দিয়ে মুখ দেখতে হয়।"

"ও, আচ্ছা কি চাই?' অহেতুক উৎসাহে পবিমল উঠে বসল, চাদবটা খসে' মাটীতে পড়ল। মা একটু সরে এসে দাঁড়ালেন সোফার হাতলে হাত রেখে।

"দেখ, আমাব বড ইচ্ছে ছিল তোর বউকে চিক দিয়ে আশীর্ব্বাদ করব। তা, একটু বেশ সোনার কাজের ওপর পাথর বসানো থাকবে। কয়েকটা ছোট ছোট সবুজ পাথর —

"পান্না ওকে মানাবে না। বরঞ্চ চুনীবসানো হার একছড়া এনে দেখাবখন তোমায়।"

'মানাবেনা'—কথাটা শুনে চকিত দৃষ্টিতে মা চাইলেন ছেলের মুখের দিকে। কিন্তু না, উৎসাহে জ্বল্জ্বল্ কবছে চোখ ওর, মুখ দ্যুতিতে ঝল্মল্। সোজা-খাড়া হয়ে বসেছে, যুদ্ধে যাচ্ছে যেন। না, না যুদ্ধ কি? অযথা শুভকর্ম্মে যুদ্ধের কথা মনে আসে কেন? যত সব! মা ভেবেচিন্তে সোজা কথাটাই পাবলেন, "দাম তো অনেক লাগবে। তোর হাতে টাকা আছে তো? না হয় আমাব হারছড়া বন্ধক দিয়ে –। সামান্য কয়েকটা টাকাও দিতে পারি।"

শেষ সম্বল স্বামীর লকেট-ছবি সম্বলিত হেলে হাবগাছা, সংসারের খরচ-বাঁচান কয়েকটি টাকা।

তাচ্ছিল্যে মুখ বক্র করে উত্তর দিল পরিমল, "রাখো তোমার হার। ধারে কারবার চালাতে পারি আমি এখন। শীগ্‌গির শোধের তো অসুবিধা নেই।

বিয়ের পরই চেক পাবো হাতে। এখন অনেকে ধার দেবে আমায়।" বিকৃত দন্তের হাসিটা শোনা গেল মুখভাংচানী। অমার্জ্জিত ভাবপ্রকাশে অপরূপ রূপ ধরল মালিন্য ছায়া।

মা চুপ করলেন। হঠাৎ স্বামীর কথা মনে এল। এমনি করে মাঝে মাঝে হাসতেন উনি। মরবার আগের দিনের কথা মনে পড়ল।

"সব শালাকে লবডঙ্কা দেখিয়ে যাব। হা, হা!" সত্যই খবর পেয়ে অসংখ্য পাওনাদারেরা এসে দেখল বেণেটোলার বস্তির খোলাঘরে বিধবা ময়লা একটি পুঁটলী ও চাদরের ঘটী এক হাতে ও মুণ্ডিতমস্তক ছেলেকে অন্য হাতে ধরে ভাইদের আশ্রয়ে যাবার উদ্যোগ করছেন। সম্পূর্ণ নিঃসম্বল

ধার কথাটা ভালো লাগে না শুনতে। তবে, হ্যাঁ ছেলের আনন্দ হ'তে পারে বৈকি। এত অভাবে থেকে মানুষ, বর্ত্তমানের নিরন্তর সংগ্রাম জীবন-যাত্রার পিষে ধরেছিল ওর তারুণ্যকে। এবার মুক্তি।

মায়ের মুখ উজ্জ্বল। এতদিনে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হ'তে বসেছে। ছেলে লক্ষপতির একমাত্র সন্তানকে বিবাহ করছে তার সম্পত্তির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী রূপে। হ'কনা মেয়ে হতকুশ্রী, তার ছেলে তো সুন্দর আছে। নাতি-নাত্নীগুলি অবশ্য সুন্দর হবে। এইবার শান্তি। নিশ্চিন্ত আরামে বসে থাকা চাঁদকপালে নাতিকে কোলে নিয়ে প্রাণভরে দুলবে। এতদিন ছেলে বিয়ে করবে না বলে এক আধাফিরিঙ্গী মেয়ের পিছু পিছু ঘুরছিল! তাকে বিয়ে করলে পেতনা কিছুই, লাভের মধ্যে জাতভ্রষ্ট পোয়াতি সাহেবী কেতায়। সে সংসারে তাঁর নিজের স্থান থাকত না। এখানে বৈদেহীকে আগেই স্নেহের বাঁধনে বেঁধেছেন তিনি। কিন্তু থেকে থেকে কল্পচোখে দুখানি ছবি পাশাপাশি ভেসে আসত। সুন্দর ছিল বটে মেয়েটা। গোলাপফুলের মত রং, আর কি মুখচোখ! অন্য মুখখানির দৈন্যে মায়ের চিত্ত নিরাশ হয়ে উঠত, কিন্তু পরক্ষণেই মুখের অধিকারিণীর পিতা প্রসন্ন রায়ের ঐশ্বর্য্যের স্মৃতি মনকে প্রসন্ন করে তুলত।

অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটি কথাবার্ত্তার পরে মা চলে যেতে ছিলেন। পরিমল ডাকল পেছন থেকে, "মা, শোন। প্রসন্নবাবু যেন আজ্‌-কালের মধ্যে আমাকে আশীর্ব্বাদ করে যান। দশদিন পরের লগ্নটাতেই যেন শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে ঠিক হয়।"

"হ্যাঁ বাবা, আমারই তাই ইচ্ছে। আজ প্রসন্নবাবু এলে বলব। অবশ্য এত তাড়াতাড়ি করলে উনি একটু বিব্রত হ'বেন। ঠিকমত আয়োজন করে ওঁর

অল্পদিনে সম্ভব নয়। ওঁর মত লোকের মেয়ের বিয়ে কি না। তাই একটু আপত্তি করছিলেন—"

"আপত্তি করলে চলবে না। আমি তো ওঁকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি আমার একটা জরুরী কাজ আছে। তার আগে বিয়ে সেরে ফেলা দরকার।"

অসহিষ্ণু কথাবার্তায় মা মনে মনে হাসলেন।

"তাই হ'বে, বাবা।"

ছেলেছোকরাদের ধরণই এই রকম। এতদিন বিয়ে না করে ছিল বেশ। যেই ইচ্ছা হয়েছে, অমনি সে ইচ্ছা আর একদিন দেরী সইতে পারছে না। অন্তরালে যেয়ে মা আবার হেসে নিলেন একটু।

বৈদেহীর বাড়ী লেগেছে সমারোহ। গয়নার সম্ভার নিয়ে ছোটাছুটি করছে স্বর্ণকারিকর দর্জ্জি ফিতে গলায় আনাগোনা করছে। সজ্জাকর কর্তার কাছে এত্তেলা পাঠাচ্ছে খাবারের দোকানের গাড়ী চলাফেরা করছে। নিকট আত্মীয়রা আসছেন একে একে। নেমতন্ন পত্র গেছে ছাপাতে নূতন ডিজাইনে। একখানা গাড়ী রাখতেন প্রসন্নবাবু। দুটি প্রাণীর দরকার ছিল না বেশী। নূতন আটসিলিণ্ডারের গাড়ী এসেছে মেয়েকে যৌতুক দেবেন বাড়ীতে রাখবার ইচ্ছা আপাততঃ দমন করে পার্ভূলক প্লেসের বাড়ীখানার ভাড়াটেকে নোটীস দিয়েছেন গৃহত্যাগের। আগাগোড়া খোল ফিরিয়ে দেবেন ওখানার। বাড়ীর কাছেই হ'বে। মনের মত জামাই পাচ্ছেন মেয়ের পূর্ব্বজন্মের শিবপূজোর জোরে। বড়লোক-বড়ঠাকুরের দরকার ছিল না তাঁর। শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান যুবক পেলেই হ'ত। এ হ'ল আশাতীত। এত রূপ, আর এতই পালিশ। লোককে দেখিয়ে গর্ব্ব হ'বে। এতদিনে জীবনের একটা অভাব পূর্ণ হ'ল তাঁর। একটা অপূর্ণতা নিঃশেষে মিলিয়ে গেল।

রাতারাতি যুবক হয়ে উঠেছেন রায়মশাই। দৌড়ে চলছেন, লাফিয়ে সিঁড়ি উঠছেন। বিনা কারণে প্রাণ খুলে হাসছেন। চাকর-বাকরকে অকারণে টাকা—নোট ছুঁড়ে বকশীষ দিচ্ছেন। মনের, দেহের প্রত্যেক অঙ্গ ভরিয়ে রেখেছেন মেয়ের বিবাহের আনন্দে। কাজের অন্ত নেই, হাঁকডাকের শেষ নেই।

আশ্রিত-আশ্রিতরা আড়ালে নিম্নস্বরে আলাপ করছে—"কি কপাল, বাবা! রাজপুত্তুরের মত ছেলে কিনা যেচে ওই পেত্নীকে বিয়ে করছে?"

মতিমাসী সনিশ্বাসে ভাবছেন, আমার বোনঝিও তো রয়েছে! পটে আঁকা ছবি যেন। ওকে যদি একবার দেখাতে পারতাম! তাকে দেখলে কি এ মেয়ে চোখে ধরত? আবার স্মরণে ভেসে এল একরাশি শাদা ঝক্‌ঝকে হীরার গহনা, পরিয়ে দেখছিলেন প্রসন্নবাবু মেয়েকে। চোখে ধরার কারণ বুঝে মতিমাসী সনিশ্বাসে চুপ করে গেলেন

আশ্রিত বিনোদ ভাবছে "লাখ-লাখ টাকা পেলে ওর চেয়েও কুৎসিৎ যদি কিছু থাকে, তাকেও বিয়ে করতে পারে লোক। আহা, আমি তো রাজী ছিলাম। কত চেষ্টা করেছি। মেয়ের নাকের ডগায় তো হাজির দিলাম তা, কালামুখী ফিরেও দেখল না বাপটিও বা কি? এত বড় বংশ আমার। 'আদৌ মৈত্রস্তবা ভীমঃ .ভেবেও দেখল না বুড়ো বেল্লিক।' আয়না ধরে দেখা যেত ম্যাকেবিয় শী· হাত ', সর ঠিব মত .দহ, বসা চোখ, ভাঙা গাল কুলীন-প্রবরটির .ভবে না দেখা কারণ দশ খুঁজতে হয় না।

খোকাদিদি নেড়ামামী ইত্যাদিরাও বৈদেহীর সুখে বুকফাটা নিশ্বাস ফেলে আশীর্ব্বাদ জানালেন

অন্য কোন সময় হলে এইসব আলোচনার ছোটখাটো ভগ্নাংশ কানে যেয়ে বৈদেহীর অশান্তির উদ্রেক হত কিন্তু আজ বাইরের কোন বস্তুই তাকে সুখী বা দুঃখী করতে পারে না। তার আত্মসমাহিত চিত্ত পরম প্রশান্তিতে কেবল অনুক্ষণ প্রিয়ের ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে। তার ভীরু চিত্ত কল্পনাতেও যা আশা করতে ভয় পেত, আজ বাস্তব তার হাতে তুলে দিয়েছে সেই ঐশ্বর্য্য, তার সেই স্বপ্ন জীবন তার ভরে গিয়েছে ফুলে ফুলে, যুঁই-চম্পা-চামেলী-বেলা-গোলাপে। তার বন্ধু আর সুদূরে নেই, নেমে এসেছে সে দ্বারে। তার যৌবন-বনের সে বনদেব সাগ্রহে, সানন্দে চেয়েছে তাকে! আমি তাকে চাই জানাবার আগেই সে চাইল আমাকে! আ, কি অসহ্য, অসহ্য এ সুখ! কি অসহ! এ সুখ দারুণ ক্ষতের মত স্মরণ করিয়ে দেয় প্রতিমুহূর্ত্তে আমি আছি! এ সুখের অনুভূতি এত তীব্র যে যন্ত্রণা-দায়ক। এখন মরলেও বৈদেহীর ক্ষোভ নেই।

বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামবার শব্দ হল। বেলা প্রায় চারটা। পরিমলের মা এসেছেন প্রসন্নবাবুর সঙ্গে এ বাড়ীতে। এমনি আসেন তিনি প্রায়। আজ এসে একবার পিসীর সঙ্গে গল্প করলেন খানিকক্ষণ বাজারদরের সম্বন্ধে। যেখানে

দর্জিরা পোষাক তৈরী করছিল সেখানে দাঁড়ালেন কিছুটা সময়। রাতারাতি প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছেন তিনি। পুত্রের বিবাহে মিসেস চকের যা হয়েছিল, পরিমলের মায়েরও পুত্রের বিবাহে কিঞ্চিৎ কম ডিগ্রীতে একই দশা। তবে, দম্ভের চেয়ে আনন্দ ছিল মনে অধিক। ভাগ্যে বিশ্বাস ছিল প্রচুর। দুর্ভাগ্যযোগ কেটে গেছে তাঁর এত সম্মান, কই ভাগ্যে ঘটেনি তো কোনদিন? পাত্র কর্ত্তা হ'লেও সেকেলে মানুষ প্রসন্নবাবু কথা বলেন মায়ের সঙ্গেই, মতামত নেন তাঁর, ফর্দ্দ দেখান। বাড়ীতে পা দিলে ঝি-চাকর, আশ্রিত-আশ্রিতা তটস্থ। হঠাৎ আলাদীনের প্রদীপ হাতে পেয়েছেন মা।

ইতস্তত তাকাতে তাকাতে মা এলেন বৈদেহীর ঘরে। বৈদেহী বসে বসে হাতের তাবিজের নক্সা কাগজে আঁকছিল। মাকে দেখে উঠে দাঁড়াল প্রণাম করে। মুখে ঈষৎ আনন্দের জ্যোতি।

"একবার দেখে গেলাম তোমাকে, মা নানা কথার পরে মা বেশ বুদ্ধি খেলিয়ে সংবাদ দিলেন, "তোমার আশীর্ব্বাদের হারছড়া মা, জান তো খোকন নিজে বেছেছিল। তোমার গয়না-গাঁটী দেখে মনে পড়ে গেল আমি একছড়া হার কিনে দিতে বলেছিলাম। তা, খোকনের কি রাগ' বলে, তাড়াতাড়ি করে কিনতে হ'বে না। আগে আমি নিজে দেখি, তোমাকে দেখাই, তারপর। ওকে যা মানায় ঠিক তাই এনে দেব আমি। বলা বাহুল্য কথাগুলি পরিমলের একটি কথার বিস্তৃতি ভিন্ন কিছু নয়। মা বুদ্ধিমতী, ভাবী পুত্রবধূকে খুসী রাখতে চান। ছেলেকে খুসী রাখা অভ্যাস আছে তাঁর। নিদারুণ বৈধব্যজীবন তো আগা-গোড়াই অশ্রুসিক্ত বিনতি ও তোয়াজের কাল ভাইদের সংসারে। বড়লোকের মেয়ে বৈদেহীকে অজানিতে বহুদিন আগে থেকেই খুসী করবার চেষ্টা করতেন তিনি অবচেতন প্রবৃত্তির নির্দ্দেশে। পুত্রবধূ দরিদ্র সংসারে কত কি নিয়ে আসছে? গাড়ী, বাড়ী, ব্যাঙ্কে টাকা, সর্ব্বাঙ্গে হীরাজহরত। বিনিময়ে কিছু দিতে না পারলে ঋণশোধ হ'বে কি করে? দেবার বস্তু মাত্র পুত্রটি তাঁর সম্যকভাবে দিতে চান তিনি তাকে বধূর করকমলে গ্রহীতার দানভারাক্রান্ত চিত্ত নিয়ে। শুধু রূপ নয়, প্রেমও নাও তুমি উপহার।

বৈদেহীর বক্ষে দোলা লাগল। এত ভালবেসেছ তুমি যে আমার কুশ্রীতাও তোমার চক্ষে সুন্দর হয়ে উঠেছে। সে শুনেই এসেছিল শুধু, ভালবাসলে রূপের অভাব থাকে না।

মা বাড়ী ফিরতে ফিরতে নিরাশচিত্তে পুনরায় ভাবলেন, এ মেয়ে দেখে কি করে পছন্দ হ'ল তাঁর ছেলের ? যা রূপের বাই ছিল ওর ! মেয়ের রং যা আছে থাক না হয়, নাকমুখচোখগুলো যদি আর একটু ভাল হ'ত ! সবাইকে বউ দেখাতে হ'বে তো। থাকগে, কত টাকা আছে মেয়ের, গুণ আছে কত ? না, ছেলে সত্যই গান ভালবাসে।

কিন্তু, আইভির খবর কি ? এই তো পুরুষের মন, একজনকে ভালবেসে আর একজনকে বিয়ে করছে তাঁর ছেলে পূর্ব্বের দেবীকে নির্ম্মমভাবে বিসর্জ্জন দিয়ে। একমুহূর্ত্তে ভুলে গেল সে আইভিকে ? মা আইভির কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস পান না ? দরকারই বা কি ? যা ভাল বোধ করে তাই করুক ওরা।

কিন্তু, আইভির খবর কি ? আইভি কি ভাবছে ? আইভি কি করছে ?

—ষোল—

আইভি কি করছে ?

বেলা দশটা প্রায়। প্রাতঃকালীন দ্বিতীয় চায়ের পাত্রটি নিঃশেষ করে আইভি আরাম-কেদারায় শায়িত হয়ে একখানা বিদেশী মাসিকপত্রের চমকপ্রদ গল্প পড়ছিল। পাশের টেবিলে লেখার ব্যবস্থা। এখনি বসতে হ'বে তাকে। বন্ধুদের চিঠি লেখা আছে, বিজ্ঞাপনের দোকানে চিঠি লিখে খবর নেওয়া আছে। কত লেখাপড়ার কাজ !!

আলস্য দূর করবার পক্ষে কড়া চা-এর মত পানীয় নয়। যত কিছু শিথিলতা, অলস নিদ্রালুতা অন্তর্দ্ধান হয় নিমেষে। শরীর উত্তেজিত হয়ে ওঠে। একটা কাজের মধ্যে সেই উত্তেজনাকে ব্যয় করতে পারলে পরিচ্ছন্ন তৃপ্তি আসে। তাই আনন্দ চা-পিয়াসীদের।

চায়ের বিজ্ঞাপন নয়, এইরূপ একপাত্র চা পান করেছিল আইভি। তাই বোধ হয় নিষ্কর্ম্মার মত পড়ে থাকা পোষাল না তার। চিঠি লেখার উদ্দেশে উঠে এল আইভি টেবিলের কাছে

রাইটিং কেস খুলে পুরু-নীলাভ, খসখসে কাগজের মাথাটা নূতন-পার্কার দিয়ে ছুঁয়ে বসে আছে আইভি। প্রথম চিঠি কাকে লিখি ?

পরিমলকে একখানা চিঠি কি লিখবে? পনেরো দিন হয়ে গেছে। এখনও ফিরে এল না সে? এত তীব্র কলহ না হ'লেও ঝগড়া আগেও হয়েছে। প্রত্যেকবার ফিরেছে সে, চেয়েছে ক্ষমা। অবশ্য, এবারে যা বলা হয়েছে, এমন কোনবার হয়নি। কিন্তু, উপায় ছিল না আইভির। তা, কি আর এমন বলেছে আইভি? প্রেমিক-প্রেমিকাদের এরকম হয়েই থাকে। তা নইলে, 'দেহি পদপল্লবম্' আর লেখাই হ'ত না। ফিরে চায় আইভি পরিমলকে। যতদিন রাখা যায়। বিবাহ না করলেও কাছে রাখতে দোষ কি? যাকেই বিবাহ করুক আইভি, এখনও তো করেনি। আগেই পরিমল একটা ব্যাপার বাধিয়ে বসে কেন?

বেয়ারার অনুগমন করে পরিমল স্বয়ং এসে ঘরে প্রবেশ করল। অপরাধীর মত একটু হাসল আইভি তার দিকে চেয়ে।

গম্ভীরভাবে আসন পরিগ্রহ করল পরিমল। জামার পকেট থেকে একখানা লম্বা-চিত্রিত খাম বার করে আইভির সম্মুখে টেবিলের ওপর রাখল, "আমি ক্রটী রাখতে চাই না, আইভি। বিশেষতঃ, সুদীর্ঘ সময় তুমি আমার বন্ধু ছিলে।"

খামটা তুলে নিয়েছে আইভি। সূক্ষ্ম অঙ্গুলী তার হলদে কাগজখানা ধরে রয়েছে। কাঁপছে তারা। তিনবার পড়ল আইভি ক্ষুদ্র কাগজখানা। দুটো নামের দিকে অর্থহীনভাবে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আর্ত্তনাদের মত স্বরে বলে উঠল, "পরি, এ কি?"

কালবৈশাখীর বজ্রপাত হয়নি সেদিন, কেবল অশনিই দেখা দিয়েছিল, আজ সেই বজ্রপাত হ'ল।

অবিচলিত কণ্ঠে পরিমল বলল, "বিয়ে হয়েছে কাল। এর আগে আসতে পারিনি। আগামী কাল বৌভাতের নেমতন্ন করতে এলাম আজ।"

হাহাকার করে আইভি লুটিয়ে পড়ল টেবিলের ওপর, "কেন এমন কাজ করলে, পরি?"

পরিমল উঠে দাঁড়িয়েছে, চক্ষে তার বিদ্রূপ।

"কেন এমন কাজ করলাম, আইভি? আশ্চর্য্য, লোকে বিয়ে করবে না? তুমি বলেছিলে কোন বড় ঘরের মেয়ে আমাকে বিয়ে করবে না। কিন্তু, দেখছি তোমাদের থেকে বড়ঘরের মেয়েই জুটে গেল শেষ পর্য্যন্ত বেগারের বরাতে। হয়তো তোমার বাবারও কিছু দেনা আছে আমার শ্বশুরের কাছে।"

নিদারুণ অপমানেও আইভির মুখর কণ্ঠে কোনও বাক্য নেই আজ। আইভির নির্নিমেষ দৃষ্টিতে অজস্র অনুশোচনা ও অপার ভালবাসা ভিন্ন অন্য ভাবের সমাপ্তি হয়েছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল পরিমল আইভির মুখে। সে চিরপ্রিয় মুখের অপরিসীম যন্ত্রণার ছায়া তাকে আরও নির্দ্দয় করে তুলল। আঘাতের ওপর আরও আঘাত দিচ্ছে সে। "বড়লোক শ্বশুরের একই মেয়ে, সবই পাব আমি। ঠিক এমনটি খুঁজছিলাম এতদিন। ভালবেসে তাকে বিয়ে করেছি। সে-ও ভালবাসে আমাকে। এইবার বোধহয় কপালে কিছু সুখ আছে। তোমার পেছনে আর কুকুরের মত ঘুরতে হবে না।"

"পরি, চুপ করো।"

পরিমল এগিয়ে গেছে দরজার কাছে

"যাই এখন। আমার বিয়েতে নিমন্ত্রণ করলাম তোমাকে। তুমিও একটা কার্ড পাঠাতে ভুল না তাহলে যেও বিকেলে। আমার স্ত্রী সুন্দর গান করেন, সে গান শুনে আনন্দ পাবে আর তিনিও তোমাকে দেখে সুখী হবেন। গুডবাই

ভগবান, ফিরে দাও তাকে, ফিরে দাও। আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্যের পরিবর্ত্তে তাকে এনে দাও। সমস্ত জীবন, আশা-আকাঙ্খা, সকল সুখ-আনন্দের সমাধি ঘটুক, শুধু সে ফিরে আসুক। মুহূর্ত্তের ভুলে যে চিরজীবনের জন্য সরে গেল পথ থেকে, তাকে কি করলে ফিরে পাবে আইভি? একবার ফিরে দাও তাকে। তুচ্ছ হয়ে যাক তার কাছে আমার উচ্চাশা, তুচ্ছ হয়ে যাক তার কাছে আমার স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ সমস্তর বিনিময়ে, সারা জীবনের বিনিময়ে ফিরে দাও তাকে।

"মধুনিশি পূর্ণিমার ফিরে আসে বারবার,
সেজন চলিয়া যায় আসেনা ফিরে'—

না, না ভুল বলেছি, ভুল ভেবেছি। জীবনের একমাত্র ঐশ্বর্য্য প্রেম। জীবনকে একমাত্র মূল্য দিতে পারে প্রেম। কেন কেন? ধূলার ধরণীতে একমাত্র ইন্দ্রধনু তো সেই এঁকে দেয়, নির্লিপ্ত মনের সক্রিয়তা সেখানেই। অনু-পরমাণু রসবিধুর

করে তোলে। প্রতিটি দিনের অর্থ শেখায়। প্রভাতকে আশার আলোকে ভরে তোলে, রাত্রিকে পরদিনের প্রতীক্ষামধুর করে। শয্যা থেকে নয়ন মেলেই মনে হয় আছে, আছে। এই দিনের বক্ষে আছে বন্ধ্যা কর্ম্মকাঠিন্য নয়—প্রেম। বাঁচার উদ্দেশ আছে, মৃত্যুতে বিস্মরণের ভয় নেই। বল, বল জীবনে আর কি বস্তু এত আনন্দ আনে, এত আশা? ঐশ্বর্য্যের স্বর্ণপিঞ্জরে সুখ কোথায়? বিলাসে কই আনন্দ, যদি না পাশে থাকে আমার আপন লোক? ভুল করেছি, পাশ্চাত্য দর্শন ভোগের পথে ইঙ্গিত পাঠায়—দেহ প্রধান হয়। আমি প্রতীচ্যের মানুষ, ভালবাসা যে আমার জন্মসত্ব। কেন ভুল করে ভেবেছিলাম খ্যাতিতে সুখ, অর্থে সুখ। সব মিথ্যা, সব অর্থহীন। একমাত্র সত্য প্রেম।

একমাত্র সত্য প্রেম। হেলায় পথের পাশে ফেলে দিয়েছি। আমার সুখহীন, যান্ত্রিক জীবনকে সত্য মনে করেছি! হায়, হায়!

কোথায় সুখ? মোটরের শব্দে শুনছি আমারি হৃদয়-স্পন্দন চক্রের তালে তালে—তুমি, তুমি, তুমি কোথায়? কোনখানে যাচ্ছি, যেখানে আমার কেউ নেই।

কেউ নেই আমার। চারপাশে সকলে গান গাইছে, নাচছে, প্রেম করছে। রঙীন পানীয় হাতে কোণে বসে নেশাখোর। নেশা করব নাকি? ভুলতে পারব তাহ'লে। কি ভুলব? তাকে? না, না। তাকে আমি ভুলতে চাইনা—অনন্ত কালেও না। শুধু আমি ভুলতে চাই সে আমার জীবনে শেষ হয়ে গেছে।

সুশোভন? হ্যাঁ, বারে বারে ওরা ভালবাসতে পারে- আমার জগতের লোক। আমি পারিনা। কারণ, আমি যে অন্যরকম। আমি যে ওদের জগতের নয়। ওঃ, এ কথা এত দেরীতে বুঝলাম কেন! কেন অযথা ওদের মত হ'তে যেয়ে নিজ হাতে আমার সুখকে দূরে ফেলে দিলাম! কি চাই আমি? কিসে আমার পূর্ণতা বুঝতে পারতাম না। আজ বুঝেছি—ওর মধ্যেই ছিল

আমার পূর্ণ হয়ে উঠবার উপাদান। সম্পূর্ণ পেতাম না, তাই জাগত অতৃপ্তি। ও চলে গেল—তবে বুঝলাম কত ভালবাসতাম। প্রেম শেষ হয়ে গেল তবে বুঝলাম আমার জগতে আমি কত পর। তারা একরকম—আমি অন্যরকম।

"Western hearts are used to loving
And may love and love again.
But an eastern heart is broken, broken."

ভুল শিখিয়েছিলেন [illegible] দরিদ্র ব্যবস্থায় সুখ থাকে। কারণ থাকে যে সে [illegible] একমাত্র জীবনের মূল্য নিয়ে তো ওখানেই। সহজে প্রেমের যুগ্ম সহজ জীবন [illegible] তো হবে না।

শোন, শোন তুমি, যেখানে যাব, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই মনের সম্পূর্ণ অধিকারী তুমি। মৃত্যু আগে পর্যন্ত শুধু কেন? মৃত্যুর পরেও তোমারি অনুগামিনী হব আমি। আমার চিতাভস্মের পাশে তোমার পদপাত হ'লেও অশরীরি আত্মা পুলকিত হয়ে উঠবে। তোমার পদক্ষেপের আশায় প্রহর গুনব মৃত্যু। পরপারেও [illegible] জীবনের সঙ্গে জড়িত, হে জীবনাধিক, আমার সমগ্র প্রেম গ্রহণ কর

—সতেরো—

বৈদেহীর স্বপ্নের জীবন আরম্ভ হয়েছে।

লাভ্‌লক্‌প্লেসের বাংলো-ধাঁচের বাড়ীতে বৈদেহী জামার ওপর ফুল তুলছিল সলমা-চুমকী দিয়ে। স্নানাহার হয়ে গেছে, খোলা চুল থেকে আবছা সৌরভ ভেসে আসছে বাতাসে। মুখে গুঞ্জরণ :—

"আমার মল্লিকা-বনে যখনি ধরেছে কলি,
আমি তোমারি লাগিয়া তখনি বন্ধু, বেঁধেছিনু অঞ্জলি"—

দরজার সামনে দাঁড়াল গাড়ী। খড়খড়ির অন্তরাল থেকে দেখল বৈদেহী

পরিমল এল। বাংলোধাঁচের বাড়ী হ'লেও দোতালায় দুখানি বৃহৎ ঘর ছিল। নীচের ঘরে পরিমল প্রবেশ করল। সেটাই শোবার ঘর গৃহকর্ত্তার।

দোতলার বড় ঘর প্রসন্নবাবু ল্যাজারাসের আসবাব দিয়ে সাজিয়েছিলেন কন্যা-জামাতার বসকেলির কেন্দ্র হিসাবে। জামাতা-জননীকে সমান মর্য্যাদা দেওয়া দরকার। তাই তাঁরও ঘর হ'য়েছিল পাশে—ল্যাজারাসের নয়, প্রবর্ত্তকের আসবাবে সাজানো। জীবনে পরিমল-জননী এত সমাদর কল্পনা করতে পারেননি। বৈবাহিকের বিবেচনায় মুগ্ধ হ'লেন তিনি- মনে মনে হাজার বার বৈদেহীকে আশীর্ব্বাদ করে প্রনামীর দুধে গরদ পরে গৃহ প্রবেশ করলেন মাতা।

নীচের দু'খানি ঘর প্রসন্নবাবু সাজিয়েছিলেন দু ভাবে। পুরুষোচিত আসবাবে ভর্ত্তি পরিমলের বসবার, শোবার ঘর। আয়না, গালিচা, কুশন-মোড়া বৈদেহীর boudoir. আশা ছিল সন্ধ্যায় প্রেমাভিনয় এখানেই হ'বে। ষ্টাণ্ডার্ড ল্যাম্প জেলে ত্রিপদীতে চা-খাওয়া চলবে সোনালী ছিটেদেওয়া শাদা কাপে, রূপোর টিপটে। সমস্ত উপচার প্রস্তুত ছিল। স্নেহান্ধ বৃদ্ধ নিজের বঞ্চিত জীবনের অপূর্ণতা মেটাতে চেয়েছিলেন মেয়ের বিবাহিত জীবনে নিজের কামনার প্রতিফলনে। বুককেসে কবিতার বই পর্য্যন্ত সাজানো। পাশে লাগাও গানের ঘর। প্রকাণ্ড অর্গান একটি শুধু 'জাগে বৈদেহীর এ ঘরে' ওস্তাদী গানের কসরতের উদ্দেশে নয়, স্বামীর শ্রবণতৃপ্তির আশায়।

খোস্তা মাসী, নোড়ামামী ইত্যাদির কত্তাবা হা-হা হাসির সঙ্গে এর ওর গায়ে ধাক্কা-দেওয়া রসিকতার আবহাওয়ায় ফুলশয্যার মেয়েলী প্রথা সেরে নিল। অনূঢ়া ও হতাশ-বিবাহিতারা কন্দর্পকান্তি বরের অঙ্গস্পর্শের লোভ সম্বরণ করতে পারল না। দোষ কি? শ্যালার সম্পর্কে তো হাতাহাতি চলেই। সমবেত দাবীতে বৈদেহী কিন্নরকণ্ঠে নিজের বিয়ের গান, নিজেই করল—

"ওহে সুন্দর মম, গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি,
আমি রেখেছি কনকমন্দিরে কমলাসন পাতি", ইত্যাদি হ্যাকনিড্

বিবাহ-গাথা।

প্রসন্নবাবুর তাড়ায় অর্দ্ধরাত্রে নবযৌবনার দল বিদায় নিলেন। এতক্ষণের নির্ব্বাক পরিমল অবশেষে মুখ খুলল।

না, না পাঠিকা। আপনার উনি যে সব কথা ফুলশয্যার রাত্রে বলেছিলেন মোটেই সে ধরণের বাক্য পরিমল লাহিড়ী নববিবাহিতা ধর্ম্মপত্নীর প্রতি প্রয়োগ

করেনি। সে একটি লেকচার দিল ধর্ম্ম-অর্থ-মোক্ষকে কেন্দ্র করে কিন্তু কামকে সযত্নে বহিষ্কার করে। পাশের ঘরে মা, কিছু চলবে না। অতএব বৈদেহী, হিন্দুধর্ম্ম স্মরণ করে ধৈর্য্য ধর, সংযমের সাধনা কর। বিবাহিত জীবনের মত সংযমের ক্ষেত্র কোথায়? অতএব বৈদেহী, আমি নীচে যাচ্ছি। তুমি যার সঙ্গে বিবাহ হ'ল, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হও আগে। মনে মনে গুরুত্ব অনুধাবন কর। বিবাহের পূর্ণতা আগে হৃদয়ে ফুটে উঠুক। তারপর—।

তারপরে কি?

আসন্ন সঙ্কটকে কৌশলে ব্যাহত করে নিজের বিনিদ্র শয্যায় চিন্তা করল পরিমল। বিবাহের যে অন্য মানে আছে। শুধু মন্ত্রপাঠ, নূতন আসবাব কেনা নয়। দেহের নূতন অর্থ আবিষ্কার করা। পরিমল লাহিড়ী জানে তা কি প্রয়োজন নেই তার? কিন্তু, বৈদেহী তো চায়। নিশ্চয়ই চায়। লাল শাড়ীর আঁচলে সেই ইঙ্গিত লেখা রয়েছে, কঙ্কনের রিমঝিম বাজছে আহ্বান। সিঁথির উজ্জ্বল সিন্দুর রেখা, হাতের নবীন শঙ্খ এক কথাই বলে—এখন?

করুণা বৈদেহী, কিন্তু হায়, সে তো নামের মত বৈদেহী নয়। দেহ আছে এই বৈদেহীর। দেহের আছে পিপাসা।

স্বাভাবিক নিয়মে দাম্পত্য মিলনে দুই দেহ এক না হলে যে সকলের মাথায় টনক নড়বে, পৃথিবী অন্য ভাবে বাঁকা কৌতুক প্রশ্ন করবে। পরিহাসস্থানীয়ারা জিজ্ঞাসা করবে, "সন্দেহ হয়নি বুঝি?" প্রসন্নবাবুর প্রসন্ন মুখ অন্ধকার হয়ে যাবে আদরিণী কন্যার সৌভাগ্য ক্ষুণ্ণ হতে দেখে।

বিবাহ কি ক্রীড়া! এর পেছনে অপেক্ষা করছে সংসার বিলাপ। বিবাহের প্রকৃত অর্থ ভেবে দেখেনি পরিমল। জলে নেমে দেখছে সে সাঁতার না দিলে ডোবা অবশ্যম্ভাবী।

অসম্ভব! পারবে না সে, পারবে না। কল্যাভাগিনী করতে পারবে না বৈদেহীকে। দেহের তন্দ্রা বৈদেহীর ঘোচানো পরিমলের সম্ভাব্য কাজ নয়।

সরলা বৈদেহী পৃথক শয়নের ব্যবস্থা সাময়িক ভেবে নিশ্চিত ছিল। যে যেচে বিবাহ করে সে যে ভালবাসে না এ-তথ্য বৈদেহী জানে না। বিশেষতঃ প্রগাঢ় আস্থা ছিল পরিমলের কথায়, "আমি তোমাকে ভালবাসি।" বাস্তবিক; মাতার সম্মুখে বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দাম্পত্যলীলা কি শোভায়, না উচিত? তাছাড়া, শিক্ষিত, উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন পুরুষ বয়স্থা পত্নীকে মর্যাদা দেয়, সম্মান দেখায় তাকে

সম্ভ্রমমিশ্রিত দূরত্ব বজায় রেখে, সুযোগ দেয়, সহজভাবে অনাত্মীয় পুরুষকে জীবনে ঘনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করবার। ধীরে ধীরে পরিচয় হ'বে। অনাস্বাদিত দৈহিক প্রেম—যার স্বাদ পায়নি কখন, তার জন্য বৈদেহী ব্যাকুল হ'লনা। পরিমলের স্ত্রী সে, এই তার পক্ষে যথেষ্ট। এর বেশী চাইবার কি আছে?

অসময়ে পরিমল এসেছে। জানালা দিয়ে মুখ বা'র করেই দেখা গেল আলো-বাতাসের মত অনায়াসে পরিমল প্রবেশ করল, যে বাড়ীতে বৈদেহী আছে। এক ছাদের নীচে থাকা, সর্ব্বক্ষণ চেয়ে দেখা। অনিশ্চিত আবির্ভাবের আশায় পথ চাওয়া নয়, হাতের মধ্যে পাওয়া। রোজ পাওয়া, অন্নের মত, সংবাদপত্রের মত, বিদ্যুতের আলোর মত নিত্য স্বয়ংসিদ্ধ উপস্থিতির মত প্রিয়কে পাওয়া। তাই বুঝি ভালবাসার লোককে বিবাহ করা এত মধুর।

পূর্ব্বের কথা মনে হয়ে হাসি পেল বৈদেহীর। পরিমলকে পরিণয়ের বন্ধনে পাবার আশা ছিল না তার। ভেবেছিল, স্মৃতিপূজায় জীবনটা কাটিয়ে দেবে গান-বাজনা নিয়ে। বাবার এক সন্তান হ'লেও, বাবার অত্যন্ত প্রিয় থাকলেও সংসার করা এ জন্মের মত শিকেয় উঠল বৈদেহীর। পরিমলের আসনে আর কাউকে বসাতে পারা যাবে না।

আর সে? পরিমল জানবেও না বৈদেহীর নীরব পূজা, রূপহীনার রূপারতি। সুন্দরীকে বিবাহান্তে সুখে থাকবে সে। সন্তানসেবা দিন মালার মত কাটবে তার। দূর থেকে বৈদেহী তাকে লক্ষ্য করে যাবে। কাছেও যাবে মাঝে মাঝে পূর্ব্ব আলাপের সূত্র ধরে। মৃত্যুর সময়ে ডেকে নেবে বৈদেহী। আধুনিক মেয়ের প্রথায় নয়,—পায়ের ধুলো চেয়ে বিদায়। সমস্ত অর্থ দিয়ে যাবে পরিমলের হাতে তুলে। মনোরঞ্জনের চেষ্টায় ব্যগ্র হ'লেও আশা করতে পারে নি তো বৈদেহী

কিন্তু, সব পেয়ে গেল বৈদেহী। শুধু প্রেম নয়, পরিণয়। শুষ্ক পরিণয় নয়, প্রেম। আর কিছু না পেলেও চলবে তার কিছুদিন। কি আর চায় বৈদেহী? সহসা চোখে ভেসে এল চলচ্চিত্রের যুগল মূর্ত্তির যুক্ত ওষ্ঠাধর। না জানি কেমন লাগে? ওইটি চায় বৈদেহী। তবে, চিন্তা কি? রয়েছে সম্পদ, ভোগ করলেই হ'বে।

বৈদেহীর জামার হাতায় এখন আর ফুল তোলা হ'ল না। হাতে সূচের খোঁচা খেয়ে সূচীশিল্প গুছিয়ে উঠে পড়ল সে। ঘরে যেয়ে একটু দেখা যাক ওর কি চাই।

বসবার ঘরে যেয়ে চমকে দাঁড়াল বৈদেহী। দরজার আড়ালে সরে তাকিয়ে রইল সে পরিমলের প্রতি। কি হয়েছে ওর?

চামড়ার পোর্টফোলিও পাশে পড়ে রয়েছে। দুহাতে মুখ ঢেকে টেবিলের ওপর মাথা রেখেছে সে। অদম্য আবেগে সর্ব্ব শরীর যেন কম্পমান তার। সরলা হলেও বৈদেহী বুঝতে পারল এ কোন শারীরিক যন্ত্রণার বেদনা নয়। এ হচ্ছে পুরুষের ক্রন্দন, যা ব্যথা সয়ে সয়ে জমে পাষাণ হয়ে যায়, নারীর মত জল-ধারায় নিজেকে নিঃশেষিত করে দিয়ে বাঁচে না।

যেতে পারল না বৈদেহী ঘরে। কি বেদনায় তার স্বামী নির্জ্জনে এমন আকুল হয়ে পড়েছে জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হ'ল না তার।

বৈদেহী দাঁড়িয়ে রইল একপাটী দরজার আড়ালে নিশ্চল হয়ে। তার মন কথা কয়ে উঠল—সুন্দর, পেয়েছি তোমাকে লোকতঃ। কিন্তু, আরও পাবার আকাঙ্ক্ষা যে আমার বেড়েই চলেছে। আরও কাছে চাই তোমাকে, আরও, আরও! মনে এল বৈদেহীর এক লাইন গান—

"দাও, সাড়া দাও, কও, কথা কও,
বরষি অমিয় শ্রবণে"—

ইচ্ছা হ'তে লাগল বৈদেহীর দুহাতে-রাখা পরিমলের মুখ সে তুলে ধরে, যেমন করে লোকে অঞ্জলিতে পদ্মকলিকা ধরে। তারপর—না, আর কিছু নয়—কেবল দেখতে চায় সে কেমন করে প্রখর সূর্য্যের মত উজ্জ্বল সে রূপ মেঘে-ঢাকা চাঁদের মত করুণ হয়ে এসেছে। এ সৌন্দর্য্য যেন আকাশ, এক এক সময়ে এক এক রূপ তার। দুচোখ ভরে না দেখে কেমন করে বৈদেহী থাকবে? দেখার পিপাসা তার মিটছে না, যত দেখছে ততই আরও দেখতে চায় সে। বিবাহিত স্বামীর প্রেমে এমন করে কি কেউ ভোলে?

তীব্র প্রেম তীব্র, অতি তীব্র বেদনার মত! কেমন করে এত ভালবাসা বহন করবে সে? সেই মুহূর্ত্তে মনে হ'ল বৈদেহীর যে পরিমলের তুচ্ছ চরণাঙ্কুর তুলবার জন্য মরতে পারে সে।

কি হ'ল ওর? কোন বন্ধুবান্ধবের দুঃসংবাদ এসেছে কি? অথবা, কোন কারণে মন খারাপ হয়েছে? কিন্তু, এত মন খারাপ! কেন, কেন এ যন্ত্রণা প্রিয়ের!

সাহস হ'ল না কাছে যেয়ে জিজ্ঞাসা করতে। অন্তরের ভার অন্তরে বহন করে দাঁড়িয়ে রইল বৈদেহী।

পরিমল তাকে জীবনে গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু ধরা দেয়নি। এখনও বৈদেহীর রজনী নিঃসঙ্গ, মাঝে মাঝে পরিমল জননীর কাছেও শয়ন করে সে। এ ব্যবস্থা যেন মাতার ইচ্ছামত, দেখিয়েছে এইভাব পরিমল। বিশেষ কিছু মনে করেনি বৈদেহী। প্রাপ্তির আনন্দে মন তার পূর্ণ। প্রসন্নবাবুর সুপারিশে মোটা টাকা জমা দিয়ে একটা ভাল কাজ পেয়ে গেছে পরিমল সারাদিন খাটে কাজ নিয়ে বাইরে। সন্ধ্যার অনেক পরে বাড়ী ফেরে সে। বড় লোকের জামাই হবার পর থেকে পুরাতন বন্ধু ও ভুলে যাওয়া আত্মীয়ের দল আলাপ ঝালিয়ে নিয়েছেন। সারা দিন আনাগোনা লেগে আছে। পরিমল নানা কারণে ব্যস্ত, অবকাশ সময়ে নির্জনতার ভক্ত। পরিমল বৈদেহীর সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না সত্য, কিন্তু এটা বৈদেহী নববরসুলভ সঙ্কোচ ভিন্ন অন্য কিছুই বলে ধারণ করেনি। পরিমল তাকে বিবাহ করেছে এই আনন্দেই মরে যাচ্ছে সে

হঠাৎ মাথা তুলল পরিমল। নিঃশব্দ একাগ্র দৃষ্টির আঘাত গায়ে বিঁধ হচ্ছিল দরজার আড়ালে অবস্থিতা বৈদেহীর সঙ্গে তার বেশ স্পষ্ট চোখাচোখি হল

স্থির দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে পরিমল তাকিয়ে আছে। উজ্জ্বল তার চোখ অশ্রুতে ডুবে গেছে। কালো তারার ওপর চোখের জল যেন সাদা চোখকে তরল করে তুলেছে। মনে হচ্ছে, কোন বিজ্ঞাপন-খ্যাত কালীর বড়ির মত তার ভ্রমরকৃষ্ণ চোখের তারা এখনি গলে ঝরে পড়বে নরম জলধারায় বিন্দু বিন্দু করে

দেখতে দেখতে কঠোর হয়ে উঠল সে বিগলিত দৃষ্টি, মুখের কারুণ্য হল কঠিন। আকস্মিক তর্জনে পরিমল বলে উঠল, "এখানে তুমি কি করছ?

নিমেষে বৈদেহীর স্বর্গাভিলাষী চিত্ত ধূলার ধরণীতে লুটিয়ে পড়ল নীরবতাই পরিমল দিয়েছে তাকে এতদিন, সহসা-রূঢ়তার আভাস ছিল না পর্কে চকিত বিস্ময়ে বেদনাহতা বৈদেহী ইতস্তত থেমে থেমে বলল, "আমি এসেছিলাম যদি তোমার কিছু দরকার হয়। ততক্ষণে পরিমল আত্মসংবরণ করে নিয়েছে। লজ্জিত নরম সুরে সে বলল, "ঝি-চাকরের অভাব নেই। তুমি অযথা কেন কষ্ট কর?"

বৈদেহী কথা শেষ হবার আগেই চলে গেল। অনুতাপ-মিশ্রিত লজ্জা হল পরিমলের। হঠাৎ কেন এমন রূঢ় ব্যবহার করে ফেলল সে? হঠাৎ কেন বৈদেহীকে সহ্য করতে পারল না? আজ অফিসের আবহাওয়া সহ্য করতে পারেনি সে। যান্ত্রিক একঘেয়েমি অসহ্য লাগছিল। রুটীনে বাঁধা যন্ত্রের মত

বাঁধাধরা কাজ সে করতে পারবে না, পারবে না। পাগল হয়ে যাবে তা'হলে। মনের রুদ্ধ আবেগকে মুক্তি দিতে হ'বে। ব্যবসায়ে নামবে সে। এখন তো মূলধনের অভাব নেই। শ্বশুরের অর্থে শুধু হবে না—নিজের ত্র'হাতে সে অর্থ উপার্জ্জন করে মুঠো-মুঠো ছড়িয়ে দেবে কলিকাতার পথে পথে। দেখিয়ে দেবে সে পাষাণীকে—

আজ যে ওর জন্মদিন, আজ জন্মদিন আইভির। পরিমলের জীবনে একটি লালদাগে চিহ্নিত দিন। প্রতি বছর এই দিনটিতে একত্র থাকত তারা। মিসেস চক নানা আয়োজন করতেন। বরাবরই পরিমল লাহিড়ী উপস্থিত হ'ত, মিসেস চকের নিমন্ত্রিত নয়, আইভির অতিথি রূপে। মাতা কন্যার জন্মতিথির দিনে মেয়েকে তিরস্কার করতে পারতেন না। অন্যান্য অতিথিদের সম্মুখে বরাহুতকে কিছু বলতেন না বটে কিন্তু আইসক্রীম পরিমলকে দিতে ভুল হয়ে যেত। গত বছর সকালের দিকে সমবয়স্কাদের সঙ্গে বোটানিক্যাল গার্ডেনে 'টী পিকনিক' করতে গিয়েছিল আইভি। সন্ধ্যায় ডিনার ছিল, সুশোভন প্রভৃতিকে নেমতন্ন করা হয়েছিল। সেখানে সুশোভনের আসায় বিরাট ব্যাপার ঘটেছিল। ধার করা মুক্তোর মালা গলায় তুলেছিল আইভির। সকালে ঘরোয়া ব্যাপারের ব্যবস্থা একটু দরদর্শী মিসেস চক করেছিলেন। সেদিন আইভি পরিমলের কাছছাড়া হবে না জানতেন তিনি। তাই সকালে বাইরে যা করবার করে নিক —ডিনারে লোফারটাকে বাদ দিতেই হবে। সুশোভন সন্দীহান।

সেদিন পরিমল উপস্থিত ছিল বটগাছের নীচে। সঙ্গীদের ইচ্ছা করে হারিয়ে এসেছিল আইভি। সেখান থেকে এক ঝোপে প্রবেশ করেছিল। নবনী-কোমল বক্ষে স্থান দিয়েছিল পরিমলকে সেদিন আইভি। শুষ্কপত্রের মর্ম্মরে যৌবন-কামনার প্রতিধ্বনি, অপরাজিত-নীল আকাশে প্রেমের প্রতিশ্রুতি। ঝিলের দুষ্প্রাপ্য রক্তলিলির সমতুল্য অধর আইভির অবিরত চুম্বনে নীলোৎপল হয়ে উঠেছিল—অকালবোধনের নীলপদ্ম। অতসী-সুকুমার শরীর আইভির, প্রেমের পীড়নে রক্তজবা হয়ে ফুটেছিল শ্যামল তৃণের শয়নে। আইভি শুয়েছিল পরিমলের বক্ষের নীচে আবৃত হয়ে। সতৃষ্ণ-নয়নে দেখে যাচ্ছিল পরিমল—প্রিয়ার দেহ যেন পুষ্পপাত্র। এক এক অঙ্গে এক এক পুষ্প সজ্জিত প্রেম-দেবতার পূজার নিমিত্ত।

কাল চুলে অপরাজিতা-নীলমণির স্তবক দুলছে। ললাট শাদা পদ্ম, চোখ

দুটি উৎপল। গালে ফুটেছে বসোরা-গোলাপ। অধর কিংশুক। সর্ব্বদেহ পুষ্পকোমল, পুষ্পসুবাসিত! আঙ্গুলে চাঁপার কলি, পদপল্লবে স্থলপদ্ম। কণ্ঠ বেলকুঁড়ির তোড়া। বক্ষে দুইটি কদম্ব। চোলি জামার বোতাম খুলে ফেলেছিল পরিমল। আইভি প্রতিবাদ করে নি। মনসিজের পূজার অর্ঘ্য সাজানো আছে কিন্তু পুরোহিত চাই। আইভির দেহার্ঘ্যের পুরোহিত পরিমল।

শাদা দোলন-চাঁপার মত মসৃন-উজ্জ্বল বক্ষে পরিমল রেখেছিল একটি চুম্বন অতি সাবধানে, অতি সম্ভ্রমে। ভুলে গিয়েছিল ব্যবধান—অপূর্ণতার আশঙ্কা। আইভি অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে বলে উঠেছিল—

"Because the birth day of my life is come,
My love is come to me"

আইভির ঠোঁটের উপর ঠোঁট রেখে আইভির নিশ্বাসে নিশ্বাস নিতে নিতে পরিমল আবৃত্তি করেছিল অক্ষম বাংলায়—

জন্মদিন এ জীবনে সমাগত হ'ল,
যে আমার ভালবাসা, সে যে কাছে এল।

"উঃ, ছাড়, ছাড় লাগছে। কি ভাবী তুমি, পরি!" নিমিষে স্বপ্ন কেটে গেল। দংশিত অধর মুক্ত করে নিয়ে পরিমলকে বক্ষের উপর থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে শিথিলবাসা আইভি উঠে বসল। দেহ প্রেমের পীড়নে লাল-কাল হয়ে উঠেছে স্থানে স্থানে, দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে। অধরে, গায়ে হাত বুলিয়ে, চুল ঠিক করে জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে অতুল গ্রীবা বক্র করে চাইল আইভি, "বাপরে, মেরে ফেলেছ আমাকে!"

দাঁতে দাঁত রেখে চাপাগলায় বলেছিল পরিমল, "সত্যি একদিন মেরে ফেলব তোমাকে।"

লঘু বাতাসের মত শুষ্ক পত্রশয্যা থেকে লাফিয়ে উঠেছিল আইভি, ঘাসের ওপরে খুলে-রাখা জুতো পা দিয়ে পরতে পরতে বলেছিল, "Othello's occupation gone? তা, এ ডেসডিমোনা তোমাকে তার আগেই শেষ করে তবে মরবে। ওঠো, ঘড়িতে বারোটা বেজে গেছে ক্ষিধে পেয়েছে।"

"তুমি যাও আইভি, ওদের কাছে। আমি বাড়ী ফিরি।"

"ইস্, ক্ষিধে পায় নি? পাবে কি করে, এতক্ষণ ধরে যা খেলে, রাক্ষস!" মাথা নীচু করে তৃণশয্যায় আধশোয়া হয়ে বসে রইল পরিমল, আইভির কঙ্কনের

খোঁচায় তার সাদা আদ্দির পাঞ্জাবী অনেকটা ছিঁড়ে গেছে তাই দেখছিল। এলোমেলো চুলের রাশায় গঙ্গার বাতাস খেলা করছে। অবসাদশ্রান্ত দেহ।

"আমি যাবো না, আইভি। এই স্টীমার ধরে ওপারে যাচ্ছি আমি।"

"কেন?"

"ঘরেও নহে পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে, সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তায়?"

আইভি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পরিমলের ওপর। "ঘরে তুমি আসনি, না? মিথ্যাবাদী!"

আইভিকে বুকে জড়িয়ে [illegible] আবার শুয়ে পড়ল পরিমল। এবারে পরিমল নীচে, আইভি ওপরে।

"সোনা! আজ এ কথা বলছ, আজ এত কাছে এসেছ। কালই যে অন্যরূপ দেখব তোমার, আইভি। আর যে [illegible] পারি না।"

পরিমলের মুখে-চোখে অজস্র চুম্বনবর্ষণ করতে করতে আইভি বলেছিল, "আজ যে আমার জন্মদিন, পরি। আজ আমি তোমার ছাড়া কারুর নয়। প্রত্যেক বছর এই দিনে [illegible] তুমি [illegible] আমাকে ফেরাবে।"

আজ সেই দিন। বিকেলে চৌধুরী দিনের পাগল মতন করে ক্যালেণ্ডারে খুঁজে দেখে, সেই দিন। আইভি আহ্বান দিয়েছিল। সে যাবে কেমন করে? কোথায় আইভি আজ? আর, সে কোথায়? হায়, হায়! কি করেছে পরিমল? না, ঠিক হয়েছে। তবু, আজ পাগল হয়ে যেতে ইচ্ছা করে। অসহ্য লাগে জীবনের বাঁধাবাঁধি। আজ এমন অসহ্য লাগে বৈদেহীকে। পরিমল তো মানুষ।

নিজের ঘরে এসে মেঝের ওপর বৈদেহী লুটিয়ে পড়ল। সে পরিমলকে অপ্রসন্ন করেছে, পরিমল তাকে তিরস্কার করেছে। কেন সে গিয়েছিল কি দরকার পরিমলের আছে জানতে? চলে সে তো আসতই, আসতেই যাচ্ছিল, কিন্তু পরিমলকে আড়াল থেকে দেখবার লোভ ছাড়তে পারে নি। তাই তো বৈদেহীর নির্লজ্জ চৌর্য্যবৃত্তি এমন করে পুরস্কৃত হল।" 'তুমি এখানে কি করছ?' মনে মনে বৈদেহী পরিমলের কথাগুলো ভেবে দেখল, সে কঠিন দৃষ্টির কথা স্মরণ করে নিভৃতে

কাঁদতে বসল। কিন্তু, কেন? পরিমল তো কোনদিন তাকে রূঢ় কথা বলেনি। সে যে বলতে পারে জানত না বৈদেহী। একটি মাত্র কথা—পরের কথায় অনুতাপ-মিশ্রিত কোমলতা, তবু বৈদেহী যেন কথাটার ভার সহ্য করতে পারছিল না। পরিমল তার সঙ্গে এমন করে কথা বলবে, বলতে পারে? যার একটু বিরক্তি বৈদেহীর মৃত্যু, তার তিরস্কার? বৈদেহী এ ব্যথা রাখবে কোথায়?

কেন এমন করল ও? কিসে বৈদেহীর অপরাধ হয়েছে? আর ও অমন করছিল কেন? চোখে জল? ওঃ! কেন, কেন? বলুক না বৈদেহীকে, প্রাণ দিয়ে আপনার ওর ব্যথা মুছিয়ে দেবে সে। এত বেদনার কারণ কি? অফিসে কেউ কিছু বলেছে? অসম্ভব। প্রসন্নবাবুর জামাইকে কিছু বলা সেখানে কারুর সাধ্য নেই। বাবা ওকে কিছু বলেছেন নাকি? কি অন্যায়! কিন্তু, না। জামাইকে খুসী রাখতে বাবা সব পারেন, বাবা এত করছেন! বাবা কখনও কিছু বলতে পারবেন না। অন্যায় দেখলেও না, বিরক্তিবোধ করলেও না। তবে কেন ও এমন করছে? কে ব্যথা দিল? সম্ভব-অসম্ভবের চিন্তায় বৈদেহী তন্ময় হয়ে গেল পরলোকগত পিতাকে হয়তো স্মরণ করছে অথবা বিগত কোন বন্ধুকে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। অবচেতন মন সাড়া দিয়ে উঠল। এমন কোন বন্ধুকে স্মরণ করে বিহ্বল হয়েছে ও, সে বন্ধু আজ ওর জীবনে নেই। তবু, বৈদেহীকে কি করে রূঢ় বাক্য বলল পরিমল? আবার চোখে জল এল বৈদেহীর।

সংসারের কাজে যে মনোযোগ ব্যয় হচ্ছিল পরিমলের মায়ের, এখন সেটা ব্যয় হচ্ছে পুণ্যকর্ম্মে। বিধবাদের স্বভাব, একটা কোন দিক চাই, যেদিকে তাঁদের বঞ্চিত ব্যথিত জীবনের সমস্ত উৎসাহ, আশা ও আনন্দকে পরিচালিত করা যেতে পারে। মনের মরণ ঘটে তাঁদের বহুদিন। স্বাভাবিক অবস্থায় হৃদয়ের যে তাপটা অন্যদিকে সঞ্চারিত হয়, স্বামীর প্রেমের মধ্য দিয়ে, সন্তান-পালনের মধ্য দিয়ে মনের যে বৃত্তিগুলো নিরন্তর তৃপ্ত হ'তে থাকে, সেগুলো তৃপ্ত হ'তে পারে না ব্রহ্মচারিণীর একক জীবনে। আমরা আজকাল মনঃসমীক্ষণের কৃপায় সব জেনে ফেলেছি কিনা। তাই আমরা দেখতে পাই মনের কোমল নিগৃহীত বৃত্তির বিকৃতরূপ আনাচে-কানাচে। আমাদের বিধবারা অতিধর্ম্মকর্ম্মে, শুচি-

অশুচিব বিচাবে, এবং লোকনিন্দার গেজেটস্বরূপে বিকৃত হয়ে ওঠেন। চিরকুমারী হয়ে ওঠেন সভা-পবায়ণা, অকতদাব খিটখিটে।

দক্ষিণেশ্বরে কি একটা উৎসব দেখে ফিরছেন মা বেলা তিনটেব সময়। হাতে তাব মা-কালীব প্রসাদী সিঁদুব, কাটা ফলমূলেব মধ্যে চিনিব বরফী। বৈদেহীর ঘবে আগেই প্রবেশ কবলেন, বৈদেহীব সঙ্গে দেখা কবে তাকে সিঁদুব ও প্রসাদ দিয়ে নিজেব ঘবে দোতালায় উঠবেন।

প্রথমেই চোখে পড়ল তাব বৈদেহীব অবলুণ্ঠিতা মূর্ত্তি। ত্রস্তপদে অগ্রসর হয়ে এলেন মা, মুখ নীচু কবে দেখলেন বৈদেহী ক্রন্দন কবছে।

প্রসাদগুলো [illegible] ঠেকিয়ে নামিয়ে বেখে মা বসলেন বৈদেহীব শিয়বে। "[illegible], বৈদেহী। [illegible] বেলা তিনটে বাজে।"

[illegible] উঠে [illegible] বৈদেহী, এলোমেলো চুলগুলো গুছিয়ে শাড়ীব আঁচলে মুখের [illegible] বিস্ময়ে বলল, "কখন আপনি এলেন, মা? এত [illegible]?"

[illegible] বেশীক্ষণ থাকা যায় না। চবণের মা'কে [illegible] একটু থেমে মা বল্লেন, "এখনও [illegible] চাবটেব মধ্যেই ফিবে আসবে।"

[illegible] বাইবেব দিকে চেয়ে বৈদেহী বলল।

[illegible] কাঁদছিলে কেন, মা?"

[illegible] বৈদেহীব চোখে জল এল। মাথা নীচু করে কাঠের [illegible] বৈদেহী।

[illegible] বুদ্ধিমতী মা ব্যাপাবটা বুঝে নিলেন। ছেলের তাঁর মন [illegible] সাইভি ছাড়া কাউকে বিয়ে কববে না বলেছিল। আবাব [illegible] এক হতকুশ্রীকে। আবাব তাব সঙ্গেই এমন ব্যবহাব কবছে।

[illegible] বুঝে উঠতে পারছিলেন না। হয়তো এই ব্যবস্থা সুবিধাব জন্য। নিশীথেব অন্তবালে, তাব চোখে সুপ্তি নামলে, পুত্র ও পুত্রবধূ মিলিত হয় নিত্য গোপনে। বয়স্ক ছেলে, বয়স্কা বধূ। কিশোর-কিশোরীর উদ্দাম প্রেমলীলা ওদেব কাছে আশা কবা চলে না। ছেলে চিরদিনই গম্ভীব, মায়ের সঙ্গে অন্য মায়েব ছেলেব মত কখনই গল্পগাছা করত না। মনেব কথা কাউকেও সে

কখন খুলে বলেনি। অন্তরঙ্গ কোন বান্ধব তার মা দেখেননি কখন। কুমার পুত্রের যে কৌমার্য্য অক্ষুণ্ণ নেই, এ কথা মা জানতেন ভাল করে। তার রূপের পেছনে ধাবমানা বহু তরুণীর পক্ষচ্ছেদ হয়েছে, দেখেছেন তিনি নিজের চোখে। অনেক লঘু প্রেমলীলার ইতিহাস পড়তে পেরেছেন মাতা অন্তর মুহূর্ত্তে। তবে, বাড়ীর বাইরেই লীলাখেলা চলত পুত্রের, কাকে সে ভালবাসে, কাকে বাসে না তা তিনি জানতেন না। তবু, আইভি যে গড্ডালিকা-প্রবাহের অন্তর্গত নয়—স্বতন্ত্র পুত্রের জীবনে, মা জানতেন।

অত বাছ-বাছা মেয়েদের সঙ্গে মিশবার পরে এমনটিতে রুচি হ'ল কেন? কে বলতে পারে পুরুষের মনের খবর? টাক-সহায় বড় কথা। সারাজীবন কষ্ট পেয়ে এখন সম্পদে লোভ স্বাভাবিক। আর বৈদেহীর গানের আকর্ষণ কম নয়, স্বভাবটিও মিষ্ট।

ভালই হয়েছে। একটি আপাতদৃষ্টিতে উদ্ধত ... পরিবারের এমন নরম স্বভাবের মেয়েকে ছেলে ভাগ্যি বিয়ে করেছে। এত বড় লোকের মেয়ে, বাবা এত দিয়েছেন, বলতে গেলে বউ-এর টাকাতেই সংসার চলছে এখন, তবু অহঙ্কারের লেশ নেই। বেচারা রূপে খাটো, তাই সে মাটিতে মিশিয়ে আছে। ঝি চাকরকে পর্য্যন্ত বড় করে কথাটি বলে না। শাশুড়ী যা বলছেন শুনছে সানন্দে আর স্বামীর জন্য প্রাণ তো দিতে পারে। পরিমল তাকে বিয়ে করেছে, এতেই কৃতজ্ঞ সে! রূপের দৈন্যে মরমে মরে থাকে। বড় ভাল মেয়ে। ও হতো আজ মায়ের সংসারে প্রকাণ্ড জায়গা। নইলে, ছেলে যেমন ছিল তেমনি একপাশে, রূপসী ছেলের বউ কি করত কে জানে? জীবনে এত সম্মান তো কেউ পরিমল-জননীকে দেয়নি। তার ছেলেবেলায় এত ঐশ্বর্য্য কেউ দেখায়নি। ভালোই হয়েছে।

তথাপি বৈদেহীর মুখে চোখ পড়লে বুকের মধ্যে ছ্যাং করে ওঠে। হায় ভগবান, মানানো তো চাই। কার পাশে কে? একটিমাত্র সন্তান ওই ছেলে, রূপে কন্দর্প। তার পাশে এই বউ! কি হবে? সম্পদের পরিবর্ত্তে এটুকু ত্যাগ স্বীকার্য্য।

ছেলে বউকে ভালবাসে না, পরিমলের মা বুঝতে পেরেছিলেন। তবে ক'টা বিয়ে হয় ভালবাসার? এ ওকে সহ্য করে চলতে পারলেই হ'ল। ভালবাসা কেমন একদিন দেখেছিলেন তিনি। সেই একটিমাত্র দিন আইভি তাঁদের বাড়ী

এসেছিল। হাজার বাতির ঝাড় জ্বলে উঠেছিল পরিমলের রূপের পিছনে। তার আলো আইভির সর্ব্ব অঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছিল। পিচ্ছিল পেলবতায় নয়নের আলো প্রেমিকের প্রেমিকার পদতলে, মাথার চূড়ায় খেলা করে যাচ্ছিল। সমগ্র সত্তা পরিমলের আইভির কথার উপর ভর করে কম্পিত হচ্ছিল। আইভির হাতে জীবন-মরণ তার। সেই অপরূপার তুচ্ছ কনিষ্ঠা অঙ্গুলিটির ভঙ্গি পর্য্যন্ত পুত্র আকণ্ঠ পান করছে। মায়ের চোখ নীচু হয়ে এসেছিল আপনা থেকে প্রেম ও কামনার এমন অকপট প্রকাশ সন্তানের মুখে দেখে। আইভির চা-তৈরীর ছুতোয় তিনি রান্নাঘরে চলে গিয়েছিলেন।

সেই ভালবাসা [illegible] আজ? ভ্রাতৃগৃহে দুর্গাপূজার স্মৃতি মনে পড়ল মায়ের। দশমীর পরের দিন মণ্ডপের পাশ দিয়ে চলতে চমকে উঠেছিলেন তিনি প্রথমবারের পূজোয় [illegible] সারা মণ্ডপে নিরানন্দ বিকৃত, ঝাড় লণ্ঠন খুলে নেওয়া হয়েছে, অর্চনা-হীন [illegible] অন্তর্হিত। সামিয়ানা নেই, বাতার বাঁশ আছে শুধু। ছবিখানা [illegible] মনে ছিল [illegible] নববিবাহিত পুত্রের মুখে অতীত স্মৃতির ছায়া দেখে মা বিস্মিত ভীত হলেন।

[illegible] না থাকলেও স্বস্তি [illegible]। [illegible], স্বপ্ন না মিললেও শান্তি চাই। নইলে গার্হস্থ্য জীবন [illegible] ভেঙে পড়বে। প্রসন্নবাবু পরিমলের ঘরে ছোট [illegible] প্রায় বিবাহের সাজসরঞ্জাম দেখে বিস্মিত হননি। ভেবেছিলেন পূর্ব্ব স্মৃতি [illegible] সোনার মূল্য। বিবাহ ঘরে অনেক জায়গা, তাই রেখেছে জামাতা। অনেক সময়ে শোওয়া বসা যায়। দোতালার ঘরে যেমন খাটে [illegible] তেমনি [illegible] থাকত, যেমন [illegible] লেগে থাকত [illegible]। প্রসন্নবাবুর সন্দেহের অবকাশ হয়নি।

আজকের [illegible] ভবিষ্যতের সূচনা মাত্র, বুঝলেন মাতা। অবহেলা করা চলে [illegible] পৃথক শয়নকে অবহেলা করে চলেছে। প্রসন্নবাবুর প্রসন্নতা বজায় রাখতে ছেলেকে শাসন করা প্রয়োজন।

মা বৈদেহীকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রসাধনে পাঠালেন। তারপরে দ্বিধাকুণ্ঠিত পায়ে পায়ে ছেলের ঘরে প্রবেশ করলেন।

চেয়ারে বসে পরিমল কতকগুলো কাগজপত্র দেখবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। কুঞ্চিত-ভ্রূ মুখ তুলে চাইল।

প্রথমে মা সাধারণ মামুলী কথা দু'চারটে বললেন, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ভিড়,

গঙ্গার শোভা ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপরে আরম্ভ করলেন আসল বিষয়ের ভূমিকা—"যাই দেখিগে, বৈদেহী তোর জন্যে কড়াইসুঁটির কচুরী করছে, কতদূর হ'ল। হাত-পা পুড়িয়ে বসলই কিনা। কোন দিন অভ্যাস নেই তো এ সব করা। বড়লোকের মেয়ে! তা তুই খেতে ভালবাসিস দেখে গেছে তাড়াতাড়ি কচুরী ভাজতে।" সস্নেহে মা পুত্রের দিকে চেয়ে হাসলেন।

পরিমল কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, তার মুখ দেখা যায় না। ইতস্তত দ্বিধায় মা বল্লেন ভয়ে ভয়ে, "এবারে শোবার ব্যবস্থাটা তোর ওপরে করাই ঠিক। বৌমা মাঝে মাঝে আমার কাছেও শোয়। ভাল দেখায় না। ও-ওই-বা কি ভাবে?"

পরিমল মুখ তুলে গম্ভীরভাবে বলল, "ওকে যে আমি বিয়ে করেছি সেই ওর ভাগ্য।"

মা চমকে উঠলেন। সন্তানের নিষ্ঠুরতা, অমার্জ্জিত চাষামী মাঝে মাঝে বাহিরে আত্মপ্রকাশ করত, যদিও বাইরের উচ্চ পালিশের চাকচিক্য অধিকাংশ সময়ে আবৃত রাখত প্রকৃত সত্তা পরিমল লাহিড়ীর। তবে, আজ বিবাহের এত অল্পদিন পরে এমন কথা অমার্জ্জনীয় বলেই জ্ঞান হ'ল তার। অকৃতজ্ঞতারও সীমা আছে। বিয়ে করেছ তুমি তাকে, এ তার ভাগ্য বটে। কিন্তু, এই যে অট্টালিকা দাসদাসী নিয়ে রয়েছ তুমি, এই যে মোটরে চড়ে বেড়াচ্ছ, এসব কার জন্য? দু'দিন বাদে লক্ষলক্ষ টাকা তোমার হাতে আসবে, সেটা কার জন্য? এতদিন তো তুমি সেই একতলা বাসাবাড়ীতে বসে নিজের জুতো নিজে পরিষ্কার করতে, পয়সা বাঁচাতে নিজে আয়না দেখে চুল কাটতে, একটা জামা কিনতে দশবার ভাবতে! আজ একটি বড় কর্মস্থলে পদস্থ তুমি, মানুষের মত মানুষ তুমি, কার কৃপায়? তোমার রূপ দেখে তো আর কেউ ভোলেনি? আইভি তো ভাঙা বাড়ীতে পা-ধুতেও আসেনি। গরদের পাঞ্জাবী, গিলে ধুতি, রূপোর ভোজন-পাত্র, ব্যাঙ্কে হিসাব—সবই ওই কুরূপার উপহার! কোন সুন্দরী তোমাকে দিত না, দিতে আসেনি।

মনে হ'ল নিমেষের জন্য মা আত্মসংযম হারিয়ে ফেলবেন। তার এই অনিন্দ্য-সুন্দর, অকৃতজ্ঞ পুত্রকে কঠিন ভাষায় তিরস্কার করবেন। মানুষ হ'তে শিক্ষা দেবেন তাকে। শুধু নিতে নয়, দিতেও শেখাবেন। রূপহীনার কি হৃদয় নেই? সে কি শিক্ষিত, পূর্ণবয়স্ক মানুষ নয়? তার কাছ থেকে এত নিলে, দেবে না কিছুই?

আবার প্রৌঢ় বয়সের শীতল রক্তধারা অভ্যস্তগতিতে ধীরে প্রবাহিত হ'ল। প্রকাশ্যে মা কিছুই বলেন না অবশ্য।

একা ঘরে পরিমল জ্বলতে লাগল। মা এসেছেন পুত্রবধূর সুপারিশ করতে! মাকে দেখলেই আজকাল রাগ হয় পরিমলের। তাঁর প্রসন্ন মুখ দেখে গা জ্বালা করে। দিব্যি আছ? ভাল খাওয়া-পরা, গাড়ী চেপে অহোরাত্র বেড়ানো। ছেলের আত্মবিক্রয়ের মূল্য পেয়েছ ভাবী। আর কোন কর্ত্তব্য নেই ছেলের। কিন্তু, তোমার কর্ত্তব্য নেই? তোমার স্বামী সন্তানের দায় এড়িয়ে চোখ মুদল। 'ভিখারী।' হ্যাঁ, ভিখারী পরিমল লাহিড়ী আইডি ঠিক বলেছে, ঠিক। মামা একটি কপর্দক দিলেন না। তুমি কেন গর্ভে ধরলে তাকে ভূমিষ্ঠ হ'বার সঙ্গে সঙ্গে ভিখারিণীর সন্তান ভিখারীকে নুন খাইয়ে মেরে ফেললে না? সারাজীবনের হতাশা ক্ষণ তাহলে বহন করতে হত না। মা হয়ে ছেলের বিয়েতে আনন্দ করছ তুমি' বৈদেহীর তরফদারী করছ তুমি ছেলের দিকে না চেয়ে' নির্লজ্জা পেয়েছে নাম, চায় দেহ, চাইবে মন। তার দুই শত্রু একত্রে তাকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে নিজের মা আর ওই বৈদেহী। মা, পক্ষ নিয়েছেন বৈদেহীর কেন? নিশ্চয় বৈদেহী হাত করেছে মাকে। অসুখী মনে পরপর নানা ভাবের দ্বন্দ্ব ধরে একটি ভাব ফুটে উঠল পরিমলের সূচের মত সূক্ষ্ম কিন্তু সূচের মত সুদীর্ঘ একটি বিদ্বেষের রেখা বিবাহিতা পত্নীর প্রতি।

আঠারো

অবলুণ্ঠিত জ্যোৎস্না গাছের ফাঁক দিয়ে দিয়ে এসে পড়েছে তৃণের শয্যায়—শ্যাম সুকোমল বিছানায়। আলিনে লতার বালিশে হেলান দিয়ে চঞ্চল চাঁদের কিরণ ঘুমন্ত

শকুন্তলাদের লনে সন্ধ্যাশেষের পা[illegible]লেখার ছায়া। একদল তরুণ-তরুণী মাধবীকুঞ্জের চারপাশে কানামাছি খেলা করছে। সৌখিন সিল্কের ফুলতোলা রুমালে কানামাছির চোখ ঢেকে সোনার ব্রুচে আটকানো। দোদুল্যমান তরুণীর বেণী কবরী-বন্ধনে শাসিত, ধরা পড়ার ভয়ে। দু'হাত ছড়িয়ে অন্ধ কানামাছি

খুঁজে বেড়াচ্ছে কাকে চোর করা যাবে, কে ধরা পড়বে। দূর থেকে গায়ক মানসমোহন অত্যন্ত মধুর কণ্ঠে গান গেয়ে উঠল :—

"মৌমাছিদের সাথে সাথে গান গাওয়া মো'র হবে সফল
ফাগুন সন্ধ্যায়,
গন্ধ বহে অন্ধকারে রজনীগন্ধায়"—

কানামাছি একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে গেল। সে গান বড় ভালবাসে। চীৎকার স্বরে শকুন্তলা বলে উঠল, "বা পরিমল দাঁড়াচ্ছ যে ?"

পরিমলের একতলার ঘরে সেইরকম জ্যোৎস্না ফিরে এসেছে আজ। অনেক দিনের ভোলা, অনেক দিনের হারানো কথা ফিরে আসছে সঙ্গে সঙ্গে। আনন্দের দিন সেগুলো। প্রকৃতপক্ষে জীবনে সেগুলোই আনন্দের দিন। ভালবাসার আগে লঘু প্রজাপতির মত হাল্কা কয়েকটি নির্বিরোধী দিন। কোথাও বিরোধ নেই, অশান্তি নেই। প্রেম জীবনে আসবার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল বেদনা, এসেছিল নৈরাশ্য।

হাস্নু,-হানার উতলা গন্ধ সহসাগত সমীরণে ভেসে আসছে। এ-সুবাস যেন পুরাতন, বহুদিন আগের মনের দ্বারে আঘাত করে। কত কি কথা মনে পড়ে - আধভোলা স্মৃতি সব এই ফুলের গন্ধে ফুলের গন্ধের মত মনে ভেসে আসে। সব তো মনে পড়ছে না ? জড়িয়ে গেছে সমস্ত কাহিনী তন্বীর চুলের বেণীর মত। কিছুই মনে পড়ে না, অথচ সবই আছে মনে, ভাবতে পারছি না, ছুঁতে পারছি না, মনের এও এক অবস্থা।

শকুন্তলা লম্বা-ছিপছিপে মেয়েটি, শ্যামল রং, চোখেমুখে অহেতুক দীপ্তি। তার চকিত হরিণ নয়ন মাঝে মাঝে কিসের আলোয় জ্বলে উঠত পরিমলের দিকে চেয়ে ? তার কাকার বন্ধু ছিল পরিমল পাঁচবছর আগে।

শকুন্তলা গিয়েছিল দার্জ্জিলিং কনভেন্ট-এ পড়তে,তার স্বাস্থ্য কলিকাতায় টিকছিল না। যাবার আগে সে গোপনে বলেছিল, "তোমাকে না দেখে কেমন করে থাকব ?"

তাকে বলা নিজের কথাগুলো পরিমল যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে, "সেটা উভয়তঃ, শকু।"

কি চমৎকার করে সর্ব্বাঙ্গে শাড়ীটা জড়িয়ে নিত চম্পা! বেহালার হাতটি কি মিষ্ট ছিল তার! ছায়াছবির মত একটা করে দিন ভেসে আসছে পরিমলের মনে।

দোতালায় লম্বা ঘর, সতরঞ্চে বসে বাজাচ্ছে চম্পা। নিটোল দেহ শাড়ীর বাঁধনে ঢাকা পড়েনি সম্পূর্ণ। ইমন বাজাতে বাজাতে নিজের মনে ঈষৎ হাসছিল সে। হঠাৎ ইমন ছেড়ে ধরল সস্তা বিদেশী "T' is the last Rose of Summer, left blooming alone", পরিমলের হাতে বন্দী হ'ল তার হাত ছড়সমেত – "কী বাজনা তোমার, চম্পা। সারাজীবন যদি শুনতে পেতাম!"

"আঃ ছাড়ুন না।" কে বলেছিল কবে এ কথা কপট রোষে? অতসী, না রত্না? কার শাড়ীর আঁচল ধরে পরিমল বলেছিল, "না, না তোমাকে ছাড়ব না।" কবিতা উদ্ধৃত করে যোগ দিয়েছিল, "চলিছে ছুটিয়া পলতকা হিয়া"—।

আজ প্রথম মনে হ'ল পরিমলের জীবনে সে অনেক পাপ করেছে, অনেক পাপ। কত উন্মেষোন্মুখ হৃদয় তার নির্মম আঘাতে শীতের কলিকার মত মলিন হয়ে গেছে। কত তরুণীর হৃদয়-বৃত্তি নিয়ে খেলা করেছে সে! প্রেমের ভান করেছে। নিয়েছে অনেক, দেয়নি কিছু। আজ এই অসহ্য যাতনা, এ কি তারই প্রতিফল? কে জানে কোথায় আছেন সর্ব্বনিয়ন্তা, যিনি সবেরি বিচার করেন? এ কি সত্যই নেমেসিস?

কাণে ভেসে এল দূরাগত গানের করুণ মধুর ধ্বনি –

"গানগুলি মোর কাঙালের মত তোমার দুয়ার পাশে,
বারবার যায় বৃথা অভিসারে, বেদনায় ফিরে আসে।"

রজনীর নির্জ্জন যামে অপ্রত্যাশিত ভাবে গান গাইছে বৈদেহী। অতি মৃদুস্বরে খালি গলায়। কিন্তু, পরিমলের ঘরের ওপর শয়নকক্ষ। সুতরাং, অনিবার্য্য ভাবে শোনা যাচ্ছে প্রত্যেকটি কথা।

অসামান্যতা ওই তো ওখানে। রজনীর নিভৃত যামে আলোর ফুল ঝরে পড়ছে অন্ধকারের বুকে। সকাতর আহ্বান বাতাসে ভেসে আসছে পরিমলের প্রতি, ডাকছে তাকে।

নেমেসিস? তাহ'লে, তাহ'লে? আবার ভুল করছে না পরিমল? একটি উন্মুখ হৃদয় বিকশিত তার প্রতি। সর্ব্বস্ব সমর্পন করেছে বৈদেহী। বৈদেহীর

অর্থে অর্থশালী পরিমল। তরুণ জীবন তরুণী পায়ে ঢেলে দিয়েছে ওর। বৈদেহী ভালবাসে, চায়। তাকে বঞ্চিত করা পরিমলের ধর্ম্ম হ'বে না। ভালবাসা-বঞ্চনার দুঃখ জানে সে।

উঠে দাঁড়াল পরিমল চঞ্চল হয়ে। বিনিদ্র যামিনী, গানের দূত আহ্বান পাঠাচ্ছে। নয় কেন? বিবাহিত নরের কর্ত্তব্য পালন করবে সে। সব সহজ হয়ে যাবে। নির্ব্বিবাদে বিবাহিত নরের দলে মিশে যাবে নার্সিসাস। সন্তান হ'বে তার বিবাহের স্বাক্ষর স্বরূপ। কুরূপা বৈদেহীর গুণ আছে, আছে প্রাণ। সে প্রাণে প্রেম আছে। বিবাহিতা পত্নীর দাবী মেটাতেই হ'বে। অনেক দিয়েছে বৈদেহী। সেও দেবে পরিবর্ত্তে তার দেহ, তার রূপ।

পরিমল নেটের গেঞ্জির উপর সাদা আদ্দির পাঞ্জাবী পরে ফেলল। ম্লান নীল আলো জ্বালিয়ে চুলে বুরুষ বুলিয়ে গেল। কন্ডীতে ঢেলে নিল পম্পিয়াই, কাণের পাশে দিল ভায়োলেট। কিভাবে সজ্জিত হ'তে হয় সুরত-সংগ্রামে, জানে পরিমল! অসংখ্য আরব্য রজনীর একমাত্র নায়ক সে। আর কি? বাঁধাধরা ছকে অনেক জানা, অনেক চেনা কাজ—জটীলতা নেই, ভুলবোঝা নেই। জীবশক্তির নির্দ্দেশে নারীদেহে প্রবেশ। আর প্রেম চেয়ে মলিন হ'বে না বৈদেহী, জাগরণ ক্লান্ত চক্ষে দয়িতের আসাপথে চেয়ে বিরহের সঙ্গীত-দূত পাঠাতে হ'বে না বৈদেহীকে। সংসার-সমাজ বজায় থাকবে পরিমল কর্ত্তব্য সম্পাদন করলে। অতি সোজা কাজ। দীপ-নির্ব্বাপিত কক্ষে বৈদেহীর ন্যক্কারজনক কুরূপ দেখা যাবে না। মনে পড়ে গেল পিরান্দেল্লোর গল্প—'A Call to Duty'—কোনমতে রাত্রি জেগে থাকলেই স্বামী স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনে তৎপর হ'ন নিসন্দেহে। ডাক্তারের বিধান অনুযায়ী ড্রাগ প্রস্তুত হ'ল স্বামীর রাত্রিজাগরণের নিদান নিয়ে। ফলে, বিমুখ স্বামী হ'লেন অনুকূল—অবৈধ সন্তানের বৈধতা স্থাপিত হ'ল রজনীর গভীর যামে অতি স্বাভাবিক স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যে দিয়ে। পিরান্দেল্লোর অদ্ভুত গল্পটির স্মৃতি মনে এল—অধরে বিষাদ হাসি দেখা দিল পরিমলের। আজ সে লু'গি-পিরান্দেল্লোর গল্পের নায়ক।

হো'ক কুরূপা, রমণীস্পর্শ-সম্ভাবনায় এই যে সারা দেহ তার আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠেছে। অগ্নিস্রোতে বাধা, দ্বিধা, সব ভেসে যাবে, আসবে চরম সাফল্য পুরুষ-জীবনের জৈবিকধর্ম্মে। নারী চাই, নারী চাই! দেহ চাই—মনের খোঁজে প্রয়োজন নেই। এই নিভৃত রাত্রে যুবতীর গৃহে—হোক কুরূপা, যৌবন তো আছে

—সগৌরবে মাথা উঁচু করে প্রবেশ করবে সে। বিজয়ী বীরের মত গ্রহণ করবে নারীকে। ত্রুটি মন্ত্র, আর দোষ থাকে না। যখন খুসী তখন যাও অনাত্মীয়ার শয়নকক্ষে।

বারান্দায় বেরিয়ে এল পরিমল। অস্পষ্ট চাঁদের আলো বারান্দা উজ্জ্বল করে তুলেছে। পেছনে, সামনে বাগান, একঝাড় গাছ যেন ফুলের। আসার পরে লক্ষ্য করেনি পরিমল। সেই ঝাড়ের উপর আলো পড়েছে—অস্পষ্ট মূর্ত্তি যেন দাঁড়িয়ে আছে।

এ কি চেনা গন্ধ! ফুলের ঝাড়ের গন্ধ সে কত স্মৃতি সাগরে অবগাহন করে এল, না? কি মনে পড়ে। ওকে? নিমেষে ফুলের ঝাড় নারীমূর্ত্তি হয়ে চোখের সম্মুখে এগিয়ে এল।

ও কে মেয়েটি? যার দেহে অদ্ভুত পুষ্পের তীব্র মধুর স্মৃতি? ও গলায়-হাতে হীরা পরত প্রায় প্রতিটি উৎসবে। লীলায়িত বামতনু ওর, অতনুর ধনুকের মত বক্র অধরোষ্ঠ।

ওঃ, আইভি, আইভি! আইভি, আইভি! ব্যাকুল আগ্রহে এগিয়ে এল পরিমল। ওইতো সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে এগিয়েই আসছে। কিন্তু, কই ও মুখে তো চিরদিনের মত লীলাহাস্য বিদ্রূপ ব্যঙ্গের সঙ্গে খেলা করছে না? ম্লান সে মুখ, ব্যথায় বিবর্ণ! সেই মুখের ছবি মনে আঁকা রয়েছে যখন লুটিয়ে পড়ে আইভি বলেছিল, “পরি, এ কি করলে?

“বড় ব্যথা দিয়েছি তোমায় বিশ্বাস কর, অনেক বেশী পেয়েছি নিজে।”

পরিমল শূন্যে হাত প্রসারিত করল। স্বপ্নের আইভি মিলিয়ে গেছে তার। গাছের কর্কশ খোঁচা লাগল হাতে মাত্র। হাস্নু হানার ঝোপ। ও, তাই, তাই। তাই বিভ্রম

আইভি, আইভি! কেন এমন করেছিলে? তোমাকে তো ভালবেসেছিলাম। তোমাকে অর্থের ঐশ্বর্য্য দিতে না পারলেও প্রেমের ঐশ্বর্য্য দিতে পারতাম। সে কি এতই সুলভ? ভালো তো বেসেছিল আমাকে, তবে কেন ফিরিয়ে দিলে?

নিদ্রাহীন রাত্রি বিষাক্ত-কণ্টকাকীর্ণ। প্রতিশোধ নিয়েছে সে। আরো চাই তবু। মন ভাঙতে হবে ওর, যে মন ভেঙেছে তার মন। দেখাতে হবে আইভিলতাকে পরিমল ভালবাসে নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে—পরম সুখে আছে পরিমল।

প্রিয়কে ব্যথা দেবার চিন্তা মনে এক অপরূপ অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। অতি তীব্র এ আনন্দ! সে ব্যথা পাবে আমি যেমন পাচ্ছি। আমার তাকে দুঃখ দেবার ক্ষমতা আছে।

ওঃ! পরিমল বারান্দায় রেলিং চেপে ধরল। বুঝি তার সঙ্গে শত্রুতা করেই এমন চাঁদ উঠেছে আকাশে! কী দরকার চাঁদ উঠবার? জ্যোৎস্না হ'বার? অমবস্যা কেন সারা আকাশ গ্রাস করছে না? প্রকৃতির সমস্ত মাদকতা, মাধুর্য্য লুপ্ত হয়ে ঝড়, অশনিপাত হ'লে পরিমল শান্তি পেত। মনের দুঃখ দ্বিগুণ হয়ে ওঠে চান্দ্রিকাতে। মনে পড়ে তার হাসি, তার কটাক্ষ।

না, হ'ল না। কর্ত্তব্যপালন হ'ল না। এ দেহ অষ্টভির। একবার সে গ্রহণ করেছে। লোলুপ রক্তিমাধরে পান করেছে অধরের মধু, নির্দ্দয়ভাবে উপভোগ করেছে যৌবন ও রূপ। সেই আষ্টভি সমর্পিত দেহ অপরকে দেওয়া চলে না!

দেবে না পরিমল। রূপকুমারীকে প্রীত করে এখন কুরূপার সম্পত্তি হওয় সম্ভব নয়। কুরূপার বিয়েই হ'ত না। বিবাহের মন্ত্র পড়ে ধন্য করে দিয়েছে তাকে পরিমল। আর কিছু দিতে পারবে না সে।

চাঁদের আলো, ফুলের গন্ধ ডেকে আনে পুরাতন স্মৃতি। মাবীর শয্যায় নয়, স্মৃতির শয্যায় চল, পরিমল।

> "Remind me not, remind me not,
>
> Of those beloved, those vanished hours
>
> When all my soul was given to thee.
>
> Hours that may never be forgot."

"ভাল করে শিকড়টা তুলে ফেল মালী, আবার ফের যেন গাছ না গজায়।"

নিজের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে পরিমল কর্মরত মালীকে উপদেশ দিচ্ছে। হাতে তার কবোষ্ণ কোকোর পেয়ালা। চা খাওয়া ছেড়েছে পরিমল, রাত্রে ঘুম হয় না বলে। দোতালায় জানালার পাশে ঠিক পরিমলের ওপরে দাঁড়িয়ে বৈদেহী রূপো-বাঁধানো সোনার কাজ করা চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়ে বাঁধছে। পাঁচমাস আগের বৈদেহীর সঙ্গে এ বৈদেহীর কিছু অসাদৃশ্য লক্ষ্য হয়। দেহ ঈষৎ স্থূল, গৃহিনীপদবাচ্যার ন্যায়। বর্ণ একটু ফিকে, বোধহয় দিনে ছয়বার সাবান-পর্ব্বে।

মুখে-চোখে বিবাহের অনতিপূর্ব্বে যে সামান্য সবসতা এসেছিল, এখন তা ঢাকা পড়েছে একটা বিষাদ-বিষণ্ণ ম্লান ছায়ায়।

বিস্মিত হয়ে ভাবছে বৈদেহী এমন সুন্দর ফুলের গাছটা হুকুম দিয়ে কাটাবার কি প্রয়োজন? হাস্নু-ও-হানার গন্ধে সারা বাড়ীটা উল্লসিত হয়ে উঠত প্রতি সন্ধ্যাবেলা। গন্ধকে এমন করে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্য কি থাকতে পারে তার স্বামীর?

কেমন করে জানবে কে এ কয়েকটা মাস কেন পরিমলের হাস্নু-ও-হানার গন্ধ অসহ হয়ে উঠেছিল? সেই রাত্রে সজাগ হয়ে উঠেছিল পরিমল এ বাড়ীতেও হাস্নু-ও-হানার অস্তিত্ব সম্পর্কে। তারপরে প্রতি নিদ্রাহীন রজনীতে হাস্নু-ও-হানার ঝোপ গন্ধদূত পাঠিয়ে দিত পরিমলের শয়নকক্ষে। সে গন্ধ তার মনে জাগাত তাকে, যা ভুলবার সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

এর একটা সুবাস হঠাৎ মনে কত স্মৃতি না জাগিয়ে তোলে। বিষাক্ত-তীব্র সব স্মৃতি, মধুর কোমল সব স্মৃতি। কেন মনে করছি কেউ বলতে পারে না, কিন্তু কোন ফুলের, কোন পুষ্পসারের গন্ধ হঠাৎ এক চমকে অসংখ্য ভোলা কথা মনে করিয়ে দেয়। মনের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ভীষণ আলোড়ন হয়। নিশ্চয়ই সেই সব কাহিনীর পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে প্রথম দিনেই জড়িয়ে ছিল এই বিশেষ গন্ধ, কিন্তু আমরা ক্রমে সে কথা বিস্মৃত হয়ে যাই, তাই মনে করি, কেন ভাবছি পুরাতন কাহিনী, এ সুবাসের সঙ্গে কিসের এর সম্পর্ক?

শৈল-শিখরের পরিচয়ের পর সেদিন থেকে পরিমলের জীবনের প্রথম প্রেম হেনা মঞ্জরীতে গাঁথা। সায়াহ্ন বাতাস মদির হয়ে উঠত ফুলের গন্ধে, রাশি রাশি হাস্নু-ও-হানা নিত্য ফুটে উঠত তাদের প্রেমের মত। আহা, সে ফুলকে সহ্য করা যায় কেমন করে!

"বৈদেহী, তোমার এখনও কাপড়ছাড়া হয়নি?" স্ত্রীর শয়নকক্ষের দ্বারে বিরসকণ্ঠে বলল পরিমল।

আবার প্রসাধনের দিন ফিরে এসেছে। শ্যাওলা বেনারসী পরিহিতা বৈদেহী বেরিয়ে এল। ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টিতে পরিমল চেয়ে দেখল তাকে। দিব্যি মোটা হয়েছে বিয়ের জল গায়ে পড়ে। একটু সরল আছে, নির্ব্বোধও বেশ। দিন তাই চলে যাচ্ছে পরিমলের।

"গাড়ীতে চল, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি।" ছাতখোলা গাড়ীতে উঠে বসল দুজনে পাশাপাশি। রত্নালঙ্কারভূষিতা বৈদেহী, সুসজ্জিত পরিমল। স্বামী-স্ত্রী বিকালবেলায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। সুখী দম্পতি। রাস্তায় বিগতযৌবনা চিরকুমারীর এদের দেখে বুকফাটা নিশ্বাস পড়বে, স্বামী-প্রেমবঞ্চিতা জানালা দিয়ে দেখে ঈর্ষ্যাকাতর হ'বে, দরিদ্রের মনে আসবে বিদ্বেষ। হাওয়ার গাড়ী হাওয়া হয়ে ছুটবে শহরের রাস্তা ধরে হঠাৎ-বড়লোক বালিগঞ্জে লেকের তীরে। লেক প্রদক্ষিণ করে বাড়ী ফিরে এল সুখী দম্পতি। কিছুদিন ধরে এমনি চলেছে।

গাড়ীর হুড ফেলে দিয়ে নিয়মিত স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে বেড়ানো চাই পরিমলের। নিত্য এই খেয়াল তার। তাহ'লে, মিলন হয়েছে?

কই, সারাদিনে তো বাক্যালাপও করতে দেখা যায় না। স্ত্রী সম্মুখে পড়ে গেলে অন্যদিকে চেয়ে থাকে স্বামী। একত্রে পানভোজনও করে না। পরিমল চলে যায় কার্য্যস্থলে, বৈদেহী থাকে পরিমল-জননীর কাছে।

তবে কি, রজনী উভয়কে এক করেছে, এনেছে মিলন জৈবিক জীবনে স্ত্রী-পুরুষের? হ'ক রূপহীনা, তরুণী তো। একই গৃহে মন্ত্রের অধিকারে ভোগ্যা। কয়জন পুরুষ পারে প্রতিরোধ করতে?

না, আর কখন তো পরিমল লাহিড়ী বারান্দায় বেরিয়ে আসেনি দোতালায় যাবে বলে। স্ত্রীকে ভোগ করবার প্রেরণায় বেশসংস্কার করেনি স্বামী। হাস্নু-হানার ঝাড় কেটে ফেলা হয়েছে, তাতে কি? স্মৃতি তো আছে। রয়েছে সারা জীবনে আইভির ছাপ। মুছে ওঠানো যাবে না।

যদি স্ত্রী রূপহীনা না হ'ত? আইভির ছায়ামূর্ত্তি যেন বিদ্রূপ করে, ভুলে কি যেতে না তুমি? ভুলে কি যেতে না একজনকে? গ্রহণ কি করতে না বাঞ্ছনীয়াকে?

প্রেমজীবন আমার মৃত হয়ে গেছে, পৌরুষ হয়েছে নিদ্রিত আকস্মিক আঘাতে। আমি তো আর কাউকে গ্রহণ করতে পারব না, হ'ক না সে নারী মোহিনী।

হা, হা, হা, হা। হেসে উঠল ছায়ামূর্ত্তি। পরিচিত ব্যঙ্গ হাস্যে জাগর প্রহর মুখর করে তুলল,—'Quiet Flows the Don'এর পুরুষের প্রমাদ নাকি? যুদ্ধের বিপৎপাতে আকস্মিক পুরুষত্বহীনতা। তা, কন্টিনেণ্টাল লেখকেরা ওই জিনিষটি বোঝেন ভাল, স্বীকার করতেই হয়।—

কি যে বল, আইভি?—চিরদিনের পরিহাসনিপুনাকে আনন্দিত তিরস্কার

করতে যেয়ে চমকে উঠেছিল পবিমল। শূন্য কক্ষে একা সে, তন্দ্রাব ঘোরে আইভি কথা বলছে। বাস্তবে কোথায় সে দুর্লভা? পাগল হয়ে যাব! পাগল হয়ে যাব! না, প্রেম বলে সত্যই নিদাৰুণ বস্তু আছে একটা। যা'ব কবলে অতি বড় শক্তিমানও মোহাতুব হয়ে পড়ে। প্রতিশোধ কোথায় নিতে পারল পবিমল লাহিড়ী? প্রতিশোধ নিচ্ছে আইভি চক্রবর্ত্তী প্রতিটি মুহূর্ত্তে।

তবে বৈদেহীকে নিয়ে সান্ধ্যভ্রমণেব অধ্যায়টি অহেতুক নাকি?

পবিমলের এ নূতন ব্যবস্থা, এ অভিনব খেয়াল বৈদেহী মাথা পেতে নিয়েছিল। এমনি মাথা পেতেই নিয়েছে সে তাব প্রেমাস্পদেব অবহেলা। সত্যই বিবাহ তাব ভাগ্য। সত্যই তো তাব ভাগ্য! পবিণয়েব দিন সহচবীদেব, আত্মীয়াদের ঈর্ষ্যামিশ্রিত সপ্রশংস দৃষ্টি মনে আছে বৈদেহীব। সাম্রাজ্যলাভেব গৌববে তারা পিতাপুত্রী উদ্ভাসিত হয়ে যে যেখানে আছে নিমন্ত্রণ কবে এনেছিল।

প্রথম প্রথম নিত্য এই বৈকালিক ভ্রমণ তাকে স্বর্গেব চাবিকাঠি এনে দিয়েছিল। আশাব আলোয় অন্ধকাব মন আলোকিত হয়ে উঠেছিল। এইবার বিমুখ প্রিয় সদয় হ'বে। ভ্রমণ এনে দেবে বৈদেহীব জীবনেব চবম প্রাপ্তি। কেন পবিমল তাব সঙ্গে কথা বলেনা, বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া? কি দোষ করেছে বৈদেহী, কি দোষে প্রিয় বিরূপ? নিজে যে বিবাহ কবল চরম সার্থকতা বৈদেহীর জীবনে এনে দিয়ে, সে কেন এমন দূবে সবে থাকে? কাকে বলবে মনের কথা? বাবাকে বলা চলেনা। পবিমলেব মা-তো নিজেব চোখে দেখেন নিত্য। তাবও কিছু কববাব নেই। বাইবেব আত্মীয়-বন্ধুবা কিছুই টেব পায়না। আপাতদৃষ্টিতে সুখী দম্পতি তাবা। কি কবা যায়। কি দোষ বৈদেহীব? তার কুরূপ দেখেই তো পবিমল নিয়েছে তাকে। তবে? এ বহস্যেব সমাধান কবে হ'বে? প্রতীক্ষা ছাড়া বৈদেহীব গতি নেই।

সেই প্রতীক্ষাব নিষ্কম্প-নিবন্ধ কাল মেঘ প্রত্যাশাব বায়ুবেগে কম্পমান আজ। একটু সবে গেছে মেঘেব প্রাচীর, আড়াল থেকে ভেসে আসছে দূবাগত চাঁদের ছোঁয়া। আবাব প্রসাধনে প্রিয়েব মনোরঞ্জনেব ইচ্ছা, আবার অধরে সুখের হাসি।

কিন্তু, অকারণ এ ভ্রমণের উদ্দেশ কি? নিস্তব্ধ হয়ে উদাসভাবে বসে থাকে পরিমল। বাড়ী ফিরে নিজের এলাকায় চলে যায় সে। দুজনের মধ্যে দুলতে থাকে নৈশব্দ্যের যবনিকা।

পথ চলে যায় গাড়ীর সামনে ফিতের মত। সে পথের শেষ নেই। নির্লিপ্ত দম্পতির সঙ্গে এ ভ্রমণে সুখ নেই। আবার হঠাৎ হয়তো সরে আসে পরিমল কাছে, সহসা কথা বলে। আবার সুদূর নির্লিপ্ততা।

জটিলতার মধ্য থেকে অনেক চিন্তার পর সহজ কয়েকটি তথ্য বেছে নিয়েছে বৈদেহী। গাড়ী রোজই একটা বিশেষ রাস্তা দিয়ে ঘুরে যায় মাঠের দিকে। সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথ দিয়ে চলে গাড়ী ধীর-মন্দ গতিতে। সহসা এক সময় পরিমলের সুদূর ভাব খসে পড়ে সাময়িকভাবে। সেই বিশেষ পথে এলেই পরিমলের পরিবর্ত্তন দেখা যায়। সন্নিকটে সরে আসে সে। প্রেমিকের মত পাশে বসে, মুখের ভাব অহেতুক প্রণয়োদীপ্ত হয়, পুষ্পধনুর শরাসনের মত অধরে ভালবাসার হাসি দেখা দেয়। বৈদেহীর মুখের কাছে মুখ সরে আসে, বৈদেহীর কণ্ঠের পশ্চাতে গাড়ীর গদির ওপর বাহু ন্যস্ত হয়। কিন্তু, এ প্রণয়-বিলাস ক্ষণস্থায়ী। তার পরেই সরে যায় পরিমল, গাড়ীর বিপরীত দিকে সংলগ্ন হয়ে বসে। অবসাদ আবেগকে বিদায় দেয়। এবং সেই বিশেষ রাস্তাটি ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সরে যায় প্রিয়।

কি এর কারণ? কেন, কাকে দেখিয়ে দেখিয়ে মুহূর্ত্তের জন্য সে বৈদেহীকে ভালবাসে? কয়েকদিন হ'ল এ কথা কেবলই বৈদেহীর মনে তোলপাড় করে ফিরছে। একটা বিশেষ বাড়ীও সে লক্ষ্য করেছে, যেখানে গাড়ী এলেই পরিমলের সারা সত্ত্বা যেন উন্মাদ হয়ে ওঠে। অজানিতে, তার দৃষ্টি কাকে খুঁজে বেড়ায়? দুইদিন হ'ল বাড়ীটির সম্পর্কে অবহিত হয়েছে বৈদেহী। এখন জানা চাই, সে বাড়ীর সঙ্গে পরিমলের এমন ব্যবহারের যোগসূত্র কোথায়।

গাড়ী প্রতিদিনকার শ্লথ গতিতে চলেছে সেই বিশেষ রাস্তা দিয়ে। ছাদখোলা, বৈদেহীর পাশে সুসজ্জিতবেশে বসে আছে পরিমল পেছনে হেলান দিয়ে। বাঁ-হাত অলসভাবে গাড়ীর আসনের ওপরে এলানো বৈদেহীর ঘাড়ের পশ্চাতে! দক্ষিণ হস্তে ধরা চুরোটের আগুন কখন দুরন্ত বাতাসে নিভে গেছে।

কি অপূর্ব্ব-সুন্দর এই মূর্ত্তি! এই নির্লিপ্ত ঔদাসিন্য, বিষন্ন অলসতা মর্ম্মর-প্রতিমূর্ত্তির মত সুন্দর আকৃতিকে কি কোমল করেছে! আকর্ণ-বিশ্রান্ত গভীর নয়নে সারা জীবনের ক্লান্তি সঞ্চিত হয়ে আছে, উন্নত-প্রশস্ত ললাটে অবসাদ, অধরে-ওষ্ঠে করুণ ম্লানিমা। ছয় মাস পূর্ব্বের সে যৌবনের প্রতীকস্বরূপ চপল পরিমল লাহিড়ী আজ কত পরিবর্ত্তিত!

সহসা সরে এল পরিমল নিবিড় হয়ে। মুহূর্ত্তে সমস্ত অলস অবসাদ জোর করে ঝেড়ে ফেলল। হাসিমুখ তার যেন পরম পরিতৃপ্তিতে বৈদেহীর প্রতি আনত হয়ে পড়ল।

চকিতে বৈদেহী চেয়ে দেখল উর্দ্ধে। একটা লাল গাড়ীবারান্দা থেকে কে যেন সরে গেল। শুভ্রবাহুর আন্দোলন তার দেখা গেল শুধু, আর রেশমের ঝলমল।

বৈদেহী তাকে ভাল করে দেখলেও চিনতে পারত না।

সে আইভি

—উনিশ—

কি বলব? আর কি বলব? এসব কি বলছি আমি? অবশেষে অতি সাধারণ একটি গল্প লিখে আমার সময় নষ্ট করছি, ব্যয় করছি কালি-কাগজ। এমন একটা গল্প বলতে বসেছি যে গল্পের কোন বিশেষত্ব নেই। সেই একঘেয়ে প্রেম-ভালবাসা, মান অভিমান বিবাহ স্বামী-স্ত্রী। অসুখী তিনটি প্রাণীর কাহিনী এমন তো ঘরে ঘরে দেখা যায় কি নূতনত্ব আছে এই কাহিনীতে?

কিন্তু, তুমি? তুমিও কি এক কথাই বলবে? ওইযে দেখতে পাচ্ছি বন্ধ ঘরে তীব্র চম্পা সৌরভে অলস বিরামে তুমি তুলে নিয়েছ আমার বই। তোমার কর্ম্মব্যস্ত দিনের একটি নিশ্চল প্রহর তুমি দিয়েছ আমার গল্পকে। অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা ভাল লেগেছে তোমার।

তুমি তো জান জীবনের এই গল্প, এই গল্প প্রতিটি ঘরের আনাচে-কানাচে ভেসে বেড়ায়। চলন্ত ট্রাম-বাসে চলতে যে সব ইলেক্ট্রিক-আলোজ্বালা-পাখাঘোরানো ঘরবাড়ী চকিতের জন্য দেখা যায়, তারা বুকে ধরে আছে এমনি সাধারণ গল্প। পাশের বাড়ীতে এমন গল্প লেখা হচ্ছে অলক্ষিতে, রাস্তার ওপারে বেজে উঠছে একই কথা। বাঙালী ঘরের আগমনীর মত পুরাতন, আগমনীর মত সুলভ এই বিরহ-মিলন কথা। আমি জানি মধ্যবিত্ত জীবনের একমাত্র গল্প এটাই।

প্রেম। একমাত্র ঐশ্বর্য্য মধ্যবিত্ত বাঙালী-ঘরে। যে গলিতে ব্যাঙের ছাতার মত জন্মায় তারা, সে গলি থেকেই একদা খট্টাঙ্গে বাহিত হয়ে যায় চলে। তিনটি ছকে গাঁথা জীবন—জন্ম -সন্তানোৎপাদন—মৃত্যু। এর মধ্যে জোর করে বিলাস আনে মানব-মন, যে মানব পরাজিত হয়েও জয়ী, সেই মানব পশুর জীবনে লিখে

যায় আপনায় অমর-কাহিনী প্রেমের-অক্ষরে। জোর করে ভালবাসে সে, জোর করে দেবতা হয়। তবু, উপসংহার লিখিত হয় তার ইচ্ছায় নয়, বিধাতার অমোঘ অভিপ্রায়ে।

এসনা, আজ লখুচন্দের গল্পটাই শোনাই। আমারও তো ক্লান্তি আছে। বুদ্ধি-প্রখর মনকে সামনে রেখে চমকপ্রদ বুদ্ধির খেলা আর তো পারছিনা। এ যুগে আমরা সবাই শ্রান্ত। যুগলক্ষণকে এড়িয়ে যাবার সাধ্য কি আমার? আমি কি সার্কাসে দড়ির খেলা দেখাতে এসেছি? আমার পায়ের নীচে পিচ্ছিল দড়ি, অপসৃতমান, অতি কৌশলে ভারসাম্য রেখে চলেছি আমি দর্শকজনের সম্মুখে। যত বিপজ্জনক তত করতালি। তাই বলি, একটু বিশ্রাম চাই, চাই অলস অবসর। বুদ্ধিপ্রখর নেত্রে স্বপ্নের ছায়া নেমেছে। ক্লান্ত স্বরে ঘরোয়া একটি মধুর গল্প বলি আজ। আমারও তো সহজ হ'তে ইচ্ছা করে।

গল্প আমার বহুদূর এগিয়ে গেছে। এমন অনেক ঘটনার কথা জান তুমি। শুধু উপসংহারটি শুনতে চাইছ। ভাবছ, এতো নিত্য-নৈমিত্তিক। এর শেষ তো আছে। বিস্মরণ। আচ্ছা, দেখা যাক।

সুখের জীবন বটে। একজন থাকে দোতালায়, একজন একতলায়। কদাচিৎ দেখা হ'লেও পরিমল সে দেখাকে স্মরণীয় করে তুলতে চায় না চোখের দৃষ্টি, মুখের হাসি দিয়ে।

কিছু দিন চলে গেছে। বৈকালিক ভ্রমণ বন্ধ হয়েছে। আর গাড়ী-বারান্দা-দেওয়া দোতালা বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে গাড়ী চালাবার দরকার করে না। কারণ, সে বাড়ী থেকে তার অধিবাসীরা কোথায় যেন চলে গেছেন দরজা-জানালা বন্ধ করে।

"Though my many faults defaced me,
Could no other arm be found,
Than the one, which once embraced me,
To inflict a cureless wound."

আমার সময় নেই, সময় নেই। অহোরাত্র ক্ষয় করে দেব অন্বেষনে। আমার

হৃদয়-বেগ ব্যয়িত হ'বে শ্বাসরোধকারী কর্ম্মপ্রাবল্যে। চাই, আমি চাই। অর্থ। আমার সময় অনেক। তাই কাজে সময় রাখতে চাই নিয়োজিত।

পরিমল মন দিয়েছে অর্থোপার্জ্জনে। অর্থ ই তো দূরে ঠেলে দিয়েছে জীবনের একমাত্র আরাধ্যাকে। সে অর্থ উপার্জ্জন করা চাই আপন বাহুবলে। শ্বশুরের টাকা কিছুদিন পরে করতলগত হ'বে, তবু তো অর্থোপার্জ্জন-স্পৃহা বেড়েই চলেছে। হৃদয়বৃত্তিকে যে কোনপথে চালান অত্যাবশ্যক। সহজাত প্রবৃত্তি, কোন বস্তুতে ঢেলে দেওয়ার উদ্যম ও উৎসাহের মূলে প্যাশন। অর্থ পরমার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিমল লাহিড়ীর।

শীর্ণ-শুষ্কদেহ বৈষ্ণব, নামাবলী গায়ে জড়ানো, কণ্ঠে তুলসীর মালা। সে কি শান্ত নির্লিপ্ত? দেবতাকে ভালবাসে, তাকে পেতে চায় নিজের কাছে একান্তে। যত উপবাস, যত কৃচ্ছ্রসাধন সবই পরিচালিত হয় অদম্য হৃদয়াবেগে। অর্থ পরিমলের দেবতা হয়েছে। নিঃসন্দেহে আইভির সমাজে মিশে গেছে সে। ম্যামনের উপাসনায় আত্মরতি তার। কিন্তু, বড় বিলম্বে।

একটি লাভজনক ব্যবসায়ের অংশীদার হয়েছে পরিমল অল্পদিনের মধ্যেই। প্রসন্নবাবুর সৌজন্যে মূলধন। দিনরাত্রি ব্যস্ত থাকে সে! বাড়ীতে থাকে না বেশীক্ষণ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ দাসীচাকর সন্ত্রস্ত। কি জানি কখন কার অন্ন উঠে এ বাড়ীতে কর্ত্তার মন বোঝা ভার। বৌ-গিন্নিমা মাটীর মানুষ, দিনরাত গান নিয়েই আছেন অবকাশ সময়ে সেলাই। প্রত্যহ পিত্রালয়ে যাওয়া চাই। দাসীচাকরের বা ঘরকন্নার কথায় থাকেন না।

বুড়ো-গিন্নীমা ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়ে পাগল। ভাঁড়ার-দেওয়া, কুটনো-বলা ফাঁকে ফাঁকে সারেন। গোল ওই কর্ত্তাকে নিয়ে। নবীন হলেও মেজাজে সাতাত্তর।

সেইদিন অহেতুক উড়ে বেয়ারা কাঙ্খির কাজ গেল। অপরাধের মধ্যে সে উচ্চকণ্ঠে হাসছিল। পরিমল ঘরে বসে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে কি যেন ধ্যান করছিল একাগ্র-চিত্তে। লোকটার হাসি হঠাৎ অসহ্য মনে হল। কি বিশ্রী! বিশ টাকার চাকরি করে যে, এত হাসবার কি অধিকার আছে? কি অভদ্রভাবে, বিরক্তিকর-ভাবে হাসছে লোকটা। ধ্যানসীমানায় রূক্ষ হাসির শব্দ সহসা চমক আনে। মাথার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত সজোরে গুণটানা ধনুকের মত ছিঁড়ে পড়তে চায়। মুখে রক্ত উঠে এল পরিমলের, অধরপ্রান্ত দংশন করে সে বাইরে বেড়িয়ে এল কাঙ্খিকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে।

কাঞ্চি ছিল পরিমলের নিজস্ব বেয়ারা। তার অনুপস্থিতিতে কাজের ভার বৈদেহী নিজে তুলে নিল সাগ্রহে। এমন সুযোগ পেয়ে সে ধন্য হয়ে গেল। সেবা করার প্রবৃত্তি সফল হ'ল তার।

প্রথমে উদাসীন ছিল পরিমল বিবাহিতা পত্নীর প্রতি। বৈদেহী থাকে না থাকে, তার সামনে আসে না আসে, তাতে কিছু এসে যেত না উদাসীন পরিমলের। সযত্নে এড়িয়ে চলত সে পত্নীকে। পত্নী এত দিয়েছে, বিনিময়ে সে দিচ্ছে না কিছু —সামান্য সূক্ষ্ম বিবেককে চাপা দিতে দিতে স্বল্পজীবী বিবেকের মৃত্যু হয়েছিল তবু ম্লানমূর্ত্তি বৈদেহী ঘুরত-ফিরত চারপাশে। দৃষ্টিতে প্রার্থনা সর্ব্বদা ফুটে থাকত, ব্যবহারে যাচ্ঞা। সে যে কি চায় মনের অবচেতনে বুঝত পরিমল। বুঝেও বুঝতে চাইত না।

তবু ম্লান ছায়া সরে না, নড়ে না দৃষ্টি আবর্তিত করে থাকে বৈদেহীর সকাতর দেহী রূপ —যেন প্রসারিত কর বিস্তার করে আছে সে পরিমলের প্রতি— চাইছে সে পূর্ণ অধিকার পত্নীত্বের রাত্রের নির্জ্জন কক্ষে বিনিদ্র শয্যায় চলে আসছে প্রার্থনা। চিরন্তনী নারী চিরন্তন পুরুষের কাছে চায় দাও সহধর্ম্মিণীকে। মন্ত্রের দাবী মিটিয়ে দাও, গ্রহণ কর উৎসব। স্বয়ংবরাকে

কত এড়িয়ে চলা যায়? ক্রমেই বৈদেহী বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগল অর্থের প্রয়োজন প্রায় শেষ পরিমল লাহিড়ী স্বোপার্জ্জনে ধনী বলে গণ্য হবে কলিকাতায়। সূচনা দেখা যাচ্ছে শ্বশুরের টাকায় প্রয়োজন নেই তবে। কিন্তু? তখন বাবা কি অপসারিত হবে? না, না সারা জীবন ধরে তার তো বৈদেহীর নিকষকৃষ্ণ মূর্ত্তি আইডি ও তার মিলন পথ থেকে পরিমল সরাতে পারবে না। যে কাজ সে করে ফেলেছে, সে কাজ আর ফেরে না। নির্দ্দয় হয়ে উঠল পরিমলের মন। সে নির্দয়তা তার মনের কোণে চাপাই ছিল

অপরাহ্নের আলো স্তিমিত হয়ে আসছে পরিমলের ঘর গুছিয়ে সাজাচ্ছিল বৈদেহী।

হাতে ঝাড়ন, ঘর্ম্মাক্ত মূর্ত্তি,, চুল টেনে তোলা। পরিমল ফিরবার আগে ঘর গুছিয়ে কাপড় বদলে নেবে। আজ কয়েকদিন হল প্রিয়-পরিচর্য্যার এ অধিকার পেয়েছে কৃতার্থা বৈদেহী। পরিমল তাকে প্রেম না দিলেও পত্নীত্ব দিয়েছে। পত্নীর পদে প্রীতা আছে সে।

বন্ধ আলমারি-দেরাজে কি রহস্য আছে জানেনা বৈদেহী। জানবার প্রয়োজন কি? ওপরে ঝাড়ন বুলিয়ে চলে যায় সে। ধীরে ধীরে হাত ফেলে কাঠের আসবাবে, আদর করে যেন কোমল স্পর্শ দিয়ে। সন্তর্পণে গালিচার ওপর ঘাসের ঝাঁটা বুলোয়। জীবনে যে সব কাজ করতে হয়নি, তাতেও আরাম চাকরের কাজে কত গৌরব! বিছানায় একটু বসে এদিকে ওদিকে ভীরু দৃষ্টি মেলে একটি গোপন চুম্বন রেখে আসে উপাধানে। চামড়া-মোড়া চেয়ারটি বুঝি এখন প্রিয়-স্পর্শে উত্তপ্ত বৈদেহীর পা চলে আসে, ক্ষণিকের জন্য বসে চেয়ারটিতে কাজ হয়ে গেছে প্রেম না, কাজ্কি যেয়ে ভাল হয়েছে। আর বেয়ারা রাখবে না বৈদেহী

আজ হঠাৎ জরুরী টেলিফোন পেয়ে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে ছুটে যেতে হয়েছিল পরিমলকে বেড়িয়ে তাই ঘর খুব অগোছাল রয়েছে আজ। ছড়ানো কাগজপত্র বেছে তুলতে লাগল বৈদেহী গুনগুন করে নিজের মনে

"রাত্রি এসে যেথায় মেশে
দিনের পারাবারে,
তোমায় আমায় দেখা হ'ল
সেই মোহানার ধারে
মুখের পানে তাকাতে চাই,
দেখি দেখি দেখতে না পাই"

গান বন্ধ হয়ে গেছে অকস্মাৎ মরক্কো চামড়ার ব্লটিংপ্যাডের তলা থেকে বেড়িয়ে এল ছবি একখানা। এক অনুপমার প্রতিচ্ছবি মুগ্ধ দৃষ্টি বৈদেহীর নির্নিমেষ হয়ে চেয়ে রইল। হঠাৎ দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল যেন রূপসীর চিত্র দেখছে না সে, দেখছে গোক্ষুর সর্পিণীর ভয়াবহ আকৃতি ছবির হাতে লেখা রয়েছে 'ভালবাসার সহিত পরিমলকে।

তার পশ্চাতে দাঁড়িয়েছে পরিমল চমৎকার ত্রিভুজ। স্বামী-স্ত্রী-প্রেমিকা।

চকিতা বৈদেহী ফিরে তাকাল। গম্ভীর ভাবে পরিমল একটি চেয়ারে বসল। শান্তকণ্ঠে বল্ল, "ছবি দেখছিলে? ওটা কার ছবি, জান?"

বৈদেহী নীরব দৃষ্টি মেলে রইল। ছবিখানা রেখে দিয়ে পায়ে পায়ে দরজার দিকে চলে যাচ্ছিল সে।

"দেখ ভাল করে, দেখ কত দেখবে। আরও দেখ।' পরিমল লাফিয়ে উঠে

একটানে আলমারীদেরাজ খুলে ফেলল। একগোছা ছবি বার হ'ল। নানা ভাবে, নানা ভঙ্গিতে আইভির চিত্র।

পকেট থেকে চুরুটের কেসটা বার করল পরিমল, সবুজ সিল্কের রুমাল, নোটবুক, ঝরণা কলম। কৌটোর ডালায় রুমালের কাপড়ের বুকে, নোটবুকের কোলপৃষ্ঠায়, কলমের মাথায় সব কিছুর ওপরে আঁকা আছে একই মুখ! স্বদেশ-বিদেশ নানা স্থান থেকে চারমাসে সংগ্রহীকৃত। ইতস্ততবিক্ষিপ্ত, লণ্ডভণ্ড চিত্র-সৌধ—বাতুলের স্মরণাগার। মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে পরিমল, চুল এলোমেলো, চোখ লাল। অপরাহ্নের আলো নিভে আসছে, অন্ধকার ঘনিয়েছে ঘরে। পাগলের মত লাগছে পরিমলকে সহসা পাগল হয়ে গেছে যেন

দাঁতে দাঁতে চেপে নিষ্ঠুর চাপা স্বরে আবার বলল পরিমল, "দেখ ভাল করে। দেখেছ? কার ছবি, জান? আমি যাকে ভালবাসি, তার ছবি।'

অপস্রিয়মানা বৈদেহীর মূর্ত্তি মুহূর্তের মধ্যে ফিরে দাঁড়াল, অসংকোচে চেয়ে স্পষ্ট-গলায় উত্তর দিল, "তুমি যে একজনকে ভালবাস বুঝেছিলাম। আজ দেখলাম তাকে। নিমেষে পরিমলের জ্বালাময় তৃপ্তির নৃশংস আত্মপ্রসাদ অন্তর্হিত হ'ল অবসন্নসহনশক্তি সে বসে পড়ল। কই ব্যথা বৈদেহীর? এমন স্থৈর্য্য ও পেল কোথায়? বৈদেহীর কাছে নিজের বাতুল ব্যবহারের লজ্জা প্রকট হয়ে উঠল। ছি, একি করল সে? বিনা কারণে।

বৈদেহী আবার ফিরে চলে যেতে উদ্যত হতেই ত্রাস্তকণ্ঠে পরিমল প্রশ্ন পাঠাল "এখন তুমি কি করবে?"

স্বামীর দিকে উজ্জ্বল সহজ চক্ষে তাকিয়ে বলল বৈদেহী, "কি আবার করব?"

একটু চুপ করে বৈদেহী আবার উত্তর দিল, "না, বাবাকে কিছু বলব না।

মনে মনে এই আশঙ্কা ছিল পরিমলের। এখনও শ্বশুরকে প্রয়োজন আছে। তাছাড়া, বড় বিশ্বাস করেন তিনি জামাইকে। এত বড় আঘাত দেওয়া চলে না—এ কেলেঙ্কারী প্রকাশ করা চলে না। দাম্পত্য-যবনিকার আড়ালে থাক না চাপা বিভীষিকা। বৈদেহী তার নিরুত্তর প্রশ্নের উত্তর দিল তাকে বিস্মিত করে। তবে, বৈদেহী মূঢ়া নয়। বৈদেহীর বুদ্ধি আছে, মস্তিষ্ক আছে। আচ্ছা, তাহ'লে কি বৈদেহী যা, সে তা বোঝে নি? বৈদেহী বিচলিত হ'ল না। এমন শক্তি কোথায় লুকানো ছিল ওর?

বিদ্যুতের মত শানিত-দৃষ্টি বৈদেহীর, বিদ্রূপের আভাস অধরে। ভীরু লাজললিতা কিশোরী, কুণ্ঠিত-ভীরু চোখ তুলে তাকাতে পারত না। এক নিমেষে সব কুণ্ঠা-দ্বিধা ঘুচে গেল কিসে? না, সত্যই কি অসামান্যা বৈদেহী? শুধু সঙ্গীতে নয়, চরিত্রেও? ভুল হয়ে গেল কি? মনে হ'ল চীৎকার করে বলে ওঠে, 'বৈদেহী, ভুল বলেছি। ফিরে এস। এখনও আমার সময় আছে। এখনও স্বর্গ গড়ে তুলতে পারি।'

শান্ত-ভদ্র পরিমল বাহ্যসত্তায় ফিরে এল। বিস্মিত-মূঢ় কণ্ঠে আবার বলে উঠল, "রাগ হচ্ছে তোমার?"

দরজা দিয়ে মিলিয়ে যাবার আগে বৈদেহী শেষবারের মত মুখ ফেরাল, শানিত হাস্যে বলে গেল, "না!"

একাক্ষরের সাধারণ শব্দ। কিন্তু জ্বালা ধরে গেল, আগুন জ্বালিয়ে গেল। ক্ষণিকের কোমলতা অন্তর্হিত হ'ল নিমেষে। জ্বলতে জ্বলতে চীৎকার করে বলে উঠল পরিমল—না, ক্ষণপূর্ব্বের অনুতাপ-স্বীকার নয়—তর্জ্জন, —"বৈদেহী, যেও না শোন। প্রত্যেকটি পয়সা তোমার শোধ দিয়ে দেব, প্রতিজ্ঞা করছি। যদি মানুষ হই, কিছু নেবনা তোমার কাছ থেকে।"

হাসির অর্থ বুঝেছিল পরিমল নিঃসংশয়ে। সহসাগত সত্যের মত বৈদেহীর ঔদ্ধত্যের গোপন কারণ আলোর উজ্জ্বলতায় নেমে এলো তার কাছে। বৈদেহী প্রেমাস্পদের ওপর শ্রদ্ধা হারিয়ে নবজন্মে বেঁচে উঠেছে একপলে।

কেন, কেন? যে কিছুই দিতে পারেনা, সে কি এতই নিতে পারে দু'হাত পেতে? তাকে শ্রদ্ধা করা চলে না।

—কুড়ি—

নিজেকে দগ্ধ করে একি তপস্যা চলছে দিনরাত?

তিনটি বছর অতীত হয়ে গেছে, কিন্তু স্মৃতি আর অতীতকালের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চায় না। যে সকল কথা সাধারণভাবে বলা হয়েছিল, তারা স্মৃতিপটে অসাধারণ অর্থ ধরেছে বারবার আহূত হয়ে। যে কথা অসমাপ্ত ছিল, সে কথা মনে মনে সম্পূর্ণ করে বলা বা শোনা হয়েছে।

একেই কি বলে ভালবাসা? এরই শক্তি চিরঞ্জয়ী? কি মাধুর্য্য আছে

ভালবাসায়, যাতে সর্ব্ব জগৎ মুগ্ধ হয়ে আছে শাশ্বত কাল থেকে? বিরহ ভালবাসার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি তাই রাধাকৃষ্ণের বিরহগাথা চিরদিন মিলনের ঊর্দ্ধে স্থান পেয়েছে।

যাকে পাওয়া যায় সে তো নিঃশেষ হয়ে যায় নিজেদের কাছে। যাকে চেয়ে পাওয়া যায় না, সেই মন জুড়ে থাকে চিরকাল। কল্পনায় তাকেই বারবার ডাকতে হয় পূজার মন্দিরে দেবতার মত। দুঃখকষ্টের পৃথিবীর সঙ্গে তাকে মেশাতে পারা যায় না। সে থাকে সুদূর আকাশে শুকতারার মত, বিজন অরণ্যে ফুলের মত সে ভাবের জগতে প্রিয়, বাস্তবের জগতে তার চির অদর্শন।

হাজারীবাগের রাস্তায় একখানা লাল গাড়ী প্রায়ই দেখা যায়। গাড়ীতে থাকে অসাধারণ সুন্দরী একজন। সারা মুখে তার মনোহর ক্লান্তির ছায়া, অধরোষ্ঠ তীব্র ব্যঙ্গপূর্ণ হাস্যে কুটীল। একদিন প্রেমিকের চুম্বনে-চুম্বনে যে অধরোষ্ঠ সুকোমল পুষ্পধনু ছিল, আজ সে হয়েছে অর্জ্জুনের হাতের নিষ্ঠুর গাণ্ডীব। উজ্জ্বল নয়নে হীরক-জ্যোতি সুন্দরীর অঙ্গের হীরককে ম্লান করে দিয়েছে কমনীয় বরতনু—রেশমের আবরণ। প্রতিটি সামাজিকতায় তাকে দেখা যায়, প্রতিটি উৎসবক্ষেত্রে সে আবির্ভূতা। নারী তার নিন্দায় পঞ্চমুখী, নর তার পদানত সে ভাল জানে তার শক্তি জানে পুরুষচিত্তে সিংহাসন পাতা তার। তবু গভীর রাত্রে নিজের গৃহে ফিরে, বিজয়িনী কেন হয় অবলুণ্ঠিতা? শুকতারাকে সাক্ষী রেখে তার অশ্রুবিসর্জ্জন জানে না কেউ। কে দেখে বেদনা তার, কে দেখে বেদনা তার? কে দেখে নিসঙ্গতা? কার অভাবে তার সমস্ত দিন বিষাক্ত, রাত্রি নিদ্রাহীন হয়ে ওঠে? মুহূর্ত্তের ভুল সারাজীবন ধরে করে চলেছে মাইভি।

কলিকাতায় প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী পরিমল লাহিড়ী ক্যাডিলাকে চড়ে বেড়ায়। অল্পদিনের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের শিখরে তার অভ্যুত্থান বিস্ময়জনক। হাতে ধরা থাকে সর্ব্বদা জলন্ত বর্ম্মা চুরোট, যেন নিজেকে চুরোটের মতই দগ্ধ করে ফেলছে সে। দিবারাত্র কাজে আবৃত করে রাখে সে। তার সঙ্গে দেখা করতে ভিড় বসে। শ্বশুর সম্প্রতি গতায়ু হয়েছেন। প্রভূত অর্থের মালিক সে। তবু বিরাম নেই। অর্থ উপার্জ্জন করে চলেছে সে বিনা প্রয়োজনে। নারীতে অভিরুচি নেই,

একজনের হৃদয়হীনতায় সকলকে ঘৃণা করে সে। অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি, বিরহের অনলে আরও সুন্দর হয়েছে।

বালিগঞ্জে পরিমলের বাড়ীর দ্বিতলে থাকে ম্লানমুখী এক তরুণী। কুশ্রী দেহ স্বাস্থ্যহীন হয়ে আরও কদাকার দেখায়। একদিন কাকে ভোলাবার জন্য সে অত্যন্ত সৌখিন হয়ে উঠেছিল? আজ তার বেশভূষা শ্রীহীন, তাকে ভালবাসার লোক কোথায়?

পিতা বিগত হয়েছেন, শাশুড়ী বদরিকাশ্রম-তীর্থে গেছেন সম্প্রতি দীর্ঘ মেয়াদে। একা থাকে বৈদেহী।

আইভি ও পরিমলের চেয়ে কম কষ্ট পায় না সে। আইভি-পরিমল দূরে দূরে থাকে, কিন্তু অন্তরে তাদের যোগ আছে। বৈদেহীর চিরবঞ্চিত মন কেবল দিয়েই গেল, কণামাত্রও পেল না। যে মন্দিরে প্রবেশের সৌভাগ্য তার জীবনে হ'বে না, যার দরজায় সে ভিখারিণীর মত লুব্ধচিত্তে ঘুরে বেড়াত, সেই মন্দিরে অন্য এক নারীর সাড়ম্বর উপাসনা চলছে—দূর থেকে তাই বৈদেহী দেখছে চেয়ে নীরবে।

এখানেই বৈদেহী-জীবনের উপসংহার লিখলে বেশ হ'ত না? প্রেমবঞ্চিতা অভাগিনী সূর্যমুখীর মত দয়িতের ধ্যানে নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে। সকালে উঠে স্বামীর আলেখ্যে মালা পরায়, নিরজনে আহার্য্য প্রস্তুত করে রাখে মনোমত। অলক্ষিত সেবায় প্রিয়তমের পায়ে কুশাঙ্কুরটি ফুটতে দেয় না। 'দুই বোনের' শর্ম্মিলা, 'শ্রীকান্তের' অন্নদা দিদি—আরও যতসব পৌরাণিক সতী আছেন, তাঁদের উপযুক্ত দুহিতা। চোখের জল ফেলে ফেলে হৃদয়বতী-হৃদয়বানেরা আমার এ আখ্যান পড়বেন দ্বিতীয় সাবিত্রী ও সত্যবান। নিমেষে আমার দুর্নাম কেটে যাবে, আমার হয়তো সুনামও হয়ে যেতে পারে উপদেশমূলক রচনাকার বলে। 'দেশের মাটীর গন্ধ' এ-নগরাখ্যানে না থাকলেও আছে তো দেশের নীতিকথা। সুতরাং, চাই কি বিশেষ বিশেষ স্বর্ণপদক, এই আমারি গলে লম্বিত হ'বে। 'গোপনে গুমরি' মরে ভালবাসা, নীরবে ঝরিয়া যায় ফুল'? কিন্তু, পারব না। লিখতে পারব না ওভাবে। আমার জীবন-বেদ পৃথক। প্রত্যেকটি জীবনের মূল্য আছে, অর্থ আছে আমার খাতায়। অমন ব্যর্থতার জন্য জন্ম হয়নি কারও। তাই, বৈদেহীর উপসংহার ও তো নয়। জীবনে নূতন বীণা বেজেছে বৈদেহীর। এখনও বাজেনি, কিন্তু অনিবার্য্যভাবে বাজবে। কি সে সুর? নূতন পুরুষ

নিশ্চয়? হা, হা! তুমি কি ভেবেছ পতি-পরিত্যক্তা সতীর সান্ত্বনার মধুর আধুনিক চিত্র এঁকে যাব আমি? বড় বড় কথা বলে যা পাপ, তাকে সমর্থন করব? অন্যায়কে কলমের জোরে ন্যায় বলে চালাব? না, না। তবে কি নূতন সুর বৈদেহীর জীবনে? ভুলে যেওনা বৈদেহী শিল্পী। ত্রিভুজের মধ্যে একমাত্র সেই অসাধারণ। অসাধারণ পরিণতি তার চাই।

—একুশ—

সারাদিন মেঘাচ্ছন্ন। উতলা বায়ু-উত্তরীয়। 'বায়ু বহে পূববৈয়াঁ।' মুক্তা-ধাবার মত বৃষ্টি ঝরছে। আস্তে বৃষ্টি পড়ছে—কোন শব্দ ধরা যায় না, তবু চারপাশের কোলাহল, মোহাচ্ছন্ন ভাব প্রকৃতির ইত্যাদির মধ্য থেকে মৃদু একঘেয়ে শব্দ বোঝা যায়। কান দিয়ে শোনার নয়, প্রাণ দিয়ে অনুভব করার।

কলিকাতার উপকণ্ঠে বাড়ী। প্রকাণ্ড বাংলো, চারিপাশে যথেষ্ট জায়গা, মধ্যে একখানা একতলা বাড়ী। বেলা এগারোটা সাতাশ মিনিট বেজেছে, দেখা যাচ্ছে দরজার ওপরে রাখা মন্দিরের মত ঘড়িটায়। ঘণ্টাখানেক আগে বাড়ীর মালিক বেরিয়ে গেছেন কর্ম্মস্থানে, একখানা বেবী অষ্টিন নিজে চালিয়ে।

স্বামিনী সম্মুখের বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন চঞ্চল ভাবে। হেলিওট্রোপ-রংএর শাড়ীর আঁচল তাঁর অজ্ঞাতসারে পেছনে লুটোচ্ছে। ঈষৎ-উদাসীন ভাব, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে তাঁর আঙুরের মত মসৃণ অধরে ও কপোলে রংয়ের খেলা ধরা পড়ছে।

আইভি কিছুক্ষণ ইতস্তত বেড়াল। তারপর সম্মুখের ড্রইংরুমে প্রবেশ করে স্বরলিপির বইগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে কোনে রাখা কটেজ-পিয়ানোর দিকে তাকিয়ে একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বহুদিন হ'ল পিয়ানোটা ভেঙে গেছে।

বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী রেখে একজন ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন। মধ্যবয়সী তিনি, পরিধানে বিদেশী পোষাক। দীর্ঘ গ্রীবা একটু উন্নত করে আইভি তাঁকে দেখল চেয়ে জানালার কাঁচের মধ্য দিয়ে, তারপরেই পাশের ঘরে দ্রুত প্রস্থান করল।

আয়নার সামনে আইভির ছায়া পড়েছে। কাণের পাশে চুলের গুচ্ছগুলো ঠিক করে সাজাচ্ছে সে হেয়ারপিনের সাহায্যে। রুজের কৌটা খুলে স্বভাব-রক্ত গণ্ডে খানিকটা রুজ দিচ্ছে সে। সারা দেহে আইভির ক্লান্তি, মুখে বেদনার অস্পষ্ট আভাস।

পাশের কক্ষ থেকে সাহেবী কণ্ঠে শোনা গেল : "বোই, বোই !"

চকিতে ফিরে দাঁড়িয়ে পাশের কক্ষে প্রবেশ করল আইভি, মুখে তার হাসি।

ভদ্রলোক কৃতার্থ হয়ে গেলেন—"কী সৌভাগ্য আমার"—দীর্ঘ করে টেনে বললেন।

"সৌভাগ্যটা কার বেশী তা বোঝা মুস্কিল"—বক্রহাস্যে উত্তর দিয়ে আইভি সোফায় বসল।

ভদ্রলোক বিনীত কণ্ঠে বললেন, "উনি কি"—

"তিনি আপনার জন্যে বসে থেকে থেকে এই পাঁচ মিনিট আগে বেরিয়ে গেছেন।"

"আজ যে তিনি আমার পাওনা টাকা কিছু দেবেন বলেছিলেন, তা" ইতস্ততভাবে নম্রস্বরে ভদ্রলোক বল্লেন।

"কি জানি! বেরিয়ে তো গেলেন দেখলাম।" অত্যন্ত মধুর করে আইভি হাসল।

তার মুখের দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে ভদ্রলোক বলে উঠলেন—"I donot care for that money. It is you—well, tell him—" ভাল করে ঠিক মত কিছু বলতে না পেরে তিনি বিব্রত হয়ে পড়লেন।

আইভি করুণভাবে হাসল।

পিয়ানোর দিকে তাকাতে তাকাতে ভদ্রলোক বল্লেন, "তুমি এখন পিয়ানো বাজাও না? বাজাও না, একটু শুনি"

"ওটা খারাপ হয়ে গেছে।" সংক্ষেপে আইভি বলল।

"জান তো আমার দশা। আমার স্ত্রী মারা যাবার পরে তাঁর পিয়ানোটা পড়েই আছে অমনি। কেউ বাজায় না। বেশ ভাল পিয়ানো—যদি তুমি বল এখানে এনে দি। মাঝে মাঝে আমাকে শুনতে দিও তোমার বাজনা।"

আইভি একবার স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল তাঁর মুখের দিকে। পাটের দালালী করলে কি হয়, অজিত সেন বুদ্ধি রাখে। Vini, Vidi, Vici. চমৎকার!

বাইরের ঘড়িতে বারোটা বাজল। চায়ের সরঞ্জামগুলো গুছোতে গুছোতে আইভি বলল, "আপনাকে অযথা আটকে রাখব না।"

"আটকে কি সবাই সকলকে রাখতে পারে, আইভি"—অজিত সেন

বিগলিত কণ্ঠে আরম্ভ করলেন—"তোমার কাছে থাকা আমার পক্ষে,—তুমি কি বোঝ না?"

কটাক্ষে আইভি তাঁর দিকে তাকাল, ঈষৎ বিদ্রূপ হাস্তে বলল, "বুঝি বই কি।"

অজিত সেন টেবলের পাশ থেকে উঠে আইভির অত্যন্ত নিকটে দাঁড়ালেন। আইভির আনত গ্রীবার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বলে উঠলেন মৃদুস্বরে, "সুইটহার্ট!"

পরমুহূর্ত্তে উঠে দাঁড়াল আইভি। বিদ্যুতের শিখার মত তাঁর সামনে দাঁড়াল—"বেরিয়ে যান, Get away" উত্তেজিত কণ্ঠে আইভি বলছে, "চলে যান। আমি আপনাকে ঘৃণা করি। I hate you."

আকস্মিকের জন্য যতটা সময় বিমূঢ় হয়ে থাকা উচিত অজিত সেনের তার বেশী সময় লাগল না। টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে বিদেশী ভাষায় বলে গেলেন, "তথাস্তু। আমার টাকাকে বোধহয় ঘৃণা করনা তুমি।"

নিজেকে বিক্রয় করে বেঁচে থাকার মূল্য কি? তবু জীবনে এতই মোহ?

কঠিন হাসি আইভির মুখে দেখা দিল।

—বাইশ—

"বসন্তের শেষ রাতে এসেছিনু শূণ্য হাতে,
এবার গাঁথিনি মালা, কি তোমারে করি দান?
কাঁদিছে নীরব বাঁশী, অধরে মিলায়ে হাসি,
তোমার নয়ন-তলে ছলছল অভিমান।"

"এই যে মিসেস্ সরকার?" আইভির সাম্‌নে চার বছর পরে দাঁড়িয়ে পরিমল লাহিড়ী বল্‌ল।

নূতন করে পরিচয় হয়েছে তাদের এক বাড়ীর সামাজিক উৎসবে কয়েকদিন আগে। পৃথিবী গোলাকার এই উক্তি সপ্রমাণ করে আজ আবার অতর্কিত সাক্ষাৎ হয়ে গেল প্রদর্শনীতে।

"পরি!" আইভির চোখ তিরস্কার করল।

পরিমল একদৃষ্টে চেয়ে আছে আইভির দিকে, অধরে অভ্যস্ত ব্যঙ্গ হাস্য, ঈর্ষার নিষ্ঠুর জ্যোতি চক্ষে।

'কি আশ্চর্য্য! আরও সুন্দর হয়েছে ও। বোধহয় অত্যন্ত মনের আনন্দে আছে।'

দীর্ঘ চার বছর পরকালের আশার বিনিময়েও পরিমল যাকে ক্ষণেকের জন্য চোখের সামনে দেখতে পায়নি তাকেই প্রতিমুহূর্তে অপর একজন অতি সন্নিকটে ধরে রয়েছে। ওইতো চুলের সীমায় রেশম-আঁচল, আঙুলে বিবাহের অঙ্গুরীয়ক। বিবাহ হয়ে গেছে বহুদিন, জানত পরিমল। আইভি কলিকাতার বাইরে থাকায় দেখা হয়নি। যে চিরকাল তার ধ্যানের মন্দিরে কল্পনার দেবী হয়ে আছে, তাকেই তার মত সামান্য একজন মানুষ সামান্য একটা স্থাবর দ্রব্যের মত অধিকার করে আছে!

কিন্তু বুঝতে পারল না, বুঝতে পারল না পরিমল: তার সঙ্গে দেখা হয়েই আইভির রূপে এত লাবণ্য উপচে পড়েছে—জোয়ারে সাগর। কয়েকদিন আগেও আইভি এত সুন্দরী ছিল না। ফিরে এসেছে, আবার আমি তাকে দেখতে পাব, তার কথা শুনতে পাব, সে আমার দিকে চেয়ে হাসবে, সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে! এই চিন্তাই আইভির মনে বারবার ভেসে আসছে বহুদিন আগে শোনা, হঠাৎ ভালো-লাগা কোন গানের মত। অতীতের যেটুকু সুন্দর, তাই ছায়া-ছবির মত তার চোখের সামনে মোহন অলকা রচনা করেছে—ভবিষ্যৎ ম্লান হয়ে গেছে। বর্ত্তমানকে উপভোগ কর।

পরিমল এতো সুন্দর! তার মনে যে হাস্যমুখ প্রণয়ীর চিত্র জাগরূক ছিল, তার চেয়ে অনেক, অনেক সুন্দর এই লোক, যার যৌবনের এক পা এখন অস্তাচলে। এই ক্লান্ত, উদাসীন মুখচ্ছবি, প্যাশন যার প্রতিটি রেখায় রেখায় নিজকৃত ধ্বংসের চিহ্ন রেখে গেছে—এই বিদ্রূপে-বঙ্কিমে অধরোষ্ঠ, সবই অনেক সুন্দর সেই প্রাণস্রোতে উচ্ছল যুবকের চেয়ে।

"ভালো আছ, আইভি?" আত্ম-সংবরণ করে অতি সাধারণভাবে পরিমল বলতে চেষ্টা করল। যেন কোনদিন সে আইভিকে ভালবাসেনি, যেন আইভি তার সারাজীবন বিষাক্ত করে তোলেনি। মনে মনে তার অভিমান-মিশ্রিত রাগ দেখা দিচ্ছিল। কি দরকার ওর এত সুন্দর হবার! যে সৌন্দর্য্য সে দেখতে পায়না তা অন্য দশজনের দেখাবার কি প্রয়োজন? আইভির সুরুচিসঙ্গত বেশভূষার দিকে

সে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল। সহসা যেন চোখে কুলোয় না একটু একটু করে উপভোগ করবার মত সুন্দরী তার প্রিয়া। ওর চোখ চেয়ে দেখতে এক যুগ লাগবে; ওর হাসি, ওর অধরের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় অন্ততঃ দশ বৎসর। ওর তনুর সুষমা এক সঙ্গে দেখার মত নয়, একবারে দেখবার সাহস পাওয়া যায় না। কিন্তু, কি করে হ'ল? যে জীবনে জীবন গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল, সে জীবন থেকে স্খলিত হয়ে আইভি কি করে সুখে আছে! সে তো পারছে না।

আইভি কোমল কণ্ঠে বলল, "তুমি ভাল আছ?" পরমুহূর্ত্তে সব ভুলে গেল পরিমল। এ সেই কণ্ঠ, যে সুরে আইভি তাকে ডেকেছিল "ডার্লিং!" পরিমল ভুলে গেল আইভির প্রতি ঔদাসিন্য দেখানোই তার মান বাঁচানোর একমাত্র উপায়, আইভিকে বিশেষ সুরে বিশেষ কিছু না বলাই তার একমাত্র আশ্রয় আত্ম-গোপন করবার। সারাজীবনের অভিমান তার প্রতিটি কথায় স্পষ্ট হয়ে উঠল—"তা দিয়ে তোমার কিছু দরকার আছে?"

আরও কোমল কণ্ঠে আইভি বলল, "রাগ কোরনা, পরি।" রাগ? সে কার ওপর করবে? তিন বছরেব অদর্শনে যে সোনালী রং কালচে হয়ে গিয়েছিল, সে রং জ্বলে উঠল নূতন করে পরিমলের মনে, পরিমলের মুখে চোখে।

রাগ কেন সে করতে পারছে না? কেন মুখ ফিরিয়ে সাধারণভাবে চলে যেতে পারছে না? রাগ সে করতে পারছে না, কিন্তু অভিমান হচ্ছে তার।

যার ওপরে রাগ করা যায় তাকে তো চোখের সম্মুখে দেখতে ইচ্ছা হয় না। সে ব্যক্তি রাগের কারণ জানুক বা না জানুক তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু যার ওপর অভিমান হয়, তাকে যেন ডেকে এনে সোরগোল করে জানাতে ইচ্ছা করে যে তার ওপর অভিমান হয়েছে। সে থাক আমাদের সামনে। জানুক, সে জানুক এ মনোভাবের কারণ।

কোমলতম কণ্ঠে আইভি আবার বলছে, "রাগ কোরনা।" কবে কোন আঙ্গুর ক্ষেতের পাশে সুর্ম্মা-আঁকা নয়নে করুণ চেয়ে কোন তরুণী বুঝি তার অভিমানী প্রিয়কে এমনি করেই বলেছিল: "রঞ্জা হঠাও, দিলদার।" কোথায় দিয়ে কি হয়ে গেল বোঝা গেল না। ধীরে ধীরে জনসমুদ্র যেন মিলিয়ে গেল পরিমলের চোখের সম্মুখ থেকে। দারুণ মানের কণ্ঠে আইভিকে পরিমল কত কি কথা বলে যেতে লাগল। দীর্ঘ তিন বছর যে সব কথা তার মনে জেগে ছিল সে সব কথা এক মুহূর্ত্তে বলে শেষ করে দিতে চায় সে।

বেলা তিনটা তখন। দারুণ রৌদ্র শীতকালে, মাথা জ্বলে যাচ্ছে। প্রেমের অনুকূল চন্দ্রিকা, কোকিলের গান কিছুই নেই। বসন্তকালের তন্দ্রাজড়িত আবেশের কোন চিহ্ন নেই কোনখানে। চূর্ণ কুন্তলে গোলাপের মালা জড়িয়ে আসেনি আইভি অলক্তে চরণ রঞ্জিত করে। মাথায় ছিল তার বিদেশী সানশেড, পায়ে খুর-তোলা জুতো।

তবু, এ প্রেমে সে সব কিছুর প্রয়োজন হ'ল না। বসন্ত-নিশীথে কোকিলের কুহুধ্বনির মধ্যে পার্শ্ববর্তিনী তরুণীকে দু'চারটি মিষ্ট কথা বলা সহজ-সাধ্য, কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ায় দাঁড়িয়ে তিন বছরের অদর্শনের পরে, অসংখ্য লোকের অসুবিধাজনক উপস্থিতির অনুভূতি নিয়েও যে ভালবাসা আপনি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে দুর্মদ, দুর্ধর্ষ সে। কি বলব? বেহুইন-প্রেম?

দূরের ষ্টলের দিকে চেয়ে আইভি বলল, "চলনা, আইসক্রীম খাওয়া যাক। যা গরম!"

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে ইতস্তত করে পরিমল বলল," "তোমার স্বামী—"

"ওধারে কোথাও আছে। এস, পরি।"

নীরবে আইভির অনুগমন করে পরিমল আবার বলল, "সুশোভন চিরকালই একটু ঈর্ষিত ছিল, না?"

"সুশোভন?" ভ্রূকুঞ্চিত করে আইভি বলে উঠল," ওঃ, তাই আমাকে মিসেস সরকার বলে ডাকছিলে? আমার স্বামীর নাম তো সুশোভন নয়, নিখিল চৌধুরী।"

"সেকি? সুশোভনকে কি—?"

ষ্টলের পর্দার আড়ালে বসে আইভি সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে চলল পরিমলের অবিরত ব্যগ্র প্রশ্নের।

বিরহিনী আইভিলতা একদা পেল সে-ই প্রস্তাব, যে প্রস্তাব তার মাতার কামনার ধন, আপনার অপ্রার্থিত নয়। "বিরহে কাতরা বিনোদিনী রাই, পরাণ বাঁচে না বাঁচে" ভাব তখন তার। পরিমলের বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেছে। আইভির দিন কাটে না।

সুশোভন সন্ধ্যার নিরালা অবকাশে এল। সান্ধ্য সম্মেলন হয় না আর। আইভির ভাল লাগে না। নীল আকাশে সন্ধ্যা নেমে আসছে, তাই চেয়ে দেখছিল আইভি বারান্দায় বসে। লন্ পেরিয়ে এল সুশোভন, ক্যাডিলাক-বাহন।

"হ্যালো।"

আইভি মুখ ফেরাল নিরুৎসাহে। "বসুন, মিঃ সরকার।" মিসেস চক্রবর্ত্তীর খাড়া শেয়াল-কান খাড়াই ছিল। এল কফির সরঞ্জাম।

কফি খেতে খেতে প্রস্তাব হ'ল বিবাহের। অন্যমনস্ক আইভি চেয়ে রইল সান্ধ্য-আকাশে। মা খুসী হ'বেন, সারাজীবন নিশ্চিন্ত রইবে সে। বন্ধুরা ঈর্ষাকাতর হ'বে, স্বজনের চক্ষে বাড়বে মর্য্যাদা। এই তো। আর কি?

তবু—কতদিন দেখা হয় না। কতদিন! কতদিন পাইনা স্পর্শ তার! কোথায় আছে এখন?

"কি? প্রস্তাবটা সামান্য হ'ল, না?" সবিদ্রূপ প্রশ্নে চমকিতা আইভি চেয়ে দেখল সুশোভনকে। এই মুহূর্ত্তে প্রিয়চিন্তা থেকে ধ্যাননিমগ্ন মনকে জোর করে ফেরায় কে? সে এই তো সুশোভন। সম্মুখে উপস্থিত। এর উপস্থিতির জন্যই পরিমলকে ছিটকে পড়তে হ'ল। অত্যন্ত ক্ষোভে ঘৃণায় এবং মনের জ্বালায় আইভি বিতাড়িত করেছে পরিমলকে। মায়ের প্রতি এবং সংসারের প্রতি প্রতিশোধ-কামনায়, নিজেকে আত্মধিক্কারের অসহ অবস্থায় আত্মশাস্তির উদ্দেশে আইভি জীবনের শ্রেষ্ঠ মানুষকে জীবন থেকে দিয়েছে নির্ব্বাসন। সমস্তর মূল এই সুশোভন। একে দেখেই মিসেস চক্রবর্ত্তী লোভে অন্ধ হয়ে গেলেন। সুশোভন, প্রস্তুত হও।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল আইভি। "প্রস্তাবটা অসামান্য একথা মনে আসবার কোন কারণ দিয়েছি আপনাকে, মিঃ সরকার?"

কালকোলো মুখ সুশোভনের ছাই হয়ে গেল। আশা করতে পারেনি। মিসেস চক্রবর্ত্তীর প্রশ্রয়, নিজের যোগ্যতা নিসন্দেহে তাকে বুঝিয়েছিল চক্রবর্ত্তী-দুহিতা তারি গললগ্ন লতা হ'তে পথ চেয়ে বসে আছে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না।

"বসে থেকে লাভ কি, মিঃ সরকার? সময় নষ্ট হচ্ছে।"

"তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ?" সুশোভন সতেজে উঠে দাঁড়াল।

"তাড়াবার মালিক আমি নই, বাড়ী আমার নয়। তবে, নিজের বিয়ে ঠিক করার মালিক আমি।" অন্দরে চলে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে বলল আইভি, "আমাকে তুমি বলার অধিকার আজ থেকে হারালেন। হ্যাঁ, কথাটা মনে থাকে যেন।"

তারপর? হা-হুতাশ মিসেস্ চকের, তিরস্কার, ক্রন্দন। কিছুই মন স্পর্শ করল না এবার। অতি বড় আঘাতে যে মন পাথর হয়ে গেছে, ছোট আঘাত তাকে ছোঁয় না।

নিসঙ্গ দিন। সন্ধ্যায় বাড়ীর সম্মুখ ধরে চলে পরিমলের গাড়ী। পারে না, আইভি আর পারে না।

হাজারিবাগ বায়ু-পরিবর্ত্তনে। মিলের মালিক নিখিল চৌধুরী পরিচিত হ'লেন। বিদেশ-ফেরৎ কুমার। সপ্রতিভ সুশ্রী তরুণ। আইভিকে দেখে অনিবার্য্যরূপে প্রেমে পড়লেন। বাড়ীতে আসা-যাওয়া করতে লাগলেন।

দিন কাটে না আইভির। একজনের অভাবে সারা বিশ্ব যে এমনি শূন্য হয়ে যাবে জানলে আইভি কি চোখের আড়াল করত তাকে?

"বুকে তায় মালা করি
রাখিলে যায় সে চুরি,
বাঁধিলে বলয় সনে
মলয়ায় যায় সে উড়ি"—

এমন যে নিধি, সে তো দ্বারে এসেছিল। আইভি তাকে চিনতে পারেনি। এখন কি করা যায়? বেদনার্ত্ত মনে সদালাপী নিখিল সান্ত্বনার প্রলেপ টেনে দিতে লাগল।

প্রবাসের দিন ফুরিয়ে যায়। কলিকাতা ফেরার দিন এগিয়ে এল। আইভি যেতে চায় না—প্রেত আছে সেখানে। স্মৃতির প্রেত। ব্যথার প্রেত অনিবার্য্য সত্যরূপে রয়েছে যুগলমূর্ত্তি। নিখিলের বিবাহপ্রস্তাব গ্রহণ করল আইভি।

মিসেস চক হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বর হিসাবে সুশোভন অধিকতর বাঞ্ছনীয় হ'লেও ইনিও ফেলনা নন। নূতন বড়লোকীর চালে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। চেহারাটিও ভাল। সর্ব্বোপরি বয়স কম। মিসেস চক বিস্মিত হয়ে চিন্তা করলেন, আজকালকার মেয়েরা যেন কিছুতেই বুড়ো বিয়ে করতে চায় না। তরুণ ধুয়ে কি জল খাবি? সুশোভনকে প্রত্যাখ্যান করবার মূলে প্রৌঢ়ত্বভীতি আইভির ছিল নিশ্চয়। নইলে, বলতে নেই ভগবানের ইচ্ছায়, পথের কাঁটা তো আপনি সরে গিয়েছিল। লোফারটা লোপাট হয়ে গিয়েছিল বিয়ের হাড়িকাঠে।

আচ্ছা শ্বশুর বাগাল কিন্তু, লোফারটা! মনে-মনে এই ছিল ওটার? দাঁ খুঁজে ঝাঁ করে কোপ। আইভির প্রেমে তো 'মরি-মরি, ধরি-ধরি' শুনতে পেতাম। অথচ, আইভির বিয়ের আগেই ছুটে যেয়ে প্রসন্নরায়কে কোতল করল। ঝগড়ার কথাটা জানতেন না চক্রবর্ত্তি-জায়া। লোফারটাকে কখন বিশ্বাস করতে পারতেন না মহিয়সী। আইভির সঙ্গেও প্রতারণা? আ মরণ, আইভির

বিয়েটা পর্য্যন্ত অপেক্ষাই না খাতিরে কর ভদ্রতার। মেয়েটা হেদিয়ে মরছে এখনও। অমন যে রূপ তাতেও ভাঁটা ধরে গিয়েছিল মনোকষ্টে। আর একটু হ'লেই মাথাটি খেত নিজের। নিখিলকে ধন্যবাদ।

ফোঁস করে সাপের মত একটা নিশ্বাস ফেলে মিসেস্ চক ভাবলেন, মেয়ের যা ভাবগতিক হয়েছিল, তাতে কোন আশ্রম-টাশ্রমে ঢুকে পড়লেই বা ঠেকাত কে? ভগবান সুবুদ্ধি দিয়ে রক্ষা করলেন তাঁর পথ থেকে সংসারে ফিরিয়ে। সর্ব্বশক্তিমান তিনি। পৌত্তলিকতা মানেন না মিসেস, নইলে গঙ্গাস্নান হয়তো করেই ফেলতেন। গঙ্গাহীন দেশে অবশ্য আপাততঃ সম্ভব নয়। আইভি কোট ধরেছে বিয়েটা হাজারীবাগেই হ'বে। পাছে মেয়ে বেঁকে বসে জননী অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হয়েছেন। ভালই! লোফারটার কথা তো বলা যায় না। বিয়ের দিন ধড়াম করে হাজির হয়ে পাত্রীকে বিয়ের আসন থেকে উঠিয়ে নিতেই বা কি লাগে? ও আপদ সেখানে আছে, সেস্থান বর্জ্জনীয়। অদেখা প্রসন্ন রায়ের দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়লেন আইভি-জননী। এমন লোফার যার জামাই হয়ে বসেছে, তার না জানি কত দুঃখ! আর একটু হ'লে তিনিতো গিয়েছিলেনই। নেহাৎ বুদ্ধির জোরে রক্ষা পেয়েছেন এ যাত্রা।

তা-ও বলি, লোফারটার কি কৃতজ্ঞতাও নেই? এক-আধবার না হয় দেখাই কর। ছেলেব হাতের জিনিষটি হঠাৎ কেড়ে নিলে কেমন লাগে? যা হ'ক, নিখিল বাঁচাল। মনের আনন্দে আইভি-জননী একমাত্র বন্ধু ও ভগ্নী নীতার জননীকে রামপট-পত্র লিখলেন। গীতার বিয়ে হয়ে গেছে গেঁয়ো জমীদার-পুত্রের হঠাৎ-আলো-লাগা চোখে পড়ে। নীতা এখন নিসঙ্গ। ভাবছে এদেশে সুবিধা হ'ল না, ওদেশে যেয়ে দেখবে নাকি? দেহ তার সন্তানধারণের উপযুক্ত, Pelvic bone ইত্যাদির গঠন দেখলেই বোঝা যায়। ডাক্তারেরাও তাই বলেন। অথচ, পুরুষ কোথায়? কার সন্তান ধারণ করবে নীতা? না হয়, রাশ্যাতে যেয়েই দেখা যাক, হাঁা। শেষাশেষি নীতা রাশিয়া গেল কি বনগাঁয়ে গেল, আমার কাহিনী জানে না। তার সেই সন্তানধারণযোগ্য দেহ থেকে মানুষ বেরল কি শেয়াল জন্ম পেল, তা-ও জানি না। তবে আইভির বিবাহের বাদ্য শুনে এসেছি—তাক্‌ডুমাডুম্।

হাজারীবাগে দিন কাটতে লাগল ঐশ্বর্য্যের ছায়ায়। সেকি বিলাসের

উপকরণ দু'হাতে যোগাল নিখিল মনোমতা পত্নীকে! ডিনার-ডান্স্-চা, বিভিন্ন পার্টিতে মুষ্টিমেয় অভিজাতের সঙ্গে ফিরতে লাগল আইভি চৌধুরী, একদা যে ছিল কলিকাতার বেল্।

তারপর? সমস্ত উড়ে গেল, পুড়ে গেল। ফিরে এল নিখিল কলিকাতায় নূতন জীবিকার সংস্থানে।

সুশোভনের কি হ'ল?

পরিচিত ব্যঙ্গের ঝলক খেলে গেল আইভির মুখে-চোখে, আবার নিমেষে মেঘ-মেদুর বরষার সজলতা নেমে এল। শ্যামলতার ইতিহাসে যুক্ত হ'ল সুশোভন নূতন-তোলা মোগল-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের ছবির মত। আইভি অন্যমনস্ক হয়ে গেল, সামনে আইক্রীমের পাত্রে গলে যাচ্ছে আইস অবহেলায়। ছোট চামচেখানি হাতে ধরাই রয়েছে।

শ্যামলতার সঙ্গে প্রথম আলাপের দিন কৌতূহলী সুশোভন জিজ্ঞাসা করেছিল রহস্যচ্ছলে: "আপনার নামের মানেটা কি? শ্যামলতা, না শ্যাম-লতা?"

মুক্তোর মালা বুকে দুলছিল শ্যামলতার, যেমন নকল মুক্তোর এক ছড়া করে মালা ওদের সেটে সবাই পড়ে সন্ধ্যাবেলায়। যার ক্ষমতা আছে সে আসলই দুলোয়।

নকলমুক্তা দুলিয়ে শুভ্র হাত বার করে শ্যামলতা বলে উঠল: "হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি হচ্ছি শ্যামলতা—ever green!"

একসঙ্গে দু'জনে হেসে উঠেছিল—গোড়া থেকেই মিল ছিল।

নাচের আসরে ক্রমাগত পার্টনার। অবশেষে শ্যামলতার টেবলে একখানা দশহাজারের চেক ছেলের ভরণ-পোষণের উদ্দেশে রেখে দিয়ে গেল চলে শ্যামলতা সুশোভনের সঙ্গে কাশ্মীর-ভ্রমণে। পিনকুশনে গাঁথা চেক—মায়ের পরিবর্তে সুশোভনের দান সন্তানকে।

বিয়ে হ'ল না ওদের?

কি করে হবে? সুশোভন কায়স্থ, শ্যামলতা ব্রাহ্মণ। সুশোভন হিন্দু, শ্যামলতা ব্রাহ্ম। স্বামী বর্তমান, বিবাহ-বিচ্ছেদ হ'ল না, এখন সুশোভন একে-ওকে-তাকে নিয়ে ঘোরে, শ্যামলতা মদের নেশায় বাড়ীতে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। এক বাড়ীতে আছে বটে, শুনছি শীঘ্রই তাড়িয়ে দেবে সুশোভন। একটি জু-নারী তার মনোহরণ করেছে। নেহাৎ বাচ্চা, মাত্র আঠারো। তার

মা বিয়াল্লিশের ধাড়ী, পাড়ি জমাতে গিয়েছিলেন সুশোভন-সাগরে। ধর্ম্মতলার হোটেল চালান মা-বেটী, দেনার স্রোতে ভাসমান অবস্থায়। প্রৌঢ় সুশোভনকে জেটী করতে চাইলেন অগাধ সে কূলহীন তরঙ্গ-সাগরে। পঁয়তাল্লিশের কুমারের চোখে লাগল বালিকা জুয়েস্‌কে। মা মেয়েকে ঠেলে দিয়ে আড়ালে সরলেন। মেয়ের বয়সী কন্যকাকে নিয়ে এখন হাবুডুবু খাচ্ছে সুশোভন।

আইভি চুপ করে গেল। শুধু তার সূক্ষ্মাগ্র নাসিকার অগ্রভাগ কম্পিত হয়ে মনোবিক্ষোভ প্রকাশ করল। সুশোভনের কাহিনীতে শ্রীমতী এত বিচলিত কেন? পরিমল ধরে নিল, হয়তো যোগ্য প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করার প্রতিক্রিয়া এখন দেখা যাচ্ছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল পরিমল। এতক্ষণ রূপই দেখেছে, এখন অন্য কিছুও চেয়ে দেখতে লাগল একটু একটু করে। হাতের হীরার আংটী জ্বলছে পুরাতন দিনের মত। একখানা সোনার ফুলগাঁথা কঙ্কন একহাতে, অন্যহাতে ছোট হাতঘড়িটি মণির মত জ্বলছে। গলা-কান খালি। গহনা সে অনাবশ্যক বলে বর্জ্জন করেছে, কি গহনা নেই তার, কে জানে?

"তোমার মা-বাবা কোথায়, আইভি?"

"মাসীমা রঁাচিতে বাড়ী করেছেন। মায়ের শরীর ভাল নয়। বাবা মাকে নিয়ে রঁাচী আছেন। মায়ের প্যারালিসিসমত হয়েছে।"

"কলকাতার বাড়ীতে সুনীল থাকেন?"

"না, সুনী লিলিকে নিয়ে ইংলণ্ডে গেছে। বাড়ী লীজ দেওয়া হয়েছে। এখনও ফিরল না ওরা। হয়তো ওখানেই থেকে যাবে। ও দেশটা তো সুনীর চিরকালই পছন্দ।"

পরিমল দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীরব হ'ল। ফিরে এল তারা বর্ত্তমানে।

"তোমার ছেলেপিলে কি?" অবশেষে লাজুক প্রশ্নটি করে ফেলল পরিমল দ্বিধায়।

"নেই।" সংক্ষেপ উত্তর, "তোমার?"

"—হয়নি।" আইভি চকিত দৃষ্টি হানল। পৌরুষ কণ্ঠ পরিমলের। স্থির-চক্ষে তাকাল পরিমল আইভির দেহের প্রতি। ওই দেহ বাসনার অলকা। কামনার স্বর্গদ্বার। এখনও বন্ধ্যা পৃথিবী আইভির? কে সে অরসিক, যে সৃজনী প্রতিভায় সুন্দরীকে মহিয়সী করে তোলেনি? তবে কি—তারই মত অনুর্ব্বর

জীবন যাপন করছে আইভি স্বেচ্ছায়? না তো। তদ্গত স্বামীকে সঙ্গেই দেখা গেছে।

আহা, ও যদি আমার হ'ত! প্রতি রজনীতে পূজা করতাম ওই দেহ, ভোগ-লালসায় নয়, প্রেমিকের নিষ্ঠায়। কর্ষণ করতাম ক্ষেত্র একাগ্র সাধনায়। আমাদের প্রেমের প্রতীক দেখা দিত—সুন্দর শিশু। আমার চেয়ে, আইভির চেয়ে অনেক সুন্দর। সৌন্দর্য্য দেবতার শিল্পজ্ঞানের পরীক্ষা হ'ত সে। প্রেমের সাক্ষ্য।

আমি বাধা দিতাম না। নিষেধ করতাম না। পরিমল, তোমার-আমার মিলনের চিহ্ন হ'ত সেই শিশু। জগতে আমাদের গৌরবের বস্তু। আমরা ভালবেসেছি, মিলিত হয়েছি। মিলনকে স্বীকার করে ভবিষ্যৎকে সানন্দে উপহার দিতে সক্ষম হয়েছি—আর একটি মানুষ।

"ওঠা যাক, পরি। বাইরে হয়তো নিখিল আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

"হ্যাঁ, চল। তোমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে চল।" অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে আইভি বলল, "ব্যস্ত হয়ো না। ওঁর দিক থেকেই ব্যস্ততা আসবে।"

অশান্তিতে মন ভরে উঠল। স্বামী কি রকম আইভির কে জানে? সুশোভন ঈর্ষ্যান্বিত হ'লেও ভদ্র ছিল। ইনি হয়তো সোজাসুজি ওথেলো সাজবেন। আইভির কথায় ইঙ্গিত আছে একটা। সঠিক বোঝা না গেলেও চিন্তার বিষয়। স্বামীকে নিয়ে আইভি সুখী হয়তো নয়। কালো চোখের পাতার নীচে শ্রান্তি লেখা আছে, অধরের কোণে বিষাদ। পরিমলের প্রতি অপরিবর্ত্তনীয় মনোভাবের প্রকাশ মুখেচোখে লেখা। তাই তো স্বাভাবিক। সে বা আইভি কাউকে কি করে ভালবাসতে পারে?

স্টল ছেড়ে বেরিয়ে একটু এসেই দেখা গেল শ্রীমান্ নিখিল কিছু দূরে নিশ্চিন্ত দাঁড়িয়ে সিগারেট ধ্বংস করছে। মনে হয়, যেন আইভির এতক্ষণ কালক্ষেপের প্রণালী সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল ছিল সে। চিক্চিকে চুল-চোখ, ধূর্ত্ত চিতার লিক্লিকে ভাব। নিভাঁজ স্যুট, চক্চকে জুতো। মধ্যদেহী, শ্যামবর্ণ ব্যক্তি। ইনিই আইভির স্বামী?

এরই সঙ্গে ঘরে যাবে আইভি—যেতে হবে তাকে। এরই বাহুপাশ আইভির আশ্রয়? কোথায় মিল আছে এঁর সঙ্গে আইভির? অথচ সজ্জিত বিপনীর সবগুলো আয়নাই বলে দিচ্ছে পরিমলের পার্শ্ববর্ত্তিনী যে, সেই একমাত্র যোড়া

মেলাতে পারে। আর তার যোড়া একমাত্র মেলাতে পারে পরিমল। এতদিনে চাঁদের সঙ্গে সূর্য্য মিলেছে। জনতার চক্ষেও বিস্ময়।

কিন্তু হয় না, জগতে এ হয় না। প্রস্তুত রয়েছে আয়ান ঘোষ। ওগো রাধা, শ্যামকে ছেড়ে দিয়ে এস, এস; কুলে ফিরে এস।

"নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছি আনি,
বাঁশী কেন বলে, রাধা রাধা!"

কুঞ্চিত-ধূর্ত্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আপাদমস্তক দেখল পরিমলেব নিখিল। পরক্ষণেই আদর-আপ্যায়নে ফেটে পড়ল। গলে গেল সে ভদ্রতায় মাখনের মত, সামাজিকতার রুটীতে তুলে নিলেই হয়। চিন্তিত পরিমলের বাধা উড়িয়ে দিল নিখিলের দাক্ষিণ্যের দক্ষিণ হাওয়া। স্ত্রীকে দিয়ে পরদিনে নেমতন্ন করল চায়েব। বারবাব প্রতিশ্রুতি নিল যাবাব। অবশেষে করমর্দ্দন করে বহুদিনের পরিচিত বন্ধুব মত বিদায় হ'ল।

বিমূঢ় পরিমল, চিন্তিত পরিমল বাড়ী ফিরল ভাবতে ভাবতে। সত্যই কি এ আপ্যায়ন আন্তরিক, না মৌখিক? গায়ে-পড়ে আলাপ জমানো। যেন মনে হ'ল নিখিলেব কোন উদ্দেশ্য আছে? কিসের উদ্দেশ্য?

একটা রক্তাক্ত কেলেঙ্কারীব ছায়া ভেসে এল মনে। তাহ'লেই বা উপায় কি? আইভিব প্রেমে ফেবা জানে না পবিমল। ফেবা শেখেনি।

তেইশ

সন্ধ্যা! মধুব সন্ধ্যা! সারাবিশ্ব কমনীয়তায় স্নান করে উঠেছে। আকাশের এককোণে একটিমাত্র তারা—সন্ধ্যাতারা। ললাটিকা জ্বলছে। সমস্ত আকাশ নিস্তব্ধ, তারাফোটার আশায় মৌন হয়ে আছে।

এখনি সারা আকাশে রাশি রাশি তারা ফুটে উঠবে, গাছে যেমন ফুল ফোটে।

বারান্দায় দুটি শান্তিনিকেতনী মোড়া পেতে বসেছে আইভি ও পরিমল নীরবে। অর্থময় নীরবতা দু'জনকাব মধ্যে পরদার মত আন্দোলিত হচ্ছে। কে তাকে সরাবে?

চা-পর্ব্ব শেষ হয়েছে। চলে গেছে নিখিল কাজের ছুতোয় আবার পরিমলের মনে অস্বস্তি জাগিয়ে। কি উদ্দেশ ওর? অবশ্যই আছে একটা

কিছু। নইলে, এমনভাবে প্রথম দিনেই আইভি ও পরিমলকে সুযোগ দিয়ে অন্তর্ধ্যান ?

প্রথমে কথা বলল পবিমল, "আশ্চয্য লোক তোমার স্বামী! একদিনের আলাপেই স্ত্রীর বন্ধুব হাতে স্ত্রীকে ফেলে দিয়ে সরে গেলেন! মনে হয়, খুবই উদাবচেতা উনি। এধাব থেকে জিতেছ বেজায়। সুশোভন এমন হ'তনা।"

আইভি নিরুত্তবে হাস্য কবল।

পবিমলেব মনে যে চিন্তা এসেছিল, তাবই জের টেনে বলে চলল সে, "লোকটি খুব চালাক হ'লেও বেশ ভাল লোক। আমাব তো মনে হয় সাধাসিধে।"

অনিচ্ছুক আইভি বলল, "অনেক দেখবে ওঁব। ব্যাকুল হোয়ো না। সবে তো আরম্ভ।"

"তাব মানে ? উদ্বিগ্ন হযে পবিমল প্রশ্ন কবল।

"মানে কিছুই না। তোমাব টাকা আছে, তুমি বডলোক। তাই স্বামী তোমাকে খাতিব কবছেন।

পবিমলেব মন এ যুক্তি মানতে চাইল না। আবাব ত্রিভুজ স্বামী, স্ত্রী, প্রেমিক। তিনজনেব একত্রে থাকা চলে না। বহুলোকেব একত্র থাকা চলে সকল সম্বন্ধেব বাঁধনে। কিন্তু, এই লোকগুলিব একত্রিত চলে না। তিনেই তিনশো। একজনেব সবে যেতে হ'বেই। কে সে ? সে, বৈদেহী, আইভি—ত্রিভুজের বৈদেহী সবে যেয়ে আইভিকে স্থান দিয়েছে। এখন নূতন করে ত্রিভুজ রচনা হ'ল—সে, আইভি, নিখিল। কে সববে এখন ? কে কাকে সরাবে ? পূর্ব্বেব ত্রিভুজে একজন কল্পনায় ছিল। এবাবেব ত্রিভুজে তিনই বাস্তব। পরিস্থিতি জটিল।

কিন্তু যাবে কে ? নিখিলেব আছে মন্ত্রেব দাবী, অলিখিত সংস্কারের শিকল, লোকমতেব সায। তবু, পবিমল সবে যাবে না। মন্ত্রেব দাবীর উপরে দাবী তাব—প্রেমেব।

এই যে বুভুক্ষু দেহমন খাদ্য-প্রার্থনা কবছে—দেহি, দেহি। দাও, দাও আইভি। চাব বছবেব ক্ষুধা সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। প্রাপ্য তার সব তোমারি কাছে।

বেজবংয়ের জর্জ্জেটজডানো তনু—সন্ধ্যায় আলোয় হলদে শাড়ী আরও

হলুদ। গোপন রহস্ত বুঝি বা শাড়ীর পরতে পরতে বেঁধেছে বাসা। ঝাঁপিয়ে পড়বে পরিমল নীরব নারীর বুকে। দূরে শয়ন-কক্ষ দেখা যাচ্ছে। টেনে নিয়ে যাবে আইভিকে বিছানায়। ভেদাভেদ লুপ্ত হ্যে যাবে—অনন্ত তৃষ্ণার নিবৃত্তি হ'বে পলকে। চাই, আইভিকে চাই।

আর আইভি অনাঘ্রাতা কুমারী নয়—ছেড়ে দিতে হ'বে না সসম্ভ্রমে। সংযমের বাঁধন গলায় দিয়ে উদ্দাম অশ্বকে শাসন করতে হ'বে না। ওই দেহ আইভির কতবার ভোগ্য হয়েছে? তিনবছর বিয়ে হয়েছে বলেছিল। তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের ত্রিগুণ রাত্রি। শুধু বাত্রি কেন? দিনও নিশ্চয় ভোগের তালিকায় পড়ে। তিনশো-পঁয়ষট্টির তিনগুণ মাত্র? সহজ অঙ্ক কি অসামান্যাব জন্য? ছয় দিয়ে গুণ করা সমীচীন, নয় দিয়েও গুণ করা চলে কি?

ওই দেহ আইভির—মনসিজের ধনু ওই তনু। পরিমলের স্বপ্ন। সম্পূর্ণ উপভোগ করে চলেছে নির্ব্বিচাবে নিখিলেব মত একজন সামান্য পুরুষ! কি স্পর্দ্ধা নিখিলের? বিবসনা আইভির শুভ্র তনু শয্যায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ইস, কি নির্দ্দয় উপভোগ করছে নিখিল! পাণ্ডু মূর্চ্ছাতুর মুখ আইভির। হাতের মুষ্টি দৃঢ় হ'ল পরিমলের। হত্যা করব আমি নিখিলকে। হত্যা কবব। হত্যা করব।

তার আগে?

"আশাকরি, তুমি এখন সুখী হয়েছ, আইভি?"

রেলিংএ মাথা হেলাল আইভি। কালো চুলের কবরী রেলিংএব কাঠে পীড়িত হয়ে উঠেছে।

"তুমি সুখী হয়েছ?" আইভি জিজ্ঞাসা করল।

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।" পবিমলের স্ববে অকারণ ব্যস্ততা। কি জানি একমুহূর্ত্তের জন্যও যদি আইভি সন্দেহ করে যে সে সুখী হয়নি।

আইভি নয়ন নিমীলিত করল, 'অভিনন্দন।"

"ধন্যবাদ।" পরিমল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর দিল।

আইভি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল পরিমলের নত মুখের দিকে। সুখী হয়েছ তুমি? তথাস্তু! কিন্তু, কিসের জন্য তোমার নয়নে এত ক্লান্ত দৃষ্টি বেদনায় স্নাত? কিসের জন্য তোমার সারা দেহ বিশীর্ণ সুন্দর? কাকে প্রার্থনা করে তোমার মুখের প্রতিটি রেখা অতৃপ্ত, উদগ্রীব হয়ে আছে? ব্যর্থ কামনার যন্ত্রনা তোমার পল্লবমসৃন অধরে চিহ্ন রেখেছে। সুখী হয়েছ তুমি!

স্বর কেটে গেল। কামনা-বাসনার স্বর কেটে যেয়ে বেজে উঠল আবার নির্লিপ্ত উদাসী বাউল-রাগিনী। একটা চুরোট ধরাল পরিমল। অন্ধকার ঘনতর হয়েছে। আগুনের আভা কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তার মুখকে স্পষ্টতর করে তুলল। আইভি সহসা প্রশ্ন করল, "তোমার স্ত্রীর খবর কি ?"

ছায়াছবির মত বৈদেহীর জীবন খেলে গেল পরিমলের সম্মুখে। কই, তাকে বাদ দিয়ে ম্রিয়মানা নয়তো বৈদেহী! দিনকত নিরালা কাটাল। মধ্যে বাবা বেঁচে থাকতে ওঁর সঙ্গে গিয়েছিল বদরীকাশ্রম-তীর্থে। তারপরে, বাবা মারা গেলেন হঠাৎ। নিস্তব্ধ শোকের মধ্যে কাটল বৈদেহীর কতকগুলি দিন। বাবার টাকাকড়ি, বিষয়সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করতে হ'ল। নগদ টাকা বাবা জামাইকে অনেক দিয়ে গেলেও স্থাবর-অস্থাবরের মালিক বৈদেহী। তারপরে পরিমল-জননীকে সমুদ্র দেখাতে পুরী যেয়ে কয়েকটি মাস থেকে এল বৈদেহী। অবশেষে ফিরে এসে পিতার বসত-বাটীতে প্রকাণ্ড একট গানেব স্কুল খুলল বৈদেহী সবাইকে বিস্মিত করে। 'প্রসন্ন-স্বরায়ন নাম স্কুলের, দিনের পর দিন শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। সারা কলিকাতায় 'প্রসন্ন-স্বরায়নের' নাম যথেষ্ঠ। এখানে ওখানে মেয়েরা গানের কসরৎ দেখিয়ে বেড়ায়। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বৈদেহী দেবী, উপাধি পেয়েছেন জনসভার সম্বর্দ্ধনায়—'স্বর-সরস্বতী'। একখানা সঙ্গীত স্বর-সরস্বতীর শোনা নাকি সৌভাগ্য।

বৈদেহীর এখনকার রূপ হয়ে গেছে সম্পূর্ণ পৃথক—ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবল পরিমল। অযথা উগ্র প্রসাধন নিশ্চিহ্ন হয়েছে—সাদা শাড়ীর সুষমায় কুশ্রীকেও সুশ্রী দেখায়। পাউডার-ইত্যাদি প্রসাধনী-বর্জ্জিত বৈদেহীর মুখমণ্ডল কিন্তু হয়েছে অনেক উজ্জ্বল, অনেক সুশ্রী আজকাল। এমন কি, অতটা কুশ্রী বলে মনেই হয় না। প্রতিভার আপন লাবণ্যের ছাপ এতদিনে পেল বৈদেহী।

আর, দ্বিধা-সঙ্কোচ, ভীরুতা নিসন্দেহে পদদলিত করে দাঁড়িয়েছে এই নূতন বৈদেহী। আত্মপ্রত্যয়ের দীপ্তি সর্ব্বাঙ্গে ঝলকিত—হীরার গয়না যা দিতে পারেনি, সেই শোভা দিয়েছে বৈদেহীকে আত্মপ্রত্যয়। পরিমলের সঙ্গে কোন সংশ্রব নেই বৈদেহীর। নিজের টাকাকড়ি নিজে ব্যবস্থা করে নিজে খরচ করে। স্কুলের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখে। নূতন নূতন গানের মহলা দেয়। গলা সাধে। বাড়ীতে দেখা হয় যখন, পরিমলই কেমন অপরাধী হয়ে যায়, কিন্তু এই নূতন বৈদেহী স্বচ্ছন্দ্যে মুখ তোলে, স্বচ্ছন্দ্যে কথা বলে। যেন তার জীবনে পরিমল

এতটুকুও ভার দিতে পারেনি। সার্থক হয়ে উঠেছে সে, তাই পরিমল অবান্তর। এখন আমাকে ভালও বাসেনা ও। কি করে ভালবাসাব হাত থেকে মুক্তি পেল বৈদেহী? পরিমল পাবছে না কেন!

"হ্যাঁ, সুব-সরস্বতী বৈদেহী দেবীর নাম শুনেছি। কাগজে নামের শেষে লাহিড়ী না থাকায় চিনতে পারিনি আমি। অমন প্রসিদ্ধ মেয়ে তোমার স্ত্রী, তোমার গর্ব্ব হওয়া উচিত, পরি।" আইভি বলল।

তাইতো। 'লাহিড়ী' শব্দ নিঃশব্দে পবিহার করেছে বৈদেহী। 'দেবী' তার দ্বিতীয় নাম, পরিমল লাহিড়ীর স্ত্রী নয় সে।

"আমি প্রসিদ্ধ মেয়ের স্বামী হ'তে চাইনি। জগতে একটিমাত্র মেয়েরই স্বামী হ'তে চেয়েছিলাম।"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে আইভি যেন আপনার মনে বলে চলল: "অনেক পেয়েছ ভাগ্যের হাত থেকে। স্ত্রী পেয়েছ গুণী। অর্থ, যা মানুষের কাম্য, অকাতরে তোমাকে দিয়েছেন ভাগ্য। টাকা ছিল না তোমার, আপশোষ ছিল তোমার আজীবন। টাকাই প্রচুর কবে পেয়েছ। ভাগ্যবান তুমি।" ভাগ্যবান? আশ্চর্য্য! এভাবে কখন ভেবে দেখেনি পবিমল। যাব অভাবে প্রতিক্ষণ নিজেকে ভাগ্যহীন বলে মনে করছে সে—সে-ই ব্যক্তি তাকে ভাগ্যবান আখ্যা দিল!

"আব আমাব জীবন? Snoot ng St:ı—উড়ন্ত তারাব মত চলেছি অন্ধকাবে ছুটে। একদিন নিভে যাব।'

ঘনতবা সন্ধ্যা। অন্ধকাবে মুখ দেখা যায় না, তবু শুভ্র দেহ জ্বলছে মুক্তার মত। অজানিতে হাত চলে গেল। একখানা হাত চেপে ধরে আইভির সহসা ছেড়ে দিল পবিমল। মনে হ'ল, শয়নকক্ষের ভারী পবদার আড়াল থেকে নিখিল চৌধুরী বেবিয়ে আসছে পা টিপে টিপে। ধূর্ত্ত হায়েনা-হাসি শোনা গেল। হাতখানা উভয়ের দিকে তুলে ধরল নিখিল। ও কি? ওর হাতে কি? হিংস্র পিস্তল। আতঙ্কে শিউরে উঠল পরিমল। এ সে কি করছে? পরস্ত্রীর গায়ে হাত দিচ্ছে নাকি? ক্রুদ্ধ স্বামী কি ক্ষমা করবে? পুলিশ-আদালত-সংবাদপত্র কত না বিভীষিকার ছবি মনে এল। পরিমল লাহিড়ী নিজের চেষ্টায় মহানগরীতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—কত গুণগ্রাহী ভক্ত তার! ব্যবসায়ী-মহলে একডাকে চেনার লোক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সভাপতিত্ব, উদ্বোধন, পুরস্কার-বিতরণ, ধাপে

ধাপে সবই হয়ে যাচ্ছে। যে গতিতে চলেছে ও, তাতে ভবিষ্যতে প্রদেশপাল হওয়া অসম্ভব কি? দেশ তো স্বাধীন হয়েছে। এখন এমন একটা সস্তা কেলেঙ্কারী করে ভবিষ্যৎ মাটী করা উচিত নয়। ভিখারী পরিমল ঐশ্বর্য্যের দুয়ারে এসেছে। চিরকালের অবজ্ঞাত পরিমলের অসীম প্রাপ্তি। ঈর্ষ্যাপরায়ণ স্বামী আইভির অবশ্য! উদ্দেশ নিয়ে পরিমলকে কাছে ডাকছে। অন্তরঙ্গ হ'তে দিয়ে দেখবে প্রথমে জল কতদূর গড়ায়। নিখিলের বাঁকা হাসির তলায় মানে আছে। অস্বস্তিতে ভরে উঠল পরিমল। এখনি সরে যাওয়া কর্ত্তব্য।

কিন্তু, দৃষ্টি ফিরে গেল মর্ম্মরপ্রতিমা আইভির প্রতি। কোথায় যাবে পরিমল? অনন্ত শূন্যতা বক্ষে ক্রন্দন করে ফিরছে যার অভাবে, তার সাক্ষাৎ পেয়েও তুচ্ছ ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে বর্ত্তমানকে ঠেলে দিয়ে চলে যাবে সে নির্ব্বোধ? সে ভবিষ্যৎ নিস্ফলা, যাতে আইভি নেই, যাতে প্রেম নেই। সোনার মুকুট মাথায় অথচ ভিখারী ভবিষ্যৎ পরিমলকে ভিখারী করে ছাড়বে। না, যাবে না সে। জগতের একমাত্র সত্য প্রেম যেখানে, সেখানে থাকবে পরিমল। কেউ সরাতে পারবে না তাকে।

"আইভি, কিছু মনে কোরনা। তোমার স্বামী কি করেন?"

"কিছু মনে করবার দিন আমার চলে গেছে বহুদিন। কিছু না করে দিন চালানো আমার স্বামীর কাজ।"

"তার মানে?"

"মানে -" লজ্জাকর কাহিনী সুরু করল আইভি—"বিনা মূলধনে ব্যবসা চলে না, ব্যবসায়ের ভান চলে। কম্পানী না খুলেও শেয়ার বিক্রী চলে। ধার নিয়ে ধার শোধ না দেওয়া চলে। বিদেশ থেকে এটাই শিখে এসেছেন উনি। হাজারীবাগেও একইভাবে চলছিল বড়লোকী। আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। বহু ধার করেছিল। সদ্য বিদেশ-ফেরৎ। বড় বড় কথা মুখে। বড় চাল। লোকে বিশ্বাস করত। অবশেষে দেউলের খাতায় নাম লিখিয়ে চলে এল এখানে।"

"তোমার স্বামী দেউলে?"

"অবাক হ'বার কথাই, না? বিবাহে তো ওটাই মাত্র চেয়েছিলাম—টাকা।" চাপা-দেওয়া অভিমান মাথা তুলল আবার—এরই জন্য আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলে তুমি! এরই জন্য? তা-ও পেলে না। অদৃষ্টের পরিহাস।

"নিখিল দিন চালাচ্ছে দেনার সমুদ্রে ডুবে। অবশ্য দেনা করে বড়লোকী দেখা অভ্যাস আছে আমার। বিয়ের আগেও তো দেখেছি। তাইতো দারিদ্র্যকে অত ভয় করতে শিখেছিলাম। তবে, দেনার ভাব ছিল মায়ের এলাকায়। কোথা থেকে কি করে চালাতেন, পাওনাদারদের ঠেকিয়ে রাখতেন, জানতাম না। এবার ভার পড়েছে আমার ওপরে, তাই বিপদ।"

পরিমলের মুখ ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠল, "কি করে ঠেকাও তুমি ?"

"অনেক কিছুই করতে হয়, পরি। নাই শুনলে।"

"নিখিল তোমাকে ভালবাসে না ?"

"ওর ভালবাসার কোড আলাদা। আমাকে হস্তগত করেই আনন্দ। আমি ওর সম্পত্তি আছি, এতেই প্রীত। একটু আমাকে অন্যের হাতে ছাড়া ওর বিলাস মাত্র। প্রয়োজনে ব্যবহার করে ও আমাকে ওর গাড়ীর মত, ওর বুদ্ধির মত। তাছাড়া, ওর উপায়ই বা কি আছে, বল ?"

"তুমি, তুমি আইভি, কি কর ?"

"যা করা উচিত, পাওনাদারদের ঠেকিয়ে রাখা।"

"আইভি, তোমার আত্মীয়বন্ধুরা দেখে না ?"

"মা-বাবার কথা তো বলেছি। স্বনী-লিলিও এখানে নেই। কলকাতায় আমার তো এখন কোন নিকট আত্মীয় নেই। বন্ধুরা এক-আধদিন চা খেতে আসে। কলকাতায় আমরা নূতন এসেছি। ভেতরের কথা এখন প্রকাশ পায়নি।"

"মাদের লিখে জানাতে পার না ?"

"দরকার কি ? মা এখনও মনে করেন আমার বিয়েটা ভালই হয়েছে। সব জানলে মারা যাবেন। পক্ষাঘাতের রোগীকে এটাই কি জানাবার কথা ?"

"আইভি, আইভি। এমন জীবনে জড়িয়ে থাকার মেয়ে তো তুমি নও ? এ ছেড়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে পারতে তুমি।"

আইভি নিশ্বাস ফেলল, "আমাকে মা তো নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখান নি। পণ ছিল ওঁর আমি খাঁচার পাখী হয়ে থাকব। সব দিকে আমার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কৌশলে খর্ব্ব করে রেখে গেছেন মা। এত বয়সে নূতন করে কিছুই শিখতে পারব না।"

এতক্ষণের অস্বস্তির মানে বুঝল পরিমল আইভির ইঙ্গিত কি নির্দেশ

করছে, নিখিলের বাঁকা হাসির মানে কি বুঝল পরিমল। নিখিল ভয়াবহ সন্দেহ নেই, কিন্তু সে ওথেলো নয়। জন্ম-ধীবর নিখিল জালে তুলতে চায় জীবন্ত মৎস। হত্যা করা তার স্বভাবে নয়, জীইয়ে রাখাই ব্যবসায়।

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে আইভি ধীরে ধীরে বলল, "পরি, তুমি যাও। আমার অনুরোধ, এসনা এখানে।"

পরিমল আইভির সন্নিকটে সরে এল, পরিপূর্ণ ভাবে চোখের দিকে তাকাল। অন্ধকার কেটে যেয়ে জ্যোৎস্না উঠেছে। চোখের ভাব তার বহুভাষী। অভিমান বলছে: এখনও তুমি আমাকে চাওনা! ভালবাসা বলছে: তোমাকে না দেখা আমার শাস্তি। বেদনা বলছে: তোমার কষ্ট বুঝেছি, আমি।

মুখে কিছুই বলতে হ'লনা পরিমলের, আইভি চোখের দিকে তাকিয়ে আছে।

"পরি, তোমাকে কিছু বলা দায়। সমস্ত কথায় তুমি রাগ কর।" চোখ সরিয়ে মন্ত্রের মায়া কাটিয়ে বলে উঠল আইভি। ব্যথায় মুখ করুণ, বাঁকা চোখের পল্লবে মুক্তার মত অশ্রুর আভাস!—"বুঝতে চাও না কিছু তুমি। বোঝার বড় ভুল কর। চার বছর আগে ভুল করেছিলে।"

বেদনার সিন্ধু এক মায়ামন্ত্রে সরে গেল। এ কি আনন্দের প্লাবন সারা চিত্তে জাগে! সে আমাকে চেয়েছিল, আমাকেই! আর কাকেও নয়। সে মনে করে রেখেছে আমার ভুলের কথা! সে বলছে, আমারি ভুল হয়েছে!

কিন্তু, কেমন করে এ ভুলের সংশোধন হ'বে? প্রফুল্ল চিত্ত আবার মেঘম্লান। বিষাদের কলঙ্করেখা রাহুর গ্রাসে গ্রাস করেছে চন্দ্রকে।

কী ভুল! কী ভুল! সারা জীবনেও আর এ ভুল যাবেনা। ফুলের মত সহজ ভালবাসা, ফুলের মতই সুকুমার। নানা পরীক্ষা পার হ'তে পারলে তবে ভালবাসবার বা ভালবাসা পাবার যোগ্যতা হয়। তাই ভালবাসার পথে এত ভুল!

ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণা বহন করে যারা, তারা একটু অসাধারণ হ'তে চায়। তাদের মনের মধ্যে একটি গোপন কক্ষ থাকে, সে গৃহে কাউকে প্রবেশ করতে দিতে তারা ইচ্ছা করে না, অথচ অনেক সময় সে কক্ষের অস্তিত্বের আভাস না দিয়েও থাকতে পারে না। মনে হয়, মনের মধ্যের উড়ো আপদকে তাড়িয়ে দেওয়া দরকার। যে প্রেমিক-প্রেমিকা ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তে পড়ে পৃথক হয়, তারা কখনও চায় খেয়ালমত সে উড়ো আপদকে সযত্নে পুঁষতে। দুঃখকে অনেক

সময় আমরা ব্যবহার করি বিলাসিতা হিসাবে। আমি দুঃখী, এ চিন্তা যেন মনে স্বচ্ছ তৃপ্তি দেয়। আহা, আমার মত কষ্ট কেউ পাচ্ছেনা। এই যে আমার চারিপাশে অগণিত নরনারী, কেউ আমার সমকক্ষ নয়। কেবল এক বেদনা বহন করবার গৌরবে আমি উঠেছি তাদের বহু উর্দ্ধে, আমি তাদের থেকে স্বতন্ত্র।

ভাববিলাসীর ভালবাসা সদাউৎসুক। কবিতাপাঠ এবং সিনেমা-দর্শন ইঙ্গিত দেয়—চলে যাও, সোজা ধপাৎ করে পড় প্রেমে। আত্মপ্রসাদ অনুভব করে বিজন রজনীতে চাঁদের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেল, কিংবা পুষ্পগন্ধে উতলা হও। এই তো প্রেমে পড়েছি। লরেন্সের বই পড়ে, টলষ্টয়ের চরিত্র-বিশ্লেষণ করে বয়োজাত মোহকে প্রেম বল। দিন কেটে যাক অশ্বত্থমার ভ্রান্তি-বিলাসে।

পুরাতন প্রেম যাদের সার্থক হয়েছে, তাদের মনে রাখতে হ'বে পুরাতন ভালবাসা সৌখিন দ্রব্য। সযত্নে রাখতে হয় তাকে। সৌখীন সীবন কার্য্যের মত ঝেড়ে রৌদ্রে দিতে হয় মাঝে মাঝে। নইলে ছাতা ধরে যাবাব ভয় আছে।

আসল কথা ওই। ফুলের মত ভালবাসা। ফুলেব মত বিকশিত হ'তে দাও, ফুলের মত ঝরতে দাও। যতক্ষণ জীবন তার, থাক সে অপরূপ হয়ে। যখন তার পাপড়ি বিবর্ণ-ম্লান হয়ে আসে, তখন আরকে ডুবিয়ে তাকে রাখার প্রয়োজন কখন থাকলে সার্থকতা নেই।

কিন্তু, যে প্রেম ফুল্ল শতদল, সহস্রদল বিস্তার করে দিনেব পর দিন বর্দ্ধিত হয়ে উঠছে ; যার পরাগদল আলোকাভিলাসী, তাকে ঝরাবে কে ? তাকে তার প্রাপ্য তো দিতেই হয়।

চব্বিশ

আইভির কাল শাড়ী শুভ্র দেহে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। দুচোখ ভরে দেখার মত। কাল বেশ আইভির চায়ের টেবিলগুলোর এধার থেকে ওধারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। স্বামী সুসজ্জিত বেশে ভ্রমণশীল। বন্ধুরা তাঁর সরবে চা-পানরত। নিখিল চৌধুরী পার্টি দিয়েছেন!

বাংলোর চারপাশে খোলা জায়গায় ছোট ছোট টীপয়-টেবল পড়েছে। একটা টীপয়ে দূরে সরে বসে আছে পরিমল ভ্রূকুঞ্চিত করে। ঘৃণাব্যঞ্জক বিরক্তি

মুখে-চোখে তার। পীনেলোপীর স্বয়ম্বর-সভায় স্বয়ং ইউলিসিসও নিশ্চয় একটা ধ্বংসাভিলাষী ছিলেন না।

কিন্তু, অডেসির যুগ বহুদিন গত হয়েছে। পারছে না পরিমল আইভির প্রসাদভিক্ষুদেব ধ্বংস করতে। পরিবর্ত্তে শান্ত-শিষ্ট হয়ে দেখতে হচ্ছে। ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের পালের মধ্যে আইভিকে একা ফেলে যেতে পারেনা সে।

ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের পালই ওরা। অধিকাংশ পাওনাদার তারা, বেশ বোঝা যায়। অবাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক। স্ফীতোদর মারবার-তনয়ের অভাব নেই। মিসেস চৌধুরীর সুমধুর হাস্য, সুছন্দ বাক্যাবলী-সম্বলিত চা-পরিবেশন পাওনার অপেক্ষা লোভনীয় নিসন্দেহে। লুব্ধ দৃষ্টিতে চলমানা তন্বীর দিকে তাকিয়ে আছে তারা। হাসিও ভদ্র নয়। একদিন আইভি চৌধুরীর হাসি ও আলাপের বেড়ার মধ্যের ফল তারা পাবে, এমন বিশ্বাস তাদের আছে।

আইভির চারপাশে জনতা দেখতে পরিমল চিরদিনই অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু, সে জনতা স্বেচ্ছাচারী হ'লেও অভিজাতবংশের ভদ্রতা-মণ্ডিত ছিল। এরা সোজাসুজি অভদ্র শ্রেণী।

নূতন বড়লোক বাঙালী, যুদ্ধের কালবাজারে সাদা রূপোর ব্যবসা যার মেদে বাহুল্য এনেছে, সে 'হ্যা-হ্যা' হাসির সঙ্গে মিসেস চৌধুরীর গা-ঘেঁষে বসছে। আজন্ম তিষির চালানীতে বড়লোক মারোয়ারী স্ফীত হয়ে আংটী ঝলসে আইভির সঙ্গে রসিকতা করছে। লম্পট পাঞ্জাবীর সতৃষ্ণ দৃষ্টি বারে বারে পতিত হচ্ছে আইভির উন্নত বক্ষশীর্ষে, পশ্চাতের নিতম্বে। ধূর্ত্ত বেহারী মাথার টুপী খুলে গুণগুণ করে গান ধরেছে। পশ্চিমা মুসলমান তাক ধরে আছে করস্পর্শের অছিলায়। দুই একজনের সঙ্গে স্ত্রী নামধেয়া একটিদু'টি স্বৈরিনী আছে। তাছাড়া, প্রত্যেকেই নিসঙ্গ।

ঘৃণায় শিহরিত হয়ে বসে দেখছিল পরিমল। বিরহের কঠোর তপস্যায় নিজেব যা কিছু অমার্জ্জিত ছিল লুপ্ত হয়ে গেছে পরিমলের। প্রেম তাকে সম্পূর্ণ মার্জ্জন করতে পারেনি, করেছে বিরহ। নবজন্মে আজ জাগরিত পরিমল লাহিড়ী। নার্সিসাসের নবজন্ম কিসের আশায় ?

নিজের নবজন্মে সম্মুখের পশুজন্মধারীদের দেখে ঘৃণা হচ্ছিল পরিমলের। কি নির্লজ্জ এরা, কি নির্লজ্জ নিখিল! আইভি এদের সঙ্গে মেশে, এদের মনোরঞ্জন করে! কি ভাবে ? হঠাৎ মাথা গরম হয়ে উঠল। কতদূর গেছে

আইভি এদের সঙ্গে? তাকাচ্ছে ওরা কেমন করে আইভির দেহের দিকে? নিশ্চয়, ও দেহের স্বাদ ওরা জানে।

ঠিক! তাহ'লে সে-ই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? এতগুলি খাতকের পরিবর্ত্তে একা খাতক হ'বে সে। আইভিকে বেঁধে রাখবে। সম্পূর্ণ ভোগ করবে আইভিকে। নির্বোধের মত পাপপুণ্যের বিচারে পিছিয়ে রয়েছে সে। যৌবন-কালেও ছিল তাই। আর বিলম্ব নয়। আজই আইভিলতা, তোমার খেলার শেষ। এত নীচেই নেমেছ যদি, আমিও নীচে নামতে জানি।

অপরূপ সুন্দর মুখ হৃদয়-বেগে লাল হয়ে উঠল পরিমলের। শিরায় রক্ত চলেছে বন্যার বেগে। কান গরম হয়ে উঠেছে। আইভি কখন নিশব্দে পাশে এসে বসল।

এক এক করে নিমন্ত্রিতেরা চলে গেলেন। শুধু পরিমল বসে আছে। নিখিল চৌধুরী অভ্যাগতদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন কাজের অজুহাতে। যাবার আগে সবিনয়ে পরিমলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আইভির দিকে অর্থপূর্ণভাবে হেসে, "Ta, ta, dear," বলে চলে গেলেন। পত্নীর রূপজালে নূতন মক্ষিকা ধরা পড়েছে, এবারে চিন্তা নেই।

বিজন গৃহে এতক্ষণে আইভি কথা বলল। খানসামা চায়ের টেবল সরিয়ে নিচ্ছে। বসবার ঘরে চলে এল দু'জনে। এতক্ষণে আইভির মনে মনে যে কথা জমছে, তারই রূপ দিল আইভি, "আবার এসেছ তুমি? আমি তো তোমাকে নেমতন্ন করিনি। নিখিল আসতে বলবেই।"

"আইভি!"—ব্যথিত কণ্ঠ পরিমলের।

"এখন আর এসে লাভ কি, পরি? সব তো শেষ হয়ে গেছে। দেখছ আমার জীবন, আমার পরিবেশ। আগের জীবনে যাকে চিনতে, সে তো নেই আর। এসে লাভ কি তোমার?"

"কিছু না, কিছু না; কোন লাভ নেই, জানি। তবু তোমাকে দেখতে"—পরিমল চুপ করল হঠাৎ।

"জান পরি, স্বামী আমাকে অনুরোধ করেছেন তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে। এর অর্থ জান?"

"জানি।"

আইভি সবিস্ময়ে তাকাল,—"অনেক লোকের পতনের জন্যে দায়ী আমি। অনেকের বেলায় যা করেছি তোমার বেলায় পারব না। আমি তোমার ক্ষতি করব না। Why, I cannot ruin you."

পরিমল টেবলের ওপরে রাখা আইভির একখানা হাত ধরল। "আইভি!" স্বরে তার আবেগ, "আইভি, আমাকে যে জন্যে ঠেলে দিয়েছিলে আজ দেখছ সে জিনিষ কত তুচ্ছ। ভালবাসার মত অব্যয় নয় টাকা। দুদিনেই ফুরিয়ে যায়। একদিন"—পরিমলের সারা মুখ লাল হয়ে উঠেছে—"আমাদের ভাগ্য পৃথক হয়েছিল। আজ, let us share my fortune together, তোমার টাকা নেই, আমার আছে।"

আইভি ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে নিল। টেবলের ওপাশ থেকে পরিমলের দিকে চেয়ে হাসল। হাসিতে তার বিদ্যুতের ঝিলিক। "পরি, তোমার ভুল হয়ে যাচ্ছে," তীব্র বিদ্রূপের সুরে আইভি বলল, "আমি সাধারণ বাঙালী ঘরের মেয়ে। গল্স্ওয়ার্দির উপন্যাসের নায়িকা নই।"

এতক্ষণের শান্তসংহত আইভি-মূর্ত্তি পূর্ব্বের লীলায় সহসা ফিরে গেল। সেই অতীতের ব্যঙ্গ? বহুদিন এমন মূর্ত্তি দেখেনি কেউ। প্রেমিককে কাছে পেয়ে বিগতজীবনার উজ্জীবন হ'ল নাকি?

পরিমল অপ্রতিভ হয়ে বলল, "আমি বলছি, আমার টাকার অভাব নেই। যদি তোমার অভাব মেটাতে নাই পারি, তবে টাকায় দরকার কি?"

"ভাগ্যসুন্দরী বেশ হাস্যোদ্দীপক পরিস্থিতিটা সাজিয়েছেন, দেখছ, পরি? যে টাকার জন্যে তোমাকে নিতে ইতস্তত: করেছিলাম, সেই টাকা অবশেষে আসছে তোমার কাছ থেকে! কিন্তু, তুমি তো আমার অভাব মেটাতে পারবে না। অযথা চেষ্টা করবে কেন?"

"অভাব কি এতই বেশী? দুটি তো প্রাণী মোটে।"

"একটি প্রাণীই যে হাজারের সমান। নিখিল টাকা খরচ করতে জানে না, ওড়াতে জানে। একটা মোটা অঙ্ক হাতে এলেই আগের ধার শোধ না করে ধার করে আবার বাবুগিরি চলে। সুতরাং, ধার দিয়ে কি করে অভাব দূর করবে তুমি?"

"ধার না দিয়ে যদি আমার ফার্ম্মে একটা কাজ দি?"

"একই কথা, পরি। মিল তো চলছিল ভাল গোড়ায়। কিন্তু, যার কাজ করার ইচ্ছা নেই, যে ধার করে দিন কাটানোকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে,

তার কি সংশোধন হয়? আমি কি চেষ্টা করিনি? হাল ছেড়ে দিয়েছি। আমার শরীরমনে আর শক্তি নেই। মদের দোকানে একরাত্রে তিন—চারশো টাকা উড়িয়ে যে বাড়ী ফেরে পরের দিনের অন্ন-সংস্থান না রেখে, তাকে নিয়ে চলি কেমন করে? ভদ্র ঘরের মেয়ে আমি, এমন জঘন্য কাণ্ড নিয়ে রোজ ঝগড়া পোষায় না।"

পরিমল লাফিয়ে উঠেছিল, "অ্যাঁ, নিখিল মাতাল?"

"মাতাল নন, মদ খান মাত্র আভিজাত্যের তাড়নায়। নইলে, বড়-লোকী হ'ল কিসে? বন্ধুদের নিয়ে মদের দোকানে তিনশো উড়িয়ে আবার ওদের কাছ থেকেই পাঁচশো ধার করেন। ওরা ওঁর অভিজাত্যে সন্দেহ করতে পারে না। বড়লোক হ'লেই তো মদ খেতেই হ'বে। তুমি খাওনা এখন?"

"কি যে বল, আইভি!"

"ওইতো, ওই জন্যেই ভাল লাগে তোমাকে। তোমার বিশেষত্ব, তুমি আমার চারপাশের পুরুষের মত নও।"

চিন্তাক্লিষ্ট মন পরিমলের আইভির ভাললাগাটুকু মধুর মত লেহন করতে লাগল। একটু পরে দ্বিধার সঙ্গে আবার বলল, "তাহ'লে, তোমার স্বামীকে সংশোধন করাই অসম্ভব, না?"

"আমার তো তাই মনে হয়।" নির্লিপ্ত স্বর, যেন এতে আইভির কিছু আসে যায় না।

একটা সন্দেহ ছুরির মত পরিমলের মনে প্রবেশ করল—"আইভি, ওই ধরণের লোকজনের সঙ্গে তুমি কতদূর গেছ?"

"যতদূর নিজেকে নষ্ট না করে যাওয়া চলে। একবার তা-ও হয়ে গেছে। হাজারীবাগে পাওনাদার বাড়ীর আসবাবপত্র প্রকাশ্যে টেনে বার করতে গিয়েছিল।"

"আইভি!"

"অমন করে চীৎকার করে উঠনা, পরি। তোমার কাছে কিছুই গোপন করব না। এমন অনেকে করে। তুমি কি জান না? ন্যাকা সাজছ কেন?"

সেই আইভি, অভিজাত-দুহিতা, নিষ্কলুষ-চরিত্রা। কুমারী আইভি, রূপ ও রুচিতে বরণীয়া। পরিমলের দেবী। আজ লালসার হাত স্পর্শ করেছে তাকে!

আইভি কোমল কণ্ঠে বলল, "নিখিলের সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়ে গেল

তারপরে। অতদূর আমি যেতে পারব না বলে দিলাম। ও বাধ্য হয়ে দেউলে হ'ল।"

আইভি পঙ্কস্রোতে ভাসছে। চরম-সীমায় না গেলেও সে, অনায়াসে শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করছে প্রতিদিন। ওই রকম সাহচর্য্যে? আইভিকে নিয়ে কি করা যায়, কি করা যায়!

"আশ্চর্য্য, স্বামী ত্যাগ করনা তুমি!"

আইভির নেত্রে দূরপ্রসারী স্বপ্নের ছায়া নামল। অতীতের আইভি।

"শ্যামলতা স্বামী ত্যাগ করেছিল, পরি। স্বামী তাকে উপযুক্ত বিলাসের উপকরণ যোগাতে পারেননি। তার ছেলেকে তো তুমি দেখনি। মায়ের বদলে দশহাজার টাকা পেয়ে দিন কেমন চলছে ওর, জান? বুড়ো পিসী এসে আছেন দেখাশোনার জন্যে। ওর বাবা মনের দুঃখে আর কলকাতায় ফেরেন না। একলা-একলা ছেলেটা ঘুরে বেড়ায় অন্ধকার খালি বাড়ীটার আনাচে কানাচে। আমি তার মুখ দেখে এসেছি।"

"এ কথা বলার অর্থ কি, আইভি? তোমার তো ছেলে নেই।" স্বপ্নাকুল দৃষ্টিতে আইভির মমতাছায়া নেমে এল, "নেই। এতদিন ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু, হ'তে দোষ কি? আজ রূপ আছে, আছে যৌবন, সন্তানের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যখন এ সব কিছু থাকবে না, তুমিও থাকবে না, পরি। তখন থাকবে সে-ই আমার। মাকে সন্তান ফেলতে পারে না।"

"সন্তান চাই বলেই কি স্বামী?"

"কতকটা তাই এখন হয়েছে। আগে ছিল লোকাচার, কেলেঙ্কারীর ভয়। সকলেরই যদি বিয়ে মনের মত না হয়, সবাই যদি চলে আসে, সমাজ থাকবে কোথায়? চলেই বা যাব কার কাছে? যাবার মত শক্তি নেই আর। চারবছর আগে আমার মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। চুপচাপ দিন কাটুক, এই আমার কাম্য।"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে পরিমল বলল, "সোজা করে কথা বল। এই বিশ্রী আবহাওয়ায় সারাজীবন থেকে যাবে তুমি? যে লোককে শোধরানো যাবে না, তার অন্যায় সহ্য করে চলবে নাকি?"

নিশ্চিন্ত সুরে আইভি বলল, "কতদিন চলবে কে জানে? না চললে ব্যবস্থা করব। আজ শক্তি পাচ্ছি না, কাল হয়ত পাব—সন্তান থাকলে জীবনের উদ্দেশও থাকবে। তারি জন্য বাঁচব ভাল করে।"

"সন্তানের পিতা ওই নিখিল চৌধুরী? আইভি, আমি কি অক্ষম হয়েছি?"

আইভি বিস্মিত হ'ল না: "সে ছেলের কাছে তোমার কি পরিচয় দেব আমি? মাতৃগর্ব্বে মাথাটা নিশ্চয় উঁচু হয়ে উঠবে না তার।"

বিচলিত পরিমল ত্রস্তে বলল, "বৈধতাব ব্যবস্থাও তো আছে।"

"তুমি জান না, আমার হিন্দুমতে বিয়ে হয়েছে। এ বিবাহের বিচ্ছেদ নেই, আষ্টেপৃষ্ঠে ললাটে বন্ধন। শ্যামলতার কেস্।"

"মুসলমান হ'ব আমরা।"

"পাগলামী কোরনা, পরি। নিখিল আমাকে ভালবাসে, তোমার স্ত্রী আছে। তাদের কি গতি?"

চকিতে নূতন বৈদেহীর নূতন মুখখানা ভেসে এল পরিমলের চোখের সম্মুখে, প্রতিভাদীপ্ত মুখ। কিন্তু, বৈদেহী তো আর ভালবাসে না পরিমলকে।

"আমার স্ত্রী গান নিয়ে, আর তোমার স্বামী মদ নিয়ে বেশ থাকতে পাববে। তাদের জন্যে চিন্তা নেই।"

"ছি, পরি। যে ভালবাসাকে সার্থক করতে নিজেরা অবৈধ কাজ কবব, অন্যের সেই ভালবাসাকে ব্যর্থ করব কোন যুক্তিতে? প্রেমই যদি জীবনের চরম সার্থকতা হয়, সে সার্থকতার অধিকার ওদেরও আছে। আমাদেব দর্শন যে ভ্রমাত্মক হ'বে।"

"প্রেমের রকম-ফের আছে। যার দাবী বেশী, সে-ই পাবে।"

"'শেষের কবিতার' ভাষায় কথা বোল না, পরি। তোমাকে আবার দেখার পর থেকে জীবনে আশা এসেছে আমার। শুধু তোমার ভালবাসার জন্যেই ভাল হ'ব আমি। অবলম্বন ছাড়া পারব না। তাই চাইছি সন্তান।"

"প্রেম কি সব চেয়ে বড় অবলম্বন নয়, আইভি?"

"টেনে নাবাব তোমাকে, নিজেও নামব? সব বিষ হয়ে যাবে। শ্রদ্ধা ছাড়া ভালবাসা থাকে না। শ্যামলতার কেস্ আবার।"

"শ্যামলতার ভূত ঘাড়ে চেপেছে তোমার। সকলেই সুশোভন নয়।" অত্যন্ত শুষ্ক-নীরস স্বরে আইভি বলল, "ওকথা থাক। যে আলোচনায় লাভ নেই, লোকসান আছে, সে আলোচনা বন্ধ করাই ভাল।"

অসহ্য ক্রোধে আপাদমস্তক দগ্ধ হ'তে লাগল পরিমল। লজ্জাও নেই,

অস্বস্তিও নেই আইভির। স্থগিত জীবন-যাপনে ধিক্কার নেই! যে হাত বাড়িয়ে দিল তুলে আনবার উদ্দেশে, তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চায় ও! অতীতের আইভি, দীপ্তি যার হীরক-দীপ্তি ছিল, রুচি ছিল শুচি। যে আলস্য না করছে সেই আইভির সঙ্গে এখন মিলতে পারছে ঘনিষ্ঠতায়। আর যে ভয়ানক কথা বলে দিল একটু আগেই! স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষ ভোগ করেছে ওকে? কি সর্ব্বনাশ!

পুষ্পবাণধারী অদৃশ্য বায়ুস্রোতে সংযোজিত-ধনুঃশর এলেন।

মনে নেই? অভিসম্পাত দিয়েছিলে একদিন তুমিই? এক মস্ত কালবৈশাখীর দিনে?

না, না। পরিমলের অন্তরাত্মা হাহাকার করে উঠল।

তিরস্কার করেছিলে পতিতা বলে, মনে নেই? প্রকৃত প্রেম ছিল মনে তোমার। বঞ্চিত প্রেমের দীর্ঘশ্বাস—বঞ্চিত প্রেমের অভিশাপ। মহাশ্বেতার অভিশাপে পুণ্ডরীক যদি শুক হন, তবে তোমারি অভিশাপেই বা আইভিলতা পতিত হ'বে না কেন?

আমি ওকে পতিত হ'তে দেব না। রক্ষা করব। অন্তরাত্মা বলে উঠল।

তুমি ওকে আরও পতিত করবে। তোমার মনের ভাব দুঃশীল। আমার প্রভাবে তুমি বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছ।

আমি ওকে পতিত করব না প্রাণান্তেও। বিধাতা আমাকে রক্ষা করবেন।

বিধাতার ওপরেও যে বিধাতা আমি। দেখবে?

পুষ্পধনু কৃশানু ঈষৎ হাস্য করলেন। ত্রিলোকের গর্ব্বখর্ব্বকারী হাস্য। অদৃশ্য হ'লেন তিনি। একটি অশোক ঝরে পড়ল।

ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠতে লাগল পরিমল চিন্তার ধারা ধরে। তার কাছে নীতিবাগীশ সাজছে আইভি, অথচ রূপাদান করে চলেছে সকলকে। একজনের কথা উল্লেখ করল নিজমুখে নারী হয়েও। হয়তো, অনেকে আছে আরও। হয়তো কেন? নিশ্চয়ই আছে। এত আড়ম্বরে দিন চালাবার রসদ যোগায় যারা, তারা ধারে আগাগোড়া কারবার করে না। ঝুনো ব্যবসায়ী, সাতঘাটের জল-খাওয়া বণিক যারা, তারা শুধু মিষ্টি কথায়, মিষ্টি হাসিতে সন্তুষ্ট থাকার ব্যক্তি নয়। অনুরূপ মিষ্টান্নের খোঁজ করে তারা। কেবল পরিমলের বেলায় রসহীন

প্রীতি কথা ? ভণ্ড আইভির ভণ্ডামীর শেষ নেই। অতীতের প্রেমিকের চক্ষে শুদ্ধ থাকার লোভ।

আজ ফিরবে না পরিমল লাহিড়ী। যার ধ্যানে সে দেহে মনে আজও কুমার রয়ে গেল বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও, যার প্রতি অসীম প্রেম সুযোগ সত্ত্বেও অন্য রূপসীর দিকে ফেরাল না তাকে; সেই আজ পতিত। শুদ্ধ রয়ে গেল পুরুষ ? উল্‌টপুরাণ বটে।' আইভির অসামান্যতা পরিমলকে পবিত্র রেখেছিল। নির্বোধ পরিমল। কিন্তু, আর নির্বোধ রইবে না সে। সকলে যা চেয়েছে ও পেয়েছে, তাই চায় সে।

আলো জ্বলছিল ঘরে। পরিমল আলোর সুইচ্‌ বন্ধ করে দিয়ে আইভির সোফার পেছনে দাঁড়াল। নিবিড় অন্ধকার, কোথাও কেউ নেই। ঘন নিশ্বাস পরিমলের নিস্তব্ধতার বক্ষে হাতুড়ির ঘা মারছে।

আইভি ধীরে ধীরে বলল, "আমি বড় ক্লান্ত আছি। এবার শুতে যাব।"

হাতের ঘড়ি দেখে পরিমল অবহেলাভরে বলে উঠল, "মাত্র সাড়ে আটটা। সন্ধ্যেবেলায় শোয়া তোমার অভ্যাস নাকি ? আর, ক্লান্তির কি আছে তোমার ? বেয়ারা-বাবুর্চি টেবল সাজিয়েছে। একটু হেসেছ মাত্র।"

আইভি নিরুত্তরে উঠে দাঁড়াল। কম্পিতপদে পরিমল তার পিছন থেকে পাশে এল।

"শুতে যাবেই নাকি ? বেশ, চল। আমিও যাচ্ছি সঙ্গে।"

"তোমার আজ কি হয়েছে, পরি ?"

"কি হয়েছে বোঝনা ? এত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও!" সম্মুখে পথরোধ করে দাঁড়াল পরিমল। লোলুপ-রুক্ষ হাত তার, সজোরে আইভির বাহু দুহাতে চেপে ধরে বুকের কাছে টেনে আনল আইভির কমনীয় তনু।

হতাশার স্বরে আইভি বলল, "সকলের মত হোয়ো না তুমি। অন্ততঃ, একজনের ওপরেও বিশ্বাস রাখতে দাও। আমি শিকার, তুমি শিকারী। এ ছাড়া অন্য পরিচয়ও আছে নারী-পুরুষের।"

কোন কথাই পরিমল তখন শুনতে পাচ্ছিল না। কর্ণ বধির প্রায়—হাত-পা মস্তিষ্কের নির্দেশ মানতে প্রস্তুত নয়। তাদের নির্দ্দেশের কেন্দ্র পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে অন্য অঙ্গে।

হিংস্র-তীব্রতায় পরিমলের অধরোষ্ঠ গ্রাস করল আইভির অধরোষ্ঠ। এমন

চুম্বন জীবনে কখনও পরিমল দেয়নি আইভিকে। রুক্ষ-পৌরুষ, অতিদীর্ঘ কাম-চুম্বন।

প্রাণপণে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করতে করতে রুদ্ধস্বরে আইভি বলে উঠল, "আমাকে নিতে প্রবৃত্তি হয় তোমার? আমি তো আগের আইভি নেই।"

উত্তর—দীর্ঘতর, অধিক হিংস্র চুম্বন। প্রেমিকের প্রেম-চুম্বন নয়। বুভুক্ষু পুরুষের দীর্ঘ, অবাঞ্ছিত কৌমার্যের প্রতিক্রিয়া।

এখানেই, এখনই। প্রশস্ত সোফা আছে। আইভির বিবশ দেহ বক্ষে তুলে নিয়ে সোফায় রক্ষা করল পরিমল। কিন্তু, এত হাল্কা হয়ে গেছে ও? পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা ফিরে এল। এত দুর্ব্বল হয়েছে আইভি? তন্বীকে চেয়ে দেখে ধরা পড়ে না সহসা। বুকে তুলে নিলে বোঝা যায়। সোলার মত হাল্কা হয়ে গেছে।

আইভির মুখের ওপর আবার নত হ'তেই চোখে পড়ল তার শিথিল দক্ষিণ হস্ত সোফার নীচে বিলম্বিত হয়ে আছে। শিরা-বহুল শীর্ণ হাত—নীল ধমনীর তন্তুজালে স্বাস্থ্যহীনতা প্রকট। কিউটেক্স-রং করা হয়েছে আঙ্গুলে সত্য; পার্টির জন্য বোধহয়। কিন্তু তর্জ্জনী, অঙ্গুষ্ঠের মাথায় লেগে আছে হলুদের ক্ষীণ আভাস। তবে? সন্ধানী দৃষ্টিতে আইভির আপাদমস্তক দেখল পরিমল। জানালা দিয়ে বাইরের আলো এসে পড়েছে।

আইভি সব কথা বলেনি। পরিমলকে যে বেদনার হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল, তাকে বেদনা দিতে যাচ্ছে পরিমল! আইভির অভাব কত বেশী, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। টাকা ওড়ায় নিখিল, আইভি কি করে?

রুক্ষকরতল গৃহকাজে। কঠিন কর্ম্মে পদ্মপাণি বজ্রপাণি হয়েছে। খানসামা একটি রয়েছে শোভা-বর্দ্ধনে। আর লোক রাখা সাধ্যে কুলোয় না আইভির। যে চপ একটু আগে লম্পটের দল গিলল, আড়ালে বসে ভেজেছে আইভি গোপনে। হলুদ পিষতে হয়েছে, উনুন ধরাতে হয়েছে। সমস্ত খাবার তৈরী করে, সাজঘরে হাসতে হয়েছে। সে ক্লান্ত হ'বে না?

প্রাণের দায়ে, মানের দায়ে সুখাদ্য সাজিয়ে পার্টি দিলেও অনাহারে, অর্দ্ধাহারে বিশীর্ণা আইভি। ঠাট রাখ্‌তে যেয়ে নিখিল প্রাত্যহিক প্রয়োজন খর্ব্ব করে এনেছে। মনের কষ্টে আইভি প্রতিবাদ করেনি। নিশ্চেষ্ট পুতুলের মত দিন কাটিয়েছে।

এই হাত! পাণিগ্রহণের স্বপ্নে যাকে সসম্ভ্রমে গ্রহণ করত পরিমল। এই হাতেই লেখা আছে আইভির ইতিহাস।

আবার মুখের দিকে তাকাল পরিমল। পাণ্ডু, মূর্চ্ছাতুর মুখ আইভির। নারীর অসহায় আত্মসমর্পন। কতবার করতে হয়েছে? যার জীবন শ্মশান হয়ে গিয়েছিল প্রেমিকের বিরহে, তার ভালমন্দে যায় আসে না। তবু, প্রেমিকের স্মৃতি ছিল। আজ সে প্রেমিকও মরে গেছে।

দুর্ব্বল, ক্লান্ত, স্বাস্থ্যহীন নারীর অনিচ্ছায় তার ওপরে অত্যাচার করতে চলেছে কে? যে একদিন ভালবেসেছিল। যে এখনও ভালবাসার গর্ব্ব করে। যাকে আইভি এখনও ভালবাসে।

এই পাণ্ডু মুখের ছবি নিখিলের শয্যায় কল্পনায় দেখে পরিমল নিখিলকে ক্ষণিকের জন্যও মনে মনে হত্যা করতে চেয়েছিল। আর এখন?

অস্ফুট আর্ত্তনাদে মাথা নামাল পরিমল—আইভির মুখে নয়, আইভির বুকে নয়। সোফার নীচে প্রসারিত আইভির পদযুগলে মুখ আবৃত করল সে।

নিমীলিতনেত্রা নেত্র উন্মীলন করল। অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা প্রাণ ফিরে পেল। সবিস্ময়ে আইভি অনুভব করল, প্রিয়ের অশ্রুপ্রবাহে পা দুখানি সিক্ত হয়ে উঠেছে তার।

দুর্ব্বল মানুষ ঈশ্বরের নির্দ্দেশে প্রেমের স্বর্গ রচনা করল জৈবিক-তাড়না অগ্রাহ্য করে। পুষ্পধনুর অশোক-তীর বিফল হয়ে তূণে ফিরে গেল।

বিধাতার কাছে আজ কৃশানু সম্পূর্ণ পরাজিত হ'লেন।

—পঁচিশ—

সাজ-টেবলের ওপর একছড়া মুক্তামালা পড়ে রয়েছে।

মালার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে আইভি চুপ করে। অনেকক্ষণ পরে আইভি পরিমলের দিকে তাকাল। শোবার খাটে পরিমল অপ্রতিভ হয়ে বসে আছে।

"কি করে বন্ধকী টিকেট্‌টা পেলে?"

পরিমল উত্তর দিল, "তোমার হাতব্যাগের মধ্যে ছিল। সবুজ চামড়ার পার্শটার মধ্যে, চুরী করেছিলাম।"

মালাটি হাতে তুলে নিল আইভি, "এই একটিমাত্র দামী গয়না আছে আমার। জন্মদিনে মা দিয়েছিলেন।" একটু হেসে বলল আইভি, "ধারে এ-ও কেনা ছিল।

সুনীর বিয়ের টাকায় ধার শোধ হ'ল। অনেক আশায় কেনা, মায়ের। এতদিনও খোয়াই নি।"

মনে পড়ে গেল পরিমলের, জন্মদিনের সন্ধ্যায় নিরালায় একটু পেয়েছিল আইভিকে। প্রত্যেকটি মুক্তায় একটি করে চুম্বন দিয়ে বলেছিল পরিমল, "যখনই এই মালাছড়া গলায় পরবে, মনে রেখ, এটি আমারি চুমোর মালা তোমার গলা ঘিরে দুলছে—সাধারণ মুক্তোর মালা নয়।"

সেই স্মরণ কি মালাকে বিশেষত্ব দিয়েছে, তাই সযত্নে আজও রক্ষা করেছে আইভি ? না, ঠাট বজায় রাখতে একটা-দুটো দামী অলঙ্কার চাই ?

আইভিব চোখের দিকে জিজ্ঞাসু পরিমল তাকাল। তার মন-প্রাণ পূর্ণ করে উত্তর এল চোখের ভাষায়—আইভি ভোলেনি। পরক্ষণেই আইভির চোখ ভৎর্সনা করল।

পরিমল খাট ছেড়ে আইভির কাছে এগিয়ে এল—"তোমার গলার একটা মালা ছাড়িয়ে আনবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে আমার।"

"সেটা ভাল করে তুমিই জান।" আইভির স্বরে ব্যঙ্গ।

উত্তেজিত হয়ে পরিমল বলল, "হ্যাঁ, জানি। সে অধিকার আমার আছে। নইলে, তোমার সামনে আব আসতাম না।"

"পবি, তোমার মনে রাখা দরকার আমার স্বামী আছেন এবং আমাকে ভালবাসেন।"

"ভালবাসা কি বকমেব ?"

"প্রত্যেকের শাস্ত্র আলাদা। নিখিল ভাবে আমি তারই। তুচ্ছ প্রয়োজনের তাগিদায় একটু ছাড়তে দোষ কি ? দেহ গৌন, মনই সব, এই বুঝিয়েছে আমাকে। আমি অন্য কাউকে ভালবাসি বুঝতে পারলে সে পাগল হয়ে যাবে। তুমি আমাব পূর্ব্বপরিচিত এটুকুই জানে সে মাত্র। তোমার ভালবাসার শাস্ত্রও তো আলাদা। কেউ কেউ এরকম ক্ষেত্রে দূরে সরে যেত।"

"তার মানে, আমাকে দূরে যেতে বলছ ?"

আইভি নিরুত্তর। একটু পরে চেষ্টা করে সহজ হ'ল সে, গলায় মুক্তাহার পরল সে।—"নিলাম মালা। এ তোমারি উপহার। কিন্তু, তুমি এস না। পায়ে পড়ি তোমার, তুমি এস না। বারণ করলেও শোন না কেন ? পাঁচবছর আগের ছেলেমানুষী—"

"আইভি, আইভি, তাকে তুমি ছেলেমানুষী বল।"

"তাছাড়া, আর কি বলি?" আইভি উত্তর দিল—"এ রকম তো প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে হচ্ছে। তুমি ভাবছ একটা অসাধারণ বস্তু, তা নয়।—

"—The same old story everywhere,
A roving heart and a roving glance'—"

তোমার Vautrin-কে মনে আছে? সেই যে তুমি আর আমি একসঙ্গে পড়েছিলাম ব্যাল্‌জাকের 'গুল্ড্ গরিয়' ? সেই যে ভোঁত্র্যা.? সব সময় এই গানটা করত?"

"সব মনে আছে।"

দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দে আইভি বলে উঠল, "এতো বিশেষ সুরে এ কথাটা বলে দশইঞ্চি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলার কারণ কি?"

"আইভি, তুমি ঠাট্টা কোর না। জগতকে নিয়ে বিদ্রূপ সহ্য হয়, এ জিনিষটা নিয়ে ছাড়া। তোমার ভুল হয়ে যেতে পাবে, কিন্তু আমার মনে আছে। প্রতিটি কথা, প্রতিটি দিন আমার এমন করে মনে আছে! তুমি কি বুঝবে? আমার নিজের অতীতকেও আমি এমন করে মনে রাখিনি। সেই পাঁচ বছর আগে আমি চলে গিয়েছি। তা নইলে, বাঁচতাম কি নিয়ে?"

এসব কথা শুনতে ভাল লাগলেও শোনবার উপায় নেই। একজন বিবাহিত ভদ্রব্যক্তি অপরেব স্ত্রীকে এমন কথা বলছে? গোপনে বাখতেই হয়—জানাজানি হ'লেই দোষ। ঈশ্বরের অভিশাপ মানুষ সেদিনই মাথায় তুলে নিয়েছে, যেদিন সে সমাজ ও সংস্কার দিয়ে আপনার মুক্ত আত্মাকে বন্ধন করেছে। মানুষ কেন নিজের সুখের পথে এমন অভ্রভেদী চীনের প্রাচীর নির্মান করেছে? 'Sanini' এর যুক্তিগুলো মনে এল আইভির। যাকে আমার চাই, কিছুতেই পাওয়া যাবে না তাকে। যে কথা শুনতে ভাল লাগে সে কথা বিষবৎ ত্যাগ করতে হ'বে। কেন? সমাজ তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন বলে।

সমাজ ধ্বংস হ'ক। তাহ'লেই কি পাব তাকে? বিফল জীবন কদর্য পরিবেশে নেমে এসেছে, এর মধ্যে কোথায় স্থান দেব প্রেমকে? যাকে ভালবাসি তার লোকের মধ্যে মুখ তুলে দাঁড়াবার উপায় রাখব না, কল্যাণের পথ থেকে ভ্রষ্ট করব তাকে জোর করে তার সঙ্গে পথ চলে? একদিন তো পথের শেষ

হ'বেই, সে শেষ কেমন? কোন পথে যাবে তাদের জীবন, যদি সে জীবন অবৈধরূপে যুক্ত হয়?

আইভি নিজের ও পরিমলের কথা ভাবছে স্বার্থপরের মত। পরিমল ও নিজের মধ্যে কোন বিয়োগ দেখতে পারে না সে, তাই নিজের কথা ভাবা মানেই পরিমলের কথা ভাবা। স্বার্থপর আইভি? কিন্তু, বৈদেহী? কিন্তু, নিখিল? তাদের কথাও ভাবছে আইভি।

আইভির নীরবতায় অসহিষ্ণু পরিমল বলে উঠল, "তোমার কাছে কিছুই চাইনা বদলে। একদিন ভুল হয়েছিল বলে কি আমাকে অবিশ্বাস করবে? তোমার কাছে থাকাই আমার পরম আনন্দ। আর কিছু চাই না আমি।"

"আজ কিছু চাইছ না সত্যি। কিন্তু, কতদিন থাকবে এমন, শুনি? প্লেটোনিক প্রেমে রক্তমাংসের মানুষ তুমি ভুলবে কতদিন? সেদিন সূচনা দেখা গিয়েছিল। সামলে নিলে। দ্বিতীয়বার হয়তো পারবে না।"

"পারব, আইভি। ঠাট্টা না করে সোজা কথা বল। তোমার ঠাট্টা কখনও বুঝি না আমি।"

"শোন, আমার সব থেকে বড় শত্রু তুমি। এখানে আর এস না।

"আবার তাড়িয়ে দিচ্ছ, আইভি?

"নিজের, তোমার সর্বনাশ করে একবাব যদি তোমাকে তাড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে ভালর জন্য পারব না কেন? আজ শান্ত আছ, কাল চাইবে অনেক কিছু। আমি বাধা দেব—সব মধুর সম্পর্কটা বিষাক্ত হয়ে উঠবে। নইলে, নীচে নামতে হ'বে। অনেক নেমেছি, আর পারব না। এবার ওঠার পালা।"

পরিমল ক্ষোভ দমন করে ব্যঙ্গ করে বলল "এইবারে আইভি চৌধুরীর পুনরুত্থান। সমাজ সংস্কার নিয়ে গবেষণা করেছ বিস্তর, দেখা যায়। উচিত-অনুচিত কিছুই জানার বাকী নেই তোমার, না?"

আইভি আরক্ত মুখে, উদ্দীপ্ত দৃষ্টিতে তাকাল। শেষবারের কলহ তার প্রেমিকের সঙ্গে।

"হ্যাঁ, কিছু জানবার বাকী নেই আমার। পরি, আমি অন্ততঃ ভালবাসাটা তোমার থেকে বুঝি বেশী। যে একটা ঝগড়ার কথা শুনে অধৈর্য্য হয়ে যেয়ে তক্ষুণি বিয়ে করে, তার আবার ভালবাসা!"

একমূহূর্ত্তে অঘটন ঘটে গেল। সারা মুখ পরিমলের বেদনায় নীল হয়ে গেছে।

অত্যন্ত আহত দৃষ্টিতে সে তাকাল রৈমেন্দ্রীর দিকে। একহাতে খাটের ডাণ্ডা চেপে ধরেছে সে। ভুল যে তারই হয়েছিল, এমন করে উপলব্ধি আসেনি আগে।

খাটের ওপর বসে পড়ে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে, অন্তিমপ্রার্থনা উচ্চারণের কণ্ঠে পরিমল বলল, "আইভি, চুপ কর।"

অপরাহ্নের শান্ত আলো কাঁচের ফাঁক দিয়ে আইভির কাল চুলের মুকুট উজ্জ্বল করে তুলেছে। গর্ব্বিতা রাণীর ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে আইভি উত্তর দিল, "ভালবাসার বড়াই কর তুমি! যে পর্য্যন্ত না একজনকে আমি বিয়ে করি, সে পর্য্যন্ত আমাকে হারাবার ভয় ছিল তোমার?"

দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল।

গভীর ছিল ভালবাসা আইভির, পরিমলের কাছ থেকে গোপন করে রাখত ব্যঙ্গ-রঙ্গের ছায়া দিয়ে। পাশ্চাত্যপন্থী সমাজে অত প্রেমের স্থান কোথায়?

পরিমলের ঠোঁটে অকথিত কথাগুলো যেন কাঁদছে। আইভির দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটা কথাই বলল সে, "আমার ভালবাসার পরীক্ষা চাই তোমার?

আইভি উত্তর দিল, "কিছুমাত্র না।"

"তবে, আইভি," মর্ম্মভেদী কণ্ঠে পরিমল ডাকল,—"আইভি, চল আমার সঙ্গে, আমরা কোথাও চলে যাই।"

ঘৃণার স্বরে আইভি উত্তর দিল, "Don't be silly. মনে আছে, পরি, একদিন আমরা আমাদের জীবনের উপসংহার নিয়ে আলোচনা করেছিলাম?'— অতীত-বর্ণনায় আইভির স্বর লঘু হয়ে উঠল,

"এই রকম উপসংহার করতে চাও তুমি?"

"কেন চাইব না? ধর্ম্ম বা ভগবানের অনুশাসনে আমার কি প্রয়োজন? যে ভগবান বিনা কারণে আমার সারা জীবন এমন ভাবে নষ্ট করল, তাকে আমার চাইনে! আমি চাই তোমাকে। ভালবাসায় পাপ নেই, আইভি। যদি তোমাকে ভাল না বেসে চাইতাম, তাহলে দোষ হ'ত। কেন?'—পরিমলের স্বরে উদ্ধত বিদ্রোহ—" কেন? ভগবান নিজে কি? প্রেমের দেবতা রাধাকৃষ্ণ কি? তাঁদের দেবতা বলে নামকীর্ত্তন করা হচ্ছে কেন? আইভি, প্রেমে কিছুমাত্র অপরাধ হয় না, বরঞ্চ ভাল না বেসে অন্যের ঘর করা—প্রতিমুহূর্ত্তে নিজের সঙ্গে, অপরের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। এটা আমাদের আত্মার অপমান, আত্মহত্যার সমান এ অপরাধ।"

পরিমলের কণ্ঠস্বর অশান্ত। মুখের সামান্য অমার্জিত ভাব বিরহের আগুনে অদৃশ্য। কমনীয়, মেয়েদের মত কমনীয় মুখে অতৃপ্ত প্রেমের অপরিসীম জ্বালা।

বিনাদোষে তোমাকে শাস্তি দিইনি, পরিমল লাহিড়ী। তুমি ভুলে গেছ, আমি ভুলিনি। সেই নিরপরাধ পশুকে হত্যা? আরও কত করে গেছ। সব জমা আছে। সব অঙ্ক মিলিয়ে তবে না উপসংহার?

অনন্ত বিরহে প্রায়শ্চিত্ত করুক আত্মা, একদিন শুভ্র বেশে উত্থান করবে সে বিরহান্তে, যে বেশে আমি তাকে প্রথম পাঠিয়েছিলাম পৃথিবীতে।

"তারপর ফিরে যেন পুণ্ডরীক-দেহ
দগ্ধ-ধৌত প্রাণ মোর করিল গ্রহণ,
গলে তব করার্পিত একাবলী হার,
অন্তর-দর্পণে স্থিরা মহাশ্বেতা-ছায়া।
দুঃস্বপন অবসানে কিবা জাগরণ,
মহাশ্বেতা-পুণ্ডরীক চির-পরিণীত।"

আইভি মোহাচ্ছন্নার মত তাকিয়ে আছে পরিমলের মুখের দিকে। দীর্ঘ নয়নে তার স্বপ্নচ্ছায়া। বেয়ারা চায়ের ট্রে নামাল দু'জনের সামনে ত্রিপদী টেনে। নিজেকে সংবরণ করে পরিমল ব্যগ্র হয়ে উঠল, "কই, ফল দেয়নি কেন তোমাকে? শুধু ডিম দিয়ে চা খেওনা তুমি। বেয়ারাকে বলে দাও। কিছুদিন হ'ল তোমার শরীব আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

আইভি চা ঢেলে তার হাতে তুলে দিয়ে ক্লান্ত কণ্ঠে বল, "সারাদিনই তো খাচ্ছি, পরি। সেদিকে চোখ রেখেছ তুমি। ফলের ঝুড়ি, ডিমের ঝোড়া, উপহারে প্যানট্রি ছেয়ে দিয়েছ। টনিকের শিশি আর রাসায়নিক খাদ্যে ঔষধের কার্বাডে জায়গা রাখনি। কিন্তু কতদিন এমন করে চলবে? কাজ কামাই করে করে অসময়ে হাজির হচ্ছ। আজ একটা মীমাংসা হওয়া দরকার!"

"আইভি, তুমি কি জান প্রতিটি খাদ্য মুখে তুলতে দম আটকে যায় আমার? ঐশ্বর্য্য আমার শ্বাস বন্ধ করে আনে। তোমাকে দেওয়া মানে, আমার নিজেকে দেওয়া। নইলে, মুখে তুলতে পারি না।"

"প্রায় একবছর আমাদের আবার দেখাশোনা চলছে। এর মধ্যে আমাকে তুমি কত উপহার দিয়েছ ও দিতে উদ্যত হয়েছ, ভেবে দেখ। কতদিন চলবে এসব?"

বেয়ারা সরু করে কাটা আপেল, ন্যাসপাতির পাত্র রেখে গেল, সঙ্গে আঙুরের গোছা। বেয়ারা চলে যাবার অপেক্ষা করতে লাগল পরিমল।

"আমার সব তোমার। ভালবাসা নিলে এও নিতে পার।"

"ভালবাসা নিয়েছি, ভালবাসা দিয়েছি সত্যি। আজ পর্য্যন্ত আছে প্রেম। কাল যদি চলে যায়, তবে?"

"চলে যাতে না যায় তারই জন্য চলে এস তুমি। এস আমার সঙ্গে।"

"পাগল!" আইভি চায়ের বাসন সরিয়ে রাখল।

পরিমল ব্যগ্রস্বরে বলে যেতে লাগল, "যখন আমরা জানি না কি কাজে এখানে এসেছি, তখন কেমন করে বুঝব প্রাণ যা চায় তাই করাই কর্ত্তব্য নয়? হয়তো, এই প্রত্যেকটি ইচ্ছা পূর্ণ করাই আমাদের মনুষ্যত্বের লক্ষণ। জীবনকে উপভোগ কর আইভি"—মৃদু আদরের মত পরিমলের স্বর নত—"আইভি, তুমি আমাকে চাও, আমি তোমাকে চাই। এস, আমরা কোথাও যাই। নূতন করে জীবন-যাত্রা আরম্ভ করিগে।"

আইভির সুন্দর নয়নে মুক্তার মত অশ্রুবিন্দু ধীরে ধীরে জমা হ'ল, গলার চুম্বন-মুক্তাহারের মত। তারপর সে চোখের মুক্তাহার একটি একটি করে খসে পড়তে লাগল আইভির দাড়িম-রক্তকপোলে। প্রথম পরিমল আইভির চোখে অশ্রু দেখল আজ। যেদিন সে তাদের জীবনের অশুভতম মুহূর্ত্তে পরিণয়-বার্ত্তা নিয়ে আইভির কাছে গিয়েছিল, সেদিনও আইভি পরিমলের সম্মুখে ক্রন্দন করতে পারেনি।

পরিমল আইভির শিথিল মণিবন্ধ সজোরে চেপে ধরে রুদ্ধ কণ্ঠে ধৈর্য্যের শেষ সীমায় উপনীত কণ্ঠে, উন্মাদের মত করে বলে উঠল, "এস। আমার সঙ্গে তোমাকে আসতেই হ'বে।"

আইভি চকিতে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পূর্ব্বের মত অভ্যস্ত ব্যঙ্গভঙ্গিতে হাসবার চেষ্টা করল—"It is too late now. বড় দেরী হয়ে গেছে।"

পরমুহূর্ত্তে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করল। পথরোধ করে দাঁড়াল পরিমল, "আজ আর কুকুরের মত তাড়িয়ে দিতে পারবে না, আইভি। আমি যাব না।"

আইভি ফিরে এসে খাটে বসল, শান্ত স্বরে বলল, "বেশ, শোন সব কথা। আমি তো মীমাংসা করতেই চাই। বস এখানে। কিছুদিন হ'ল আমাকে একেবারে উত্যক্ত করে তুলেছ, পরি। তোমাকে বারেবারে ফেরানো, সে

আমার নরক-যন্ত্রণা, তুমি কি তা বোঝ না? যেটুকু পাপ করেছিলাম, তার প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও হয়নি?"

মাথা নীচু করে বসল পরিমল, শান্ত-সমাহিত স্বর আইভির, শীর্ণ মুখে এমন গভীর বেদনা, যার কাছে পরিমলের উন্মাদ আবেগ ছেলেমী বলে মনে হয়।

আইভি বলল, "একদিন প্রতিক্রিয়া বিষয়ে কয়েকটা কথা তোমাকে বলেছিলাম। আশাকরি, মনে আছে। প্রতিটি বস্তুর মূলে আছে re-action. যখন এই প্রতিক্রিয়া এসে পড়ে, পরস্পরকে যখন আর ভাল লাগে না তখনকার জন্যে চাই একটা বন্ধন, যেটা উভয়কে বেঁধে রাখে। তারপর হয়তো সাময়িক প্রতিক্রিয়া চলে গেলে আবার পুবাণো আকর্ষণ ফিরে আসে। না-ও আসতে পারে। এই প্রতিক্রিয়ার গোড়ায় যাতে যে যার মত চলে যেতে না পারে, তাই সৃষ্টি হয়েছে বিবাহ-বন্ধনের। কোন বন্ধন না মানলে থাকি কেমন করে?"

পরিমল বলতে লাগল, "বন্ধন কি নেই"—

বাধা দিয়ে পরিমলকে বলে গেল আইভি, "প্রেমের বন্ধনে চলে না শুধু, সমাজের বন্ধনও চাই। চুপ কর, পরিমল। মনে আছে আমার তোমার কথা। ধর্ম্মত্যাগ আমি করব না। ধর্ম্মে আমি বিশ্বাস করি। হিন্দুমতে বিয়ে আমার ইচ্ছায় হয়েছিল।"

"বেশ, এমনি থাকব আমরা। নূতন জগৎ তৈরি করব।"

"তাতেও বাধা আছে। আমার সন্তান কি পরিচয় দেবে মায়ের?"

"সন্তান না-ই হ'ল। চাইনে আমি সন্তান।"

"কিন্তু আমি তো চাই, পরি। চেষ্টাব ক্রটী করিনি এবার। সফল হয়েছি।"

"ওঃ! নিখিলের ছেলে তোমার হ'বে।" আইভির ক্লান্ত মাধুরী দুচক্ষু ভরে পান করল পরিমল—গর্ভিণীর স্নিগ্ধ শোভা। "ও, তাই মীমাংসা চাও, আইভি?"

"হ্যাঁ, মীমাংসার শেষ করে দিয়েছি সন্তান ধারণ করে।"

"তাহ'লে, দেখছি কোন অগ্রগতিই নেই তোমার। 'যোগাযোগের' কুমুই হ'লে তুমি অবশেষে!"

"না, আমি কুমু নই। স্বামীর সঙ্গে যোগ নেই আমার, আছে কেবল সন্তানের সঙ্গে যোগ। আমার ভবিষ্যৎ।"

"এই আবর্জ্জনায় পড়ে থাকবে? কুমুর মত ঘৃণা করেও ঘর করে যাবে নির্ব্বিচারে? সেই তোমার সন্তানের ভবিষ্যৎ?"

"না, সন্তানের জন্যেই পরিবেশ ত্যাগ করে যাব, অন্যায়কে আঁকড়ে ধরব না। গোপনতার বেড়া ভেঙ্গে ফেলব এবার।"

"তাহ'লে—?" পরিমলের স্বরে আশা।

"না, পরি। একটা অন্যায় আর একটায় ঢাকে না। যাব রাঁচীতে। মাসীমার প্রকাণ্ড বাড়ী, বারবার যেতে বলেছেন। আমি সব কথা প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়ে যাইনি। এবার যাব দীর্ঘদিনের মত, হয়তো চিরদিনের মত। কাছে থেকে নিখিলকে শোধরানো গেল না। দূরে যেয়ে ওকে সুযোগ দেব। যদি পরিবর্ত্তন হয় ফিরব। নইলে,—আমার সন্তানকে কোন কলঙ্কের মধ্যেই আনব না আমি।"

পরিমল বিছানায় অবসন্ন হয়ে পড়ল,—"রাঁচী চলে যাচ্ছ? মানে, আমার কাছ থেকে পালাচ্ছ তুমি? তোমার চলবে কি করে?"

"মাসীমার টাকার শেষ নেই, অতিথি আমি। মা-বাবারও অভাব এখন মিটেছে। মাকে দেখবার জন্যে সর্ব্বদা একটি সঙ্গিনী রেখেছেন ওঁরা। সেই কাজটাই আমি করব।"

"আইভি, তবু আমার কাছ থেকে নেবে না কিছু?" স্নেহ-শীতল এক-খানি হাত পুরাণো দিনের মত মাথায় পড়ল; কপোলে নেমে এল পরিমলের অসঙ্কোচে। এত সহজে স্পর্শ করেনি আইভি কখন। প্রেমিকার হাত নয়—জননীর হাত। অতি অনায়াসে পরিমলের নাগালের উর্দ্ধে চলে গেছে আইভি।

"তোমার দরজা আমার জন্যে চিরদিন খোলা রইল, জানি, পরি। আমার প্রয়োজন হ'লে তোমার কাছেই প্রথমে আসব। মায়ের সেবা আমার কর্ত্তব্য। মা আমার জন্যে কত করেছেন! কাছে গেলে জেনে ফেলবেন আমার দুর্ভাগ্য, হয়তো রুগ্ন শরীরে আঘাত পাবেন, তাই ভেবে কাছে থাকিনি একদিনও। মা-ও ভেবেছেন আমি এত সুখী যে নিখিলকে ছেড়ে যেতে চাই-না।"

"এবারে ব্যাপারটা যদি বুঝে ফেলেন?"

"আমি নিজেই বলব। আঘাতকে মিথ্যার মোহে কতদিন ঢেকে রাখব। একটি জীবনের দায়িত্ব আমার ওপরে এখন। আমাকে সত্যপথে চলতে হ'বে।"

পরিমলের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল এতক্ষণে—"আইভি, তোমার মা তোমাকে চান। নিখিলের নির্ভর তোমার ওপরে। সন্তান তোমার চাইবে মাকে। আমাকে কার হাতে দিয়ে যাবে?"

আইভির অধরে সকরুণ হাসি, "সন্তান তোমারও হ'তে পারে, পরি। তোমার স্ত্রী তোমার অপেক্ষায় আছে। গুণী সে, তার ভালবাসা সহজে মরে না। জনতার এক অংশকেও অন্তত: যে কোন শিক্ষা দিতে যে চায়, তার মন কত বড়। অনেক নিয়েছ তার কাছ থেকে। এবার দাও তাকে ফিরিয়ে।"

পরিমল সবেগে বিছানায় উঠে বসল, "পাই-পয়সাটি তার শোধ দিতে আমি প্রস্তুত। আমি অন্য কাউকে নিতে পারব না।"

"খুব পারবে। বিবাহ সফল করতে ভালবাসাই একমাত্র প্রয়োজন নয়। আর, বৈদেহীর পয়সা শোধ দিলেও ঋণী তুমি থাকবে আজীবন। দরকারের সময় যার কাছে নিয়েছ, তার কাছে দরকার ফুরলেও ঋণ ফুরয় না। আর তোমার মনে বৈদেহীর প্রতি শ্রদ্ধা এসেছে। এখনও আশা আছে।"

"ওকথা যাক। আইভি, আইভি কিছু নাও। আমাকে না নিলেও আমার কাছ থেকে কিছু নাও। আমি থাকব কি করে?"

আইভির হাত পরিমলের চুলে খেলা করে যাচ্ছিল, ঘুম-পাড়ানী ছড়ার স্বরে বলে গেল আইভি, "অনেক দিয়েছ তুমি। অনেক নিয়েছি তোমার কাছে। নূতন জীবন গড়ে তোলার আশা পেয়েছি তোমার কাছ থেকে। সেটা মস্ত পাওয়া। মরেই তো ছিলাম, পরি। তুমি এলে হঠাৎ। আবার আমার জীবন বেঁচে উঠল। মনে শক্তি এল: একজন আমাকে ভালবাসে এত, তার জন্যে আবার বাঁচব আমি, আমি মাথা তুলে দাঁড়াব। আমাকে যেন সে চিরজীবন ভালবেসেই যেতে পারে। আমার নূতন জীবন তোমারি দেওয়া।"

শীতল—নিস্তাপ একটি চুম্বন নেমে এল পরিমলের ললাটে, "এই শেষ। আজকালের মধ্যেই চলে যাব। খবর পাবে। আর আমার সঙ্গে দেখা কোর না। কি জানি, যদি ফেরাতে না পারি।"

"আইভি, দেখা হ'বে না? আমি থাকব কি করে?"

"যেমন করে আমি থাকব। জেন, তোমাকে চিরকাল আমি ভালবেসেই যাব! পরকালে আমি বিশ্বাস করি।"

চোখের জল অতর্কিতে ঝরে পড়ল, মিশল পরিমলের চোখের জলে। তৎক্ষণাৎ আইভি একলাফে খাট ছেড়ে উঠল। নিমিষে চোখ মুছে ফেলল, লঘু রঙ্গ ফুটে উঠল মুখে-চোখে। অভ্যস্ত লীলা-চপল ব্যঙ্গে আইভি হাল্কা স্বরে বলল, "এবারকার মত উপসংহার এইভাবেই হ'ক এ উপন্যাসের। অতি-

আধুনিক আমাদের সইবে না। বেশ মিষ্টিগোছের ত্যাগমূলক উপসংহার লিখুন বিধাতা-পুরুষ। পরের বারে দেখা যাবে।”

অলক্ষিত স্বরে অশ্রুত-কণ্ঠে ভেসে এল: কি পুষ্প-ধনু, ত্রিলোকের গর্ব্ব খর্ব্বকারী, এবার গর্ব্ব রইল কোথায়? পুতুল-নাচের পুতুল মানুষ। বারেবারে তাকে দড়ির টা'নের পথ থেকে ভ্রষ্ট করে নাও তুমি। বিধাতার ওপরেও বিধাতা তুমি না? এবারে কি হ'ল? দেখ, আমার সৃষ্ট দুইটি মানুষ, নর ও নারী তোমার ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করে আমার পথে আমার সৃষ্ট প্রেম—তোমার সৃষ্ট প্রেম নয়—সার্থক করে তুলল। সত্যই, নিজের মত করেই মানুষকে নির্ম্মাণ করি আমি। তাদের দেবত্ব দেখলে আপন সৃষ্টির মহিমার প্রমাণ পাই। আমার সৃষ্ট মানুষ এই—আগামীকালের মানুষ এরা। ভ্রষ্ট স্বর্গরাজ্যকে এরাই ফিরিয়ে আনবে। এ কাহিনীতে সম্পূর্ণ পরাস্ত তুমি, মনোভব। এ উপসংহার তোমার রচনা নয়—আমার নিজের হাতে লেখা। এ উপসংহার আমারি উপযুক্ত।

—শেষকথা—

বিদায়, আইভি! আমার জীবনেব শতদল তুমি! চিবদিন দূরে দূবেই থাক; কাছে এসে তোমার কি প্রয়োজন? যদি কোনদিন দুবন্ত বাতাসে তোমার একটি পরাগও শিথিল হয়, যদি তোমাব উপরাগ নিঃশেষ হয়ে যায়, সে যন্ত্রণা, আমার সহ্য হ'বে না। তার চেয়ে ভাল এই বিরহ-যন্ত্রণা —যা আমার রাত্রিকে নিদ্রাহীন, দিনকে বিষাক্ত করে তুলেছে, তবু মনে হ'ক তুমি তুমি-ই আছ। সুদূর আকাশে তারার মত আমার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জেগে থাক তুমি। শুক্লপক্ষে ব্যাপক চন্দ্রিকার মত তোমার স্মৃতি আমার বিরামকে পূর্ণ করে মধুময় করে তুলুক।

পরিণীতা পত্নীর মত আমার অতি নিকটে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেও না তুমি। কল্পনার দেবী আমার, পরলোকে আমার আত্মার মত রহস্যময় পবিত্র রূপই তোমার শোভা পায়। কামনা দিয়ে মলিন করতে চাই না তোমাকে। তুমি থাক দূরে দূরে—তোমার ভালবাসা আমাকে উর্দ্ধে নিয়ে যাক। বিদায় আইভি!

[১৩৪১ সালে লিখিত – সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত]

সংশোধন

নানা কারণে বইখানিতে নানারূপ ছাপার ভুল আছে। সম্পূর্ণ সংশোধন সম্ভব নয়। কয়েকটি গুরুতর ভুলের সংশোধিত রূপ দেওয়া গেল। পাঠকবৃন্দ স্বয়ং সংশোধন করিয়া লইবেন ও ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভুল	সংশোধন
'খেলাঘর'	৩	১৫	ওর	ওই
'দীক্ষা'	৯	৮	গুস্মা	গুস্থা
'ফরাশী শিক্ষক'	১৫	১৩	ক্রই	ক্রুই
'লোফারের কাহিনী'	২২	১৭	মেয়েদের	মেদের
'চিরজয়ী'	৫৭	১১	গুমরয়া	গুমরিয়া
'লুসিফার'	৩৩	২৩	দিয়া	দিয়ে
'শরণং গচ্ছামি'	৭৫	৮	খুঁজিছে	খুঁজেছি
'প্রমথ চৌধুরী'	৯৩	২০	এসছে	এসেছ
	৯৭	২৭	সংজ্ঞা-বিভিন্ন	সংজ্ঞা,—বিভিন্ন

'অরণ্যমর্ম্মর' ১০৬ পৃঃ দুই নম্বরের সনেটএর ৭ নং পংক্তির অর্দ্ধেক ছাপা হয় নাই। সম্পূর্ণ পংক্তি—

'ধূলিকণা ঝেড়ে রেখে ফুলবাস মাখি'—

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভুল	সংশোধন
		১১	যায়	যার
	১১৪ ৪ নং সনেট	৪	মিশাবে	মিশবে
		৮	যবে	কবে
	১১৭	৫	পনয়নের তে	নয়নের পাতে
'ইতুর'	১২৬	১০	বাসরশয়ন	বাসকশয়ন
'উপসংহার'	১৪৭	১৯	নগরে	নগর
	১৪৮	১২	প্রবাহমান	প্রবহমান
	১৫০	১২	গুঞ্জন	গঞ্জন

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভুল	সংশোধন
উপসংহার	১৫২	৭	এখন	এখনই
	১৫৩	৫	ফুটে	যুটে
	১৫৪	৭	বেশ	বেশী
	১৫৬	১৪	ওই	ওই
	১৬০	১২	পরিপাট্য	পারিপাট্য
	১৬২	২৪	বিভাবরীর	বিভাবরী
	১৬২	২৭	দেখিল	দেখল
	১৭৩	১৬	ভাস্কর	ভাস্বর
	১৭৪	৬	সুগন্ধাকুল	সুগন্ধাকুল
	১৭৫	১৭	কৌতুক পারো	কৌতুকপরা
	১৭৯	২৬	ক্রীড়াজড়িত	ব্রীড়াজড়িত
	১৮৬	১৬	থাক	যাক
	১৮৭	১৭	বরিষে	বরিখে
	১৮৭	২৮	আহ্বানে	আহ্বান
	১৮৮	১৪	রাখ	রাখছে
	১৮৯	১৯	প্যানকেকো	প্যানকেকে
	১৯০	১৬	উল্লাসিত	উল্লসিত
	২০৬	৪	Mc. calls	Mc calls